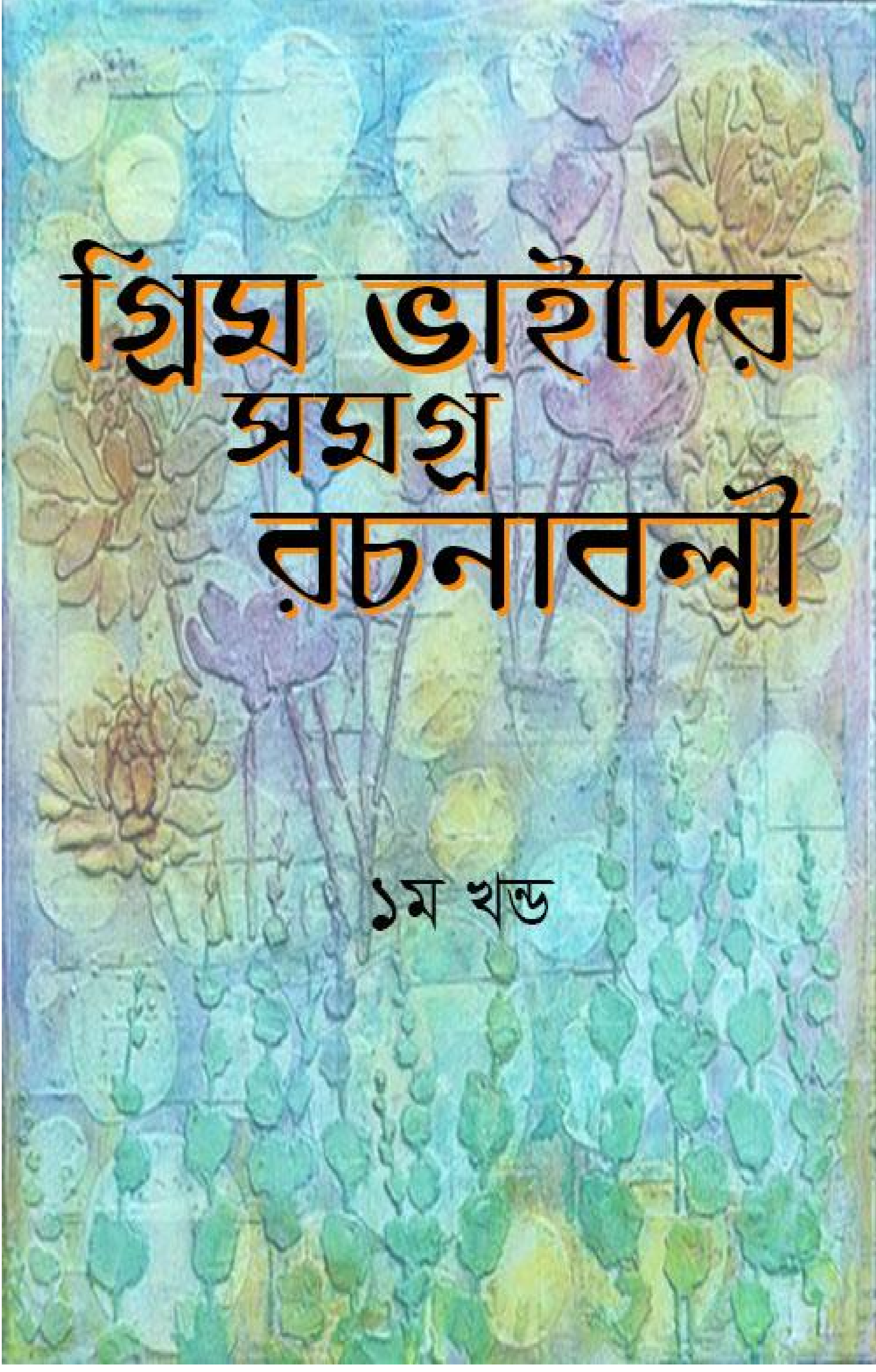
গ্রিম ভাইদের সমগ্র রচনাবলী

১ম খন্ড



গ্রিমভাইদের সমগ্র রচনাবলী

১

অনুবাদ

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ।। কলিকাতা-সাত

প্রথম প্রকাশ ঃ
জ্যৈষ্ঠ ১১, ১৩৬৫
মে ২৫, ১৯৫৮

প্রকাশিকা
গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ/১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

মুদ্রাকর :
মৃণাল দত্ত
একলা প্রিণ্টিং প্রেস প্রাঃ লিমিটেড
৭২/১, শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

বাঁধাই :
মহামায়া বাইণ্ডার্স
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

ভূমিকা

ইংরেজিতে একটি শব্দ আছে—GRIM। অভিধানে এই শব্দটির নানা অর্থ দেওয়া হয়েছে। যেমন—করালদর্শন, হিংস্র, দুর্দান্ত, ভয়ানক, কঠোর। কিন্তু ঐ শব্দটির সঙ্গে আর-একটি ইংরেজি M অক্ষর যদি জুড়ে দাও তা হলে শব্দটি হয়ে ওঠে GRIMM এবং তখন সেটি আর ইংরিজি শব্দ থাকে না। হয়ে ওঠে এমন দুই ভাইয়ের পদবী যাঁরা রূপকথা বানাবার রাজা।

এই দুই ভাইয়ের পুরো নাম হচ্ছে—জেকব লুড্‌উগ কার্ল গ্রিম এবং উইল্‌হেল্‌ম্‌ কার্ল গ্রিম। দুজনেরই জন্ম জার্মানির হানাউ শহরে। জেকব জন্মেছিলেন ৪ঠা জানুয়ারি, ১৭৮৫ সালে। উইল্‌হেল্‌ম্‌-এর জন্ম ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৬। খুব ছেলেবেলাতেই তাঁরা তাঁদের বাবাকে হারান। কিন্তু তাঁরা ছিলেন খুব সাহসী ছেলে। বিশেষ করে জেকব। তাঁদের মা শোকে-দুঃখে একেবারে ভেঙে পড়েন। কিন্তু ন' বছর বয়সে তাঁদের দরিদ্র সংসারের ভার নিজের কাঁধে তুলে নেন জেকব। উইল্‌হেল্‌ম্‌ ছিলেন রুগ্‌ণ আর দুর্বল—জীবন-সংগ্রামের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

ভবিষ্যতে যে-দুই ভাইয়ের নাম বইয়ের জগতে অতি বিখ্যাত হয়ে পড়ে তাঁদের বাইরের সাহায্য ছাড়াই নিজের প্রচেষ্টায় লেখাপড়া শিখতে হয়। কাস্‌সেল শহরে তাঁদের ইস্কুলের দিন কাটে। তার পর তাঁরা শিক্ষালাভ করেন মারবুর্গ শহরে। সেখানে তাঁরা বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন ব্যবহারশাস্ত্র আর বিজ্ঞান। তাঁদের দুজনের স্বাস্থ্য ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের, কিন্তু রুচিতে আশ্চর্য মিল। তাঁদের জীবনে ঝোঁক ছিল শুধু দুটি জিনিসে—প্রকৃতি এবং বই। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই ঝোঁক তাঁদের বজায় ছিল। বুদ্ধিগত জীবনে তাঁদের মতো অন্তরঙ্গ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে নেই বললেই চলে।

উইল্‌হেলম্‌ বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু জেকব ছিলেন চিরকুমার। কিন্তু এক বাড়িতেই তাঁরা থাকতেন আর অধ্যয়ন করতেন একই বিষয় নিয়ে। ফুল, গাছ, পাতা, আকাশের তারা, নুড়ি, বন, নদী, হ্রদ,

ঝরনা, সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত—এই-সব নিয়ে তাঁদের কৌতূহল কোনোদিন মেটে নি। যখনই বেড়াতে বেরুতেন, প্রকৃতির অফুরন্ত ভাঁড়ার ঘর থেকে কিছু-না-কিছু নমুনা তাঁরা সংগ্রহ করে আনতেন—হয় লতা-পাতা, নাহয় ডালপালা কাঠকুটো, নাহয় পাথর আর নুড়ি। পাতাগুলো সযত্নে তাঁরা রাখতেন খাতার মধ্যে। তলায় লিখে রাখতেন যেখান থেকে সেগুলো এনেছেন সেই-সব জায়গার নামধাম।

গ্রিমভাইরা বলতে গেলে কখনোই একসঙ্গে বেড়াতে বেরুতেন না। উইল্‌হেল্‌ম্‌ বেশি দূর হাঁটতে পারতেন না। আর হাঁটতেনও খুব ধীরে-ধীরে। কারণ তিনি ভুগতেন হৃদরোগে। কিন্তু জেকব ছিলেন খুব সুস্থ-সবল। তাঁর কর্মশক্তিও ছিল অফুরন্ত। তাঁর ঘোরাফেরার ধরন-ধারণও ছিল এলোমেলো গোছের। প্রায়ই তাঁর ভাইয়ের পরিবারবর্গকে চমকে দিয়ে তিনি ঘোষণা করতেন—চললেন ইতালি, স্যুইডেন কিংবা অন্য কোনো বিদেশে। আসলে প্রকৃতিকে ভালোবাসতেন বলেই এইরকম এলোমেলো তিনি ঘুরে বেড়াতেন আর স্বাস্থ্য ভালো ছিল বলেই তিনি পারতেন ও-ভাবে ঘুরতে।

তাঁদের প্রিয় পিতৃভূমি জার্মানির তখন অত্যন্ত দুর্দশা। নিজেদের দেশকে তাঁরা খুবই ভালোবাসতেন। দেশের দুঃখ দৈন্য দেখে সর্বদাই তাঁদের প্রাণ কাঁদত। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাঁরা যুক্ত হয়ে পড়েন নি। তাঁদের জীবনের প্রধান কাজ ছিল স্বদেশের সমস্ত মানুষকে জানা—বিশেষ কোনো অঞ্চল বা বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর মানুষকে নয়।

"হিস্‌সিয়ান জাতীয় গ্রন্থাগারের" গ্রন্থাগারিকের পদে বহু বছর ধরে তাঁরা নিযুক্ত ছিলেন। সেটা ছিল একেবারে তাঁদের মনের মতো কাজ। তার পর তাঁরা যোগ দেন গোট্‌টিনজেন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে। বার্লিন শহরে উইল্‌হেল্‌ম্‌-এর মৃত্যু হয় ১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৫৯ সালে। এর চার বছর পর বার্লিন শহরেই জেকবেরও মৃত্যু হয়।

গ্রিম্‌ভাইদের অমর রূপকথাগুলি প্রধানত লেখা হয় শিশুদের জন্য। কিন্তু নিঃসন্দেহে তাঁরা বুঝেছিলেন রূপকথা বড়োদেরও একদিন ভালো লাগবে। নানা জায়গা থেকে রূপকথাগুলি তাঁরা সংগ্রহ করেছিলেন। শোনা যায় উইল্‌হেল্‌ম্‌-এর স্ত্রী ডোরোথিয়া তাঁকে বলেন অনেক রূপ-কথা। ডোরোথিয়া সেগুলি শুনেছিলেন তাঁর মায়ের মুখে। যেখানেই

তাঁরা যেতেন সেখানেই চাষীদের মুখ থেকে সাগ্রহে গল্প শুনতেন আর সংগ্রহ করতেন সেই এলাকার নানা লোককাহিনী, নীতিগল্প (যাতে জীবজন্তু, গাছপালা, ইত্যাদি মানুষের মতো আচরণ করে), পৌরাণিক কাহিনী আর উপকথা। এইভাবে গল্পগুলি বার বার তাঁরা নতুন করে লিখতেন, নতুন করে সাজাতেন। এইভাবে নিজেদের অজান্তেই নিজেদের এমন একটি স্মৃতিসৌধ তাঁরা স্থাপন করে গেছেন যেটি ১৮৯৬ সালে তাঁদের জন্ম-শহর হানাউতে উন্মোচিত তাঁদের মর্মর মূর্তির চেয়েও অনেক বেশিকাল স্থায়ী হবে।

এই-সব অপরূপ রূপকথাগুলি পড়তে-পড়তে মনে হয় গ্রিম্‌ভাইরা আমাদের মতো সাধারণ মানুষ ছিলেন না, যারা হেসে-খেলে খেয়ে-ঘুমিয়ে বেঁচে থাকে। মনে হবে তাঁরা ছিলেন দুই আশ্চর্য জাদুকর, যাঁরা থাকতেন এক গহন অরণ্যের মাঝখানে এক জাদুময় প্রাসাদে—যেখানে নানা অকল্পনীয় সৌন্দর্য আর সম্ভাবনা। সেই অরণ্যের রহস্যাময় গভীরে ঘুরে বেড়ায় পরী আর অপ্সরা, দানব আর ডাইনি। আর যেখানে কাজ করে নানা শুভ সৎ শক্তি আর নানা অশুভ মন্দ শক্তিও। এক কথায় যেটা রূপকথার রাজ্য।

পুলু টুবাই পিঙ্কু রায়

মন পাওয়া যায় রূপকথায় ?

সূচীপত্র



হাঁস-চরানো মেয়ে

এক সময় এক বুড়ি রানী ছিল। অনেক বছর আগে তার স্বামী পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। রানীর ছিল সুন্দরী এক মেয়ে। বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে তার রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল আর তার পর তার বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল এক রাজপুত্তুরের সঙ্গে। বিয়ের দিন এগিয়ে আসতে রাজকন্যের বিদেশে যাবার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। যৌতুক হিসেবে বুড়ি রানী দিল দামী-দামী বহু আসবাবপত্র আর সোনা-রুপো-হীরে-পান্নার অনেক গয়না। কারণ মেয়েকে রানী খুব ভালোবাসত। রাজপুত্তুরের কাছে রাজকন্যেকে পৌঁছে দেবার জন্য রানী তার সঙ্গে দিল এক দাসী। সেই দাসী আর রাজকন্যে—দুজনকেই দেওয়া হল একটা করে ঘোড়া। রাজকন্যের ঘোড়ার নাম ফালাডা। সেটা কথা বলতে পারত।

যাত্রার সময় হয়ে গেলে বুড়ি রানী তার শোবার ঘরে গিয়ে ছোট্টো একটা ছুরি দিয়ে নিজের আঙুল কেটে রক্ত বার করল। তার পর সাদা ছোট্টো একটা রুমালে রক্তের ফোঁটা ফেলে মেয়েকে সেটা দিয়ে বলল, "বাছা, এই রক্তের ফোঁটাগুলো সাবধানে রেখো। পথে এগুলো তোমার কাজে লাগবে।"

বিদায় নিয়ে রুমাল নিজের বুকের মধ্যে গুঁজে রাজকন্যে যাত্রা করল। ঘণ্টা খানেক যাবার পর তেষ্টায় গলা শুকিয়ে যেতে দাসীকে রাজকন্যে বলল, "ঘোড়া থেকে নেমে ঐ ঝর্না থেকে আমার নিজের পেয়ালায় জল নিয়ে এসো।"

দাসী বলল, "তেষ্টা পেয়ে থাকলে ঘোড়া থেকে ঝর্নার পাড়ে শুয়ে জল খাও গে যাও। আমি তোমার বাঁদী নই।"

তেষ্টায় গলা কাঠ হয়ে গিয়েছিল বলে ঘোড়া থেকে নেমে ঝর্নার উপর ঝুঁকে রাজকন্যে জল খেল। সোনার পেয়ালায় জল খেতে তার ভরসা হল না। তার পর আপন মনে বলে উঠল, 'হা ভগবান!' তাই শুনে তিন ফোঁটা রক্ত উত্তর দিল, "ব্যাপারটা জানতে পারলে তোমার মায়ের হৃদয় ভেঙে যাবে।"

রাজকন্যে ছিল নিরহংকার। তাই কোনো কথা না বলে আবার সে ঘোড়ায় চড়ল। আরো কয়েক মাইল যাবার পর আবার তার তেষ্টা পেল—কারণ দিনটা ছিল গরম আর রোদ্দুর কাঠ-ফাটা। সামনে একটা নদী পড়তে রাজকন্যে আবার তার দাসীকে বলল, "ঘোড়া থেকে নেমে আমার সোনার পেয়ালায় জল নিয়ে এসো।" দাসীর ক্যাট্‌কেঁটে কথাগুলো অনেক আগে সে ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু আগের চেয়েও উদ্ধত গলায় দাসী বলল, "তেষ্টা পেয়ে থাকলে একলা গিয়ে খাও গে। আমি তোমার বাঁদী নই।"

তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল বলে ঘোড়া থেকে নেমে নদীর স্রোতের উপর ঝুঁকে কাঁদতে-কাঁদতে রাজকন্যে বলল, "হা ভগবান!" আর রক্তের ফোঁটাগুলো আবার উত্তর দিল, "ব্যাপারটা জানতে পারলে তোমার মায়ের হৃদয় ভেঙে যাবে।" আর ঝুঁকে পড়ে জল খেতে গিয়ে রাজকন্যের বুকের ভিতর থেকে তিন ফোঁটা রক্তসমেত রুমালটা জলে পড়ে ভেসে গেল। রাজকন্যে টেরও পেল না। কিন্তু দাসী সব লক্ষ্য করছিল। রুমালটা ভেসে যেতে দেখে খুশি হয়ে দাসী ভাবল—যাক, কনেকে এবার মুঠোর মধ্যে পাব। কারণ রক্তের ফোঁটাগুলো হারাবার সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যে হয়ে পড়ল অসহায় আর দুর্বল। রাজ-কন্যে যখন ফালাডা নামে তার ঘোড়ায় চড়তে গেল, দাসী বলল, "ফালাডা আমার। আমার ছোট্টো ঘোড়াটায় ওঠো।" রাজকন্যে আপত্তি করতে পারল না। তার পর রাজকন্যেকে দাসী আদেশ দিল তার রানীর সাজ খুলে নিজের দাসীর পোশাকটা পরতে। সবশেষে রাজকন্যেকে দিয়ে দাসী ভগবানের নামে দিব্যি গালিয়ে নিল—যা সব ঘটেছে রাজসভায় ঘুণাক্ষরেও কোনো কথা সে জানাতে পারবে না। দাসী বলেছিল দিব্যি না গাললে সঙ্গে সঙ্গে তাকে মেরে

ফেলবে। ফালাডা কিন্তু সবকিছু দেখল-শুনল আর মনে রাখল সবকিছু।

তার পর ফালাডায় দাসী আর আসল কনে সাধারণ ঘোড়ায় চেপে পৌঁছল রাজপ্রাসাদে আর তারা পৌঁছবার পর সেখানে শুরু হয়ে গেল দারুণ আনন্দোৎসব। তাদের দিকে ছুটে গিয়ে আসল কনে ভেবে ঘোড়া থেকে দাসীকে নামাল রাজপুত্তুর। হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে দাসীকে তারা নিয়ে গেল উপরে আর আসল রাজকন্যে দাঁড়িয়ে রইল নীচের তলায়। বুড়ো রাজা জানলা থেকে দেখছিলেন। উঠোনে তিনি দেখলেন তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে। তিনি আরো লক্ষ্য করলেন মেয়েটি ভারি রূপসী, নম্র আর লাজুক স্বভাবের। তাই তিনি রানীর খাস-কামরায় গিয়ে কনেকে প্রশ্ন করলেন—তার সঙ্গে যে এসেছে আর উঠোনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে মেয়েটি কে?

দাসী বলল, "সঙ্গী হিসেবে পথে ওকে আমি জোগাড় করেছিলাম। ঝিটাকে কাজটাজ দিন। চুপচাপ বসিয়ে রাখবেন না।"

কিন্তু তাকে দেবার মতো কাজ বুড়ো রাজার হাতে ছিল না। তাই তিনি বললেন, "আমার কাছে একটা বাচ্চা ছেলে আছে। সে হাঁস চরিয়ে বেড়ায়। মেয়েটি তাকে সাহায্য করতে পারে।" বাচ্চা ছেলেটির নাম কন্‌রাড। আসল কনে তাকে হাঁস চরাতে সাহায্য করতে লাগল।

অল্পদিন পরেই কিন্তু নকল কনে রাজপুত্তুরকে বলল, "আমার একটা কথা রাখবে?"

রাজপুত্তুর বলল, "নিশ্চয়ই। কী কথা, বলো।"

দাসী বলল, "যে-ঘোড়ায় চড়ে এসেছি, কসাইকে বলো সেটার গলা কাটতে। পথে ঘোড়াটা আমাকে জ্বালিয়ে মেরেছে।"

আসলে কিন্তু সে ভয় পেয়েছিল—ঘোড়াটা সব কথা ফাঁস করে দিতে পারে।

আসল রাজকন্যে শুনল প্রভুভক্ত ফালাডাকে মেরে ফেলা হবে। শহরে একটা অন্ধকার প্রকাণ্ড তোরণ ছিল। প্রতিদিন সকাল-সন্ধেয় হাঁস নিয়ে সেই তোরণের মধ্যে দিয়ে তাকে যেতে হত। চুপি চুপি কসাইকে গিয়ে সে বলল, "ঐ তোরণে পেরেক দিয়ে ফালাডার মাথাটা গেঁথে দিলে মাঝে মাঝে সেটাকে আমি দেখতে পাব। আমার জন্যে

এই সামান্য কাজটা করলে তোমায় একটা মোহর দেব।" আসল রাজকন্যের কথামতো কসাই কাজ করল।

খুব ভোরে সে আর কন্‌রাড তোরণের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় আসল রাজকন্যে বলে উঠল, "হায় ফালাডা! হায় ফালাডা!"

সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার মাথাটা উত্তর দিল :

"হায় রাজকন্যে! হায় রাজকন্যে!
তোমার মা জানতে পারলে
নিশ্চয়ই তাঁর বুক ফেটে যেত।"



তার পর চুপচাপ কন্‌রাডের সঙ্গে শহরের বাইরে হাঁস তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে তারা পৌঁছল ঘাসে-ঢাকা বড়ো মাঠে। সেখানে বসে-বসে

আসল রাজকন্যে আঁচড়াতে লাগল তার সোনালী চুল। আর তার ঝক্‌ঝকে সুন্দর চুল দেখে ভারি খুশি হয়ে কন্‌রাড বলল কয়েক গোছা চুল সে ছিঁড়ে নেবে। কন্‌রাডের কথা শুনে আসল রাজকন্যে বলে উঠল :

"বাতাস, তুমি উড়িয়ে নিয়ে যাও
কন্‌রাডের টুপি।
ছুটুক সে তার পেছনে
যতক্ষণ-না আমার
চুল আঁচড়ানো আর চুল বাঁধা
শেষ হয়।"

তার কথার সঙ্গে সঙ্গে একটা দমকা বাতাস এসে মাঠের মধ্যে উড়িয়ে নিয়ে চলল কন্‌রাডের টুপি। যতক্ষণে টুপিটা নিয়ে সে ফিরল ততক্ষণে আসল রাজকন্যের চুল বাঁধা শেষ হয়েছে। তাই সে রাজকন্যের একগাছা চুলও ধরতে পারল না। তার উপর বেজায় চটে কন্‌রাড কথা বন্ধ করে দিলে। আর তার পর সারাদিন হাঁস চরিয়ে সন্ধেয় তারা বাড়ি ফিরল।

পরদিন সেই অন্ধকার তোরণের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় আসল রাজকন্যে আবার বলে উঠল, "হায় ফালাডা! হায় ফালাডা!"

আর সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার মাথাটা উত্তর দিল :

"হায় রাজকন্যে! হায় রাজকন্যে!
তোমার মা জানতে পারলে
নিশ্চয়ই তাঁর বুক ফেটে যেত।"

আবার আসল রাজকন্যে ঘাসে-ঢাকা মাঠে বসে-বসে আঁচড়াতে লাগল তার সোনালী চুল আর কন্‌রাড চাইল কয়েক গোছা চুল ছিঁড়ে নিতে। সঙ্গে সঙ্গে আসল রাজকন্যে আবার বলে উঠল :

"বাতাস তুমি উড়িয়ে নিয়ে যাও
কন্‌রাডের টুপি।
ছুটুক সে তার পেছনে
যতক্ষণ-না আমার
চুল আঁচড়ানো আর চুল বাঁধা
শেষ হয়।"

আবার তার কথার সঙ্গে সঙ্গে একটা দমকা বাতাস এসে মাঠের মধ্যে উড়িয়ে নিয়ে চলল কন্‌রাডের টুপি। আর টুপি নিয়ে সে যখন ফিরল তার অনেক আগেই আসল রাজকন্যের চুল বাঁধা শেষ হয়েছে।

সন্ধেয় বাড়ি ফিরে বুড়ো রাজার কাছে গিয়ে কন্‌রাড বলল, "ঐ মেয়েটার সঙ্গে আমি আর হাঁস চরাতে যাব না।"

বুড়ো রাজা প্রশ্ন করলেন, "কেন?"

"সারাদিন মেয়েটা আমার পেছনে লাগে।"

বুড়ো রাজা তাকে বললেন সব কথা খুলে বলতে।

কন্‌রাড বলল, "রোজ সকালে অন্ধকার তোরণের মধ্যে দিয়ে হাঁস নিয়ে যাবার সময় দেয়ালে আটকানো ঘোড়ার মাথাটাকে সে বলে, 'হায় ফালাডা! হায় ফালাডা!' আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা উত্তর দেয়:

'হায় রাজকন্যে! হায় রাজকন্যে!
তোমার মা জানতে পারলে
নিশ্চয়ই তাঁর বুক ফেটে যেত।' "

তার পর কন্‌রাড বলল, ঘাসে-ঢাকা মাঠে রোজ তাকে কীভাবে ছুটতে হয় তার উড়ন্ত টুপিটার পিছন-পিছন।

বুড়ো রাজা কন্‌রাডকে বললেন পরদিন সকালে আবার হাঁস চরাতে বেরুতে আর নিজে গিয়ে লুকিয়ে রইলেন অন্ধকার তোরণের মধ্যে। নিজের কানে তিনি শুনলেন আসল রাজকন্যে আর ফালাডার মাথার কথাবার্তা। তার পর সেই ঘাস-ঢাকা মাঠে গিয়ে তিনি লুকোলেন এক ঝোপের পিছনে আর স্বচক্ষে দেখলেন আসল রাজকন্যেকে সেখানে বসে তার সোনালী চুল আঁচড়াতে আর শুনলেন তাকে বলতে:

"বাতাস তুমি উড়িয়ে নিয়ে যাও
কন্‌রাডের টুপি।
ছুটুক সে তার পেছনে
যতক্ষণ-না আমার
চুল আঁচড়ানো আর চুল বাঁধা
শেষ হয়।"

আর দেখলেন তার কথার সঙ্গে সঙ্গে একটা দমকা বাতাস এসে মাঠের মধ্যে টুপিটা উড়িয়ে নিয়ে যেতে আর রাজকন্যেকে তার সুন্দর সোনালী চুল বিনুনি করে বাঁধতে।

সবকিছুই বুড়ো রাজা স্বচক্ষে দেখলেন, স্বকর্ণে শুনলেন। তার পর চুপি চুপি ফিরে গেলেন রাজপ্রাসাদে। আর সন্ধেয় হাঁস-চরানো মেয়ে বাড়ি ফিরলে তাকে প্রশ্ন করলেন—এ-সব সে করেছে কেন?

আসল রাজকন্যে বলল, "সে কথা আপনাকে বলতে পারব না। কারুর কাছে নিজের দুঃখের কথা বলব না বলে ভগবানের নামে আমাকে দিব্যি গালতে হয়েছে। তা না করলে আমাকে মরতে হত।"



কারণটা শোনার জন্য রাজা তাকে অনেক অনুরোধ-উপরোধ করলেন। কিন্তু আসল রাজকন্যের মুখ থেকে একটি কথাও বার করতে পারলেন না। রাজা তখন বললেন, "বেশ, আমাকে না বলবে তো বোলো না। তোমারই দুঃখের কথা লোহার ঐ উনুনটাকে বলো।"

রাজার কথা মতো লোহার উনুনের কাছে গিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে আসল রাজকন্যে বলে চলল, "সবাই আমাকে ছেড়ে গেছে। কিন্তু আমি এক রাজার মেয়ে। দাসী জোর করে আমার রানীর পোশাক খুলে নিয়ে নকল কনে সেজেছে আর আমাকে হচ্ছে ঝিয়ের মতো হাঁস চরাতে। মা জানলে শোকে-দুঃখে তাঁর বুক ফেটে যাবে।"

লোহার উনুনটার পিছনে দাঁড়িয়ে বুড়ো রাজা সব কথা শুনলেন। তার পর বেরিয়ে এসে দাসীদের দিয়ে তাকে পরালেন রানীর সাজ-পোশাক। আসল রাজকন্যের রূপ তখন যেন ফেটে পড়ল। বুড়ো রাজা তখন ছেলেকে ডেকে বললেন, সে যাকে কনে বলে মনে

করেছে আসলে সে দাসী আর হাঁস-চরানো মেয়েটিই হচ্ছে আসল রাজকন্যে।

আসল রাজকন্যের রূপে আর নম্র স্বভাবে মুগ্ধ হল রাজপুত্তুর। তার পর আয়োজন করা হল এক বিরাট ভোজসভার। সেখানে এল অনেক অতিথি-অভ্যাগত আর বন্ধুর দল। রাজপুত্তুরের এক পাশে বসল আসল রাজকন্যে, অন্য পাশে দাসী। আসল রাজকন্যেকে দেখে দাসীর চোখ ধাঁধিয়ে গেল কিন্তু রানীর সাজ-পোশাকের দরুন তাকে সে চিনতে পারল না।

খাওয়া-দাওয়ার পর বুড়ো রাজা দাসীকে বললেন, "তোমাকে একটা ধাঁধা বলছি। কী উত্তর দেবে, শুনি। এক সময় এক রাজকন্যে ছিল আর তার ছিল এক দাসী। রাজকন্যে বিয়ে করার জন্য যাত্রা করলে পথে সেই দাসী নানাভাবে ভয় দেখিয়ে সেই রাজকন্যের সাজ-পোশাক পরে নিজে সাজে নকল কনে।" সব কাহিনী শুনিয়ে দাসীকে বুড়ো রাজা প্রশ্ন করলেন, "এখন বলো, সেই দাসীর কী শাস্তি হওয়া উচিত।"

নকল কনে বলল, "সাজ-পোশাক খুলে তাকে ছুঁচলো পেরেক লাগানো পিপেয় ভরে দুটো সাদা ঘোড়া দিয়ে পিপেটা পথে-পথে ছেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া দরকার—যতক্ষণ-না সে মরে।"

বুড়ো রাজা বললেন, "নিজের শাস্তির ব্যবস্থা নিজেই তুমি করেছ। তোমাকে নিয়ে তাই করা হবে।"

এইভাবে দাসী মরল আর আসল রাজকন্যেকে বিয়ে করে রাজপুত্তুর মনের আনন্দে চলল রাজ্য শাসন করে।

তরুণ দৈত্য

এক চাষীর একটি ছেলে ছিল। ছেলেটি তার বুড়ো আঙুলের মতো। কয়েক বছর কেটে গেল। কিন্তু মাথায় সে একচুলও বাড়ল না।

একদিন সেই চাষী ক্ষেতে কাজে বেরুবে এমন সময় তার ক্ষুদে ছেলে বলল, "বাবা, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

তার বাবা বলল, "আমার সঙ্গে যাবি কি রে? তোকে নিয়ে তো ঝামেলার শেষ থাকবে না? তা ছাড়া তুই সেখানে হারিয়ে যেতে পারিস।"

কিন্তু ক্ষুদে ছেলে বায়না ধরে কাঁদতে শুরু করে দিল। তাই চাষী তাকে পকেটে ভরে নিয়ে চলল। ক্ষেতে কাজের জায়গায় পৌঁছে চাষী তাকে নামিয়ে দিল সবে যেখানে হাল চালিয়ে খাত কাটা হয়েছিল।

সেখানে তারা যখন রয়েছে এমন সময় পাহাড় থেকে লম্বা-লম্বা পা ফেলে বিরাট এক দৈত্য নেমে এল। চাষী চেঁচিয়ে উঠল, "ঐ জুজুটাকে দেখেছিস? ও তোকে ধরে নিয়ে যেতে আসছে।" ক্ষুদে ছেলেকে ভয় দেখিয়ে কথার বাধ্য করার জন্যই কথাটা চাষী বলেছিল। দৈত্য কিন্তু কথাগুলো শুনতে পেয়ে দু'পা ফেলে সেই খাতের কাছে এসে কোনো কথা না বলে ক্ষুদে ছেলেটাকে নিয়ে চলে গেল। ভয়ে চাষী হয়ে গেল একেবারে বোবা, তার মুখ দিয়ে রা সরল না। সে ভাবল চিরকালের মতো ছেলেকে সে হারাল, কখনো আর তার দেখা পাবে না।

দৈত্য তাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে খাওয়াতে লাগল দৈত্যদের খাবার।

তাই দেখতে-দেখতে সে হয়ে উঠতে লাগল দৈত্যদের মতো বড়ো। দু বছর কাটার পর তার শক্তি পরীক্ষা করার জন্য দৈত্য তাকে বনে নিয়ে গিয়ে বলল, "গাছের একটা ডাল ভাঙো দেখি।" চাষীর ছেলের গায়ে তখন খুব জোর। চক্ষের নিমেষে শেকড়সুদ্ধ ছোটো একটা গাছ সে ফেলল উপড়ে। দৈত্য কিন্তু মনে-মনে বলল, ছেলেটার এখনো শিখতে অনেক বাকি। তাই তাকে আবার বাড়ি নিয়ে গিয়ে আরো দু বছর ধরে খাওয়াল-দাওয়াল। ততদিনে চাষীর ছেলের শক্তি এমন বেড়ে গিয়েছিল যে, অনায়াসে সে উপড়ে ফেলতে পারত বড়ো-বড়ো গাছ। তাতেও কিন্তু দৈত্য সন্তুষ্ট হল না। আরো দু বছর ধরে তাকে সে খাওয়াল-দাওয়াল। তার পর তাকে বনে নিয়ে গিয়ে বলল, "নিজের জন্যে একটা বড়োসড় ছড়ি জোগাড় করো দিকিনি।" তাই শুনে চাষীর ছেলে অনায়াসে বনের সব চেয়ে বড়ো ওক্‌গাছটা উপড়ে নিল। তাই দেখে দৈত্য বলল, "এতেই হবে। তোমার শিক্ষা এবার সম্পূর্ণ হয়েছে।" এই-না বলে দৈত্য যেখান থেকে তাকে নিয়ে গিয়েছিল সেইখানে পৌঁছে দিল।

তার বাবা তখন জমি চষতে ব্যস্ত ছিল। ছেলে তার কাছে গিয়ে বলল, "বাবা, এই দেখো—তোমার ছেলে এখন প্রমাণ মানুষের মতো বড়ো হয়ে উঠেছে।"

তাকে দেখে আঁতকে উঠে চাষী বলল, "তুমি আমার ছেলে নও। তোমাকে আমার বলার কিছু নেই। সরে পড়ো।"

সে বলল, "আমিই তোমার ছেলে। তোমার বদলে আমায় কাজ করতে দাও। তোমার চেয়ে ভালো করে জমিতে আমি হাল দেব।"

চাষী বলল, "না, না। তুমি আমার ছেলে নও। লাঙল চষতে তুমি জান না। সরে পড়ো।"

কিন্তু প্রকাণ্ড চেহারার মানুষটাকে দেখে ভয় পেয়ে লাঙল ফেলে খানিক দূরে সরে গেল চাষী। তরুণ দৈত্য তখন এক হাতে লাঙল ধরে এমন জোরে জমিতে সেটা টিপল যে, লাঙলের ফলাটা খুব গভীর-ভাবে গেঁথে গেল মাটির মধ্যে। চাষী চেঁচিয়ে উঠল, অত জোরে লাঙলের ফলা গেঁথো না। এতে কাজ ভালো হয় না।"

চাষীর ছেলে তখন লাঙল থেকে ঘোড়াগুলোকে খুলে দিয়ে নিজের কাঁধে জোয়াল নিয়ে বাবাকে বলল, "বাড়ি গিয়ে মাকে বোলো আমার

জন্যে খুব বেশি করে রাতের খাবার রাঁধতে। ইতিমধ্যে জমিটা আমি চষে ফেলছি।"

চাষী বাড়ি ফিরে বউকে খবরটা দিল। আর চাষীর ছেলে একলাই জমি চষে তার পর দুটো মই টানল জমিতে। জমিতে মই দেওয়া শেষ হলে বনে গিয়ে দুটো ওক্‌গাছ সে ওপড়াল। তার পর একটা গাছে দুটো মই আর অন্যটায় ঘোড়া দুটোকে ঝুলিয়ে গাছ দুটো কাঁধে ফেলে এমনভাবে সে বাড়ি ফিরল, যেন ঘাসের আঁটি বয়ে এনেছে।

উঠোনে সে পেঁছিতে তার মা তাকে চিনতে পারল না। আঁত্‌কে সে চেঁচিয়ে উঠল, "এই ভয়ংকর দৈত্যটা কে?"

চাষী বলল, "তোমার ছেলে।"

তার বউ বলল, "হতেই পারে না। আমাদের ছেলে বেঁচে নেই। এত বড়ো ছেলে কখনো আমাদের ছিল না। আমাদের ছেলে ছিল ছোট্টোটি।" তার পর আবার তাকে সে বলল, "এখান থেকে সরে পড়ো। তোমাকে আমাদের দরকার নেই।"

তরুণ দৈত্য সে কথার কোনো জবাব দিল না। ঘোড়া দুটোকে আস্তাবলে রেখে খাবার-দাবার দিয়ে আবার ঘরে এসে একটা বেঞ্চিতে বসে বলল, "মা, আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। রাতের খাবার তৈরি?"

তার মা বলল, "হ্যাঁ।" তার পর মাংস-ভরা প্রকাণ্ড দুটো ডিশ তার সামনে রাখল। সেটা তার আর তার স্বামীর এক সপ্তাহের খাবার।

তাদের ছেলে ডিশ দুটো শেষ করে প্রশ্ন করল, "আর নেই?"

তার মা বলল, "না।"

"এটা খেয়ে তো সবে আমার ক্ষিদে চাগিয়ে উঠেছে। আমার আরো খাবার দরকার।"

তাকে না বলতে চাষীর বউ-এর সাহস হল না। তাই বিরাট একটা কড়াইতে শুয়োরের মাংস বোঝাই করে সে উনুনে চাপাল। রান্না শেষ হলে ছেলেকে সে আবার দিল খেতে। তাদের ছেলে বলল, "এইবার ঠিক হয়েছে।" গব্‌গব্‌ করে সবটা সে শেষ করল। তবু তার ক্ষিদে মিটল না।

খাওয়া শেষ করে বাবাকে সে বলল, "বুঝতে পারছি এখানে যথেষ্ট

পরিমাণে খাবার পাব না। আমাকে একটা লোহার শক্ত ডাণ্ডা দাও, যেটাকে হাঁটুতে রেখে ভাঙা না যায়। সেটা নিয়ে ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ব।”

তার কথা শুনে চাষী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। মালগাড়িতে ঘোড়া দুটো জুতে সে বেরিয়ে পড়ল। তার পর এমন মোটা আর ভারী একটা লোহার ডাণ্ডা নিয়ে বাড়ি ফিরল যেটা টেনে আনতে ঘোড়া দুটো রীতিমতো হিমসিম খেয়ে গিয়েছিল। তাদের ছেলে কিন্তু সেটা নিজের হাঁটুর উপর রেখে এমনভাবে মট্ করে ভেঙে ফেলল—যেন সেটা প্যাঁকাটি। চাষী তখন চারটে ঘোড়া জুতে এমন ভারী লোহার একটা ডাণ্ডা নিয়ে এল যে, ঘোড়াগুলো প্রায় হাঁটতেই পারছিল না। কিন্তু আগেরটার মতোই অনায়াসে সেটা ভেঙে তাদের ছেলে বলল, “এটাও বাজে। আরো শক্ত দেখে নিয়ে এসো।” শেষটায় চাষী আটটা ঘোড়া জুতে এমন ভারী একটা ডাণ্ডা নিয়ে এল, যেটা টানতে ঘোড়াগুলোর মুখে ফেনা বেরিয়ে গিয়েছিল। তাদের ছেলে সেটা তুলে নিয়ে এক পাশে মট্ করে ছোট্টো একটা টুকরো ভেঙে বলল, “বুঝলাম যেরকম চাই সেরকম ডাণ্ডা জোগাড় করতে পারবে না। এখান থেকে চললাম।”

কামারশালায় কাজের খোঁজে সে বেরিয়ে পড়ল। যেতে-যেতে সে পৌঁছল এক গ্রামে। সেখানে থাকত ভারি কৃপণ এক কামার। কাউকে কখনো কিছু সে দিত না। সব কিছু নিজে আত্মসাৎ করতে চাইত। চাষীর ছেলে কামারশালায় তার কাছে গিয়ে চাকরি চাইল। তার বলিষ্ঠ চেহারা দেখে খুব খুশি হয়ে কামার ভাবল, একে দিয়ে হাতুড়ি পিটিয়ে অনেক টাকা কামানো যাবে। জিগ্গেস করল, “কত বেতন চাও?”

সে বলল, “কিচ্ছু না। শুধু পনেরো দিন অন্তর অন্যদের যখন বেতন দেবে, আমার দুটো ঘুঁষি তোমায় খেতে হবে।”

কৃপণ লোকটা খুশি হয়ে ভাবল, ‘যাক্, অনেক পয়সা বেঁচে গেল। পরদিন তার প্রথম হাতুড়ির ঘা দেবার কথা। গন্গনে লাল লোহার ডাণ্ডা তার প্রভু নিয়ে এলে এমন জোরে সে হাতুড়ি চালাল যে, ডাণ্ডাটা গেল চুরমার হয়ে আর লোহার টুকরো পড়ল চার দিকে ছিট্‌কে। আর কামারের নেহাইটা এমনভাবে মাটিতে সেঁধিয়ে গেল যে, সেটাকে টেনেটুনে কিছুতেই বার করা গেল না।

ভীষণ রেগে প্রভু তাকে বলল, "তোমাকে দিয়ে আমার কাজ চলবে না। ভারি জোরে তুমি হাতুড়ি চালাও। হাতুড়ির এই একটা বাড়ির জন্যে কত তোমায় দিতে হবে?"

"তোমাকে সামান্য একটু ছুঁতে দাও। আর কিচ্ছু চাই না।"

এই-না বলে তাকে এমন একটা লাথি সে কষাল যে, খড়-বোঝাই চারটে মালগাড়ির উপর দিয়ে ছিট্‌কে পড়ল সেই কৃপণ কামার। তার পর কামারশালা থেকে লোহার সব চেয়ে মোটা ডাণ্ডাটা নিয়ে ছড়ির মতো ঘোরাতে-ঘোরাতে বেরিয়ে পড়ল চাষীর ছেলে।

খানিক এগুতে একটা গোলাবাড়িতে সে পৌঁছল। জোতদারকে সে প্রশ্ন করল, "তোমার কোনো লোকের দরকার?"

জোতদার বলল, "হ্যাঁ, আমার একজন লোক দরকার। দেখে মনে হচ্ছে তুমি বেশ তাগড়া লোক, আর কাজকর্মও জান। কত বেতন চাও?"

চাষীর ছেলে বলল, "বেতন চাই না। শুধু চাই তোমাকে তিনটে করে ঘুঁষি মারার অনুমতি।"

তার কথায় জোতদার খুব খুশি হয়েই রাজি হল। কারণ এ লোকটাও ছিল কৃপণ।

পরদিন ভোরে বন থেকে কাঠ আনার কথা ছিল। গোলাবাড়ির অন্য চাকররা ঘুম থেকে উঠে করছিল যাবার তোড়জোড়। চাষীর ছেলে কিন্তু তখনো ছিল বিছানায় শুয়ে। চাকরদের একজন তাকে বলল, "উঠে পড়ো, যাবার সময় হয়ে গেছে। আমরা বনে যাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে তোমায় যেতে হবে।"

সে খেঁকিয়ে বলল, "তোমরা আগে যাও। তোমাদের আগেই দেখো, বন থেকে কাঠ নিয়ে আমি ফিরব।"

জোতদারের কাছে গিয়ে তারা বলল, "নতুন লোকটা এখনো শুয়ে রয়েছে। বলছে—আমাদের সঙ্গে যাবে না।"

জোতদার বলল, "আবার তাকে ডেকে বল ঘোড়াগুলো জুততে।"

চাষীর ছেলে আবার বলল, "তোমরা আগে যাও। তোমাদের আগেই, দেখো বন থেকে কাঠ নিয়ে আমি ফিরব।"

আরো দু ঘণ্টা সে বিছানায় শুয়ে রইল। তার পর উঠে দু বস্তা মটর সেদ্ধ করে ধীরে-সুস্থে খেয়ে বনে যাবার জন্য জুতলো ঘোড়াগুলো।

বনে যাবার পথে একটা সুড়ঙ্গ ছিল। সেই সুড়ঙ্গর ভিতর দিয়ে গাড়ি নিয়ে গিয়ে অন্যদিকে সে থামল। তার পর গাছ-গাছড়া দিয়ে সুড়ঙ্গর মুখ এমনভাবে সে বন্ধ করে দিল যাতে তার ভিতর দিয়ে কেউ যেতে না পারে। সে যখন বনে ঢুকছে অন্যরা তখন তাদের গাড়িতে কাঠ বোঝাই করে ফিরছিল। সে বলল, "যাও, যাও। কিন্তু দেখো, তোমাদের আগেই ফিরব।" তার পর আর না এগিয়ে প্রকাণ্ড দুটো গাছ উপড়ে তার মালগাড়িতে রেখে সে ধরল গোলাবাড়ির পথ। সেই সুড়ঙ্গের কাছে পৌঁছে সে দেখে—সব মালগাড়িগুলোই সেখানে থেমে রয়েছে। তাই দেখে সে বলে উঠল, "আজ সকালে আমার মতো বাড়িতে থাকলে আরো খানিক ঘুমুতে পারতে। আর সন্ধেয় বাড়ি ফিরতে আমারই সঙ্গে।" এই-না বলে সুড়ঙ্গর মুখের গাছ-গাছড়া সরিয়ে আগে সে পৌঁছল গোলাবাড়িতে। তার পর জোতদারকে গাছ দুটো দেখিয়ে বলল, "খুব ভালো কাঠ আনি নি?"

জোতদার বউকে গিয়ে বলল, "চাকরটা খুব কাজের। সবাইকার শেষে গেলেও—ফিরেছে সবাইকরা আগে।"

গোলাবাড়িতে এক বছর কাজ করার পর সব চাকররা বেতন পেল। জোতদারকে তখন চাষীর ছেলে জানাল—এইবার তাকে কড়ার মতো সেই তিনটে ঘুঁষি মারার সময় এসেছে। তাই-না শুনে দারুণ ঘাবড়ে গিয়ে কাকুতি-মিনতি করে সে বলল, "আমাকে রেহাই দাও। আমিই বরং তোমার চাকর হয়ে থাকব। তুমি হও এখানকার জোতদার।"

চাষীর ছেলে বলল, "না। আমি চাকর—চাকর হয়েই থাকব। কিন্তু যে শর্ত হয়েছে সেটা পালন করতেই হবে।"

জোতদার বলল, "যা চাইবে তাই দেব। আমাকে রেহাই দাও।"

চাষীর ছেলে বলল, "না।"

কী করবে ভেবে না পেয়ে জোতদার পনেরো দিন সময় চাইল। চাষীর ছেলে তাতে আপত্তি করল না। জোতদার তখন তার অন্য চাকরদের ডেকে পরামর্শ চাইল। তারা দেখল এরকম একটা লোক সেখানে থাকলে সবাইকারই জীবন বিপন্ন। কারণ মাছির মতো যে-কোনো মানুষকে সে টিপে মারতে পারে। তাই সবাই একমত হয়ে স্থির করল কুয়ো পরিষ্কার করার ছুতোয় তাকে কুয়োয় নামাতে। আর সে

নামলে পর উপর থেকে বড়ো-বড়ো পাথর তার মাথায় ফেলে তাকে মেরে ফেলতে।

তাদের পরামর্শ শুনে জোতদার খুশি হল। আর চাষীর ছেলে কুয়োয় নামার পর সবাই মিলে তার মাথায় ফেলতে লাগল বড়ো-বড়ো পাথর। কুয়োর নীচ থেকে চাষীর ছেলে তখন হেঁকে বলল, "কুয়োর মুখ থেকে মুরগিগুলোকে তাড়াও—বড্ডো বালি ফেলছে।"

কাজ শেষ করে চাষীর ছেলে সেই শর্তমতো জোতদারকে আবার মারতে চাইল তিনটে ঘুঁষি। জোতদার আবার চাইল পনেরো দিন সময়। লোকে তাকে বলল চাষীর ছেলেকে গম ভাঙাবার জন্য রাতে জাদুময় জাঁতাকলে পাঠাতে। জোতদার সঙ্গে-সঙ্গে চাষীর ছেলেকে বলল আট বস্তা গম রাতের মধ্যে জাঁতাকল থেকে ভাঙিয়ে আনতে। চাষীর ছেলে দু বস্তা গম ভরল তার ডান দিকের পকেটে, দু বস্তা বাঁ দিকের পকেটে আর বাকি চার বস্তা গম মস্ত একটা ঝোলায় ভরে সেটা পিঠে ফেলে পড়ল বেরিয়ে। জাঁতাকলে পৌঁছলে পর জাঁতাওয়ালা তাকে জানাল, গম ভাঙাবার সময় রাতে নয়—দিনে। আরো বলল, রাতে যারা গম ভাঙতে গেছে পরদিন সকালে তাদের দেখা গেছে মরে পড়ে থাকতে।

চাষীর ছেলে বলল, "আমি মরব না। তুমি নাক ডাকিয়ে ঘুমোও গে।" এই-না বলে জাঁতাকলে গিয়ে পরম নিশ্চিন্ত মনে সে শুরু করল গম ভাঙতে।

রাত এগারোটা নাগাদ জাঁতাওয়ালার আপিসঘরে গিয়ে একটা বেঞ্চিতে সে বসল। সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকে দরজাটা খুলে গেল আর আপনা থেকে সড়্‌সড়িয়ে চলে এল একটা টেবিল। তার পর আপনা থেকেই সেটা ভরে উঠল নানারকম সুখাদ্যে। টেবিলের চার দিকে নানা টুলও চলে এল। কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না। খানিক পরে চাষীর ছেলে দেখে কতকগুলো আঙুল ছুরি-কাঁটা দিয়ে প্লেটগুলোয় খাবার ভরছে। তার খুব খিদে পেয়েছিল। তাই টেবিলের সামনে একটা টুলে বসে পেট ভরে সে খেল।

নিজের খাওয়া শেষ হলে অন্য খালি প্লেটগুলোর দিকে তাকিয়ে সে বুঝল, অদৃশ্য অতিথিদেরও খাওয়া শেষ হয়েছে। তার পর কারা যেন ফুঁ দিয়ে মোমবাতিগুলো নিভিয়ে দিল। আর তার পর অন্ধকারে সে টের পেল



কে যেন আচ্ছা করে তার কান মলে দিচ্ছে। চেঁচিয়ে সে বলে উঠল, "এরকমটা আর করলে আমিও উচিত জবাব দেব।" কিন্তু আবার কে যেন তার কান মলে দিল আর সে-ও দিল তার কান মলে। সারা রাত ধরে এইরকম কান মলামলি চলল। থামল সেটা ভোরবেলায়। জাঁতাওয়ালা এসে তাকে তখনো বেঁচে থাকতে দেখে হল দারুণ অবাক।

চাষীর ছেলে বলল, "সারা রাত ভারি মজায় কেটেছে। কারা আমার কান মলছিল। আমিও কষে তাদের কান মলে দিয়েছি।"

জাঁতাওয়ালা খুব খুশি হল। কারণ সে দেখল তার জাঁতাকল জাদুমুক্ত হয়ে গেছে। কৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্য চাষীর ছেলেকে সে দিতে চাইল অনেক টাকাকড়ি।

চাষীর ছেলে বলল, "টাকাকড়ির দরকার নেই—আমার যথেষ্ট আছে।" এই-না বলে থলিগুলো পিঠে নিয়ে গোলাবাড়িতে ফিরে জোতদারকে সে বলল—কাজ হাসিল করেছে, এইবার শর্তমতো তিনটে ঘুঁষি তাকে সে মারতে চায়।

তার কথা শুনে দারুণ ঘাবড়ে গেল জোতদার। সে স্থির থাকতে পারল না, ঘরময় পায়চারি করে চলল। বিন্‌বিন্‌ করে ঘেমে উঠল তার কপাল। বাতাসের জন্য সে খুলল একটা জানলা আর

কিছু সন্দেহ করার আগেই চাষীর ছেলের এক ঘুঁষিতে জানলা গলে বেরিয়ে আকাশের উপর উড়তে উড়তে অদৃশ্য হয়ে গেল। চাষীর ছেলে তখন জোতদারের বউকে বলল, "এবার তোমার পালা। দ্বিতীয় ঘুঁষিটা তোমার প্রাপ্য।"

জোতদারের বউ কেঁদে বলল, "না, না। মেয়েদের গায়ে হাত তুলতে নেই।"

ভয়ে ঘেমে সে নেয়ে উঠল। তাই সে-ও খুলল আর-একটা জানলা। আর সঙ্গে সঙ্গে চাষীর ছেলের দ্বিতীয় ঘুঁষিতে জানলা গলে বেরিয়ে শূন্যে তার স্বামীর চেয়ে অনেক উপরে উঠে গেল—কারণ জোতদারের চেয়ে সে ছিল অনেক হালকা।

জোতদার তাকে ডেকে বলল, "আমার কাছে এসো।"

তার বউ বলল, "তুমি এসো আমার কাছে। তোমার কাছে আমি যেতে পারছি না।"

ক্রমশ আরো উঁচুতে তারা উড়ে চলল, কিন্তু কাছাকাছি আসতে পারল না।

হয়তো এখনো তারা আরো উপরে উড়ে চলেছে।

চাষীর ছেলে তার লোহার ডাণ্ডাটা নিয়ে আবার যাত্রা করল।

বোতলের ভূত

এক সময় ছিল গরিব এক কাঠুরে। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত সে কাজ করত। সামান্য কিছু টাকাকড়ি জমিয়ে সে তার ছেলেকে বলল, "তুই আমার একমাত্র সন্তান। তাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যা কিছু জমিয়েছি তোকে দেব তোর শিক্ষার জন্যে খরচ করতে। এমন কিছু শিখিস যাতে আমার বুড়ো বয়েসে আমাকে খাওয়াতে-পরাতে পারিস। তখন আমার হাত-পা অবশ হয়ে আসবে। আগুনতাতে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারব না।"

এক ইস্কুলে ভর্তি হয়ে ছেলেটি খুব মন দিয়ে পড়াশুনো করতে লাগল। তার অধ্যবসায় দেখে শিক্ষকরা খুব প্রশংসা করলেন। তার পর সে ভর্তি হল কলেজে। কিন্তু লেখাপড়া সম্পূর্ণ হবার আগেই কলেজ ছাড়তে সে বাধ্য হল, কারণ তার বাবার জমানো টাকাকড়ি শেষ হয়ে গিয়েছিল। সে বাড়ি ফিরতে মনের দুঃখে তার বাবা বলল, "তোর জন্যে আর কিছু করতে পারব না। রুটির জন্যে রোজ যা দরকার তার চেয়ে আর এক পয়সাও বেশি রোজগার করতে পারি না।"

ছেলে বলল, "বাবা, তার জন্যে দুর্ভাবনা কোরো না। ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যেই।" পরদিন বুড়ো কাঠুরে গাছ কাটার জন্য যখন বেরুচ্ছে ছেলেটি বলল সে-ও যাবে তার সঙ্গে।"

তার বাবা বলল, "তাই চল্, বাছা। কিন্তু তোর খুব কষ্ট হবে, কারণ কঠিন পরিশ্রমে তুই অভ্যস্ত নোস্। তা ছাড়া আমার একটাই মাত্র কুড়ুল। নতুন আর-একটা কেনার পয়সা নেই।

ছেলে বলল, "তার জন্যে ভেবো না। পড়শির কাছে একটা কুড়ুল ধার করব। যতদিন-না নতুন একটা কুড়ুল কেনার পয়সা জমাতে পারছি ততদিন সে নিশ্চয়ই তারটা ব্যবহার করতে দেবে।"

তাই কাঠুরে পড়শির কাছ থেকে একটা কুড়ুল ধার করে আনল আর পরদিন দিনের আলো ফুটতেই তারা গেল বনে। ছেলেটি মনের আনন্দে তার বাবাকে সাহায্য করতে লাগল।

সূর্য যখন মাঝ আকাশে বুড়ো কাঠুরে বলল, "এবার আমরা বিশ্রাম নিয়ে দুপুরের খাবার খাব।"

ছেলেটি তার নিজের ভাগের রুটি নিয়ে বলল, "তুমি বিশ্রাম করো, বাবা। আমি কিন্তু ক্লান্ত হই নি। আমি এদিক-ওদিক ঘুরে পাখির বাসা খুঁজে দেখি।"

তার বাবা বলল, "তোর ঘটে এতটুকু বুদ্ধি নেই। এখন দৌড়ঝাঁপ করে বেড়ালে পরে একটা আঙুলও আর নাড়তে পারবি না। আমার পাশে বসে বিশ্রাম নে।"

ছেলেটি কিন্তু কাঠুরের কথা না শুনে রুটি খেতে-খেতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। পাখির বাসার খোঁজে খুশি মনে সে তাকাতে লাগল সবুজ ডালপালার দিকে। ঘোরাঘুরি করতে-করতে তার নজর পড়ল একশো বছরের পুরনো চমৎকার একটা ওক্‌গাছের দিকে। সেটার গুঁড়ি বিরাট। দাঁড়িয়ে পড়ে সে ভাবল, নিশ্চয়ই এটায় অনেক পাখি বাসা বানিয়েছে। তার পর তার মনে হল যেন একটা স্বর ভেসে আসছে। কান খাড়া করে সে শুনল সত্যিই কে যেন চাপা গলায় বলছে, "আমাকে বেরুতে দাও। আমাকে বেরুতে দাও।" চার দিকে সে তাকাল। কিন্তু কাউকেই দেখতে পেল না। মনে হল স্বরটা যেন আসছে মাটির তলা থেকে। তাই সে চেঁচিয়ে উঠল, "তুমি কোথায়?",

সেই স্বর উত্তর দিল, "আমি ওক্‌গাছের শেকড়ের তলায়। আমাকে বেরুতে দাও। আমাকে বেরুতে দাও।"

শেকড়ের কাছটা খুঁড়তে-খুঁড়তে ছেলেটি দেখল ছোট্টো একটা কোকরের মধ্যে রয়েছে কাঁচের একটা বোতল। সেটাকে আলোর দিকে তুলে ধরে সে দেখে তার মধ্যে ব্যাঙের মতো একটা জীব পাগলের মতো লাফাচ্ছে আর ক্রমাগত চেঁচিয়ে চলেছে: "আমাকে বেরুতে দাও। আমাকে বেরুতে দাও।" তাই কাঠুরের ছেলে সাদা মনে

ছিপিটা খুলল। আর সঙ্গে সঙ্গে বোতলের ভিতরকার ভূত বেরিয়ে ক্রমশ বাড়তে-বাড়তে প্রায় অর্ধেকটা ওক্‌গাছের মতো লম্বা হয়ে বিকট দৈত্যের চেহারায় দাঁড়াল তার সামনে।

ভয়ংকর হেঁড়ে গলায় সে প্রশ্ন করল, "আমাকে বেরুতে দেবার পুরস্কার কি, জানো?"



নির্ভীক গলায় কাঠুরের ছেলে বলল, "না। জানব কি করে?"
দৈত্য বলল, "আমাকে ছেড়েছ বলে তোমার ঘাড় মট্‌কাব।"

"কথাটা আগে বললে ভালো করতে। তা হলে তোমায় বোতল থেকে বার করতাম না। আর আমার ঘাড়-টাড় মট্‌কাতে এস না। সেখানে হাত দেবার আগে অন্য লোকের পরামর্শ নেওয়া দরকার।"

"লোক-টোক জানি না। প্রাপ্য পুরস্কারটা তোমায় নিতেই হবে। তুমি কি ভাবছ আমায় মিছিমিছি বন্দী করে রাখা হয়েছিল? আমি হচ্ছি শক্তিশালী মার্‌কিউরিয়াস্‌। যে আমাকে মুক্তি দেবে তার ঘাড় আমি মট্‌কাবই।"

কাঠুরের ছেলে শান্ত গলায় বলল, "বেশ কথা। কিন্তু প্রথমে প্রমাণ করতে হবে এই প্রকাণ্ড চেহারা নিয়ে ঐ ছোট্টো বোতলটার মধ্যে সত্যিই তুমি ছিলে। আবার ওটার মধ্যে তুমি সেঁধুতে পারলে আমার সন্দেহ দূর হবে। তখন আমাকে নিয়ে তোমার যা খুশি করতে পারো।"

বড়াই করে দৈত্য বলল, "সেটা তো খুবই সহজ।" এই-না বলে ক্রমশ কুঁকড়ে উঠতে-উঠতে শেষটায় ছোট্টো আর সরু হয়ে সুড়ুৎ করে সে সেঁধিয়ে গেল বোতলের মধ্যে। আর যেই-না যাওয়া সঙ্গে সঙ্গে কাঠুরের ছেলে কষে ছিপিটা এঁটে তার পর সেটাকে ছুঁড়ে ফেলল ওক্‌-গাছের শেকড়ের তলার ফোকরটার মধ্যে।

তার পর সে ফিরে চলল তার বাবার কাছে। ভূতটা তখন আবার করুণ মিহি গলায় চেঁচাতে শুরু করে দিল, "আমায় বেরুতে দাও! আমায় বেরুতে দাও!"

ছেলেটি বলল, "না, আর তোমায় বেরুতে দিচ্ছি না।"

ভূত বলল, "আমার কথাটা শোনো। কথা দিচ্ছি তোমার ঘাড় মট্‌কাব না। তার বদলে তোমায় দেব রাশি-রাশি ধনদৌলত।"

কাঠুরের ছেলে বলল, "তোমায় বিশ্বাস নেই। আগের মতো নিশ্চয়ই আসবে আমার ঘাড় মট্‌কাতে।"

ভূত বলল, "শোনো, তুমি তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মস্ত বড়ো সুযোগ হারাতে বসেছ। প্রতিজ্ঞা করছি, তোমার মাথার একগাছা চুলও আমি ছোঁব না।"

কাঠুরের ছেলে ভাবল, 'ঝুঁকিটা নেওয়াই যাক। হয়তো ভূতটা কথার খেলাপ করবে না।' তাই ছিপিটা সে খুলল আর সঙ্গে সঙ্গে আগের মতোই প্রকাণ্ড চেহারার দৈত্য হয়ে উঠল ভূত।

তার পর কাঠুরের ছেলেকে প্লাস্টারের একটা কৌটো দিয়ে দৈত্য

বলল, "এই নাও তোমার পুরস্কার। যে-কোনো ক্ষত জায়গায় এটার একটা পাশ ছোঁয়ালে সেটা সেরে যাবে। অন্য পাশটা দিয়ে লোহা কিংবা ইস্পাত ঠুকলে সেটা হয়ে যাবে রুপো।"

কাঠুরের ছেলে বলল, "পরখ করে দেখি।" এই-না বলে কুড়ুল দিয়ে একটা গাছের খানিকটা ছাল তুলে ফেলে কৌটোর একটা পাশ সেখানে সে ছোঁয়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গজিয়ে উঠল নতুন ছাল। দৈত্যকে তখন সে বলল, "তোমার কথা মিথ্যে নয় দেখছি। এবার চলি।"

মুক্তি দেবার জন্য কাঠুরের ছেলেকে ধন্যবাদ জানাল দৈত্য। আর পুরস্কারের জন্য দৈত্যকে ধন্যবাদ জানাল কাঠুরের ছেলে। তার পর যে যার পথে চলে গেল।

ফিরে আসতে বেজায় বিরক্ত হয়ে ছেলেকে কাঠুরে বলল, "এতক্ষণ কাজে ফাঁকি দিয়ে কোথায় ছিলি? জানতাম তোকে দিয়ে এ-কাজ হবে না।"

"রাগ কোরো না, বাবা। যে-সময় নষ্ট করেছি এক্ষুণি সেটা পুরিয়ে দিচ্ছি।"

ভীষণ রেগে তার বাবা বলল, "পুরিয়ে দিবি! কিন্তু কী করে শুনি?"

"ভালো করে লক্ষ্য করো, বাবা। ঐ গাছটা:ক এক কোপে কেটে ফেলছি।" এই-না বলে কৌটোটা দিয়ে কুড়ুলের লোহার দিকটা ঘষে সে কোপ মারল। কিন্তু লোহা তখন রুপো হয়ে গিয়েছিল বলে কুড়ুলের ফলাটা গেল দুমড়ে। কাঠুরের ছেলে তখন বলে উঠল, "এই দেখ বাবা, কিরকম একটা বাজে কুড়ুল ধার করে এনেছ! ফলাটা একেবারে দুমড়ে গেছে।"

হায় হায় করে কাঠুরে বলে উঠল, "কী সর্বনাশ! কুড়ুলটার যে দফা শেষ করে দিয়েছিস দেখছি! কুড়ুলটার দাম দিয়ে দিতে হবে! কিন্তু কোথায় যে টাকা পাব জানি না। তুই আমাকে খুব সাহায্য করলি যা হোক!"

তার ছেলে বলল, "বিরক্ত হোয়ো না বাবা। কুড়ুলটার দাম আমি চুকিয়ে দিতে পারব।"

রাগে ফেটে পড়ে তার বাবা বলল, "গাধা কোথাকার! কী করে দাম দিবি শুনি? তোর তো এক পয়সাও নেই! তোর বুদ্ধি থাকতে পারে। কিন্তু কাঠ-কাটার বিষয় কিছুই জানিস না।"

খানিক পরে কাঠুরের ছেলে বলল, "বাবা, আমি আর খাটতে পারছি না। আধ-বেলা ছুটি নেওয়া যাক।"

কাঠুরে বলল, "কী বললি? তুই কি ভাবিস বসে-বসে আঙুল চুষলে সংসার চলবে? আমাকে কাজ করতেই হবে। কিন্তু তুই বাড়ি যেতে পারিস, কারণ তুই কোনো উপকারে লাগবি না।"

তার ছেলে বলল, "এই প্রথম আমি বনে এসেছি। একা-একা পথ চিনে যেতে পারব না। আমার সঙ্গে চলো।" কাঠুরের রাগ তখন খানিকটা পড়ে এসেছিল। তাই সে বাড়ি যেতে রাজি হল।

বাড়ি ফিরে কাঠুরে বলল, "অকেজো কুড়ুলটা বেচে যা পাস নিয়ে আয়। বাকিটা যেমন করে পারি রোজগার করে পড়শির দেনা শুধব।"

কাঠুরের ছেলে কুড়ুলটা নিয়ে গেল শহরের এক স্যাকরার কাছে। সেটা ওজন করে স্যাকরা বলল, "এর দাম চারশো টাকা। কিন্তু অত টাকা এখন হাতে নেই।"

কাঠুরের ছেলে বলল, "যা আছে তাই দাও। বাকিটা আমার কাছে তোমার ধার রইল।"

স্যাকরা তাকে দিল তিনশো টাকা। কাঠুরের ছেলের কাছে তার ধার রইলো একশো।

বাড়ি ফিরে সে বলল, "বাবা, টাকা এনেছি। পড়শিকে জিগ্‌গেস করে এসো তার কুড়ুলের দাম কত।"

বুড়ো কাঠুরে বলল, "জিগ্‌গেস করার দরকার নেই। দাম আমার জানা আছে—এক টাকা ছ'পয়সা।"

তার ছেলে বলল, "তা হলে তাকে দু টাকা বারো পয়সা দিয়ো। সেটা ডবল দাম। জানো বাবা—আমার হাতে এখন অনেক টাকা।" এই-না বলে কাঠুরেকে একশো টাকা দিয়ে সে জানাল, জীবনে কখনো তাদের আর অভাব-অভিযোগ থাকবে না।

বুড়ো কাঠুরে অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "কী কাণ্ড! কোথায় এত টাকা পেলি?"

ছেলে তখন তাকে জানাল সব ঘটনার কথা। তার পর বাকি টাকা নিয়ে সে আবার ফিরে গেল তার কলেজে। আর তার পর সেই কৌটোর গুণে—যেটা যে-কোনো ক্ষত সারাতে পারত—সে হয়ে উঠল পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বিখ্যাত ডাক্তার।

আনন্দভায়া

একবার এক দীর্ঘ লড়াইয়ের পর অনেক সৈন্যকে বরখাস্ত করা হয়। তাদের মধ্যে একজনকে লোকে ডাকত আনন্দভায়া বলে। তাকে সামান্য রুটি আর গোটা চারেক পয়সা দিয়ে বিদেয় করা হয়। এই পুঁজি নিয়ে সে পড়ল বেরিয়ে।

পথের পাশে সেণ্ট পিটার বসেছিলেন ভিখিরির ছদ্মবেশে। আনন্দভায়া তাঁর পাশ দিয়ে যাবার সময় তিনি ভিক্ষে চাইলেন।

সে বলল, "ভিখিরিভাই, কী তোমায় দিই? এক সময় আমি সৈনিক ছিলাম। এখন চাকরি গেছে। আমার এখন সম্বল এই সামান্য রুটি আর গোটা চারেক পয়সা। সে যাই হোক, এর থেকেই তোমায় কিছুটা দিচ্ছি। কিন্তু এগুলো শেষ হলে তোমার মতো আমাকেও ভিক্ষা করতে হবে।" এই বলে সেই সাধুকে রুটির খানিকটা টুকরো আর একটা পয়সা সে দিল।

সেণ্ট পিটার তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে খানিক দূরে গিয়ে আর-এক ভিখিরির ছদ্মবেশ ধরে আনন্দভায়ার কাছে আবার ভিক্ষে চাইলেন। আনন্দভায়া আগের মতোই কথা বলে তাঁকে দিল খানিকটা রুটি আর একটা পয়সা।

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে কিছু দূরে গিয়ে ভিখিরির ছদ্মবেশ ধরে পথের ধারে বসে সেণ্ট পিটার তৃতীয়বার তার কাছে ভিক্ষে চাইলেন।

আনন্দভায়া আবার তাঁকে দিল খানিকটা রুটি আর একটা পয়সা।

সেণ্ট পিটার তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলেন। আনন্দভায়ার

তখন সম্বলমাত্র এক টুকরো রুটি আর একটা পয়সা। একটা সরাই-খানায় গিয়ে রুটির টুকরোটা সে খেল আর বাকি পয়সাটা দিয়ে কিনল বিয়ার।

খাওয়া-দাওয়া সেরে হাঁটতে-হাঁটতে তার সঙ্গে আবার দেখা হল সেণ্ট পিটারের। তখন তিনি ছদ্মবেশ ধরেছিলেন এক বরখাস্ত-হওয়া সৈনিকের। আনন্দভায়াকে তিনি বললেন, "শুভদিন কমরেড! আমাকে এক টুকরো রুটি আর বিয়ার কেনার জন্যে একটা পয়সা দিতে পার?"

আনন্দভায়া বলল, "অসম্ভব। আমাকেও বরখাস্ত করে দেওয়া হয়েছিল সামান্য রুটি আর গোটা চারেক পয়সা। পথে আসতে-আসতে আমার সঙ্গে তিন ভিখিরির দেখা। তাদের প্রত্যেককে আমি একটা করে পয়সা আর রুটির তিন ভাগ দিয়েছি। এক সরাইখানায় রুটির শেষ টুকরোটা খেয়ে বাকি পয়সাটা দিয়ে কিনেছিলাম এক গেলাস বিয়ার। এখন সম্বল বলতে আমার কিছুই নেই। আমার মতোই যদি তোমার অবস্থা হয় তা হলে আমার সঙ্গে এসো। একসঙ্গে ভিক্ষে করা যাবে।"

সেণ্ট পিটার বললেন, "ভিক্ষে করার দরকার নেই। লোকের রোগ সারাবার কিছু-কিছু ওষুধ-বিষুধ আমার জানা আছে। মানুষের রোগ সারিয়ে যা কামাই তাইতেই মোটামুটি আমার চলে যায়।"

আনন্দভায়া বলল, "তাই নাকি? কিন্তু আমি তো ও বিষয়ে কিছুই জানি না। আমাকে তাই একাই ভিক্ষেয় বেরুতে হবে।"

সেণ্ট পিটার বললেন, "তাতে কিছু যায় আসে না। আমার সঙ্গে চলো। যা রোজগার করব তার অর্ধেকটা হবে তোমার।"

আনন্দভায়া বলল, "বাঃ, এ তো আমার পক্ষে তোফা ব্যবস্থা! চলো, এগুনো যাক।"

যেতে-যেতে তারা পৌঁছল এক চাষীর বাড়িতে। সেখান থেকে ভেসে আসছিল মড়া-কান্না। বাড়ির ভিতরে গিয়ে তারা দেখে একটা লোক মরতে বসেছে আর তার বউ স্বামীকে বাঁচাবার কোনো উপায় না দেখে আমুরি-ঝুমুরি হয়ে কাঁদছে।

সেণ্ট পিটার বললেন, "কান্না থামাও। তোমার স্বামীকে আমি সুস্থ করে দিচ্ছি।" এই-না বলে পকেট থেকে এক শিশি মলম

বার করে সেটা দিয়ে চক্ষের নিমেষে রোগীকে তিনি সারিয়ে দিলেন। সুস্থ হয়ে বিছানায় উঠে বসল রোগী।

স্বামী-স্ত্রী খুব খুশি হয়ে বলল, "কী করে এর প্রতিদান আপনাকে আমরা দিই ? বলুন, কী আপনাকে দেব।"

সেণ্ট পিটার যত বলেন কিছু দেবার দরকার নেই তত তারা কিছু নেবার জন্য তাঁকে পীড়াপীড়ি করতে থাকে।

আনন্দভায়া কিন্তু তাঁকে কনুই দিয়ে আস্তে আস্তে গুঁতো মেরে বলল, "কিছু নাও। আমাদের যে দরকার!"

শেষটায় চাষীর বউ ভেড়ার একটা ছানা এনে সেণ্ট পিটারকে বলল, সেটা নিতেই হবে। সেণ্ট পিটার কিন্তু কিছুতেই নিতে চাইলেন না।

আনন্দভায়া আবার কনুই দিয়ে আস্তে গুঁতো মেরে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "আচ্ছা বোকা তো! এটা নেবে বৈকি! আমি বলছি এটা আমাদের খুব কাজে লাগবে।"

সেণ্ট পিটার তখন বললেন, "বেশ, ভেড়ার ছানাটা নিলাম। কিন্তু এটা আমার দরকার নেই। তাই তোমাকে এটা বয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

আনন্দভায়া বলল, "তাতে আমার আপত্তি নেই। ভেড়ার একটা ছানা বয়ে নিয়ে যাওয়া খুব একটা শক্ত কাজ নয়।" এই-না বলে সেটাকে সে কাঁধে তুলে নিল।

একসঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে তারা পৌঁছল এক বনে। আনন্দভায়ার কাঁধে তখন ভেড়ার ছানার চাপ খুব বেড়ে উঠেছে। তা ছাড়া খিদেও পেয়েছে তার খুব। তাই সেণ্ট পিটারকে সে বলল, "শোনো, এখানে বিশ্রাম নেওয়া যাক। ভেড়ার ছানাটাকে রেঁধে এবার খাওয়া-দাওয়া সারি।"

সেণ্ট পিটার বললেন, "আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু রান্নাবান্নার ঝামেলার মধ্যে যেতে পারব না। তুমি রাঁধতে জানলে—এই নাও সস্‌প্যান। যতক্ষণ-না রান্নাবান্না শেষ হয় ততক্ষণ খানিক ঘুরে আসি। কিন্তু একটা কথা—আমি ফেরার আগে রান্নাবান্না শেষ হয়ে গেলে আমাকে বাদ দিয়ে খবরদার একলা খেতে বসবে না।"

আনন্দভায়া বলল, "তুমি বেড়াতে যাও। রাঁধতে আমি খুব ভালোই পারি।"

সেণ্ট পিটার বেড়াতে চলে গেলেন আর আনন্দভায়া আগুন জ্বালিয়ে ভেড়ার ছানাটাকে কেটেকুটে সস্‌প্যানে করে রাঁধল।

রান্নাবান্না শেষ হল। কিন্তু সেণ্ট পিটারের দেখা নেই। তাই আনন্দভায়া আগুন থেকে সস্‌প্যানটা নামিয়ে ভেড়ার ছানার কলজেটা বার করে খেয়ে ফেলল।

খানিক পরে সেণ্ট পিটার ফিরে এসে বললেন, "ভেড়ার ছানার সবটাই তুমি খাও। আমাকে দাও শুধু কলজেটা। সেটা খেয়েই আমি তৃপ্ত হব।"

আনন্দভায়া ছুরি-কাঁটা নিয়ে ভেড়ার ছানার কলজেটা খোঁজার ভান করতে লাগল।

কয়েক মিনিট পরে সে বলল, "কলজে তো দেখছি না।"

সেণ্ট পিটার বললেন, "আশ্চর্য ব্যাপার তো! কলজেটা যাবে কোথায়?"

আনন্দভায়া বলল, "তা তো জানি না।" খানিক থেমে সে যোগ করে দিল, "আরে—আমরা দুজনেই ভারি বোকা! আমরা কলজে খুঁজছি—কিন্তু ভেড়ার ছানাদের যে কলজেই থাকে না।"

সেণ্ট পিটার বললেন, "তাই নাকি? সে কথা তো জানতাম না! সব জন্তুরই তো কলজে থাকে। ভেড়ার ছানার কলজে থাকবে না কেন?"

আনন্দভায়া বলল, "বিশ্বাস করো বন্ধু—ভেড়ার ছানার কলজে থাকে না।"

সেণ্ট পিটার বললেন, "কলজে না থাকলে ভেড়ার ছানার মাংস আমি খাব না। তুমিই সবটা খাও।"

আনন্দভায়া বলল, "যে-মাংসটা খেতে পারব না সেটা আমার ঝোলায় রাখব। পরে খাওয়া যাবে।" এই-না বলে অর্ধেকটা মাংস সে খেল আর বাকি অর্ধেকটা তার ঝোলায় ভরে আবার যাত্রা করল।

তার পর সেণ্ট পিটার তাদের পথের সামনে ভয়ংকর বন্যার জল এনে সঙ্গীকে বললেন, "তুমি আগে যাও।"

আনন্দভায়া বলল, "না-না, তুমিই যাও আগে।" সে ভাবল, জল খুব গভীর হলে যেখানে আছি সেখানেই থাকব।

সেণ্ট পিটার তাই জল ভেঙে প্রথম গেলেন। তার হাঁটু পর্যন্ত জল উঠল। কিন্তু আনন্দভায়া যখন পেরুতে গেল জল উঠে এল তার গলা

পর্যন্ত। তাই সে চেঁচিয়ে উঠল, "বন্ধু, সাহায্য করো, সাহায্য করো।" উত্তরে কিন্তু সেণ্ট পিটার বললেন :

"স্বীকার করবে কি ভেড়ার ছানার কলজেটা তুমি খেয়েছ?"

সে বলল, "না—আমি খাই নি।"

জল তখন উঠে এল তার মুখ পর্যন্ত।

আবার সে চেঁচিয়ে উঠল, "বন্ধু, সাহায্য করো, সাহায্য করো।"

কিন্তু সেণ্ট পিটার আবার প্রশ্ন করলেন, "স্বীকার করবে কি ভেড়ার ছানার কলজেটা তুমি খেয়েছ?"

সে বলল, "না,—আমি খাই নি।"

তাকে ডুবিয়ে মারার ইচ্ছে দয়ালু সেণ্ট পিটারের ছিল না। তাই তিনি বন্যার জল সরিয়ে তাকে টেনে তুললেন।

যেতে-যেতে তারা পৌঁছল এক শহরে। সেখানে শুনল রাজার মেয়ে খুব অসুস্থ।

তাই শুনে আনন্দভায়া সেণ্ট পিটারকে বলল, "বন্ধু, মস্ত একটা সুযোগ পাওয়া গেছে। রাজকন্যেকে সারাতে পারলে জীবনে আমাদের আর কোনো ভাবনা থাকবে না।"

সেণ্ট পিটার কিন্তু তাঁর বন্ধুর কথা কানে না তুলে চলতে লাগলেন খুব ধীরে-ধীরে। শেষটায় খবর এল, রাজকন্যে মারা গেছে।

খবর শুনে আনন্দভায়া চেঁচিয়ে উঠল, "দেখলে তো, তোমার গেঁতোমির জন্যে কী ঘটে গেল।"

সেণ্ট পিটার বললেন, "শান্ত হও। আমি শুধু যে রোগ সারাতে পারি তা নয়, মরা মানুষকে বাঁচাতেও পারি।"

আনন্দভায়া বলল, "তা হলে তো কোনো কথাই নেই! পুরস্কার হিসেবে অর্ধেক রাজত্ব নিশ্চয়ই আমরা পাব।"

রাজপ্রাসাদে গিয়ে তারা দেখল শোকে-দুঃখে সবাই ভেঙে পড়েছে। তাই দেখে সেণ্ট পিটার বললেন, রাজকন্যেকে তিনি বাঁচিয়ে তুলবেন। রাজকন্যের শোবার ঘরে গিয়ে তিনি বললেন এক কেতলি জল আনতে আর ঘর থেকে সবাইকে বেরিয়ে যেতে। তাঁর সঙ্গে রইল শুধু আনন্দভায়া। তার পর তিনি কেতলিটা উনুনে চড়িয়ে রাজকন্যের সব অঙ্গগুলো কেটে ফেলে দিলেন ফুটন্ত জলে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে সব মাংস খসে যাবার পর সুন্দর সাদা হাড়গুলো তিনি সাজালেন একটা টেবিলে

আর তিনবার বললেন, "ঈশ্বর, একে বাঁচিয়ে তুলুন।" আর তাঁর কথা তৃতীয়বার শেষ হতেই সুন্দর সুস্থ শরীর নিয়ে রাজকন্যে উঠল বেঁচে।

রাজার আনন্দ আর ধরে না। সেণ্ট পিটারকে তিনি বললেন, "কী পুরস্কার নেবে বলো। অর্ধেক রাজত্ব চাইলেও তোমাকে দেব।"

কিন্তু সেণ্ট পিটার উত্তর দিলেন, "আমি কোনো পুরস্কার চাই না।"

আনন্দভায়া ভাবল, 'কী হাঁদা লোক রে বাবা!' তার পর সেণ্ট পিটারের পাঁজরে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে বলল, "বোকার মতো কথা বোলো না। তোমার কোনো জিনিসের দরকার না থাকতে পারে, আমার আছে।"

সেণ্ট পিটার কিন্তু কিছুই নিতে রাজি হলেন না। রাজা দেখলেন তাঁর সঙ্গী খুব অসন্তুষ্ট হয়েছে। তাই তিনি আদেশ দিলেন কোষাগার থেকে মোহর এনে আনন্দভায়ার ঝুলিটা ভরে দিতে।

সেখান থেকে যাত্রা করে এক বনে পৌঁছলে আনন্দভায়াকে সেণ্ট পিটার বললেন, "এবার মোহরগুলো ভাগাভাগি করে নেওয়া যাক।"

আনন্দভায়া বলল, "বেশ কথা।"

সেণ্ট পিটার তখন মোহরগুলো তিন ভাগ করলেন। আনন্দভায়া ভাবল, 'লোকটার মতলব কী? যেখানে দু ভাগ করার কথা সেখানে তিন ভাগ করছে কেন?'

সেণ্ট পিটার তখন বললেন, "মোহরগুলো আমি সমান করে ভাগ করেছি। তোমার ভাগ, আমার ভাগ আর ভেড়ার ছানার কলজে যে খেয়েছিল তার ভাগ।"

এক গাল হেসে আনন্দভায়া বলল, "আমিই খেয়েছিলাম ভেড়ার ছানার কলজে।" এই-না বলে মোহরের দুটো ভাগ সে নিয়ে নিল।

সেণ্ট পিটার প্রশ্ন করলেন, "তুমি খেলে কী করে? ভেড়ার ছানাদের তো কলজে থাকে না।"

আনন্দভায়া বলল, "তুমি বলছ কী, দোস্ত? ভেড়ার ছানাদের কলজে থাকে না? সব জন্তুরই তো কলজে থাকে।

সেণ্ট পিটার বললেন, "বেশ কথা—তুমিই মোহরগুলো রাখো। কিন্তু আর তোমার সঙ্গে থাকছি না। চললাম।"

আনন্দভায়া উত্তর দিল, "দোস্ত, তোমার যা মর্জি—টা-টা।"

সেণ্ট পিটার চলে গেলেন অন্য পথে।

আনন্দভায়া ভাবল, 'যাকগে, ভালোই হল। কিন্তু লোকটার যে আশ্চর্য ক্ষমতা তাতে সন্দেহ নেই।' হাতে তখন তার প্রচুর অর্থ। কিন্তু অত অর্থ নিয়ে কী যে করবে সে ভেবে পেল না। দু হাতে টাকা-কড়ি উড়িয়ে অল্প দিনের মধ্যেই আবার সে কপর্দকশূন্য হয়ে পড়ল।

সেই অবস্থায় একটা শহরে পৌঁছে সে শুনল—সেখানকার রাজার মেয়ের মরণ-দশা। খবরটা শুনে সে ভাবল, 'আমার কপাল খুব ভালো—রাজকন্যেকে বাঁচিয়ে অনেক ধনদৌলত পাওয়া যাবে।' তাই রাজার কাছে গিয়ে জানাল মৃত রাজকন্যেকে সে বাঁচিয়ে দেবে।

কানাঘুষোয় রাজা শুনেছিলেন—এক বরখাস্ত-হওয়া সৈনিক মরা মানুষ বাঁচাতে পারে। তিনি ভাবলেন, আনন্দভায়াই সেই সৈনিক। কিন্তু তার অলৌকিক ক্ষমতার কথা তিনি বিশ্বাস করেন নি। তাই রাজকন্যেকে বাঁচাবার ভার তাকে দেবার আগে মন্ত্রীদের পরামর্শ তিনি চাইলেন।

মন্ত্রীরা রাজাকে পরামর্শ দিল—রাজকন্যে যখন মারাই গেছে তখন এ-লোকটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে দিতে কোনো ক্ষতি নেই। তাই রাজকন্যেকে বাঁচাবার চেষ্টা করার অনুমতি আনন্দভায়াকে দেওয়া হল। সেণ্ট পিটারের মতোই আনন্দভায়া বলল রাজকন্যের শোবার ঘরে এক কেতলি জল দিতে। তার পর ঘর থেকে সবাইকে বার করে রাজকন্যের অঙ্গপ্রতঙ্গ কেটে কেতলিতে ভরে সেটা চড়াল সে উনুনে। জল ফুটতে শুরু করল, মাংস আলাদা হয়ে গেল। তার পর হাড়গুলো সে রাখল একটা টেবিলে। কিন্তু কী ভাবে হাড়গুলো রাখতে হয় সে জানত না। সেগুলো সে সাজাল একেবারে ভুল করে। তার পর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সেণ্ট পিটারের মতোই তিনবার সে বলল, "ঈশ্বর, একে বাঁচিয়ে তুলুন।" কিন্তু হাড়গুলো যেমন পড়েছিল তেমনি পড়ে রইল—নড়ল-চড়ল না। আবার কথাগুলো সে আওড়াল, কিন্তু কোনোই ফল হল না। তখন অধৈর্য হয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, "উঠে পড়ো রাজকন্যে, নইলে ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।"

তার মুখ থেকে কথাগুলো খসতে-না-খসতেই সেই সৈনিকের ছদ্মবেশে জানলা দিয়ে সেণ্ট পিটার এসে তাকে বললেন, "মুখ্যু কোথাকার! করেছ কী? হাড়গুলো যে ভুল করে সাজিয়েছ। এতে মরা মানুষ কখনো বাঁচে?

আনন্দভায়া বলল, "দোস্ত্, সঠিকভাবে সাজাবার সবরকম চেষ্টাই তো করেছিলাম।"

সেণ্ট পিটার বললেন, "এবার তোমায় বিপদ থেকে বাঁচাচ্ছি। কিন্তু আবার এ ধরনের কাজ করলে তুমি বিপদে পড়বে। আর এ-কথাটাও মনে রেখো—রাজকন্যেকে আমি বাঁচিয়ে তুললে রাজার কাছ থেকে এক পয়সাও পুরস্কার নিতে পারবে না।" এই-না বলে হাড়গুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে ঈশ্বরের কাছে তিনবার তিনি প্রার্থনা জানালেন আর সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ সবল শরীরে রাজকন্যে বেঁচে উঠল।

যে পথে সেণ্ট পিটার এসেছিলেন সে পথেই তিনি অদৃশ্য হলেন আর বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দভায়া হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু রাজার কাছ থেকে এক পয়সাও না নেবার কথাটা তার মনে ধরল না। সে ভাবল, 'হাঁদা লোকটার কথাগুলোর কোনো মানেই হয় না। কাজ করে পারিশ্রমিক কে না নেয়?' তাই রাজার কাছ থেকে তার ঝুলি ভরে মোহর সে নিল।

রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে সে দেখে সিংহদ্বারের কাছে সেণ্ট পিটার তার জন্য অপেক্ষা করছেন।

তিনি বললেন, "তোমাকে এক পয়সাও না নিতে বলেছিলাম। কিন্তু ঝুলি ভরে তুমি মোহর নিয়েছ দেখছি।"

আনন্দভায়া বলল, "ওরা জোর করে আমার ঝুলিতে মোহর ভরে দিলে কী করতে পারি, বলো?"

সেণ্ট পিটার বললেন, "তোমাকে দ্বিতীয়বার সাবধান করে দিচ্ছি—আর কখনো কোনো অলৌকিক কাজ করতে যেয়ো না।"

সে বলল, "তা নিয়ে তোমায় মাথাব্যথা করতে হবে না। আমার এখন ঝুলি-ভরা মোহর—কোন্ দুঃখে হাড়গোড় ধোয়াধুয়ি করতে যাব?"

সেণ্ট পিটার বললেন, "কিন্তু ঐ মোহরগুলো তো একদিন-না-একদিন খরচ হয়েই যাবে। যাতে তুমি আর নিষিদ্ধ কাজ না কর তাই বর দিলাম—যখন যা চাইবে সেই জিনিসে ভরে উঠবে তোমার ঝুলি।"

আনন্দভায়া বেজায় খুশি হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে?" তার পর মনে-মনে বলল, 'আমি এখন সম্পূর্ণ তুষ্ট। আমি এখন বড়োলোক। তোমার সঙ্গের আর দরকার নেই।'

তার কাছে তখন রাশিরাশি মোহর। তাই সে সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গেল তার ঝুলির আশ্চর্য ক্ষমতার কথা।

আর আগের মতোই সে অল্পদিনের মধ্যে দু হাতে উড়িয়ে দিল মোহরগুলো। তার যখন মাত্র চারটে পয়সা সম্বল তখন একদিন এক সরাইখানায় পৌঁছে সে ভাবল, 'টাকা-পয়সা চিরকাল থাকে না। খরচ করার জন্যেই তো টাকা-পয়সা।' তাই সে এক পয়সার রুটি আর তিন পয়সার বিয়ার কিনে খেতে শুরু করে দিল। খেতে-খেতে তার নাকে এল হাঁসের মাংস ঝলসানোর গন্ধ। আনন্দভায়া সেই গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে এদিক-ওদিক উঁকিঝুঁকি মেরে অল্প সময়ের মধ্যেই আবিষ্কার করল সরাইখানার মালিক উনুনে নধর দুটো হাঁস ঝলসাতে দিয়েছে। তখন তার মনে পড়ল তার বন্ধু বলেছিল, যা চাইবে সেটা দিয়ে ভরে যাবে তার ঝুলি। সে কথা সত্যি কিনা পরখ করে দেখার জন্য সরাইখানার বাইরে বেরিয়ে সে বলে উঠল, 'আমি চাই উনুনের ঐ দুটো ঝলসানো হাঁস যেন আমার ঝুলির মধ্যে চলে আসে।' সঙ্গে-সঙ্গে খুট্ করে একটা শব্দ হল আর ঝুলি খুলে সে দেখল ঝলসানো হাঁস দুটো সেখানে চলে এসেছে। তাই-না দেখে সে ভাবল, 'যাক! আমাকে আর কোনো কিছুর জন্যে দুর্ভাবনা করতে হবে না।'

খানিক এগিয়ে এক জায়গায় বসে মনের আনন্দে সে খেতে শুরু করে দিল ঝলসানো সেই হাঁস দুটো। সে যখন একটা হাঁস খাচ্ছে তখন সেখানে হাজির হল দুটি ছাত্র। বাকি হাঁসটার দিকে তারা চাইতে লাগল লোলুপ দৃষ্টিতে। আনন্দভায়া ভাবল, একজনের পক্ষে একটা হাঁসই যথেষ্ট। তাই ছাত্র দুজনকে ডেকে বাকি হাঁসটা তাদের সে দিয়ে দিল।

কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছাত্ররা সেই সরাইখানায় গিয়ে বিয়ার আর রুটির অর্ডার দিয়ে বার করল সেই হাঁসটা।

সরাইখানার মালিকের বউ তাদের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার স্বামীকে গিয়ে বলল, "ছেলে দুটোর কাছে একটা ঝলসানো হাঁস রয়েছে। আমরা যে-দুটো হাঁস উনুনে ঝলসাতে দিয়েছিলাম, দেখ তো, সেটা তাদের একটা কিনা।"

সরাইখানার মালিক ছুটে গিয়ে দেখে উনুনটা খালি। তাই-না দেখে রাগে গর্‌গর্ করতে করতে ছাত্রদের কাছে এসে সে বলল, "হতভাগা,

নচ্ছার, চোর। ভেবেছ কি—বিনা পয়সায় হাঁস পাবে? এক্ষুনি দাম চুকিয়ে দাও, নয়তো মজা দেখাচ্ছি।"

ছাত্ররা বলল, "আমরা চোর নই। ঐ ওখানকার মাঠে এক সৈনিক হাঁসটা আমাদের দিয়েছে।"

ভীষণ রেগে সরাইখানার মালিক বলল, "বাজে কথা বলে পার পাবে না। সেই সৈনিক এখানে এসেছিল। সৎ লোকের মতোই খালি হাতে তাকে চলে যেতে স্বচক্ষে দেখেছি। তোমরা চোর, দাম তোমাদের দিতেই হবে।" কিন্তু হাঁসটার দাম দেবার পয়সাকড়ি তাদের ছিল না। তাই সরাইখানার মালিক একটা লাঠি দিয়ে তাদের আচ্ছা করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে সেখান থেকে দূর করে দিল।

এদিকে আনন্দভায়া হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় পৌঁছল। সেখানে ছিল চমৎকার এক দুর্গ আর ছন্নছাড়া চেহারার এক সরাইখানা। সরাইখানায় গিয়ে সে শুনল সেখানে আর জায়গা নেই। আনন্দভায়া বলল, "এই চমৎকার দুর্গটা থাকতে লোকে এখানে ভীড় করতে আসে কেন, বুঝলাম না।"

সরাইখানার মালিক বলল, "ওখানে যারা রাত কাটাতে যায় তারা আর বেঁচে ফেরে না।"

আনন্দভায়া বলল, "আমি ভয় পাই না। ওখানেই চললাম রাত কাটাতে।"

সরাইখানার মালিক বলল, "আমার কথা শোনো। ওখানে যেয়ো না। গেলে ফাঁসির দড়িতে লটকে যাবে।"

আনন্দভায়া বলল, "সেটা দেখা যাবে। দুর্গের চাবি আর কিছু খাবার-দাবার আমায় দাও।"

সরাইখানার মালিকের কাছ থেকে সেগুলো নিয়ে আনন্দভায়া গেল সেই দুর্গে। সেখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে মেঝেয় সে শুয়ে পড়ল, কারণ খাট-পালঙ্ক সেখানে ছিল না। শোবার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু বিকট একটা শব্দে মাঝরাতে ভেঙে গেল তার ঘুম। চোখ রগড়ে ভালো করে তাকিয়ে সে দেখে নটা ভয়ংকর চেহারার দানব হাতে হাত লাগিয়ে তাকে ঘিরে নাচছে। আনন্দভায়া তাদের বলল, "যত পার নাচো—কিন্তু আমার কাছে আসবে না।"

দানবগুলো কিন্তু তার কথায় কান না দিয়ে ক্রমশ এগিয়ে আসছে

লাগল। আর একটু হলেই তাদের কুৎসিত পায়ের আঘাতে তার মুখ থেঁতো হয়ে যেত।

সে বলল, "শয়তানের দল, শান্ত হও বলছি।" কিন্তু তার কথায় তারা কান দিল না। ক্রমশ বেড়েই চলল তাদের উৎপাত।

শেষটায় আনন্দভায়া দারুণ চটে বলল, "এবার তোমাদের শায়েস্তা করছি।" এই-না বলে একটা চেয়ার তুলে দানবদের সে পেটাতে শুরু করল। কিন্তু নটা দানবের সঙ্গে একটা মানুষ তো আর বেশিক্ষণ যুঝে উঠতে পারে না। একটাকে সে মারলে অন্যটা এসে মুঠো-মুঠো তার চুল ছিঁড়ে নেয়।

আনন্দভায়া তখন চেঁচিয়ে বলল, "এটা নেহাত বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের মজা টের পাওয়াচ্ছি। এই মুহূর্তে সবাই আমার ঝুলির মধ্যে সেঁধোও।" কথাগুলো বলতে না বলতেই দানবগুলো ঝুপ্‌ঝুপ্ করে ঢুকে পড়ল তার ঝুলির মধ্যে। আর সঙ্গে সঙ্গে ঝুলিতে কুলুপ এঁটে ঘরের এক কোণে সেটা সে ফেলল ছুঁড়ে।

দানবদের দাপাদাপি শান্ত হয়ে যেতে আনন্দভায়া আবার শুয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল তার পরদিন সকালে।

যে জমিদারের সেই দুর্গ, তাকে নিয়ে খানিক পরে সরাইখানার মালিক এল সে কেমন আছে দেখতে। তাকে সুস্থ সবল দেখে অবাক হয়ে তারা প্রশ্ন করল—দানবগুলো তার উপর অত্যাচার করেছে কি না।

আনন্দভায়া বলল, "তেমন কিছু নয়। তাদের আমি আমার ঝুলির মধ্যে ভরেছি। এখন তুমি নিশ্চিন্ত মনে তোমার দুর্গে থাকতে পার। কেউ আর উৎপাত করবে না।"

জমিদার তাকে তার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অনেক টাকাকড়ি দিয়ে প্রশ্ন করল—তার কাছে আনন্দভায়া চাকরি করতে রাজি কি না।

সে বলল, "না, ঘুরে বেড়াতেই আমি ভালোবাসি। স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতেই আমি অভ্যস্ত।"

এই-না বলে সেখান থেকে আবার সে বেরিয়ে পড়ল। যেতে যেতে সে পৌঁছল এক কামারশালায়। সেখানকার নেহাই-এর উপর নিজের ঝুলিটা রেখে কামার আর তার সাকরেদদের বলল সেটা হাতুড়ি দিয়ে পিটতে। বিরাট বিরাট হাতুড়ি দিয়ে দমাদম সেটা পিটে চলল তারা আর সেই নটা দানব লাগল আর্তনাদ করতে। খানিক পরে ঝুলিটা খুলে

সে দেখল একটা ছাড়া বাকি আটটা দানবই মরেছে। যে দানবটা মরে নি সেটা আশ্রয় নিয়েছিল ঝুলির একটা ভাঁজের মধ্যে। ঝুলি থেকে বেরিয়ে পড়ি মরি করে সেটা ছুটে পালাল নরকে।

তার পর আনন্দভায়া পৃথিবীর দূর-দূরান্তরে ঘুরে ঘুরে বেড়াল। তার সব অ্যাডভেঞ্চারের কথা লিখতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। শেষটায় সে বুড়ো হয়ে পড়ল আর ভাবতে লাগল নিজের মৃত্যুর কথা। তাই সে এক জ্ঞানীগুণী সাধুর কাছে গিয়ে বলল, "ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। স্বর্গে যাবার পথটা খুঁজে বার করতে তাই আমার ইচ্ছে করছে।"

সাধু বললেন, "দুটো পথের কথা আমি জানি। একটা পথ চওড়া আর সুন্দর। সেটা গেছে নরকে। অন্যটা সরু আর খাড়া। সেটা গেছে স্বর্গে।"

আনন্দভায়া বলল, "যে পথ খাড়া আর দুর্গম সে পথ ধরে যাওয়া তো মূর্খের কাজ।" এই-না বলে প্রশস্ত আর সুন্দর পথটা ধরে সে হাঁটতে লাগল।

যেতে যেতে সে পৌঁছল একটা কালো আর বিরাট ফটকের সামনে। সেটা নরকের প্রবেশপথ। তাতে টোকা দিতে কে এসেছে দেখার জন্য দ্বাররক্ষী উঁকি মেরে তাকাল।

আনন্দভায়াকে দেখে দ্বাররক্ষী ভয়ে লাগল কাঁপতে। কারণ সে হচ্ছে সেই নবম দানব, আনন্দভায়ার ঝুলি থেকে যে প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ফটকে হুড়কো দিয়ে দানব-প্রধানের কাছে ছুটে গিয়ে সে বলল, "বাইরে ঝুলি-কাঁধে নিয়ে একজন দাঁড়িয়ে। সে ভেতরে আসতে চায়। কিন্তু, দোহাই—তাকে ঢুকতে দিয়ো না। দিলে গোটা নরকটাকে সে তার ঝুলিতে ভরে ফেলবে। সেই ঝুলির মধ্যে একবার হাতুড়ির বাড়ি খেতে খেতে কোনোমতে আমি বেঁচে গেছি।"

তাই আনন্দভায়াকে বলা হল সেখান থেকে চলে যেতে। সে ভাবল, 'এরা যদি এখানে আমাকে না চায় তা হলে স্বর্গে গিয়ে দেখি সেখানে একটা আস্তানা মেলে কি না। কারণ কোনো-একটা জায়গায় আমাকে তো বিশ্রাম নিতেই হবে।'

সেখান থেকে ফিরে তাই সে স্বর্গের ফটকে গিয়ে টোকা দিল। সেখানে দ্বাররক্ষী ছিলেন সেণ্ট পিটার। তাঁকে দেখেই চিনতে পেরে

আনন্দভায়া ভাবল, 'এই তো আমার সেই পুরনো বন্ধু। নিশ্চয়ই আমাকে এ আসতে দেবে।'

কিন্তু সেণ্ট পিটার বললেন, "আমাকে কি বিশ্বাস করতে বল তুমি স্বর্গে আসতে চাও ?"

"হ্যাঁ, বন্ধু। আমাকে আসতে দাও। নরকে আমায় ঢুকতে দেয় নি। দিলে তোমায় আর বিরক্ত করতাম না।"

সেণ্ট পিটার মাথা নাড়িয়ে বললেন, "না, এখানে তুমি আসতে পাবে না।"

আনন্দভায়া বলল, "বেশ কথা। আমি যদি আসতে না পারি তা হলে ফিরিয়ে নাও তোমার ঝুলি। তোমার কোনো উপহার আমি রাখতে চাই না।"

সেণ্ট পিটার বললেন, "দাও।"

আনন্দভায়া ফটকের উপর দিয়ে ছুঁড়ে দিল তার ঝুলিটা। সেণ্ট পিটার লুফে নিয়ে নিজের আরাম কেদারার উপর সেটা ঝুলিয়ে রাখলেন।

আনন্দভায়া তখন বলে উঠল, "আমার ইচ্ছে করছে আমার ঝুলিটার মধ্যে যেতে।" আর কী আশ্চর্য—চক্ষের নিমেষে ঝুলিটার মধ্যে সে চলে এল। স্বর্গে প্রবেশ করতে সেণ্ট পিটার তাকে আর বাধা দিতে পারলেন না।



মেরি-শিশু

এক সময় প্রকাণ্ড একটা বনের কাছে থাকত এক কাঠুরে আর তার বউ। তাদের একমাত্র সন্তান—তিন বছরের একটি মেয়ে। ভারি গরিব তারা। রোজ রুটিও জুটত না। ভেবে পেত না মেয়েটিকে কী করে খাওয়াবে। কাঠুরে এক সকালে বনে গেছে তার কাজে। দুর্ভাবনায় নুয়ে পড়েছে তার শরীর। সে কাঠ কুপিয়ে চলেছে—এমন সময় ভারি সুন্দরী ছিপ্‌ছিপে লম্বা একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল তার সামনে। মাথায় তার জ্বলজ্বলে তারার মুকুট। মেয়েটি বলল, "আমি

ভার্জিন মেরি, শিশু যিশুর মা। তুমি গরিব আর অভাবী লোক। তোমার মেয়েকে এনে দাও। তাকে আমি মানুষ করব। তারও মা হব।" আদেশ শুনে কাঠুরে তার মেয়েটিকে এনে দিল ভার্জিন মেরির কাছে। তিনি তাকে সঙ্গে করে স্বর্গে নিয়ে গেলেন। মেয়েটি সেখানে খুবই আদর-যত্নে থাকে। তার মাখন-মাখানো রুটিতে চিনি, তার জন্য মিষ্টি দুধ আর সরবত, পোশাক তার সোনার, দেবশিশুরা তার খেলার সঙ্গী।

যখন তার চোদ্দো বছর বয়েস ভার্জিন মেরি তখন একদিন তাকে ডেকে বললেন, "শোনো বাছা, অনেকদিনের জন্যে বেরুচ্ছি। স্বর্গের তেরোটা দরজার চাবি তোমার কাছে রইল। তাদের মধ্যে বারোটা খুলে সেখানকার ধন-দৌলত দেখতে পার। কিন্তু খবরদার! তেরো নম্বরের ঘরটা খুলবে না। এই ছোট্টো চাবি সে-ঘরটার। ঘরটা খুললেই অশান্তিতে পড়বে।"

কথা শুনবে বলে কাঠুরের ছোট্টো মেয়েটি কথা দিল। ভার্জিন মেরি চলে যাবার পর, সে বেরুল স্বর্গের প্রাসাদের ঘরগুলো দেখতে। এক-এক দিন এক-একটা ঘর সে দেখে বারোটা ঘর দেখা তার শেষ হল। সেই বারোটার প্রত্যেকটা ঘরেই সে দেখল এক-একজন দেবদূতকে। তাদের সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন জ্যোতি বেরুচ্ছে। কাঠুরে-মেয়ে আর তার সাঙ্গপাঙ্গ দেবশিশুরাও মোহিত হয়ে গেল। বাকি তখন শুধু সেই নিষিদ্ধ দরজাটা। সেটার মধ্যে কী আছে দেখার জন্য কাঠুরে-মেয়ের দারুণ কৌতূহল হল। তার খেলার সঙ্গী দেবশিশুদের বলল, "দরজার সবটা খুলব না। খানিক ফাঁক করে শুধু উঁকি মেরে দেখব—কী আছে।"

দেবশিশুরা বলে উঠল, "না-না। দরজা খোলা অন্যায় হবে। ভার্জিন মেরি তোমায় বারণ করেছিলেন। দরজা ফাঁক করলে ফ্যাসাদে পড়বে।"

মেয়েটি আর কোনো কথা বলল না। কিন্তু কী আছে না দেখে মনে তার শান্তি নেই। দেবশিশুরা ঘুমিয়ে পড়লে সে ভাবল, 'আমি তো এখন একা। এখন লুকিয়ে উঁকি মেরে দেখলে কে আর জানছে।' চাবিটা বার করে ঘরটার তালা সে খুলল। আর দরজা খুলতেই তার চোখ গেল ধাঁধিয়ে। ঘরে জ্বলজ্বলে আগুনের মধ্যে বসে রয়েছেন ঈশ্বরের ত্রিমূর্তি—পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা। মুহূর্তের জন্য ভয়ে,

ভক্তিতে, শ্রদ্ধায় অবশ হয়ে গেল তার সমস্ত শরীর। তার পর সেই আগুনের মতো মেঘ স্পর্শ করার জন্য সে বাড়িয়ে দিল একটি আঙুল। সঙ্গে সঙ্গে তার আঙুলের ডগা হয়ে গেল সোনা। আর তার পরেই দারুণ ঘাবড়ে দড়াম্ করে দরজাটা বন্ধ করে দৌড়ে পালাল সে। কিছুতেই তার বুকের ধুকপুকুনি আর থামে না। হাজার ধুলেও, হাজার রগড়ালেও যায় না তার আঙুলের ডগার সোনা।

অল্প কদিন পরেই ভার্জিন মেরি ফিরে এলেন। কাঠুরের মেয়েকে ডেকে চাবিগুলো তিনি ফেরত চাইলেন। চাবির গোছা তাঁর হাতে দেবার সময় ভার্জিন মেরি মেয়েটির চোখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "তেরো নম্বরের দরজাটা খুলেছিলে?" মেয়েটি বলল, "না।" ভার্জিন মেরি তখন তার বুকে হাত দিয়ে বললেন, "তোমার বুক যে ভারি ধ্বকধ্বক করছে।" তিনি জানতেন মেয়েটি তাঁর আদেশ না মেনে দরজা খুলেছিল। তাই আবার প্রশ্ন করলেন, "সত্যি বলছ খোল নি?" দ্বিতীয়বার মেয়েটি বলল, "না।" পবিত্র আগুনের ছোঁয়ায় মেয়েটির যে আঙুল সোনা হয়ে গিয়েছিল সেটি তখন ভার্জিন মেরির চোখে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝলেন তাঁর প্রিয়পাত্রী পাপ করেছে। তৃতীয়বার তিনি প্রশ্ন করলেন, "খুলেছিলে?" আর তৃতীয়বার মেয়েটি উত্তর দিল, "না।" তখন ভার্জিন মেরি বললেন, "তুমি আমার আদেশ মান নি। তার ওপর আবার মিছে কথা বলছ। স্বর্গে থাকার যোগ্য তুমি নও।"

কাঠুরের মেয়ে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। জেগে দেখে নীচের পৃথিবীতে সে রয়েছে এক গহন বনে। সে চেষ্টা করল চীৎকার করে কাঁদতে। কিন্তু গলা দিয়ে কোনো স্বর বেরুল না। লাফিয়ে উঠে চেষ্টা করল ছুটে পালাতে। কিন্তু যেদিকেই যায় দেখে কাঁটার ঘন ঝোপঝাড়। সেই নির্জন জায়গায় একটা ছিল অনেক কালের গাছ। সেটার গুঁড়ি ফাঁপা। সেটাই হল তার থাকার আস্তানা। রাতে সেখানে সে ঘুমোয়। ঝড়ে-জলে সেখানে নেয় আশ্রয়। ভারি কষ্টে তার দিন কাটে। স্বর্গের আরাম আনন্দের কথা, দেবশিশুদের সঙ্গে খেলা করার কথা মনে পড়লে আমুরি-ঝুমুরি হয়ে কাঁদে। খাবারের মধ্যে সেখানে শুধু শাক-পাতা আর বুনো বেরি। সেগুলো জোগাড় করতে তাকে বহু হাঁটাহাঁটি করতে হয়। শরতে গাছের ঝরাপাতা আর

বাদাম মাটি থেকে কুড়িয়ে এনে সে জমিয়ে রাখে। শীতকালে বরফ পড়ার সময় সেই বাদাম সে খায় আর ছোট্টো অসহায় জন্তুর মতো ঝরাপাতার মধ্যে সেঁধিয়ে ঠাণ্ডায় জমে মৃত্যুর হাত থেকে প্রাণ বাঁচায়। কিছুদিনের মধ্যেই তার পোশাক কুটিকুটি হয়ে খসে-খসে পড়তে থাকে। তার পর সূর্য উঠলে, গরম সোনালী রোদে চারি দিক ভরে গেলে কোটর থেকে বেরিয়ে গাছতলায় সে বসে থাকে লম্বা চুল দিয়ে নিজের সমস্ত শরীর ঢেকে। এইভাবে কাটতে থাকে বছরের পর বছর। জীবনের দুঃখকষ্ট হাড়ে-হাড়ে সে অনুভব করতে থাকে।

একদিন—গাছে গাছে যখন সবুজ কচি পাতা—সেদেশের রাজা সেই বনে এলেন মৃগয়ায়। ঘোড়া থেকে নেমে তরোয়াল দিয়ে ঝোপঝাড় কেটে পথ করে একটা হরিণকে তিনি তাড়া করে যেতে লাগলেন। যেতে যেতে পৌঁছলেন যেখানে কাঠুরের সেই সুন্দরী মেয়েটি বসেছিল তার রেশমের মতো পাতলা সোনালী চুলে সর্বাঙ্গ ঢেকে। থমকে দাঁড়িয়ে ভারি অবাক হয়ে মেয়েটিকে তিনি দেখতে লাগলেন। তার পর প্রশ্ন করলেন, "কে তুমি? এই নির্জন জায়গায় একলা কেন বসে?" মেয়েটি কিন্তু উত্তর দিল না, কারণ মুখ খুলতে সে পারে না। রাজা



প্রশ্ন করলেন তাঁর সঙ্গে তাঁর দুর্গে যেতে সে রাজি কি না। মেয়েটি ঘাড় হেলিয়ে জানাল—রাজি। নিজের ঘোড়ায় তাকে তুলে নিয়ে রাজা এলেন নিজের বাড়িতে। দুর্গে পৌঁছে তিনি আদেশ দিলেন মেয়েটিকে নিখুঁত সুন্দর পোশাকে সাজাতে। তাকে দিলেন অজস্র উপহার। কাঠুরের মেয়ের কোনোকিছুরই অভাব রইল না। মেয়েটি কথা বলতে পারে না। কিন্তু তার রূপেগুণে মুগ্ধ হয়ে কিছুকালের মধ্যেই রাজা তাকে বিয়ে করলেন।

বছর খানেক বাদে রানীর একটি ছেলে হল। রাতে একলা যখন সে বিছানায় শুয়ে, ভার্জিন মেরি এসে বললেন, "এখন স্বীকার করবে সেই নিষিদ্ধ দরজাটা খুলেছিলে বলে? সত্যি কথা বললে তুমি মুখ খুলতে পারবে, তোমার কথা বলার ক্ষমতা আবার ফিরিয়ে দেব। কিন্তু এখনো পাপ করে একগুঁয়ের মতো অস্বীকার করলে তোমার ছেলেকে নিয়ে যাব।" রানী উত্তর দেবার ক্ষমতা পেল, কিন্তু জেদ তার গেল না। বলল, "না, নিষিদ্ধ দরজা খুলি নি।" উত্তর শুনে তার কোল থেকে নবজাত শিশুকে নিয়ে ভার্জিন মেরি অদৃশ্য হলেন।

পরদিন সকালে সেই শিশুকে দেখতে না পেয়ে লোক ফিস্‌ফিস্ গুজ্‌গুজ্ শুরু করে দিল। গুজব রটল রানী রাক্ষসী, নিজের ছেলেকে খেয়েছে। রানীর কানে সব কথাই এল। কিন্তু নিজের হয়ে কোনো কথা বলতে পারল না। কারণ কথা বলার ক্ষমতা তার নেই। রাজা কিন্তু লোকের কথায় কান দিলেন না। কারণ রানীকে তিনি খুব ভালোবাসতেন।

পরের বছর রানীর দ্বিতীয় ছেলে জন্মাল। রাতে ভার্জিন মেরি আবার তার কাছে এসে বললেন, "এখন স্বীকার করবে সেই নিষিদ্ধ দরজাটা খুলেছিলে বলে? সত্যি কথা বললে তুমি মুখ খুলতে পারবে, তোমার ছেলে আর তোমার কথা বলার ক্ষমতা আবার ফিরিয়ে দেব। কিন্তু এখনো পাপ করে একগুঁয়ের মতো অস্বীকার করলে তোমার এ-ছেলেকেও নিয়ে যাব।" আবার রানী উত্তর দিল, "না, নিষিদ্ধ দরজা খুলি নি।" উত্তর শুনে তার কোল থেকে নবজাত শিশুকে নিয়ে ভার্জিন মেরি অদৃশ্য হলেন।

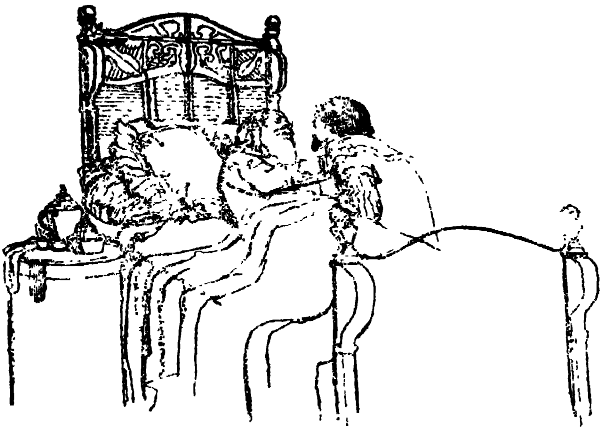
পরদিন সকালে সেই শিশুকে দেখতে না পেয়ে লোকে এবার বেশ জোর গলাতেই বলাবলি করতে লাগল—রানী তাকে খেয়ে ফেলেছে।

রানীর বিচারের দাবি করলেন রাজার মন্ত্রীরা। কিন্তু রানীকে এতই ভালোবাসতেন রাজা যে কারুর কথাতেই কান দিলেন না। মন্ত্রীদের বললেন সে কথা আবার উচ্চারণ করলে তাদের প্রাণদণ্ড দেবেন।

পরের বছর রানীর কোলে এল ফুটফুটে ছোটো একটি মেয়ে। রাতে তৃতীয়বার ভার্জিন মেরি তার কাছে এসে বললেন, "আমার সঙ্গে এসো।" রানীর হাত ধরে স্ব.র্গ এনে তিনি তাকে দেখালেন তার আগের দুই ছেলেকে। তারা হাসিতে কুটোপাটি হয়ে বল নিয়ে খেলছিল। দেখে রানীর আনন্দ আর ধরে না। তখন ভার্জিন মেরি বললেন, "এখন তোমার মন গলেছে তো? নিষিদ্ধ দরজাটা খুলেছিলে বলে স্বীকার করলে তোমার দুই ছেলেকে ফিরিয়ে দেব।" কিন্তু তৃতীয়বার রানী উত্তর দিল, "না, নিষিদ্ধ দরজা খুলি নি।" ভার্জিন মেরি তখন আবার তাকে পৃথিবীতে ফেরত পাঠিয়ে তার তৃতীয় শিশুকে নিয়ে নিলেন।

পরদিন গুজবটা চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ল। প্রজারা জোর গলায় বলত লাগল—রানী যে রাক্ষসী তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই, তার বিচার হওয়া দরকার। রাজা আর মন্ত্রীদের মুখ বন্ধ করতে পারলেন না। রানীর বিচারের জন্য সভা ডাকা হল। রানী কোনো কথা বলতে বা নিজের পক্ষ সমর্থন করতে পারল না। তাই বিচারে স্থির হল তাকে পুড়িয়ে মারা হবে। রানীকে একটা খুঁটিতে বেঁধে তার চারি দিকে স্তূপাকার করা হল কাঠ। আগুনের শিখা লকলক করে উঠল। আর হঠাৎ রানীর উদ্ধত গর্বিত হৃদয় গেল গলে। আন্তরিক অনুতপ্ত হয়ে সে ভাবল, 'মরবার আগে যদি দোষ স্বীকার করতে পারতাম! যদি বলতে পারতাম দরজাটা খুলেছিলাম।' সঙ্গে সঙ্গে তার গলায় স্বর ফিরে এল। রানী চেঁচিয়ে উঠল, "হ্যাঁ মেরিমাতা—খুলেছিলাম!" দেখতে দেখতে আকাশ থেকে বৃষ্টি নেমে আগুন নিভিয়ে ফেলল। রানীর চারি দিকে জ্বলজ্বল করতে লাগল একটা জ্যোতি। ভার্জিন মেরি নেমে এল। তাঁর দু পাশে রানীর দুই ছেলে, কোলে নবজাত ছোট্টো মেয়েটি।

সদয় স্বরে তিনি বললেন, "পাপী পাপ স্বীকার করলে তাকে ক্ষমা করা হয়।" রানীকে তিনি ফিরিয়ে দিলেন তার তিনটি সন্তান আর কথা বলার ক্ষমতা আর জীবনভোর আনন্দ।



প্রভুভক্ত জন

অনেক কাল আগে ছিলেন এক বুড়ো রাজা। অসুস্থ হয়ে পড়ে তিনি ভাবলেন, 'যে বিছানায় শুয়ে আছি খুব সম্ভব এটাই হবে আমার মৃত্যুশয্যা।' তাই তিনি বললেন, "প্রভুভক্ত জন-কে আমার কাছে ডেকে দাও।" প্রভুভক্ত জন ছিল তাঁর প্রিয় ভৃত্য। খুবই বিশ্বাসী সে। তাই লোকে তার নাম দিয়েছিল প্রভুভক্ত জন। বিছানার পাশে এসে সে দাঁড়াতে রাজা বললেন, "প্রভুভক্ত জন! আমি বুঝতে পারছি আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। আমার একমাত্র ভাবনা আমার ছেলের জন্যে। এখনো তার বয়েস খুব কম। তাই সব সময় হয়তো বুঝে উঠতে পারবে না কোনটা করা উচিত। তুমি কথা দাও, সব-কিছু তাকে শেখাবে, তার বাবার জায়গা তুমি নেবে। তুমি কথা না দিলে শান্তিতে আমি চোখ বুজতে পারব না।"

রাজার কথা শুনে প্রভুভক্ত জন বলল, "কখনো তাকে আমি ছেড়ে যাব না। জীবন-পণ করে সব সময় তার সেবা করে যাব।"

বুড়ো রাজা বললেন, "বাঁচলাম! এবার আমি শান্তিতে মরতে পারব। আর শোনো, আমি মরবার পর দুর্গ দিয়ে ঘেরা এই পুরো প্রাসাদটা তাকে দেখাবে—এখানকার সভাঘর, হলঘর আর মাটির তলার সব ঘরগুলো। দেখাবে সেখানকার সব ধনদৌলত। কিন্তু লম্বা বারান্দার

শেষ ঘরটা কক্ষনো তাকে দেখাবে না। সেখানে লুকনো আছে স্বর্ণপুরীর রাজকন্যের ছবি। ছবিটা দেখলে রাজকন্যেকে দারুণ ভালোবেসে সে জ্ঞান হারাবে। সেই রাজকন্যের জন্যে ভীষণ বিপদে পড়বে সে। বিপদটার হাত থেকে তাকে তুমি বাঁচিয়ো।" প্রভুভক্ত জন কথা দিলে বুড়ো রাজা শান্ত হলেন, তার পর বালিশে মাথা রেখে চিরকালের জন্য চোখ বুজলেন।

বুড়ো রাজাকে কবর দেবার পর তরুণ রাজাকে প্রভুভক্ত জন জানাল তার প্রতিজ্ঞার কথা। বলল, "সেই প্রতিজ্ঞা আমি পালন করবই। তোমার বাবার যেরকম সেবা করেছি, জীবন-পণ করে তোমারও সেরকম সেবা করে যাব।"

বুড়ো রাজার জন্য শোকের সময় পার হবার পর তরুণ রাজাকে প্রভুভক্ত জন বলল, "বাবার কাছ থেকে যা পেয়েছ সেটা দেখার সময় এবার হয়েছে। তোমার বাবার রাজপুরীর সব ঘর ঘুরিয়ে তোমায় দেখাব।"

রাজপুরীর উপরে নীচে—সর্বত্র তাকে সে নিয়ে গেল। দেখাল সব ধনদৌলত আর জমকাল ঘরগুলো। কিন্তু যে-ঘরে সেই বিপজ্জনক ছবি টাঙান, সে-ঘরটার দরজা সে খুলল না। ছবিটা এমন আশ্চর্য সুন্দরভাবে আঁকা যে, দেখলে মনে হয় সেটা যেন জীবন্ত, যেন নিশ্বেস নিচ্ছে। সেটার মতো নিখুঁত সুন্দর পৃথিবীতে আর কোনো জিনিস নেই। তরুণ রাজা লক্ষ্য করল প্রভুভক্ত জন বিশেষ একটা দরজা সব সময় এড়িয়ে যায়। তাই একদিন তাকে প্রশ্ন করল, "এ-ঘরটার চাবি কখনো খোল না কেন?"

জন বলল, "তার কারণ ও-ঘরে ভয়ংকর একটা জিনিস আছে। দেখলে আঁতকে উঠবে।"

তরুণ রাজা বলল, "গোটা রাজপুরী দেখেছি। এখন দেখতে চাই এ ঘরটায় কী আছে।" কথাগুলো বলে সে এগিয়ে গেল। হয়তো জোর করেই দরজাটা সে খুলে ফেলত।

প্রভুভক্ত জন তাকে বাধা দিয়ে বলল "তোমার বাবার মৃত্যুশয্যায় তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ও-ঘরটায় তোমায় যেতে দেব না, কারণ তাতে দুজনেই আমরা খুব বিপদে পড়তে পারি।"

তরুণ রাজা বলল, "ও ঘরটায় যেতে না পারলেই তো নিদারুণ

দুর্দশায় পড়ব। কারণ ঘরটার ভেতরে কী আছে নিজের চোখে না দেখলে দিনে-রাতে মুহূর্তের জন্যেও শান্তি পাব না। তুমি দরজার তালা না খোলা পর্যন্ত এখান থেকে নড়ছি না।"

প্রভুভক্ত জন দেখল সে নিরুপায়। তাই ক্ষুণ্ণ মনে হাতের চাবির গোছা থেকে ঘরটার চাবি সে বার করল। দরজার তালা খুলে প্রথম ঘরে ঢুকল সে। ভাবল সামনে দাঁড়ালে ছবিটা রাজা দেখতে পাবে না। কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না। কারণ ডিঙি-মেরে দাঁড়িয়ে তার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল রাজা। ঝকমকে সোনা আর হীরে-জহরতের গয়না-পরা সুন্দরী মেয়েটির ছবি দেখার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে সে পড়ল লুটিয়ে। প্রভুভক্ত জন তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে বিছানায় এনে শোয়াল, তার পর বিমর্ষ হয়ে ভাবল, 'বিপদ শুরু হয়ে গেছে। শেষ কোথায় কে জানে?' রাজাকে সামান্য মদ খাইয়ে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনল সে।

জ্ঞান হতে প্রথমেই রাজা জানতে চাইল সুন্দর ছবিটা কার?

প্রভুভক্ত জন বলল, "স্বর্ণপুরীর রাজকন্যের।"

শুনে রাজা বলল, "রাজকন্যেকে এমন ভালোবেসে ফেলেছি যে, বনের পাতাগুলো সব জিভ হলেও সেই ভালোবাসার কথা প্রকাশ করতে পারত না। তাকে পাবার জন্যে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। তুমি আমার বিশ্বস্ত জন। তোমাকে সাহায্য করতে হবেই।"

প্রভুভক্ত ভৃত্য অনেকক্ষণ ধরে ভাবল, কী করে সে কাজে এগুনো যায়। কারণ রাজকন্যেকে দেখতে পাওয়াই দুষ্কর। ভেবে ভেবে শেষটায় তার মাথায় একটা ফন্দি এল। রাজাকে সে বলল, "রাজ-কন্যের সব জিনিসই সোনার—চেয়ার, টেবিল, পেয়ালা, পিরিচ, গেলাস, আসবাবপত্র, সব-কিছু। তোমার কোষাগারে পাঁচ টন সোনা আছে। তার থেকে এক টন স্যাকরাদের তুমি দাও। তাই থেকে তারা বানাক পাখি, হরিণ আর সব সুন্দর সুন্দর জন্তু-জানোয়ার। সেগুলো পেলে রাজকন্যে খুশি হবে। সেগুলো নিয়ে গিয়ে আমরা আমাদের ভাগ্য-পরীক্ষা করব।"

রাজ্যের সব স্যাকরাদের রাজা ডেকে পাঠাল। দিনরাত খেটে আশ্চর্য সুন্দর কারুকাজের অসংখ্য জিনিসপত্র তারা বানাল। তার পর প্রভুভক্ত জন সেই-সব বহুমূল্য জিনিস জাহাজে তুলে রাজার সঙ্গে নিজেও

ধরল এমন সদাগরের ছদ্মবেশ, যাতে কেউ তাদের চিনতে না পারে। পাল উঠল তাদের জাহাজে। পাড়ি দিল তারা সাত সমুদ্দুর। তার-পর পৌঁছল স্বর্ণপুরীর রাজকন্যের দেশে।

প্রভুভক্ত জন জাহাজে রাজাকে রেখে তীরে একলা নামার সময় বলল, "রাজকন্যেকে নিয়ে আসতে পারি। তাই বলছি সবাই তৈরি থেকো, সোনার জিনিসপত্তরগুলো সাজিয়ে রেখো। সাজিয়ে রেখো পুরো জাহাজটা।" তার পর বাছাই-করা কয়েকটা সোনার জিনিস নিয়ে তীরে নেমে সোজা গেল সে রাজপুরীতে।

রাজপুরীর প্রাসাদের উঠোনে এসে সে দেখে তরুণী একটি মেয়ে সোনার বালতিতে ঝরনা থেকে জল তুলছে। স্ফটিক-স্বচ্ছ জল-ভরা বালতি নিয়ে যাবার সময় মেয়েটি দেখল এক বিদেশীকে। তাকে সে জিগ্‌গেস করল, "কে তুমি?"

সে বলল, "আমি এক সদাগর। এসেছি অনেক দূর থেকে। এই দ্যাখো আমার সওদাগুলো।" তাই-না বলে নিজের আলখাল্লার মতো জামা খুলে মেয়েটিকে তার সঙ্গেকার কয়েকটা জিনিস বার করে সে দেখাল।

"আরে! কী সব অদ্ভুত সুন্দর জিনিস", বালতি নামিয়ে মেয়েটি এক-একটা জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তার পর বলল, "রাজকন্যেকে এগুলো দেখানো দরকার। সোনার জিনিসপত্তর সে ভীষণ ভালোবাসে। সব-কটাই সে কিনে নেবে।" প্রভুভক্ত জন-এর হাত ধরে মেয়েটি নিয়ে এল তাকে রাজপুরীতে। মেয়েটি ছিল রাজকন্যের দাসী।

জিনিসগুলো দেখে ভারি খুশি হয়ে রাজকন্যে বলল, "ভারি সুন্দর কারুকার্যের জিনিস, সবগুলোই কিনব।"

তাই শুনে কিন্তু প্রভুভক্ত জন বলল, "ধনী সদাগরের আমি নগণ্য ভৃত্য। জাহাজে প্রভুর যে-সব জিনিস আছে এগুলো তাদের কাছে লাগে না। সোনার ওরকম দামী দামী সুন্দর জিনিস কোথাও আর নেই।"

রাজকন্যে তাকে বলল, জাহাজ থেকে সব জিনিস নিয়ে আসতে। তাই শুনে জন বলল, "অনেক-অনেক জিনিস! সবগুলো আনতে বহু দিন লাগবে। তোমার রাজপুরীর হলঘরে অত জিনিস ধরবে না।"

তাই শুনে রাজকন্যের কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। শেষটায়

বলল, "জাহাজে আমাকে নিয়ে চলো। তোমার প্রভুর দামী জিনিস-গুলো নিজে গিয়ে দেখব।"

প্রভুভক্ত জন রাজকন্যেকে নিয়ে গেল জাহাজে। আর তাকে দেখে রাজার মনে হল ছবিটার চেয়েও সে সুন্দরী। ভালোবাসার আবেগে রাজার মনে হল তার হৃদয় বুঝি ফেটে যাবে! রাজকন্যের হাত ধরে সে তাকে নিয়ে গেল জাহাজের ভিতরে। প্রভুভক্ত জন কিন্তু তাদের সঙ্গে গেল না। জাহাজের ক্যাপটেনকে নোঙর তোলার আদেশ দিয়ে সে বলল, "সব পাল খাটাও যাতে আকাশের পাখির মতো জাহাজটা জলের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে পারে।" রাজকন্যেকে নীচের কেবিনে এনে এক-এক করে রাজা তাকে দেখাতে লাগল সোনার পিরিচ-পেয়ালা-রেকাব আর নানা পাখি-হরিণ-জীবজন্তুর মূর্তি। রাজকন্যে জিনিসগুলো দেখতে দেখতে কেটে গেল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সে এমনি আত্মহারা হয়ে পড়েছিল যে, লক্ষ্যই করল না জাহাজটা যেন উড়ে চলেছে। শেষ জিনিসটা পরীক্ষা করে সদাগরকে ধন্যবাদ দিয়ে তীরে নামার জন্য জাহাজের পাশে গিয়ে সে দেখে—তীর অনেক দূরে। টের পায়—পালে বাতাস লাগায় জাহাজটা যেন উড়ে চলেছে। তাই-না দেখে দারুণ ভয় পেয়ে কাঁদতে-কাঁদতে সে বলতে লাগল, "হায় হায়! আমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এরা ধরে নিয়ে চলেছে। সদাগরের পাল্লায় আমি পড়েছি। এর চেয়ে আমার মরণ ছিল ভালো।"

তখন রাজকন্যের হাত ধরে রাজা বলল, "আমি সদাগর নই। তুমি যেমন রাজকন্যে আমিও সেরকম রাজপুত্তুর। তোমাকে ভীষণ আমি ভালোবাসি। তাই সদাগরের বেশ ধরে তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছিলাম। তোমার ছবি প্রথম দেখে অজ্ঞান হয়ে আমি পড়ে যাই।" কথাগুলো শুনে স্বর্ণপুরীর রাজকন্যে আশ্বস্ত হল। রাজাকেও সে ফেলল ভালো-বেসে আর সানন্দে রাজি হল তাকে বিয়ে করতে।

জাহাজ মাঝ-সমুদ্র দিয়ে ছুটে চলেছে। প্রভুভক্ত জন সেদিন জাহাজের সামনের দিকে বসে বাঁশি বাজাচ্ছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল—তিনটে দাঁড়কাক আকাশ দিয়ে উড়ে চলেছে। তাদের কথাবার্তা শোনার জন্য সে বাঁশি থামাল। কারণ তাদের ভাষা সে বুঝত।

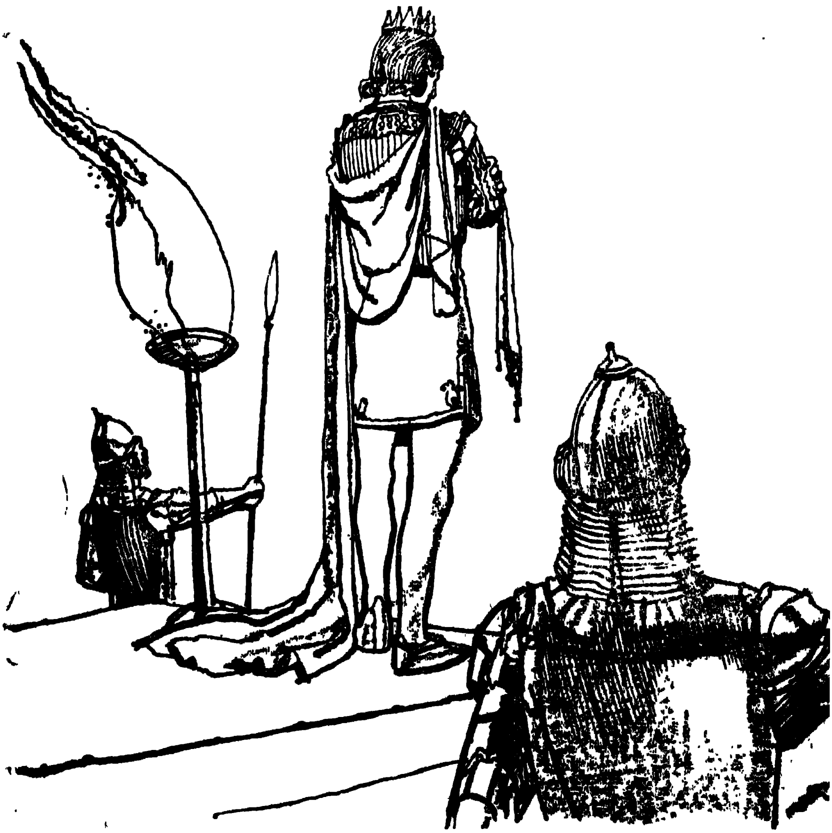
প্রথম দাঁড়কাক বলল, "ঐ দ্যাখো—স্বর্ণপুরীর রাজকন্যেকে রাজা তার দেশে নিয়ে চলেছে।"

দ্বিতীয় দাঁড়কাক বলল, "নিয়ে চলেছে বটে, কিন্তু এখনো পুরোপুরি রাজা তাকে পায় নি।"

তৃতীয় দাঁড়কাক বলল, "পেয়েছে বৈকি! ঐ দ্যাখো না, জাহাজে রাজার পাশে সে বসে রয়েছে।"

প্রথম দাঁড়কাকটা আবার বলতে শুরু করল, "তাতে কোনো ফল হবে না। কারণ ওরা তীরে পৌঁছুলে সাদা ছোপ দেওয়া কালো একটা ঘোড়া রাজার দিকে ছুটে আসবে। রাজা তার পিঠে চড়বে। আর তাই যদি চড়ে, রাজাকে নিয়ে ঘোড়াটা শূন্যে উড়ে যাবে। রাজকন্যের দেখা আর সে পাবে না।"

দ্বিতীয় দাঁড়কাক প্রশ্ন করল, "কিন্তু তার কোনো প্রতিকার নেই?"

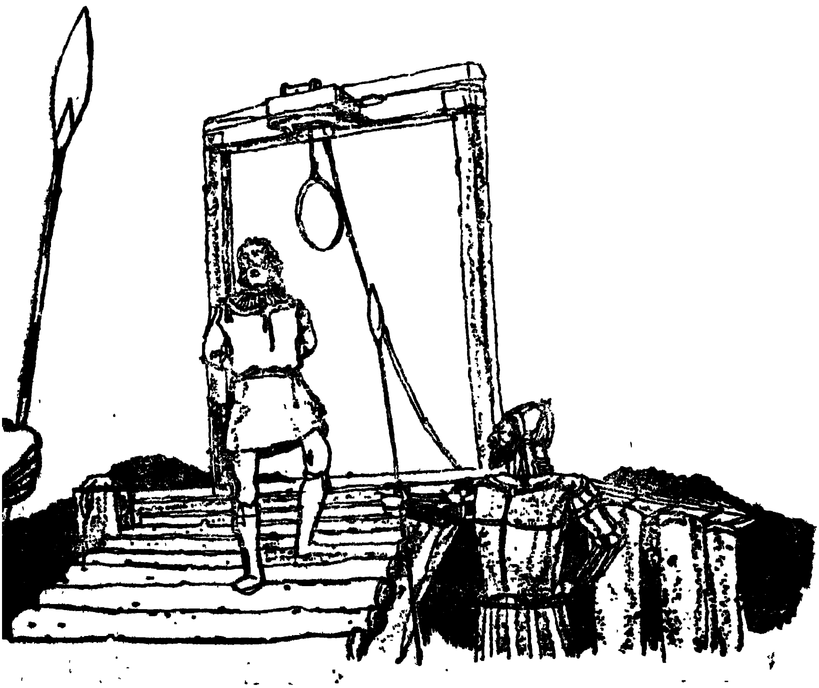


প্রথমজন বলল, "আছে বৈকি। কেউ যদি চট্‌পট্‌ রাজার আগে গিয়ে লাফিয়ে ঘোড়াটায় চড়ে খাপ থেকে পিস্তল বার করে গুলি করে সেটাকে মারে, তা হলে বিপদ থেকে রাজা রক্ষে পাবে। কিন্তু সে কথা কে জানে? আর জানলেও রাজাকে সে কথা যে বলবে, সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের আঙুল থেকে হাঁটু পর্যন্ত পাথর হয়ে যাবে।"

তাই শুনে দ্বিতীয় দাঁড়কাক বলল, "আমি আর একটা কথা জানি। ঘোড়াটা মরলেও রাজকন্যেকে রাজা রাখতে পারবে না। রাজপুরীতে তারা পৌঁছলে দেখবে একটা পাত্রে রাজার বিয়ের পোশাক রয়েছে। দেখে মনে হবে সোনা আর রুপোর সুতো দিয়ে সেটা বোনা। কিন্তু আসলে সেটা তৈরি গন্ধক আর পিচ্‌ দিয়ে। যে সেটা পরবে, তার হাড়-মাস পুড়ে যাবে।"

তৃতীয় দাঁড়কাক প্রশ্ন করল, "তার কোনো প্রতিকার নেই?"

দ্বিতীয়জন বলল, "আছে বৈকি। কেউ যদি দস্তানা পরে সেই পোশাক আগুনে ছুঁড়ে পোড়ায় তা হলে তরুণ রাজা রক্ষে পাবে। কিন্তু



সে কথা কে জানে ? আর জানলেও রাজাকে সে কথা যে বলবে সঙ্গে সঙ্গে তার হাঁটু থেকে বুক পর্যন্ত পাথর হয়ে যাবে।"

তাই শুনে তৃতীয় দাঁড়কাক বলল, "আমি আরো একটা কথা জানি। পোশাকটা পুড়লেও রাজকন্যেকে রাজা রাখতে পারবে না। কারণ বিয়ের পর নাচের সময় রানী নাচতে শুরু করলে হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে সে পড়ে যাবে। দেখে মনে হবে সে বুঝি মারা গেছে। কেউ তাকে তুলে রানীর ডান হাতের তর্জনী থেকে তিন ফোঁটা রক্ত চুষে থু-থু করে ফেলে না দিলে রানী মারা যাবে। কিন্তু সে কথা কে জানে ? আর জানলেও রাজাকে সে কথা যে বলবে সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার চাঁদি থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত পাথর হয়ে যাবে।"

কথাগুলো বলে দাঁড়কাক তিনটে উড়ে চলে গেল। সব-কিছু শুনল প্রভুভক্ত জন। "আর তার পর থেকে সে ভারি চুপচাপ আর মনমরা হয়ে গেল। কারণ সে ভাবল, 'কথাগুলো না জানালে তরুণ রাজা অসুখী হবে ; জানালে নিজের যাবে প্রাণ।' অনেক ভেবে শেষটায় মনে মনে সে বলল, 'প্রভুকে বিপদ থেকে আমি রক্ষে করবই। তার জন্যে যদি আমার প্রাণ যায়, তো যাবে।'

দাঁড়কাকগুলো যা বলেছিল ঠিক তাই ঘটল। তীরে পৌঁছতে সাদা ছোপ দেওয়া সুন্দর একটা ঘোড়া লাফাতে-লাফাতে তাদের দিকে এগিয়ে এল। রাজা বলল, "এই ঘোড়াটায় চেপে আমি রাজপুরীতে যাব।" ঘোড়ায় সে চড়তে যাবে, কিন্তু তার আগেই প্রভুভক্ত জন সেখানে পৌঁছে চট্‌পট্ সেটার পিঠে উঠে খাপ থেকে পিস্তল বার করে গুলি ছুঁড়ে ঘোড়াটাকে মেরে ফেলল।

অন্য ভৃত্যরা প্রভুভক্ত জনকে দেখতে পারত না। তারা চেঁচিয়ে উঠল, "এই সুন্দর ঘোড়াটা রাজাকে রাজপুরীতে নিয়ে যেত। তাকে গুলি করে মারা ভারি অন্যায় হয়েছে।"

রাজা তাদের ধমকে বললেন, "চুপ কর ! ওকে কেউ কিছু বলবে না। ও আমার সব চেয়ে বিশ্বস্ত ভৃত্য। কে জানে কী কারণে এটা সে করেছে।"

রাজপুরীতে তারা পৌঁছে দেখল হলঘরে একটা পাত্রে বিয়ের একটা পোশাক রয়েছে। দেখে মনে হয় সোনার আর রুপোর সুতো দিয়ে বোনা। তরুণ রাজা সেটা গেল তুলতে। কিন্তু প্রভুভক্ত জন

দস্তানা পরে রাজাকে সরিয়ে পোশাক নিয়ে দৌড়ে আগুনের কাছে এনে সেটা পুড়িয়ে ফেলল। অন্য ভৃত্যরা আবার গজ্‌গজ্‌ করতে করতে বলল, "কী কাণ্ড! রাজার বিয়ের পোশাক লোকটা এখন পোড়াচ্ছে!"

তরুণ রাজা কিন্তু আবার তাদের ধমকে বলল, "চুপ কর! ওকে কেউ কিছু বলবে না। ও আমার সব চেয়ে বিশ্বস্ত ভৃত্য। কে জানে কী কারণে এটা সে করেছে।"

বিয়ে হয়ে গেল। নাচ শুরু হল। কনে এগিয়ে গেল নাচে যোগ দিতে। প্রভুভক্ত জন তাকিয়ে রইল রানীর মুখের দিকে। হঠাৎ রানীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল আর পরক্ষণেই মেঝের উপর সে পড়ল টলে। দেখে মনে হয় দেহে তার প্রাণ নেই। প্রভুভক্ত জন দৌড়ে গিয়ে মেঝে থেকে রানীকে তুলে নিয়ে গেল রানীর শোবার ঘরে। তার পর তাকে বিছানায় শুইয়ে তার আঙুল কামড়ে তিন ফোঁটা রক্ত নিল চুষে। সঙ্গে সঙ্গে আবার রানীর নিশ্বেস পড়তে শুরু করল, জ্ঞান ফিরে এল। তরুণ রাজা কিন্তু লক্ষ্য করেছিল জন-এর কাণ্ড-কারখানা। রানীর আঙুল কেন সে কামড়েছিল সেটা রাজা অনুমান করতে পারে নি। তাই ভীষণ রেগে সে চীৎকার করে উঠল, "লোকটাকে হাজতে নিয়ে যাও।"

পরদিন সকালে প্রভুভক্ত জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। তাকে নিয়ে আসা হল ফাঁসির মঞ্চে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বলল, "মৃত্যুর আগে সবাইকেই কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়। আমারও সেই অধিকার আছে।"

রাজা বলল, "হ্যাঁ, তোমাকে কথা বলার সুযোগ দিলাম।"

প্রভুভক্ত জন তখন বলল, "রাজা! আমাকে অন্যায়ভাবে সাজা দিয়েছ। জীবনে কখনো তোমার প্রতি কর্তব্যে আমি অবহেলা করি নি।" তার পর সে বলে গেল সমুদ্র পেরিয়ে আসার সময় কীভাবে দাঁড়কাকদের কথা সে শুনেছিল আর প্রভুর জীবন বাঁচাবার জন্য কেন ঐ-সব কাজ করতে সে হয়েছিল বাধ্য।

তার কথা শুনে রাজা চেঁচিয়ে উঠল, "আমার সব চেয়ে বিশ্বস্ত জন! তোমার শাস্তি মকুব করা হল।—ওকে তোমরা নামিয়ে আনো।" কিন্তু শেষ কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রভুভক্ত জন-এর জীবন-শূন্য দেহটা গেল পড়ে। সে পাথর হয়ে গেল।

তাই দেখে রাজা আর রানী গভীর শোকে অভিভূত হয়ে পড়ল। রাজা বলল, "হায়, হায়! চরম প্রভুভক্তির কী জঘন্য পুরস্কারই-না দিলাম!" পাথরের সেই মূর্তিকে তুলে আনিয়ে রাজা রাখল তার ঘরে, নিজের বিছানার পাশে। যখনই সেটির দিকে তাকায় তখনই কাঁদতে কাঁদতে রাজা বলে ওঠে, "আমার বিশ্বস্ত জন! যদি তোমাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারতাম!"

সময় কাটে। রানীর জন্মাল যমজ দুটি ছোট্টো ছেলে। তারা বড়ো হয়ে উঠতে লাগল। তাদের দেখে রানীর আর আনন্দ ধরে না। একদিন রানী গেছে গির্জেয়। রাজার পাশে বসে ছেলেদুটি তখন খেলা করছিল। এমন সময় সেই মূর্তির দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বেস ফেলে রাজা বলে উঠল, "আমার বিশ্বস্ত জন! যদি তোমাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারতাম! যদি তোমাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারতাম!"

রাজার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই মূর্তি কথা বলতে শুরু করে বলল, "তোমার যেটা সব চেয়ে প্রিয় বস্তু সেটা ত্যাগ করলে আমাকে তুমি বাঁচিয়ে তুলতে পারবে।"

রাজা বলল, "আমার সব-কিছু তোমার জন্যে ত্যাগ করতে আমি প্রস্তুত।"

মূর্তি বলল, "তোমার দুই ছেলের মাথা কেটে তাদের রক্ত আমাকে মাখালে আবার আমি জীবন ফিরে পাব।"

তার প্রিয় সন্তানদের হত্যা করার কল্পনায় রাজার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। তার পর রাজার মনে পড়ল তার ভৃত্যের পরম আনুগত্যের কথা। মনে পড়ল, তার জন্য কী ভাবে জন তার জীবন দিয়েছিল। তাই সে খাপ থেকে তরোয়াল বার করে তার ছেলেদের মাথা কেটে ফেলল। তার পর পাথরে তাদের রক্ত ছোঁয়াতেই বেঁচে উঠল সেই মূর্তি; তার সামনে সুস্থ জীবন্ত শরীরে দাঁড়াল প্রভুভক্ত জন। রাজাকে জন বলল, "রাজা! আমার প্রতি তোমার ভালোবাসার পুরস্কার তুমি পাবে।" তার পর ছেলেদের মুণ্ডু তুলে নিয়ে তাদের শরীরের সঙ্গে আটকে কাটা জায়গায় তাদের রক্ত ঘষে দিল জন। আর কী আশ্চর্য! দেখতে দেখতে বেঁচে উঠে এমনভাবে দৌড়ঝাঁপ করে তারা খেলে বেড়াতে লাগল যেন কিছুই তাদের হয় নি।

তাই দেখে রাজা তাদের লুকিয়ে ফেলল একটা ঘরে। রানী এলে রাজা তাকে প্রশ্ন করল, "তুমি কি গির্জেয় গিয়েছিলে?"

রানী বলল, "হ্যাঁ। কিন্তু প্রভুভক্ত জন-এর কথা না ভেবে আমি পারি নি। কেবলই মনে হচ্ছিল, আমাদের জন্যে কী ভাবে নিজের জীবন সে বিলিয়ে দিয়েছে।"

রাজা বলল, "শোন রানী! তাকে আবার আমরা বাঁচিয়ে তুলতে পারি। কিন্তু তার জন্যে আমাদের দুই ছেলেকে বলি দিতে হবে।"

রাজার কথা শুনে রানীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কেঁপে উঠল তার বুক। কিন্তু সে বলল, "তার পরম প্রভুভক্তির জন্যে এই চরম ত্যাগও আমাদের স্বীকার করতে হবে।"

নিজের ভাবনার সঙ্গে রানীর ভাবনা মিলে যেতে দেখে ভারি খুশি হল রাজা। সেই ঘরের দরজা খুলে প্রভুভক্ত জন আর তাদের দুই ছেলেকে নিয়ে এসে রাজা বলল, "ঈশ্বরের কী অসীম দয়া—প্রভুভক্ত জন তার জীবন ফিরে পেয়েছে। আমাদের ছেলেরাও বেঁচে উঠেছে।"

সব ঘটনার কথা রানীকে বলল রাজা। আর তার পর থেকে পরম আনন্দে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সবাই তারা বেঁচে রইল।



কাঁপতে শেখা

একটি লোকের ছিল দুই ছেলে। বড়োটি চালাক-চতুর। ছোটোটি হাবাগোবা। কিছুই সে বোঝে না, কিছুই পারে না শিখতে। তাকে দেখে লোকে বলে, "ছেলেটার জন্যে বাপের কপালে অনেক দুঃখু আছে।"

কোনো কিছু করার দরকার হলে ডাক পড়ে বড়ো ছেলের। কিন্তু

কোনো জিনিস আনার জন্য সন্ধে কিংবা রাতে তার বাবা যেতে বললে আর পথটা গির্জের কবরখানা বা সেরকম কোনো গা-ছমছমে জায়গার ভিতর দিয়ে গিয়ে থাকলে সে বলে ওঠে, "বাবা, আমার শরীর কাঁপছে।" কারণ বড়ো ছেলেটি ছিল ভীতু। সন্ধেয় আগুনের চার পাশে বসে লোকে যখন ভয়ংকর সব ভয়ের গল্প বলে, শ্রোতাদের মধ্যে কেউ হয়তো বলে ওঠে, 'শুনে আমার গা কাঁপছে।' ছোটো ছেলেটি তখন এক কোণে বসে লোকেদের কথাবার্তা শোনে, কিন্তু তার মাথামুণ্ডু কিছুই বঝতে পারে না। প্রায়ই তাকে বলতে শোনা যায়, "সবাই বলে, 'গা কাঁপছে! গা কাঁপছে!' কই, আমার তো কখনো গা কাঁপে না, কাঁপুনি ধরে না! ব্যাপারটা নিশ্চয়ই এক জাতের শিল্পকলা, যেটা আমি বুঝি না।"

একদিন বাবা তাকে বলল, "ওরে শোন্। তুই আর এখন নেহাত খোকাটি নোস্। দিব্যি গাঁট্টাগোট্টা বড়োসড় হয়ে উঠেছিস্। কিছু একটা শেখ, যাতে রুজি-রোজগার হয়। তোর বড়ো ভাইকে দ্যাখ, শেখবার জন্যে কী পরিশ্রমই-না করে। কিন্তু জানি, তোকে উপদেশ দেওয়া বৃথা।"

ছোটো ছেলে বলল, "ঠিক বলেছ বাবা, কিছু একটা জিনিস শেখার আমারও খুব ইচ্ছে। সম্ভব হলে শিখতে চাই, কী করে কাঁপতে হয়। কারণ কাঁপতে আমি জানি না।"

কথাগুলো শুনে তার বড়ো ভাই তো হেসে কুটোপাটি। ভাবল, 'বোকামিতে ভাইটার জুড়ি মেলা ভার। জীবনে কিস্‌সু ও করতে পারবে না। বঁড়শি বানাতে হলে শুরুতেই যে দরকার লোহাকে বাঁকানো!' তাদের বাবা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "একদিন কাঁপতে শিখবি ঠিকই। কিন্তু তা দিয়ে তোর রুজি-রোজগার হবে না।"

দিন কয়েক পরে পাড়ার পুরুতমশাই তাঁদের বাড়িতে এলেন বেড়াতে। ছেলেদের বাবা নিজের দুঃখের কাহিনী তাঁকে শোনাল। বলল, তার ছোটো ছেলেটা বেয়াড়া গোছের। কিছুই সে জানে না, কিছুই চায় না শিখতে। "ভাবুন একবার," ছেলেদের বাবা বলে চলল, "আমি তাকে জিগ্‌গেস করেছিলাম—কী করে রুজি-রোজগার করবি? সে বলে—'কী করে কাঁপতে হয় শিখব'!"

পুরুতমশাই বললেন, "তাই যদি চায়, আমি তাকে কাঁপতে শিখিয়ে দেব। আমার সঙ্গে সে চলুক।"

ছেলেদের বাবার তাতে আপত্তি ছিল না। ভাবল, 'কিছু না হোক, ওখানে গেলে স্বভাবটা তো খানিক শুধরোবে।' পুরুতমশাই তাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে গির্জের ঘণ্টা বাজাবার কাজ দিলেন।

দিন কয়েক পরে মাঝরাতে ঘুম থেকে তুলে পুরুতমশাই তাকে পাঠালেন গির্জের ঘণ্টাঘরে ঘণ্টা বাজাতে। মনে মনে বললেন, 'কাঁপতে তোকে শেখাচ্ছি!' তার পর তার আগেই চুপি চুপি সেখানে তিনি হাজির হলেন। ঘণ্টাঘরে উঠে দড়িটা মুঠো করে ধরতে গিয়ে ছেলেটা দেখে জানালার উলটো দিকের সিঁড়িতে সাদামতো একটা মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে।

ছেলেটা চেঁচিয়ে উঠল, "কে ওখানে?" কিন্তু সেই শ্বেতমূর্তি কোনো উত্তর দিল না, নড়লও না।

ছেলেটা আবার চেঁচিয়ে বলল, "উত্তর দাও, নয়তো ভাগো। রাতে তোমার এখানে আসার কথা নয়।" কিন্তু পুরুতমশাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। চেয়েছিলেন ছেলেটা মনে করে তিনি ভূত।

ছেলেটা দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করল, "এখানে কী চাও? ভালো লোক হলে উত্তর দাও। নয়তো সিঁড়ির নীচে তোমায় ছুঁড়ে ফেলব।" পুরুতমশাই ভাবলেন, 'সত্যিই কি আর ছুঁড়ে ফেলবে!' তাই তিনি পাথরের মূর্তির মতো চুপচাপ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ছেলেটা তৃতীয়বার হাঁক ছাড়ল। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হল না দেখে ছুটে গিয়ে সেই ভূতকে এমন জোরে সে ঠেলা মারল যে, দশটা সিঁড়ি গড়িয়ে এক কোণে ভূত পড়ে রইল স্থির হয়ে। ছেলেটা তার পর খানিক ঘণ্টা বাজিয়ে বাড়ি ফিরে বিছানায় শুয়ে অসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কাউকে কোনো কথা বলল না। এদিকে পুরুত-মশাইয়ের বউ অপেক্ষা করে বসে রয়েছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও স্বামীকে ফিরতে না দেখে ভয় পেয়ে ছেলেটাকে ঘুম থেকে তুলে প্রশ্ন করল, "আমার স্বামী কোথায় জানো? তোমার আগেই তিনি ঘণ্টাঘরে গিয়েছিলেন।"

ছেলেটা বলল, "জানি না তো! কিন্তু জানলার উলটো দিকের সিঁড়িতে কে একজন দাঁড়িয়েছিল। আমার ডাকে সে না দিল সাড়া, না গেল চলে। তাই ভাবলাম, লোকটা হয়তো বদমাশগোছের কেউ। তাকে সিঁড়ির নীচে ঠেলে ফেলে দিয়েছি। গিয়ে দেখুন লোকটা

আপনার স্বামী কি না। পুরুতমশাই হলে সত্যিই আমি খুব দুঃখিত।"

পুরুতমশাইয়ের বউ ছুটে গিয়ে দেখে এক কোণে পড়ে তার স্বামী গোঁ-গোঁ করছে। কারণ পড়ার ফলে তাঁর একটা পা ভেঙে গিয়েছিল।

পুরুতমশাইকে ধরে ধরে বাড়ি এনে গলা ফাটিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গিয়ে ছেলেটার বাবাকে পুরুতমশাইয়ের বউ বলল, "তোমার ছেলে আমার সর্বনাশ করেছে। এমন জোরে সিঁড়ি দিয়ে আমার স্বামীকে ঠেলে ফেলেছে যে, তার একটা পা গেছে ভেঙে। হতচ্ছাড়াটাকে আমাদের বাড়ি থেকে নিয়ে যাও।"

খবর শুনে আঁতকে উঠল ছেলের বাবা। পুরুতমশাইয়ের বাড়িতে দৌড়ে গিয়ে ছেলেকে দারুণ গালমন্দ করে বলল, "এ-সব শয়তানীর মানে কী? নিশ্চয়ই তোকে দানোয় ভর করেছে।"

তার ছেলে বলল, "বাবা! বিশ্বাস কর আমার কোনো দোষ নেই। আমার কথাটা শোনো। রাতে উনি দাঁড়িয়েছিলেন যেন কোনো কু-মতলব নিয়ে। আমি জানতাম না উনি কে। তিনবার তাঁকে বলি, "হয় আমার কথার জবাব দিতে, নয় চলে যেতে।"

তার বাবা বলল, "তুই আমাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করেছিস। তুই আমার দু চক্ষের বিষ।—দূর হ!"

ছেলেটা বলল, "বেশ তাই যাব, বাবা শুধু ভোর হতে দাও। ভোরে বেরিয়ে পড়ব। শিখব কী করে কাঁপতে হয়। সেটা শিখলে হয়তো জানতে পারব কী করে রুজি-রোজগার হয়।"

তার বাবা বলল, "যা-কিছু শেখো গিয়ে। সেটা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছি না। এই নে পঞ্চাশ ডলার। বেরিয়ে পড়। কিন্তু খবরদার! কাউকে বলবি না কোথা থেকে এসেছিস। কাউকে বলবি না তোর বাপের নাম কী। তোর জন্যে লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেছে।"

ছেলেটা বলল, "যা বললে তাই হবে। এটা আর বেশি কথা কী?"

ভোর হলে সেই পঞ্চাশ ডলার পকেটে গুঁজে ছেলেটা পথে বেরিয়ে পড়ল। হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে সে কেবল আউড়ে যায়, 'কাঁপতে যদি পারতাম! কাঁপতে যদি পারতাম!'

হঠাৎ পথে দেখা গেল আর-একটা লোককে। ছেলেটার বিড়বিড়

করে কথাগুলো সে শুনেছিল। খানিক হাঁটার পর একটা ফাঁসিকাঠ চোখে পড়তে ছেলেটাকে সে বলল, "ওরে শোন্। ঐ যে গাছটা দেখছিস, ওখানে এক সঙ্গে সাত-সাতটা ডাকাতকে লটকানো হয়েছে। গাছতলায় বসে থাক। রাত হলে শিখবি কী করে কাঁপতে হয়।"

ছেলেটা বলল, "এটা আর শক্ত কী? অনায়াসে পারব। অত চট্‌পট্‌ কাঁপতে শিখলে আমার এই পঞ্চাশ ডলারের পুরোটাই তোমায় দিয়ে দেব। কাল সকালে এসো।"

সেই ফাঁসিকাঠটার কাছের গাছতলায় গিয়ে বসে পড়ল ছেলেটা। রাত হল। খুব ঠাণ্ডা। ছেলেটা আগুন জ্বালাল। কিন্তু মাঝরাতে এমন ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করল যে, আগুন সত্ত্বেও শরীর আর গরম হয় না। বাতাসে সেই ডাকাতদের মড়াগুলো এদিক-সেদিক দুলতে-দুলতে খট্‌খট্‌ করতে লাগল। ছেলেটা ভাবল, 'আগুন-তাতে আমি শীতে কাঁপলে, গাছের ওপর ও-বেচারাদের কতই-না জানি শীত করছে!' তাই সে একটা মই দিয়ে উঠে সেই সাতটা ডাকাতের মড়া এক-এক করে নামিয়ে আনল, তার পর খুঁচিয়ে আগুনের আঁচ গন্‌গনে করে তাতিয়ে তোলার জন্যে সেগুলোকে রাখল আগুনের চার পাশে। তাদের পোশাকে আগুন ধরতেও মড়াগুলো কিন্তু নড়ল না। তাই-না দেখে ছেলেটা বলল, "সাবধান! নয়তো আবার তোমাদের গাছে লটকে দেব।" কিন্তু ডাকাতদের মড়াগুলো তার কথা শুনতে পেল না। চুপচাপ রইল তারা। তাদের পোশাক জ্বলতে লাগল।

তাই-না দেখে ছেলেটা দারুণ রেগে উঠল। বলল, "তোমরা সাবধান না হলে আমি আর কী করব? তোমাদের সঙ্গে আমি তো আর পুড়ে মরতে পারি না।" আবার তাদের সারি সারি গাছে লটকে দিয়ে গাছতলার আগুন-তাতে বসে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে সেই লোকটা তার কাছে এসে পঞ্চাশ ডলার চেয়ে বলল, "আশাকরি এখন বুঝেছ—কী করে কাঁপতে হয়!"

ছেলেটা বলল, "না-না, কী করে বুঝব? বেচারারা তো একবারও মুখ খোলে নি! ভারি তারা বোকা—নিজেদের পোশাক পুড়লেও কোনো কথা বলে না!"

লোকটা বুঝল সেদিন তার কপালে পঞ্চাশ ডলার পাবার কোনো

প্রশ্নই ওঠে না। যাবার সময় তাই সে বলে গেল, "জন্মে এরকম ছোকরা দেখি নি।"

ছেলেটা আবার যাত্রা শুরু করল। আর যেতে যেতে আপন-মনে লাগল বিড়্‌বিড়্‌ করতে, 'কাঁপতে যদি পারতাম। কাঁপতে যদি পারতাম।'

তার পিছন-পিছন আসছিল এক গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান। ছেলেটার কথা শুনে সে প্রশ্ন করল, "কে তুমি?"

ছেলেটা বলল, "জানি না।"

গাড়োয়ান আবার প্রশ্ন করল, "কোথা থেকে আসছ?"

"জানি না।"

"তোমার বাবার নাম কী?"

"সেটা তোমায় বলতে পারব না।"

"বিড়্‌বিড়্‌ করে কী-সব বকছিলে?"

ছেলেটা বলল, "আমি শুধু জানতে চাই কী করে কাঁপতে হয়। কিন্তু কেউ আমায় সেটা শেখায় না।"

গাড়োয়ান বলল, "বাজে বকবক থামাও। আমার সঙ্গে এসো। তোমার থাকার ভালো একটা ব্যবস্থা করে দেব।"

তার সঙ্গে গেল ছেলেটা। সন্ধেয় তারা একটা সরাইখানায় পৌঁছল। স্থির করল, সেখানেই রাত কাটাবে। ঘরে এসে ছেলেটা আবার চেঁচিয়ে উঠল, "যদি কাঁপতে পারতাম। যদি শুধু কাঁপতে পারতাম।"

সরাইখানার মালিক আড়িপেতে কথাগুলো শুনে বলল, "কাঁপুনি শিখতে চাও? —বেশ কথা। এখানেই তার সব চেয়ে ভালো সুযোগ পাবে।"

বউ তাকে মুখ-ঝাম্‌টা দিয়ে বলল, "থামো তো। অনেক গোঁয়ার লোক ওখানে মরেছে। এ-ছেলেটার চোখদুটো ভারি সুন্দর। ঐ চোখে দিনের আলো আর সে দেখতে না পেলে আমার দুঃখের অবধি থাকবে না।"

ছেলেটা কিন্তু বলল, "কাজটা কঠিন হলে আমি তো শিখবই। তাই তো বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছি।" সরাইখানার মালিককে প্রশ্ন করে করে জেরবার করে তুলল সে। শেষপর্যন্ত সরাইখানার মালিককে

কবুল করে তাকে জানাতে হল সব ব্যাপারটা। ছেলেটা শুনল— কাছেই রয়েছে একটা মায়াবী দুর্গ। সহজেই সেখানে যে-কোনো লোক শিখতে পারে—কী করে কাঁপতে হয়। শুধু দরকার সেখানে তিনটে রাত কাটানো। রাজা বলেছেন সেখানে তিন রাত যে কাটাবে তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবেন। মেয়েটির মতো রূপসী আর হয় না। সেই দুর্গে আছে রাশি রাশি গুপ্ত ধনদৌলত। সেগুলো পাহারা দিচ্ছে যখের দল আর ডাকিনী-যোগিনীরা। অনেকেই সেই দুর্গে গিয়েছিল। কিন্তু প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে নি।

পরদিন ছেলেটা রাজার কাছে গিয়ে বলল, "রাজামশাই! রাজা-মশাই! আপনি অনুমতি দিন। ঐ মায়াবী দুর্গে তিন রাত কাটাতে আমি প্রস্তুত।"

তাকে দেখে রাজার ভালো লাগল। তিনি বললেন, "বেশ! দুর্গে তিনটে জিনিস নিয়ে যেতে পার তুমি। কিন্তু কোনো জীবন্ত জিনিস নয়।"

ছেলেটা বলল, "মহারাজ! আমাকে তা হলে এই তিনটে জিনিস দিন—প্রথমটা একটা আগুন। দ্বিতীয়টা ছুতোরের বেঞ্চি। তৃতীয়টা ছুরি লাগানো একটা লেদ্‌মেশিন।"

ছেলেটার কথামতো জিনিসগুলো সেদিনেই রাজা পাঠালেন দুর্গে। রাত হতে ছেলেটা সেখানে গিয়ে একটা ঘরে আগুন জ্বালিয়ে ছুতোরের বেঞ্চি আর ছুরিটা পাশে রেখে লেদ্‌মেশিনের কাছে গিয়ে বসল। বলল, "যদি কাঁপতে পারতুম! কিন্তু মনে হচ্ছে—কী করে কাঁপতে হয়, এখানেও শিখব না।"

মাঝ রাত নাগাদ আগুন জ্বালাবার জন্য বাতাস করতে গিয়ে এক কোণ থেকে হঠাৎ নানা স্বরে তার কানে এল: "মি-ও, মি-ও, ঠাণ্ডায় যে জমে গেলুম!"

ছেলেটা বলল, "বোকার ঝাড়! কেন মিউ-মিউ করছিস? শীত করে তো আগুন-তাতে বসে নিজেদের সেঁকে নে-না?"

তার মুখ থেকে কথাগুলো খসবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড দুটো কালো বেড়াল হুড়্‌মুড়িয়ে লাফাতে-লাফাতে এসে দু পাশে বসে লাল টকটকে চোখ মেলে তার দিকে ভয়ংকর দৃষ্টিতে তাকাল। খানিক আগুন পুইয়ে তাকে তারা বলল, "দোস্ত্‌! আমাদের সঙ্গে এক হাত তাস খেলবে?"

সে বলল, "নিশ্চয়ই। কিন্তু আগে তোমাদের থাবাগুলো দেখাও।"

বেড়াল দুটো তার দিকে থাবা বাড়িয়ে দিল।

সে বলল, "ও মা। কী কাণ্ড। কী বড়ো-বড়ো নখ। একটু সবুর কর। এক্ষুনি কেটে দিচ্ছি।"

বলে ঘাড় খাম্‌চে ধরে তুলে ছুতোরের বেঞ্চিতে বসিয়ে সেখানে তাদের থাবাগুলো ইস্‌ক্রুপ দিয়ে এঁটে সে বলল, "এই আঙুলগুলো দেখার পর তোমাদের সঙ্গে তাস খেলার আর ইচ্ছে নেই।"

তাই-না বলে তাদের মেরে ফেলে জলে তাদের সে ছুঁড়ে ফেলল।

কিন্তু তার পর আগুনের পাশে সে বসতে না বসতেই সেখানকার সব গর্ত আর কোণ-টোন থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল লাল কালো বেড়াল আর কালো কুকুরের দল। প্রত্যেকেই টেনে আনছিল গন্‌গনে লালচে শেকল। গুণে তাদের শেষ করা যায় না।

সবাই তারা ভয়ংকর স্বরে চীৎকার করতে লাগল। তার পর চেষ্টা করতে লাগল সে-যে আগুনের পাশে বসেছিল সেটা তছ্‌নছ্‌ করে নিভিয়ে ফেলতে। খানিক চুপচাপ সে সইল। শেষটায় অসহ্য হয়ে উঠলে লেদ্‌মেশিনের সেই ছুরিটা বার করে কচ্‌কচ্‌ করে তাদের কাটতে কাটতে সে চেঁচিয়ে উঠল, "দূর হ হতচ্ছাড়ার দল।" সেগুলোর কতক পালাল, বেশির ভাগই মরল। যেগুলো মরল সেগুলোকে সে ছুঁড়ে ফেলল বাইরের পুকুরে।

ফিরে এসে নিজের শরীরকে গরম করার জন্য আগুনের আঁচ ফুঁ দিয়ে সে গন্‌গনে করে তুলল। তার পর সেখানে বসে থাকতে থাকতে ঘুমে জড়িয়ে এল তার দু চোখ। চারি দিকে তাকিয়ে সে দেখল এক কোণে মস্ত বড়ো একটা খাটে বিছানা পাতা। "আঃ, কী আরাম।" বলে সেই বিছানায় শুয়ে সে চোখ বন্ধ করতে না করতেই দুর্গময় চলতে শুরু করল খাটসুদ্ধু বিছানাটা।

চেঁচিয়ে বলল সে, "ঠিক আছে। যত পার জোরে দৌড়োও।"

সঙ্গে সঙ্গে সেই খাটটাও পাগলের মতো ছুটে চলল নানা ঘরের চৌকাঠ আর সিঁড়ি দিয়ে। যেন আধ-ডজন ঘোড়া সেটাকে টেনে নিয়ে চলেছে। হঠাৎ দুম্‌-দুম্‌ করে একটা শব্দ হল আর বিরাট একটা পাহাড়ের মতো খাটসুদ্ধ বিছানাটা পড়ল তার উপর উপুড় হয়ে। লেপ-তোষক-বালিশ ছুঁড়ে সরিয়ে সে বলল, "যার খুশি সে এবার এটায় চড়ে

বসুক।" এই-না বলে নিজের আগুনের পাশে গিয়ে শুয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে রাজা এসে তাকে মাটির উপর পড়ে থাকতে দেখে ভাবলেন ভূতেরা তাকে মেরে ফেলেছে। বললেন, "আহা বেচারা! ছেলেটার চেহারা ভারি সুন্দর ছিল।"

রাজার কথাগুলো শুনেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ছেলেটা বলল, "রাজামশাই! এখনো আমি মরি নি!" রাজা অবাক হলেন, খুশি হলেন। তার পর জিগ্‌গেস করলেন কেমন সে আছে।

ছেলেটা বলল, "খুব ভালো আছি, রাজামশাই! একটা রাত কেটেছে। অন্য দুটো রাতও কাটবে।"

সরাইখানায় ছেলেটা ফিরতে অবাক হয়ে চোখ গোল-গোল করে তার দিকে তাকিয়ে সরাইখানার মালিক বলল, "ভাবি নি তোমাকে বেঁচে ফিরতে দেখব। কী করে কাঁপতে হয় শিখেছ কি?"

ছেলেটা বলল, "না—একেবারে পণ্ডশ্রম। কাঁপুনি ব্যাপারটা কী—কেউ যদি আমায় বলতে পারত!"

দ্বিতীয় রাতে সেই পুরনো ঠাণ্ডা কেল্লায় গিয়ে আগুনের পাশে বসে আবার সে বিড়্‌বিড়্ করতে শুরু করল, 'যদি কাঁপতে পারতাম! যদি কাঁপতে পারতাম!' যখন মাঝ রাত তখন প্রথমে দূরে শোনা গেল দারুণ হৈচৈ। শব্দটা ক্রমশ বাড়তে-বাড়তে মুহূর্তের জন্য থামল, আর তার পর চিমনির ভিতর দিয়ে আধখানা মানুষ পড়ল তার কাছে গড়িয়ে। ছেলেটা চেঁচিয়ে উঠল, "আরে! কী কাণ্ড! আর আধখানা গেল কোথায়?"

তার পর আবার শুরু হল দারুণ হৈ-হল্লা আর বাকি অর্ধেক শরীরটাও পড়ল গড়িয়ে।

ছেলেটা বলল, "একটু সবুর কর। আগুনটা খানিক উস্‌কে দি।"

আগুন উস্‌কে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে ছেলেটা দেখে সেই আধখানা শরীর দুটো জোড়া লেগেছে আর তার বসার জায়গায় গিয়ে বসেছে ভয়ংকর বীভৎস চেহারার একটা লোক।

ছেলেটা বলল, "আরে! বেঞ্চিটা যে আমার!"

লোকটা তাকে ঠেলে সরাতে গেল। কিন্তু ছেলেটা তাকে জোর করে ঠেলে সরিয়ে বেঞ্চিতে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। তার পর

আরো নানা লোক এল গড়িয়ে গড়িয়ে। তাদের সঙ্গে বড়ো-বড়ো নটা হাড় আর দুটো মানুষের মাথার খুলি। ভাঁটা খেলার জন্য হাড়গুলো তারা সাজাল। ছেলেটারও ইচ্ছে হল খেলতে। তাই সে বলল, "আমি খেলতে পারি?"

তারা বলল, "টাকা থাকলে খেলতে পার।"

ছেলেটা বলল, "টাকাকড়ি যথেষ্টই আছে। কিন্তু এই খুলিগুলো মোটেই গোল নয়।" নিজের লেদ্‌মেশিনে খুলিগুলো চড়িয়ে সেগুলো গোল করে সে বলল, "এগুলো এখন অনেক ভালো গড়াবে। এসো, খেলা শুরু করা যাক।"

তাদের সঙ্গে খেলা শুরু করে কিছু পয়সাকড়ি সে হারল। কিন্তু যেই-না ঢং ঢং করে বারোটা বাজা অমনি হঠাৎ সব-কিছু অদৃশ্য হয়ে গেল। ছেলেটা তখন চুপচাপ শুয়ে পড়ল ঘুমিয়ে।

তৃতীয় রাতে আবার নিজের বেঞ্চিতে বসে দারুণ বিরক্ত হয়ে সে বলে উঠল, "যদি শুধু কাঁপতে পারতাম!"

হঠাৎ সেখানে হাজির হল একটা লোক। সেরকম লম্বা মানুষ আগে কখনো সে দেখে নি। চেহারাটাও তার ভয়ংকর। লোকটা বুড়ো। লম্বা তার সাদা দাড়ি।

বুড়োটা চেঁচিয়ে বলল, "হতচ্ছাড়া। শিগ্‌গিরই কাঁপতে শিখবি। কারণ মরতে তোর আর দেরি নেই।"

ছেলেটা উত্তর দিল, "অত তড়্‌বড়্‌ কোরো না। মরতে হলে প্রথমে আমার অনুমতির দরকার।"

ভূতটা গর্জে উঠল, "এক্ষুনি তোকে নিকেশ করে ফেলছি।"

ছেলেটা বলল, "গলা ফাটিয়ে বড়াই কোরো না। আমার তো মনে হয় তোমার চেয়ে আমার গায়ের জোর অনেক বেশি।"

বুড়োটা চেঁচিয়ে উঠল, "সেটা দেখা যাবে। আমার চেয়ে তোর গায়ের জোর বেশি হলে তোকে ছেড়ে দেব। আয়, লড়ে যাওয়া যাক।"

নানা অন্ধকার বারান্দা দিয়ে একটা জায়গায় তাকে সে নিয়ে এল। সেখানে ছিল একটা কামারশালা। একটা কুড়ুল তুলে এক কোপে বুড়োটা কামারের দুটো নেহাইয়ের একটাকে মাটিতে গেঁথে ফেলল।

"ওটার চেয়েও বেশি আমি করতে পারি" বলে ছেলেটা গেল অন্য নেহাইয়ের কাছে। বুড়োটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল।

খুলে পড়ল তার লম্বা সাদা দাড়ি। ছেলেটা সেই কুড়ুল তুলে অন্য নেহাইটাকে শুধু দু টুকরোই করে ফেলল না, সেইসঙ্গে নেহাইয়ের মাঝখানে শক্ত করে গেঁথে দিল বুড়োর দাড়ি।

সে চেঁচিয়ে উঠল, "এইবার তোমায় পাকড়েছি। এবার মরবার পালা তোমার!"

তার পর লোহার একটা ডাণ্ডা তুলে সে পেটাতে শুরু করল বুড়োটাকে। বুড়ো কাতরাতে-কাতরাতে ছেড়ে দেবার জন্যে তাকে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। বলল, মার থামালে তাকে দেবে অনেক ধনদৌলত। ছেলেটা তাই কুড়ুলটা টেনে তুলে বুড়োর দাড়ি খুলে দিল।

বুড়ো তখন তাকে আবার দুর্গের মধ্যে নিয়ে এসে দেখিয়ে দিল মোহর ভর্তি বিরাট তিনটে সিন্দুক। বলল, "এর একটা গরিবদের, একটা রাজার আর তৃতীয়টা তোমার।"

তার কথা শেষ হতে-না-হতেই ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল আর সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হল বুড়ো ভূত। অন্ধকারে একলা ছেলেটা দাঁড়িয়ে রইল।

সে বলল, "এখান থেকে বেরুনো শক্ত হবে না।" হাতড়ে-হাতড়ে নিজের ঘরে ফিরে তার আগুনের কাছে সে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে আবার রাজা এসে বললেন, "মনে হচ্ছে কাঁপতে তুমি শিখেছ।"

ছেলেটা উত্তর দিল, "মোটেই না, রাজামশাই! কাঁপুনি জিনিসটা কি? এক দাড়িওলা বুড়ো এসে অনেক মোহর দেখিয়েছিল, কিন্তু কি করে যে কাঁপতে হয় সে কথা বলে নি।"

রাজা বললেন, "দুর্গটাকে তুমি জাদুমুক্ত করেছ। তাই আমার মেয়েকে তুমি বিয়ে করবে।"

ছেলেটা বলল, "সে তো খুব ভালো কথা। কিন্তু এখনো যে শিখলাম না কাঁপুনিটা কী জিনিস!"

তার পর সেই-সব মোহর আনা হল আর খুব ধুমধাম করে হয়ে গেল বিয়ে। সেই তরুণ রাজা খুব সুখী, বউকেও খুব ভালোবাসে। কিন্তু থেকে থেকেই বলে ওঠে, "যদি কাঁপতে পারতাম! যদি কাঁপতে পারতাম!" কথাগুলো শুনতে শুনতে শেষটায় তার বউয়ের ভারি রাগ

ধরে গেল। তাই দেখে তার দাসী বলল, "আমি এর বিহিত করছি। কী করে কাঁপতে হয় শিখিয়ে দেব।"

বাগানের মধ্যে দিয়ে বয়ে যেত ছোটো একটা নদী। সেখান থেকে এক বালতি ছোটো-ছোটো মাছ সে নিয়ে এল। রাজকন্যেকে সে বলল রাতে তার বর ঘুমিয়ে পড়লে বিছানা-ঢাকা তুলে মাছ ভরতি বালতির জল তার গায়ে ঢেলে দিতে, মাছগুলো যাতে তিড়িংবিড়িং করে তার গা-ময় লাফাতে থাকে।

রাজকন্যে তাই করল আর জেগে উঠে তরুণ রাজা চীৎকার করতে লাগল, "আমি কাঁপছি—উঃ—উঃ—কেন আমি কাঁপছি? বউ, এখন জানলাম কাঁপুনি কাকে বলে!"

শেয়াল আর বেড়াল

বনের মধ্যে একদিন শেয়ালমশাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বেড়ালের। সে ভাবল, শেয়াল বেজায় ধূর্ত। তাই ওর সঙ্গে ভাব-সাব করা যাক।

এই-না ভেবে বেড়াল বলল, "শুভদিন, শেয়ালমশাই। কেমন আছেন? এই ঝামেলার জীবনের দিনগুলো কেমন কাটছে?"

বেড়ালের দিকে খানিক কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে রইল শেয়াল। শেষটায় বলল, "হতচ্ছাড়া গুঁফো, গায়ে ডোরাকাটা হাঁদা, ইঁদুর-খেকো আধপেটা কোথাকার! কোন্ সাহসে জিগ্‌গেস করছিস—আমি কেমন আছি? সভ্যতা-ভব্যতা কাকে বলে জানিস? তুই কী কী জানিস, শুনি?"

সবিনয়ে বেড়াল বলল, "শুধু একটা জিনিসই জানি।"

মুখ বেঁকিয়ে শেয়াল জিগ্‌গেস করল, "কী সেটা?"

"কুকুর তাড়া করলে গাছে উঠে আমি আশ্রয় নিতে পারি।"

শেয়াল বলল, "আর কিছু জানিস না? আমি হাজারটা ফন্দি-ফিকির জানি। বিশ্বাস না হয় তো আমার সঙ্গে চল। কুকুরের কাছ থেকে পালাবার আমার ফিকিরটা তোকে দেখিয়ে দেব।"

ঠিক সেই মুহূর্তে চারটে কুকুর নিয়ে হাজির হল এক শিকারী। তড়াং করে লাফিয়ে একটা গাছে উঠে মগডালে বসে ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে বেড়াল চেঁচিয়ে উঠল, "শেয়ালমশাই! শেয়ালমশাই! আপনার ফন্দি-ফিকিরগুলো দেখাতে শুরু করে দিন।" কিন্তু ততক্ষণে কুকুরগুলো এসে শেয়ালকে কামড়ে ধরে ফেলেছে।

বেড়াল আবার চেঁচিয়ে উঠল, "শেয়ালমশাই! হাজারটা ফিকির জানা সত্ত্বেও আপনি বিপদে পড়লেন। কিন্তু আমার মতো শুধু গাছে উঠতে জানলে প্রাণে বেঁচে যেতেন।"

জলের ভূত

এক কুয়োপাড়ে ছোট্টো একটি ছেলে তার বোনের সঙ্গে প্রায়ই খেলা করত। একদিন খেলা করতে করতে দুজনেই তারা ঝুপ্ করে জলে পড়ে গেল। কুয়োর তলায় থাকত এক জলের ভূত। তাদের দেখে সে চেঁচিয়ে উঠল, "এইবার তোদের বাগে পেয়েছি। আমার জন্যে এইবার তোদের খাটাব।" সুতো কাটার জন্যে মেয়েটিকে সে দিল জলের নানা আগাছা আর বলল একটা ফুটো বালতি করে জল আনতে। ছেলেটিকে একটা ভোঁতা কুড়ুল দিয়ে সে বলল গাছ কাটতে। আর তাদের খেতে দিল শুধু পাথরের মতো শক্ত পিঠে।

ভারি কষ্টে ছেলেমেয়েদের দিন কাটে। এক রবিবার জলের ভূত যখন গির্জেয় গেছে তারা দুজনে পালাল।

গির্জে থেকে ফিরে জলের ভূত দেখে তার পাখিরা উড়ে গেছে। দারুণ রেগে বড়ো-বড়ো পা ফেলে তাদের সে ধাওয়া করল।

দূরে তাকে আসতে দেখে মেয়েটি একটা ঝাঁটা পিছন দিকে ছুঁড়ে ফেলল আর দেখতে দেখতে সেখানে গজিয়ে উঠল খোঁচা-খোঁচা হাজার ঝাঁটার একটা পাহাড়। পাহাড়টা পেরুতে জলের ভূতের খুব অসুবিধে হলেও শেষটায় কোনোমতে সেটা পেরিয়ে সে এল।

মেয়েটি তখন পিছন দিকে ছুঁড়ে দিল একটা আয়না আর দেখতে-দেখতে সেখানে গজিয়ে উঠল হাজার-হাজার আয়নার একটা পাহাড়। পাহাড়টা এমনই পিছল যে, জলের ভূত কিছুতেই সেটা বেয়ে উঠতে পারল না। তাই সে ভাবল, 'বাড়ি গিয়ে আমার কুড়ুলটা নিয়ে আসি। সেটা দিয়ে কাঁচের পাহাড়টা ভাঙব।' কিন্তু বাড়ি থেকে ফিরে কাঁচের পাহাড় ভেঙে সে দেখে—ছেলেমেয়েরা অনেক-অনেক দূরে চলে গেছে। কিছুতেই তাদের নাগাল ধরতে সে পারল না। তাই মনের দুঃখে জলের ভূত ফিরে গেল তার কুয়োর তলায়।

ধূর্ত গ্রেথেল

এক সময় গ্রেথেল নামে এক রাঁধুনি-মেয়ে ছিল। তার জুতোর গোড়ালি দুটো লাল রঙের। সেই জুতো-জোড়া পরে বাইরে বেরুলেই মনের আনন্দে ঘুরে ঘুরে সে নাচত আর মনে মনে বলে উঠত, 'আমার মতো সুন্দরী আর হয় না।' বাড়ি ফিরেই এক ঢোক করে আঙুর-রস সে খেত তার পর চেখে চেখে দেখত নিজের রান্না ভালো-ভালো খাবার-গুলো। মনে মনে বলত, 'রান্নাবান্না ভালো হয়েছে কি না সেটা তো রাঁধুনির চেখে দেখা দরকার।'

একদিন বাড়ির কর্তা তাকে বললেন, "আজ সন্ধেয় একজনকে খেতে বলেছি। খুব ভালো করে দুটো মুরগি রেঁধো।"

গ্রেথেল বলল, "নিশ্চয়ই, কর্তামশাই!" এই-না বলে মুরগি দুটোর পালক ছাড়িয়ে সেগুলোয় তেল মাখিয়ে ঝলসাবার জন্য শিক দিয়ে সে গাঁথল। সন্ধেয় সে দুটোকে সে রাখল উনুনের উপর। আগুনে ঝলসে মুরগি দুটোর রঙ হয়ে উঠতে লাগল বাদামী। কিন্তু অতিথি এসে পৌঁছল না।

গ্রেথেল বলল, "অতিথি না এলে আমি কিন্তু মুরগি দুটো উনুন থেকে নামিয়ে নেব। গরম-গরম সেগুলো না খেলে নষ্ট হয়ে যাবে। আর খাবার নষ্ট করা পাপ।"

তার কথা শুনে বাড়ির কর্তা বললেন, "আমি এক্ষুনি গিয়ে অতিথিকে ডেকে আনছি।"

বাড়ি থেকে কর্তা বেরুতেই উনুনের উপর থেকে শিকে-গাঁথা মুরগি

দুটো নামিয়ে গ্রেথেল আপন মনে বলে উঠল, 'উনুন-তাতে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে তেল্টা তো পাবেই। ওরা আসার আগে মাটির তলার ঘর থেকে এক চুমুক আঙুর-রস খেয়ে গলা ভিজিয়ে আসি গে।' এই-না বলে দৌড়ে মাটির তলার ঘরে গিয়ে এক মগ আঙুর-রস সে খেল। তার পর গিলল আরো এক মগ। আর তার পর রান্নাঘরে ফিরে এসে মুরগি দুটোয় ভালো করে মাখন মাখিয়ে উনুনে চড়িয়ে মনের আনন্দে শিকটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেগুলো সে লাগল ঝলসাতে।

ঝলসান মুরগি দুটোর গন্ধে চার দিক ভুর্ভুর্ করে উঠল। তাই আপন মনে গ্রেথেল না বলে পারল না, 'কেমন খেতে হল চেখে দেখা দরকার।' এই-না বলে এক টুকরো মাংস ছিঁড়ে সে বলে উঠল, "ভারি সুন্দর ঝলসান হয়েছে। এক্ষুনি না খেলে খুব অন্যায় করা হবে।"

এই-না বলে ছুটে গেল সে জানলার কাছে। কিন্তু বাড়ির কর্তা বা তাঁর অতিথির দেখা সে পেল না। তাই সে আবার মুরগি দুটোর কাছে ফিরে এসে আপন মনে বলে উঠল, 'ঐ মুরগির একটা ডানার দিক পুড়তে শুরু করেছে। ওখানটা নষ্ট হতে না দিয়ে খেয়ে ফেলাই ভালো।' এই-না বলে সেখানটা কেটে খেয়ে ফেলে মনে মনে বলে উঠল, 'অন্য ডানার দিকটাও খেয়ে ফেলা যাক। তা হলে মুরগিটাকে আর বেখাপ্পা দেখাবে না আর কর্তামশাইও কিছু টের পাবেন না।'

মুরগিটার দু পাশের ডানার দিকটা খেয়ে আবার সে ছুটে গেল জানলার কাছে। কিন্তু তখনো বাড়ির কর্তা বা তাঁর বন্ধুর দেখা নেই। তাই তার মনে হল আরো খানিকটা আঙুর-রস খেলে মন্দ হয় না। মাটির তলার ঘরে গিয়ে আর-এক মগ আঙুর-রস সে খেল আর তার পর স্থির করল ভালো খাবার নষ্ট করা খুব অন্যায় হবে। তাই যে-মুরগিটার দু দিকের ডানার অংশটা সে খেয়েছিল সেই মুরগির বাকি অংশটাও সে খেয়ে শেষ করল।

তখনো একটা মুরগি বাকি। কিন্তু বাড়ির কর্তার তখনো দেখা নেই। গ্রেথেল তাই ভাবল, 'মনে হয় দুটো মুরগি খাওয়া আমার পক্ষে শক্ত হবে না। আর একটু আঙুর-রস খেলে অনায়াসে দ্বিতীয় মুরগিটাও খেতে পারব।' এই-না ভেবে আরো খানিকটা আঙুর-রস গিলে দ্বিতীয় মুরগিটাও সে সাবাড় করল।

সবে তার খাওয়া শেষ হয়েছে এমন সময় বাড়ির কর্তা ফিরে হাঁক দিলেন, "গ্রেথেল, কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার বন্ধু এসে পৌঁছবে।" এই-না বলে খাবার টেবিল সাজানো হয়েছে কি না দেখার আর মাংস কাটার ছুরিটা শানাবার জন্য তিনি ভেতরে গেলেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর অতিথি এসে সদর দরজায় টোকা দিল।

গ্রেথেল সদর দরজায় ছুটে গিয়ে অতিথিকে বলল, "চুপ! চুপ! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালান। কর্তামশাই আপনাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছিলেন আপনার কানদুটো কাটার জন্যে। ঐ শুনুন, তাঁর ছুরি শানাবার শব্দ।"

শব্দটা শুনে অতিথি পড়ি-মরি করে ছুট দিল। আর গ্রেথেল দৌড়ে গিয়ে বাড়ির কর্তাকে বলল, "বেশ অতিথিকে নেমন্তন্ন করেছিলেন যা হোক!"

বাড়ির কর্তা প্রশ্ন করলেন, "মানে?"

"আমি মুরগি দুটো ডিশে সাজিয়ে আনছিলাম। চক্ষের নিমেষে ডিশ থেকে সে-দুটো তুলে নিয়ে তিনি চম্পট দিলেন।"

নধর মুরগি দুটোর কথা ভেবে মনে মনে হায় হায় করে বাড়ির কর্তা বললেন, "আচ্ছা লোক তো! আমার জন্যে অন্তত একটা রেখে যাওয়া উচিত ছিল।" ছুরিটা হাতে নিয়ে বাড়ি থেকে দৌড়ে বেরিয়ে তিনি চেঁচাতে লাগলেন, "অন্তত একটা! অন্তত একটা!" অতিথি ভাবল, তিনি চাইছেন তার অন্তত একটা কান কাটতে। তাই নিরাপদে বাড়িতে পৌঁছবার জন্য সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল।



লাভের কেনাবেচা

এক চাষী হাটে গিয়ে সাত ডলারে তার গোরুটাকে বিক্রি করল। ফিরতি পথে একটা পুকুরের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে শুনল ব্যাঙের দল চেঁচাচ্ছে, "আইট, আইট, আইট।" তাই পুকুরপাড়ে গিয়ে সে বলল, "বোকার দল—আসল খবরটা রাখিস না? আইট নয়, আট নয়—সাত ডলারে গোরুটা বেচেছি।"

ব্যাঙের দল কিন্তু চেঁচিয়ে চলল, "আইট, আইট, আইট।"

রেগে চাষী বলল, "তোদের বিশ্বাস না হয় তো গুণে দ্যাখ।"

খুচরো-টুচরো নিয়ে সাতটা ডলার তাদের সামনে চাষী ধরল। কিন্তু ব্যাঙগুলোর গোণবার দায় পড়েছে। আগের মতোই তারা চেঁচিয়ে চলল, "আইট, আইট, আইট।"

তাই-না শুনে রেগে ক্ষেপে উঠে পয়সা-কড়ি পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে চাষী বলল, "বিশ্বাস না হয় তো নিজেরাই তোরা গুণে দ্যাখ।" ব্যাঙের দল গুণে-গিনতে তার পয়সা-কড়ি ফিরিয়ে দেবে বলে অনেকক্ষণ সে অপেক্ষা করল। কিন্তু ব্যাঙগুলো ফিরিয়ে তো দিলই না উপরন্তু আগের মতোই চেঁচিয়ে চলল, "আইট, আইট, আইট।" অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোনো ফল হল না দেখে রেগেমেগে চাষী বলল, "জল-ছপ্‌ছপে, মাথা-মোটা, ড্যাবা-চোখ হাঁ-মুখ বোকার ঝাড়। চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে লোকের কানে তোরা তালা ধরাতে পারিস—কিন্তু সাতটা ডলার গুণে শেষ করতে পারিস না। তোরা কি ভাবছিস তোদের গোণা-গুন্তি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকব?"

এই-না বলে সন্ধের মুখে সে চলল নিজের বাড়ির দিকে। ব্যাঙের দল তখনো চেঁচাচ্ছে, "আইট, আইট, আইট।" চাষী যখন বাড়ি ফিরল মন-মেজাজ তার দারুণ তিরিক্ষি হয়ে গেছে।

কিছুদিন পরে আর-একটা গোরু কিনে, সেটা মেরে হিসেব করে সে দেখল ঠিকমতো দামে মাংসটা বিক্রি করতে পারলে দুটো গোরুর দাম সে তুলতে পারবে। আর ফাউ হিসাবে পাবে গোরুটার চামড়া। মাংস নিয়ে শহরের ফটকে পৌঁছাবার আগেই এক দঙ্গল কুকুর তাকে ছেঁকে ধরে মাংসর গন্ধ শুঁকে লাফাতে-লাফাতে চলতে লাগল। তাদের মধ্যে গ্রেহাউণ্ড কুকুরটা চেঁচাতে লাগল, "কিউ-উম, কিউ-উম, কিউ-উম।"

তার ডাক শুনে চাষী বলল, "বুঝেছি রে, বুঝেছি। 'কিউ-উম' মানে তো 'কিনুম'। মানে তোরা কিনতে চাস। কিন্তু মাংসটা তোদের দিলে তো আমার ডাহা লোকসান।"

গ্রেহাউণ্ড কুকুরটা তবু চেঁচিয়ে চলল, "কিউ-উম, কিউ-উম, কিউ-উম।"

"মাংসটা দিলে দলবল নিয়ে তোরা খেয়ে ফেলবি না তো?"

গ্রেহাউণ্ড কুকুরটা বলল, "কিউ-উম, কিউ-উম, কিউ-উম।"

চাষী বলল, "ঠিক আছে—এই নে। তোরা আমার জানা। তোদের কত্তাকেও ভালো করে চিনি। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিস—

তিনদিনের মধ্যে দামটা আমার চাই। টাকাকড়ি আমার বাড়িতে পৌঁছে দিবি।"

মাংসের ডালা তাদের সামনে উজাড় করে দিয়ে চাষী ঘর-মুখো ফিরল। মাংসের উপর হামড়ে পড়ে কুকুরের দল চেঁচিয়ে চলল, "কিউ-উম, কিউ-উম, কিউ-উম।"

দূর থেকে তাদের ডাক শুনে চাষী মনে মনে বলল, 'দেখছি ওদের সবকটাই কিনতে চায়। কিন্তু বড়ো গ্রেহাউণ্ডটার কাছ থেকেই দাম আমি আদায় করব।'

তিনদিন কাটার পর মহা ফুর্তিতে চাষী বলল, "আজ আমার পকেটে পয়সা আসছে।" কিন্তু দাম দিতে কেউ এল না। বিড়্‌বিড়্‌ করে সে বলতে লাগল, 'আজকাল দেখি কাউকে বিশ্বাস নেই।' তিতি-বিরক্ত হয়ে দাম আদায় করার জন্য শহরে গেল সে মাংস-ওয়ালার কাছে।

তার কথা শুনে মাংসওয়ালা প্রথমে ভাবল চাষী বুঝি রঙ্গ-তামাশা করছে। কিন্তু গম্ভীর গলায় চাষী বলল, "এটা ঠাট্টা-ইয়ার্কির কথা নয়। তিন দিন আগে তোমার পেল্লায় গ্রেহাউণ্ড কুকুরটা গোরুর মাংস তোমাকে পৌঁছে দেয় নি?" তাই-না শুনে মাংসওয়ালা রেগে ক্ষেপে উঠে চাষীকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিল।

চেঁচিয়ে চাষী বলল, "ঠিক আছে। তোকে দেখে নিচ্ছি। দেশে এখনো আইন-কানুন বলে একটা জিনিস আছে।" রাজপ্রসাদে ছুটে গিয়ে রাজার দর্শন চাইল সে। সিংহাসনে মেয়েকে নিয়ে বসেছিলেন রাজা। চাষীকে তিনি প্রশ্ন করলেন, কী তার হয়েছে?

চাষী ডুকরে কেঁদে বলল, "হায় হায়, মহারাজ! ব্যাঙ আর কুকুরগুলো আমার সম্পত্তি চুরি করেছে। দাম দেবার বদলে মাংস-ওয়ালা আমায় ঝাঁটা পিটিয়েছে।" তার পর আগাগোড়া নিজের দুঃখের কাহিনী রাজাকে সে বলল। সব শুনে রাজকন্যে তো হেসে লুটোপাটি।

রাজা চাষীকে বললেন, "তোমার উপর কেউ অবিচার করেছে বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু সে কথা যাক। আমার মেয়েকে তুমি বিয়ে করবে। জীবনে কখনো সে হাসে নি। তোমার কথা শুনে আজ হেসেছে। আমি কথা দিয়েছিলাম, যে-লোক তাকে হাসাতে পারবে

তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব। তোমার এই সৌভাগ্যের জন্যে আশা-করি খুব কৃতজ্ঞ থাকবে।"

আঁতকে উঠে চাষী বলল, "ক্ষমা করবেন, মহারাজ। বিয়ে-টিয়ের মধ্যে আমি আর নেই। আমার একটা বউ আছে। একাই সে একশো। তার জ্বালায় ঘরে তিষ্ঠুনো দায়।"

চাষীর কথা শুনে রাজা তো রেগে আগুন। বললেন, "তুমি ভারি বেয়াদব, শিক্ষা-দীক্ষার বালাই তোমার নেই।"

চাষী বলল, "রাজামশাই! আমি যে নেহাতই গেঁয়ো চাষী। শিক্ষা-দীক্ষা কী করে আমার হবে?"

রাজা বললেন, "সবুর কর। পুরস্কার তুমি পাবে। এখন বিদেয় হও। তিনদিন পরে এসো। গুণেগুণে পাঁচশোটা তোমায় দেওয়া হবে।"

চাষী দরজার বাইরে বেরুলে শান্ত্রী তাকে বলল, "রাজকন্যেকে তুমি হাসিয়েছ। নিশ্চয়ই পেয়েছ অনেক ধনদৌলত।"

চাষী বলল, "ঠিক বলেছ। পাঁচশোটা গুণেগুণে আমায় দেওয়া হবে।"

শান্ত্রী বলল, "শোনো। অত টাকাকড়ি নিয়ে কী করবে। তার থেকে আমাকে কিছুটা দাও।"

চাষী বলল, "তুমি লোক ভালো। তাই তোমাকে তার থেকে দুশোটা দিয়ে দিলাম। আজ থেকে তিনদিন পর রাজার কাছে গিয়ে গুণেগুণে নিয়ো।"

এক ইহুদি সুদখোর কাছে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শুনছিল। চাষীর কাছে ছুটে গিয়ে তার কোট চেপে ধরে সে বলল, "তুমি ভাই ভারি ভাগ্যবান লোক! অতগুলো কড়্‌কড়ে ডলার নিয়ে কী করবে? এসো—সেগুলো খুচরো করে দি।"

চাষী বলল, "মোজেজ তার থেকে তিনশোটা তোমায় দিতে পারি। এক্ষুনি সেগুলোর খুচরো আমায় দাও। আজ থেকে তিনদিন পর রাজপুরীতে ডলারগুলো পাবে।"

নিজের লাভের কথা ভেবে সেই সুদখোর ইহুদি তো আহ্লাদে আট-খানা। সঙ্গে সঙ্গে সে নিয়ে এল খুচরো পয়সাকড়ি। কিন্তু সেগুলোর বেশির ভাগই ছিল অচল।

তিনদিন পরে আদেশমতো চাষী হাজির হল রাজার সামনে।

রাজা বললেন, "ওর কোটটা খুলে নাও। গুণেগুণে পাঁচশোটা ওকে দেওয়া হবে।"

চাষী বলল, "মহারাজ! ওগুলো এখন আর আমার নয়। তার থেকে দুশোটা দিয়েছি শান্ত্রীকে। আর বাকি তিনশোর খুচরো আমায় দিয়েছে মোজেজ। তাই আমার বলতে এখন আর কিছুই নেই।"

ইতিমধ্যে চাষীর দেওয়া ডলারগুলোর জন্য সেখানে হাজির হল সেই শান্ত্রী আর সুদখোর ইহুদি। তাদের পিঠেই গুণেগুণে পড়ল পাঁচশো ঘা বেত। বেতের মার আগেও খেয়েছে শান্ত্রী। তাই মুখ বুজে তার ভাগটা সে সহ্য করল। কিন্তু সেই সুদখোর ইহুদি ডুকরে কেঁদে চেঁচাতে লাগল, "হা ভগবান! হা ভগবান! এগুলোই কি সেই কড়্-কড়ে ডলার?"

চাষীর দিকে তাকিয়ে রাজা হাসি চাপতে পারলেন না। তখন তাঁর রাগও পড়ে গেছে। তাই তাকে বললেন, "পাবার আগেই পুরস্কারটা খরচ করে ফেলেছিলে বলে সেটা আমি পুষিয়ে দিচ্ছি। আমার রাজ-কোষে গিয়ে যত খুশি মোহর নিয়ে যাও।"

রাজার আদেশ মানতে চাষী দেরি করল না। রাজকোষ থেকে পকেট বোঝাই মোহর নিয়ে সেগুলো গোণবার জন্য সে গেল এক সরাইখানায়। সেই সুদখোর ইহুদি চুপি চুপি পিছন পিছন এসে চাষীকে গজ্‌গজ্ করে বলতে শুনল, "শয়তান রাজা আবার আমাকে ঠকিয়েছে! টাকাকড়ি আমাকে নিজে দিলেই পারত। তা হলে বুঝতাম কত পেলাম। এখন কী করে বুঝি ঠিকমতো টাকাকড়ি পকেটে ভরেছি কি না?"

সেই সুদখোর ইহুদি নিজের মনে বিড়্‌বিড়্ করে উঠল, "কী কাণ্ড! চাষী দেখছি আমাদের মহারাজকে গাল মন্দ করছে! আমি ছুটে গিয়ে লোকটার বিরুদ্ধে লাগিয়ে আসি। তা হলে আমি নিশ্চয়ই পুরস্কার পাব আর চাষীটা পাবে শাস্তি।"

চাষীর কথা শুনে রাজা তো রেগে আগুন। সেই সুদখোর ইহুদিকে তিনি বললেন, দোষীকে তাঁর সামনে হাজির করতে। চাষীর কাছে ছুটে গিয়ে সে বলল, "যে-অবস্থায় আছ সে-অবস্থায় এক্ষুনি তোমায় যেতে হবে মহারাজের কাছে।"

চাষী বলল, "আমার কী কর্তব্য সে কথা তোমার চেয়ে ভালো করেই আমার জানা আছে। প্রথম আমাকে করতে হবে নতুন একটা কোট! আমার মতো লোক, যার পকেট-ভরা মোহর—সে কী করে পুরনো ধুলধুলে কোট পরে যায়?"

সুদখোর ইহুদি দেখল নতুন কোট না বানিয়ে চাষী কিছুতেই যাবে না। তার ভয় হল—পুরস্কারটা বুঝি হাতছাড়া হয়ে যায় আর চাষী রেহাই পায় শাস্তি থেকে। দেরি হলে রাজার রাগ হয়তো পড়ে যাবে। তাই সে বলল, "তুমি আমার বন্ধু। কিছুক্ষণের জন্যে আমার সুন্দর কোটটা তোমায় পরতে দিচ্ছি। বন্ধুর জন্যে লোক সব-কিছু করতে পারে।

চাষী তাতে আপত্তি করল না। তার কোট পরে তার সঙ্গে চাষী গেল রাজার কাছে।

তাঁর সম্বন্ধে খারাপ কথা বলার জন্যে চাষীকে রাজা খুব ধমকালেন।

চাষী বলল, "মহারাজ! এই সুদখোর ইহুদি আমার নামে ডাহা মিথ্যে করে লাগিয়েছে। লোকটা এমন-কি, এখন বলতে পারে যে—কোটটা পরে আছি সেটা তার।"

হাউমাউ করে সেই সুদখোর ইহুদি চেঁচিয়ে উঠল, "তার মানে? কোটটা আমার নয়? এটা পরে মহারাজের সামনে হাজির হবার জন্যে বন্ধু হিসেবে তোমায় আমি ধার দিই নি?"

সব শুনে রাজা বললেন, "এই সুদখোর ইহুদি নিশ্চয়ই আমাদের কাউকে ঠকিয়েছে—হয় আমাকে নয় চাষীকে।" তিনি আদেশ দিলেন আরো কয়েকটা সেইরকম কড়্‌কড়ে ডলার তার পিঠে গুণেগুণে দিতে, যেগুলো সেই সুদখোর ইহুদির মোটেই পছন্দ হয় নি। পকেট বোঝাই মোহর নিয়ে বাড়ি যেতে যেতে চাষী মনে মনে বলল, 'খুব এক হাত নেওয়া গেছে!'

ধর্মবাবা

এক গরিব লোকের ছিল অসংখ্য ছেলেমেয়ে। তাই পৃথিবীর প্রত্যেককে সে বলেছিল তার ছেলেমেয়েদের ধর্মবাবা হতে। কিন্তু আরো একটি ছেলে জন্মাবার পর তার ধর্মবাবা করার লোক কাউকে সে খুঁজে পেল না। কী যে করবে ভেবে না পেয়ে সমস্যাটার কথা ভাবতে ভাবতে সে পড়ল ঘুমিয়ে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল, ফটকের কাছে প্রথম যার দেখা পাবে তাকেই বলতে হবে ধর্মবাবা হবার কথা। জেগে উঠে স্থির করল স্বপ্নে যা দেখেছে তাই করবে বলে। ফটকের কাছে গিয়ে প্রথম যার দেখা পেল তাকে সে অনুরোধ করল ধর্মবাবা হবার।

বিদেশী লোকটি তাকে ছোট্টো একটা গেলাসে জল দিয়ে বলল, "এটা মন্ত্র-পড়ার জল। মৃত্যু কোথায় দাঁড়িয়ে আছে জানলে এই জল দিয়ে রোগী তুমি সুস্থ করতে পারবে। রোগীর শিয়রের কাছে মৃত্যু দাঁড়িয়ে থাকলে এই জল রোগীকে খেতে দিয়ো। কিন্তু মৃত্যু পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকলে কোনো ফল হবে না। রোগীকে মরতেই হবে।"

রোগীর জীবন বাঁচানো যাবে কি যাবে না সে কথা সঠিকভাবে তার পর থেকে সে বলে দিতে পারত। পরে তার খ্যাতি পড়ল চার-দিকে ছড়িয়ে এবং দেখতে দেখতে সেই গরিব লোক হয়ে উঠল খুব ধনী।

একবার রাজার শিশুকে দেখার জন্য তার ডাক পড়ল। ঘরে গিয়ে সে দেখে মৃত্যু শিয়রে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সেই মন্ত্র-পড়া জল দিয়ে রাজশিশুকে সে সারিয়ে দিল। দ্বিতীয়বারও পারল তাকে

সারাতে। কিন্তু তৃতীয়বার শিশু অসুস্থ হবার পর সে গিয়ে দেখে মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছে পায়ের কাছে। সে বুঝল শিশুটিকে মৃত্যুর হাত থেকে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না।

লোকটি ভাবল এবার তার ছেলের ধর্মবাবার কাছে গিয়ে সে জানাবে ঐ মন্ত্র-পড়া জল কী ভাবে সে ব্যবহার করেছে। কিন্তু তার বাড়িতে গিয়ে সে দেখে আশ্চর্য এক দৃশ্য। বাড়ির দোতলায় গিয়ে দেখে ঝাঁটা আর ধুলো-ফেলা পাত্রের মধ্যে ধুমাধুম ঝগড়া আর মারামারি।

সে জিগ্‌গেস করল, "ধর্মবাবা কোথায় থাকে?"

ঝাঁটা উত্তর দিল, "ওপরতলায়।"

তিনতলায় গিয়ে সে দেখে কতকগুলো মরা আঙুল পড়ে রয়েছে। সে প্রশ্ন করল, "ধর্মবাবা কোথায় থাকে?"

একটা আঙুল উত্তর দিল, "চারতলায়।"

সেখানে পড়েছিল একগাদা মরা মাথা। তারা তাকে পাঠাল আরো উপরতলায়। পাঁচতলায় পৌঁছে সে দেখে কড়াই-এর মধ্যে মাছেরা নিজেরাই নিজেদের রান্না করছে। তারাও বলল, "ওপরতলায়।" ছতলায় পৌঁছে দরজার চাবি দেবার ফুটোর মধ্য দিয়ে সে দেখে ধর্ম-বাবার মাথায় লম্বা এক জোড়া শিঙ। দরজা খুলে সে ভিতরে আসতেই ধর্মবাবা একলাফে বিছানায় উঠে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

লোকটি বলল, "মিস্টার ধর্মবাবা, তোমার বাড়ির চাকর-বাকর সব ভারি অদ্ভুত। দোতলায় দেখি ঝাঁটা আর ময়লা-ফেলা পাত্রের মধ্যে ধুমাধুম ঝগড়া আর মারামারি।"

ধর্মবাবা বলল, "তুমি ভারি বোকা। ওরা বাড়ির চাকর আর ঝি—নিজেদের মধ্যে খোশগল্প করছিল।"

"কিন্তু তিনতলায় দেখলাম অনেক মরা আঙুল।"

"আরে বোকা, ওগুলো গাছ-গাছড়ার শেকড়।"

"কিন্তু চারতলায় দেখলাম একগাদা মুণ্ডু।"

"হাঁদারাম! ওগুলো তো গাছের কন্দ।"

"আর পাঁচতলায় দেখলাম কড়াইতে নিজেরাই মাছগুলো ভাজা-ভাজা হচ্ছে।" তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মাছেরা ঘরের মধ্যে হেঁটে এল।

"আর ছতলায় এসে দরজায় চাবি দেবার ফুটোর মধ্যে দিয়ে তোমাকে দেখলাম, মিস্টার ধর্মবাবা। দেখি তোমার মাথায় লম্বা-লম্বা শিঙ।"

ধর্মবাবা বলল, "তোমার কথা সত্যি নয়।"

লোকটি তখন ভীষণ ভয় পেয়ে দৌড়ে পালাল—তা না হলে ধর্মবাবা তাকে নিয়ে কী করত না করত কে বলতে পারে?



বেহালা-বাজিয়ের গল্প

বহুকাল আগে এক বেহালা-বাজিয়ে ছিল। আশ্চর্য সুন্দর বেহালা বাজাত সে। একদিন বন দিয়ে যেতে যেতে তার ভারি একলা লাগল। তাই ভাবল, 'এখানে বেহালা-বাজিয়ে সময় কাটিয়ে ভালো একজন সঙ্গী জোগাড় করা যাক।' তাই-না ভেবে পিঠ থেকে বেহালা নামিয়ে একটা মিষ্টি সুর সে বাজাতে লাগল। বনের গাছে-পাতায় রিন্‌রিন্ করতে লাগল সেই সুর। কয়েক মিনিট পরে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল একটা নেকড়ে। বেহালা-বাজিয়ে বলল, "আরে! এ যে দেখি নেকড়ে। কিন্তু সঙ্গী হিসেবে নেকড়েকে তো চাই নি।"

নেকড়ে কিন্তু তার কাছে গিয়ে বলল, "ভারি সুন্দর তুমি বেহালা বাজাও। তোমার মতো বাজাতে শিখতে আমার খুব ইচ্ছে।"

সে বলল, "শেখা আর শক্ত কি? যা-যা বলি শুধু তাই কর।"

নেকড়ে বলল, "শিষ্য যেরকম গুরুর কথা শোনে আমিও সেরকম শুনব।"

বেহালা-বাজিয়ে তাকে বলল সঙ্গে আসতে। খানিক যাবার পর তারা পৌঁছল একটা ওক্‌গাছের কাছে। গাছটার গুঁড়ি ফাঁপা আর তাতে ছিল একটা গর্ত।

সে বলল, "শোনো! বেহালা শিখতে যদি চাও তা হলে তোমার সামনের দুটো থাবা এই গর্তে রাখো।"

নেকড়ে যেই-না তার কথামতো গর্তে থাবা দুটো রেখেছে বেহালা-বাজিয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটা পাথর তুলে গর্তের মধ্যে থাবা দুটো দিল শক্ত করে এঁটে। ফলে সেখানে বন্দী হয়ে পড়ে রইল নেকড়েটা।

"আমি যতক্ষণ না ফিরি ততক্ষণ এখানে থাকো", এই-না বলে বেহালা-বাজিয়ে চলে গেল।

খানিক পরে মনে মনে সে বলল, 'এই বনে সময় যেন কাটতেই চায় না। একজন সঙ্গী জোগাড় করা যাক।' আবার পিঠ থেকে বেহালা নামিয়ে গাছেদের উদ্দেশে সে বাজাল একটা সুর। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঝোপ থেকে হেলে-দুলে বেরিয়ে এল একটা খ্যাঁকশেয়াল। বেহালা-বাজিয়ে বলল, "আরে! এ যে দেখি খ্যাঁকশেয়াল! এরকম সঙ্গী কে চায়?"

খ্যাঁকশেয়াল তার কাছে গিয়ে বলল, "ভারি সুন্দর তুমি বেহালা বাজাও। তোমার মতো বাজাতে শিখতে আমার খুব ইচ্ছে।"

সে বলল, "শেখা আর শক্ত কী? যা-যা বলি শুধু তাই করো।"

খ্যাঁকশেয়াল বলল, "শিষ্য যেরকম গুরুর কথা শোনে আমিও সে-রকম তোমার কথা শুনব।"

বেহালা-বাজিয়ে তাকে বলল, "আমার পেছন পেছন এসো।" খানিক যাবার পর তারা পৌঁছল এক পায়ে চলার পথে। তার দু পাশে উঁচু ঝোপ। সেখানে থেমে হেজল-বাদাম গাছের একটা ডাল টেনে নামিয়ে মাটির উপর পা দিয়ে সে চেপে ধরল। তার পর অন্য পাশ থেকে আর-একটা ডাল টেনে নামিয়ে সে বলল, "শেয়াল-ভায়া! যদি শিখতে চাও তো তোমার বাঁ থাবাটা দেখাও।"

খ্যাঁকশেয়াল থাবা বাড়ালে বাঁদিকের ডালে বেহালা-বাজিয়ে সেটা বেঁধে দিল। তার পর বলল, "শেয়াল-ভায়া! এবার দাও তোমার ডান থাবাটা।" সেটাকে সে বাঁধল ডান দিকের ডালে। গিঁটগুলো শক্ত হয়েছে কি না

দেখে ডাল দুটো সে ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে খাড়া হয়ে উঠল ডাল-দুটো। আর সেই সঙ্গে খ্যাঁকশেয়ালও উঠল শূন্যে। তার পর অসহায়-ভাবে লাগল দুলতে।

"আমি যতক্ষণ না ফিরি ততক্ষণ এখানে থাকো", এইনা বলে বেহালা-বাজিয়ে চলে গেল।

যেতে যেতে খানিক পরে আবার মনে মনে সে বলল, 'পথটা ভারি লম্বা আর এই বনে সময় যেন কাটতেই চায় না। একজন সঙ্গী আমায় জোগাড় করতেই হবে।' পিঠ থেকে বেহালা নামিয়ে সে বাজাতে শুরু করল। আর দেখতে দেখতে সেই সুরের ঝংকারে রিন্‌রিন্ করতে লাগল বনের গাছ-পালা ডাল-পাতা। এবার ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল একটি খরগোশ। তাকে দেখে সে বলল, "আরে! এ যে দেখি খরগোশ! কিন্তু সঙ্গী হিসেবে খরগোশকে তো চাই নি।"

খরগোশ তার কাছে গিয়ে বলল, "ভারি সুন্দর তুমি বেহালা বাজাও। তোমার মতো বাজাতে শিখতে আমার খুব ইচ্ছে।"

সে বলল, "শেখা আর শক্ত কী? যা-যা বলি শুধু তাই কর।"

খরগোশ বলল, "শিষ্য যেরকম গুরুর কথা শোনে আমিও সেরকম শুনব।"

খানিক যাবার পর বনের একটা ফাঁকা জায়গায় তারা পৌঁছল। সেখানে ছিল একটা এ্যাস্‌পেন গাছ। ছোটো খরগোশের গলায় সে বাঁধল লম্বা একটা দড়ি। দড়ির অন্য প্রান্ত সে বাঁধল সেই গাছটার গুঁড়িতে।

তার পর সে বলল, "খরগোশ-ভায়া! গাছটার চার পাশে কুড়িবার দৌড়ে পাক দাও।" তার কথামতো খরগোশ কুড়িবার পাক দিল। আর গাছের গুঁড়িতে দড়িটা জড়িয়ে গেল কুড়ি পাক। ফলে খরগোশ পড়ল আটকা। যত সে লাফঝাঁপ দেয় দড়িটা ততই কেটে-কেটে বসে তার নরম গলায়।

"আমি যতক্ষণ না ফিরি ততক্ষণ এখানে থাকো", এই-না বলে বেহালা-বাজিয়ে চলে গেল।

ইতিমধ্যে পাথরটা আঁচড়ে-কামড়ে টানাটানি করে ফাঁদ থেকে নিজের থাবাদুটো ছাড়িয়ে নিয়েছিল নেকড়ে। দারুণ রেগে বেহালা-বাজিয়েকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করার জন্য সে ছুটল।

নেকড়েকে পাশ দিয়ে ছুটে যেতে দেখে প্রাণপণ জোরে চেঁচিয়ে

খ্যাঁকশেয়ালটা বলল, "নেকড়ে-ভাই! নেকড়ে-ভাই! আমাকে বাঁচাও বেহালা-বাজিয়ে আমাকেও ফাঁদে ফেলেছে।"

ঝোপটা টেনে নামিয়ে দাঁত দিয়ে গিঁটগুলো কেটে খ্যাঁকশেয়ালকে মুক্ত করল নেকড়েটা। তার পর দুজনে তারা ছুটল বেহালা-বাজিয়ের উপর প্রতিশোধ নিতে। পথে খরগোশকে বাঁধা পড়ে থাকতে দেখে তাকেও তারা খুলে দিল। তার পর তিনজনে ছুটল তাদের শত্রুর খোঁজে।

ইতিমধ্যে সেই বেহালা-বাজিয়ে আবার তার বেহালা বাজায়। এবার কিন্তু ফল হয় আগের চেয়ে অনেক ভালো। বেহালার সুর শুনতে পায় গরিব এক কাঠুরে। কাজ ফেলে কুড়ুল হাতে সে ছুটে আসে বাজনা শুনতে।

তাকে দেখে বেহালা-বাজিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "এতক্ষণে এসেছে আসল সঙ্গী। সঙ্গী হিসেবে বুনো জানোয়ারদের চাই নি। চেয়েছিলাম মানুষের সঙ্গ।" এই বলে এমন সুন্দর সে বাজাতে শুরু করল যে, সেই গরিব কাঠুরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে-শুনতে মুগ্ধ হয়ে গেল। আনন্দে ভরে ওঠে তার বুক!

এমন সময় দৌড়তে-দৌড়তে সেখানে হাজির হল নেকড়ে, খ্যাঁকশেয়াল আর খরগোশ। কাঠুরে তাদের কুমতলব বুঝতে পেরে বেহালা-বাজিয়ে-কে বাঁচাবার জন্য কুড়ুল উঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "ওর গায়ে আঁচড় দেবার আগে আমার সঙ্গে লড়তে হবে।" তাই শুনে জন্তুরা ভয় পেয়ে বনে পালাল আর কৃতজ্ঞতার উপহার হিসাবে বেহালা-বাজিয়ে কাঠুরেকে শোনাল আশ্চর্য সুন্দর আর-একটি সুর।

মিস্ ট্রুড্

এক সময় ছিল এক একগুঁয়ে অকালপক্ক ছোট্টো মেয়ে। বাবা-মার কোনো কথাই সে শুনত না। তাই সে সুখী হতে পারে নি। একদিন সে তার বাবা-মাকে বলল, "মিস্ ট্রুড্-এর কথা আমি অনেক শুনেছি। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব। সবাই বলে তাঁর বাড়িতে অনেক আশ্চর্য আর মজার-মজার জিনিস আছে। সেগুলো দেখার আমার ভারি ইচ্ছে।"

তার বাবা-মা তাকে যেতে বারণ করে বলল, "ট্রুড্ একেবারেই ভালো মেয়ে নয়। নানারকম তুকতাক করে থাকে। তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করলে তোকে আমরা ত্যাজ্যকন্যে করব।" কিন্তু মেয়েটি বাবা-মার কথা একেবারেই কানে তুলল না। মিস্ ট্রুড্-এর সঙ্গে দেখা করতে গেল। সেখানে যেতে সে প্রশ্ন করল, তার মুখ অমন ফ্যাকাশে কেন।

মেয়েটি থর্‌থর্ করে কাঁপতে-কাঁপতে বলল, "আমি ভীষণ ভয় পেয়েছি। দেখলাম—"

"কী দেখলি ?"

"আপনার সিঁড়িতে কুচ্‌কুচে কালো একটা লোককে দেখলাম।"

"সে-লোকটা কাঠকয়লা পোড়ায়।"

"তার পর দেখলাম এক সবুজ রঙের লোক!"

"সে-লোকটা শিকারী।"

"তার পর দেখলাম রক্তের মতো টকটকে লাল রঙের একটা লোক।"

"সে-লোকটা কসাই।"

"তার পর আপনার জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে আপনাকে দেখতে পেলাম না। তার বদলে দেখি শয়তানকে। মাথায় তার দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। দেখে আমি শিউরে উঠি।"

হো—হো করে হেসে উঠে মিস্ ট্রুড্ বললে, "তুই শুধু ডাইনিকে দেখেছিলি। তার গায়ে ছিল উপযুক্ত গয়নাগাটি। তোর জন্যে, বাছা, অনেকদিন অপেক্ষা করে আছি। এইবার তুই পুড়বি।"

এই-না বলে সেই অবাধ্য ছোট্টো মেয়েটিকে মিস্ ট্রুড্ এক টুকরো কাঠ করে দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল আগুনের মধ্যে। সেটা গন্‌গনে লাল হয়ে উঠতে তার উপর গিয়ে বসে নিজের শরীরটা সেঁকে গরম করতে করতে সে বলল, "ভারি জ্বলজ্বল করে মেয়েটা জ্বলছে তো!"

মৃত্যুর ধর্মছেলে

এক গরিব লোকের ছিল বারোটি ছেলেমেয়ে। তাদের রুটি জোগাবার জন্য তাকে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত খাটতে হত। এর পরের ছেলেটি যখন জন্মাল তখন তার মাথা খারাপ হবার দাখিল। ছুটে পথে বেরিয়ে যার সঙ্গে তার প্রথম দেখা হল সে অনুরোধ করল ছেলেটির ধর্মবাবা হতে। এখন হল কি পথে যাঁর সঙ্গে তার প্রথম দেখা তিনি স্বয়ং ভগবান। তিনি লোকটির মনের সব কথাই জানতেন। তাই তিনি বললেন, "আহা বেচারা! তোমাকে দেখে আমার করুণা হচ্ছে। তোমার ছেলেকে আমি নেব, যত্ন করে মানুষ করব—তাকে সুখী করব।"

লোকটি প্রশ্ন করল, "কে আপনি ?"

"আমি ভগবান—"

লোকটি বলল, "তা হলে আমি চাই না আপনি তার ধর্মবাবা হন। আপনি বড়োলোকদের প্রশংসা করেন, গরিবদের রাখেন উপোস করিয়ে।"

লোকটির এ-ধরনের কথা বলার কারণ, সে জানত না গরিব এবং বড়োলোক সকলের প্রতিই ভগবান কী রকম ন্যায় বিচার করে থাকেন। কথাগুলো বলে লোকটি ভগবানের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল।

তার পর শয়তান তার কাছে এসে বলল, "কী তুমি খুঁজছ? তোমার ছেলের ধর্মবাবা আমাকে করলে তোমার ছেলে পৃথিবীর সব সুখ-ঐশ্বর্য পাবে।"

লোকটি প্রশ্ন করল, "আপনি কে ?"

সে বলল, "আমি শয়তান।"

লোকটি বলল, "তা হলে আমি চাই না আপনি তার ধর্মবাবা হন। আপনি লোকদের কুপথে নিয়ে যান, তাদের প্রতারণা করেন।"

কথাগুলো বলে সে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল।

তার পর হাড়-জিরজিরে পা নিয়ে মৃত্যু এসে তাকে বলল, "তোমার ছেলের ধর্মবাবা আমাকে কর।"

লোকটি প্রশ্ন করল, "আপনি কে ?"

সে বলল, "আমি মৃত্যু—সব মানুষকে যে সমান করে দেয়।"

লোকটি বলল, "তুমি ঠিক লোক। গরিব আর বড়োলোক—সবাই-কার সঙ্গেই তুমি সমান ব্যবহার কর। আমার ছেলের ধর্মবাবা তোমাকেই করব।"

মৃত্যু বলল, "তোমার ছেলেকে আমি ধনী আর বিখ্যাত করে তুলব।"

লোকটি বলল, "নামকরণ অনুষ্ঠান হবে আগামী রবিবার। ঠিক সময় আসতে ভুলো না।"

কথামতো নির্দিষ্ট দিনে হাজির হয়ে মৃত্যু হল ধর্মবাবা।

ছেলেটি বড়ো হতে একদিন তার ধর্মবাবা এসে তাকে বলল তার সঙ্গে যেতে। তাকে সে বনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে একটা লতা দেখিয়ে বলল, "এইবার নামকরণের উপহার তোমায় দিচ্ছি। তোমাকে আমি বিখ্যাত ডাক্তার করে দেব। যখনই তোমাকে কোনো রোগীর কাছে নিয়ে যাওয়া হবে আমি সেখানে হাজির থাকব। তার মাথার কাছে আমি দাঁড়ালে নিশ্চিত হয়ে তুমি বলতে পারবে যে, সে সেরে উঠবে। কিন্তু তার পায়ের কাছে আমি দাঁড়ালে তুমি বোলো পৃথিবীর কোনো ডাক্তার বা ওষুধ তাকে সারাতে পারবে না। যে-লতা তোমাকে দিলাম আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনো সেটা ব্যবহার করবে না। ব্যবহার করলে খুব বিপদে পড়বে।"

অল্পদিনের মধ্যেই সেই তরুণ হয়ে উঠল পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ডাক্তার। লোকে বলত একবার তাকিয়েই সে বলে দিতে পারত রোগী বাঁচবে কি না। দূরদূরান্তর থেকে লোকে তার কাছে আসত ভীড় করে। এত মোটা ফি তাকে তারা দিত যে, সে হয়ে উঠল অত্যন্ত ধনী।

এখন হল কি, রাজা পড়লেন অসুখে। সেই বিখ্যাত ডাক্তারকে ডাকা হল রাজা বাঁচবেন কি বাঁচবেন না জানার জন্য। কিন্তু সে গিয়ে দেখে মৃত্যু দাঁড়িয়ে রয়েছে রাজার পায়ের কাছে। অতএব সেই লতার কোনো কাজেই লাগার কথা নয়।

তাই সে ভাবল, 'মৃত্যুকে ঠকালে নিশ্চয়ই তিনি সেটা পছন্দ করবেন না। কিন্তু তিনি আমার ধর্মবাবা। তাই একবার ক্ষমা করলেও করতে পারেন।' এই-না ভেবে রাজাকে বিছানায় সে উলটো করে শোয়াল। ফলে মৃত্যু রইল তাঁর মাথার দিকে। সে তখন সেই লতা খেতে দিল। ফলে ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন রাজা।

কিন্তু মৃত্যু ভয়ংকর থম্‌থমে মুখে ডাক্তারের কাছে এসে আঙুল নাড়িয়ে শাসিয়ে তাকে বললেন, "তুমি আমাকে ঠকিয়েছ। কিন্তু তুমি আমার ধর্মছেলে, তাই এবার তোমায় ক্ষমা করলাম। দ্বিতীয়বার এ-রকম করলে তোমার ঘাড় ধরে হিড়্‌হিড়্ করে আমি টেনে নিয়ে যাব।"

কিছুদিন পরেই রাজার মেয়ের হল ভয়ংকর অসুখ। মেয়েটি রাজার একমাত্র সন্তান। তাকে হারাবার কল্পনায় রাজা দিন রাত কেঁদে কেঁদে সারা। শেষটায় তিনি ঘোষণা করলেন, যে তাকে সারাতে পারবে তার সঙ্গে দেবেন রাজকন্যের বিয়ে এবং সেই হবে তার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী।

ডাক্তার রোগীর ঘরে এসে দেখে মৃত্যু রয়েছে পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে।

ধর্মবাবার সাবধান বাণী ডাক্তারের মনে রাখা উচিত ছিল। কিন্তু রাজকন্যের রূপে মুগ্ধ হয়ে আর রাজত্ব লাভের লোভে সে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। মৃত্যুর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি সে লক্ষ্য করল না, লক্ষ্য করল না তাকে তার হাড় জির্‌জিরে হাত নাড়তে। রুগ্‌ণ মেয়েটিকে তুলে সে ঘুরিয়ে শোয়াল। অতএব তার মাথা এল পায়ের দিকে। তার পর রাজকন্যেকে সেই লতা সে দিল খেতে আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার গালের রঙ হয়ে উঠল স্বাভাবিক। রাজকন্যে সেরে উঠল।

দ্বিতীয়বার নিজের সম্পত্তি হাতছাড়া হতে দেখে বড়ো-বড়ো পা ফেলে ডাক্তারের কাছে মৃত্যু এসে বলল, "এবার তোমার পালা।" বরফের মতো ঠাণ্ডা হাতে শক্ত করে ধরে মৃত্যু তাকে নিয়ে গেল পাতালের এক সমাধিঘরে। সেখানে সে দেখে সারি সারি হাজার হাজার মোমবাতি

জ্বলছে—কোনোটা বড়ো, কোনোটা মাঝারি, কোনোটা ছোট্টো। প্রতিমুহূর্তে একটা করে নেভে আর সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে ওঠে নতুন আর-একটা।

মৃত্যু বলল, "ঐগুলো হচ্ছে মানুষের জীবনের শিখা। বড়োগুলো হচ্ছে শিশুদের, মাঝারিগুলো ভালোমানুষ তরুণ-তরুণীদের আর ছোটোগুলো খুব বুড়োবুড়ির। কিন্তু মাঝে মাঝে শিশু আর তরুণদের মোমবাতিও খুব ছোটো হয়ে থাকে।"

ডাক্তার বলল, "আমার জীবনের শিখাটা দেখান।" ভেবেছিল সেটা বেশ বড়োসড় একটা মোমবাতি হবে।

মৃত্যু তাকে দেখাল ছোট্টো এক টুকরো মোমবাতি, সেটার শিখা নিভু-নিভু। মৃত্যু বলল, "ঐটা—"

দারুণ ভয় পেয়ে কাতরস্বরে ডাক্তার বলে উঠল, "ধর্মবাবা! দয়া করে আমার জন্যে নতুন একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিন। আমাকে দিন জীবনকে উপভোগ করতে—রাজা হতে, সুন্দরী রাজকন্যেকে বিয়ে করতে।"

মৃত্যু বলল, "আমি সেটা পারি না। একটা না নিভলে অন্য কোনো মোমবাতি জ্বালানো যায় না।"

মনে হল মৃত্যু বুঝি তার অনুরোধ মতো কাজ করতে যাচ্ছে। সে একটা নতুন আর লম্বা মোমবাতি নিয়ে এল। কিন্তু প্রতিশোধ নিতে সে ছাড়ল না। মোমবাতিটা জ্বালিয়ে ইচ্ছে করে সেটা উলটে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে গেল সেটা নিভে আর সেই মুহূর্তে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ল ডাক্তারের প্রাণহীন দেহ। মৃত্যুর বলি হল সে।

বারো ভাইদের গল্প

অনেকদিন আগে এক ছিলেন রাজা আর এক ছিলেন রানী। তাঁদের আনন্দের সংসারে ছিল বারোটি সন্তান। কিন্তু সবকটাই ছেলে। রানীকে রাজা একদিন বললেন, "এর পর যদি তোমার মেয়ে হয় তা হলে বারোটি ছেলেকেই মেরে ফেলব যাতে আমার সব ধনদৌলত আর গোটা রাজত্ব সেই মেয়ে পায়।" এই-না বলে তিনি মৃত্যু-বালিশ সমেত বারোটা কফিনও তৈরি করিয়ে রাখলেন। কফিনগুলো একটা খালি ঘরে তালা-বন্ধ করে রেখে রানীর হাতে চাবিটা দিয়ে তাকে তিনি বললেন সে কথা কাউকে না বলতে। রানীর খুব মন খারাপ হয়ে গেল। সারাদিন তিনি কান্নাকাটি করলেন।

ছোটো ছেলেটি সব সময় থাকত রানীর কাছে। বাইবেল থেকে তার নাম দিয়েছিলেন বেন্‌জামিন। রানীকে সে বলল, "মা, তুমি অমন মন-খারাপ করে কেন রয়েছ?"

রানী বললেন, "বাছা, সে কথা তোমায় বলা বারণ।"

কিন্তু কারণটা না শুনে ছোটো ছেলে ছাড়ল না। রানী তাকে সেই তালা-বন্ধ ঘরে নিয়ে গিয়ে কফিনগুলো দেখালেন।

দেখিয়ে রানী বললেন, "বাছা, তোর আর তোর ভাইদের জন্যে রাজা এই কফিনগুলো তৈরি করিয়েছেন। তোদের কোনো বোন হলে তোদের মেরে এই কফিনগুলোয় রাখা হবে।"

বলতে বলতে রানী অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। দেখে তাঁর ছোটো ছেলে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "মামণি, কেঁদো না। আমরা পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাব।"

রানী বললেন, "তাই কর। এগারো ভাইদের নিয়ে বনে পালা। সেখানকার সব চেয়ে উঁচু গাছে চড়ে লক্ষ্য রাখিস দুর্গের গম্বুজের ওপর। তোদের ভাই হলে সেখানে সাদা পতাকা উড়বে। সেটা দেখলে ফিরিস। কিন্তু তোদের বোন হলে লাল পতাকা উড়বে। সেটা দেখলে প্রাণ নিয়ে পালাস। ভগবান তোদের যেন রক্ষে করেন। প্রতি রাতে আমি প্রার্থনা করব শীতকালে তোরা যেন শরীর তাতাবার আগুন পাস, গ্রীষ্মকালে যেন পাস শরীর জুড়োবার ছায়া।"

মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে ছেলেরা বনে চলে গেল। সেখানকার সব চেয়ে উঁচু ওক্‌গাছে চড়ে পালা করে তারা লক্ষ্য রাখতে লাগল গম্বুজটার উপর।

এগারোদিন বাদে লক্ষ্য করার পালা এল বেন্‌জামিনের। গাছে চড়ে সে দেখে একটা পতাকা উড়ছে। কিন্তু সেটার রঙ সাদা নয়, টকটকে লাল। অর্থাৎ সেটা তাদের মৃত্যুর পরোয়ানা।

খবর শুনে তার ভাইরা সবাই ভীষণ রেগে বলল, "একটা মেয়ের জন্যে সবাই আমরা মরব কেন? আমরা প্রতিজ্ঞা করছি এর প্রতিশোধ নেব। যেখানেই কোনো মেয়ে দেখব, তার রক্তগঙ্গা বওয়াবো।"

এই-না বলে তারা চলে গেল বনের গভীরে। বনের মাঝখানে ছিল একটা খালি মায়াবী কুটির। তারা বলল, "এখানে আমরা থাকব। বেন্‌জামিন, তুই সব চেয়ে ছোটো আর সব চেয়ে দুর্বল আমরা খাবারের খোঁজে বেরুবো তুই এখানে থেকে বাড়ি আগলাবি।"

প্রতিদিন তারা বনে বেরিয়ে খরগোশ, হরিণ, পাখি আর বুনো পায়রা মেরে আনে। বেন্‌জামিন সেগুলো রাঁধেবাড়ে আর সবাই মিলে পেট ভরে খায়। এইভাবে দেখতে দেখতে সেই কুঁড়ে ঘরে তাদের দশটা বছর কেটে গেল।

এদিকে রানীর ছোট্টো মেয়েটি বড়ো হয়ে উঠল। তার মুখ যেমন সুন্দর মন তেমনি নরম। কপালে তার তারার মতো সোনার টিকলি। একদিন রাজপুরীতে সব জামাকাপড় যখন কাচাকাচি হচ্ছে সে দেখল বারোটা শার্ট শুকতে দেওয়া হয়েছে। শার্টগুলো তার বাবার পক্ষে খুব ছোটো। তাই মাকে সে জিগ্‌গেস করল শার্টগুলো কাদের।

রানী দীর্ঘনিশ্বেস ফেলে বলল, "বাছা, ওগুলো তোর বারো ভাইয়ের।"

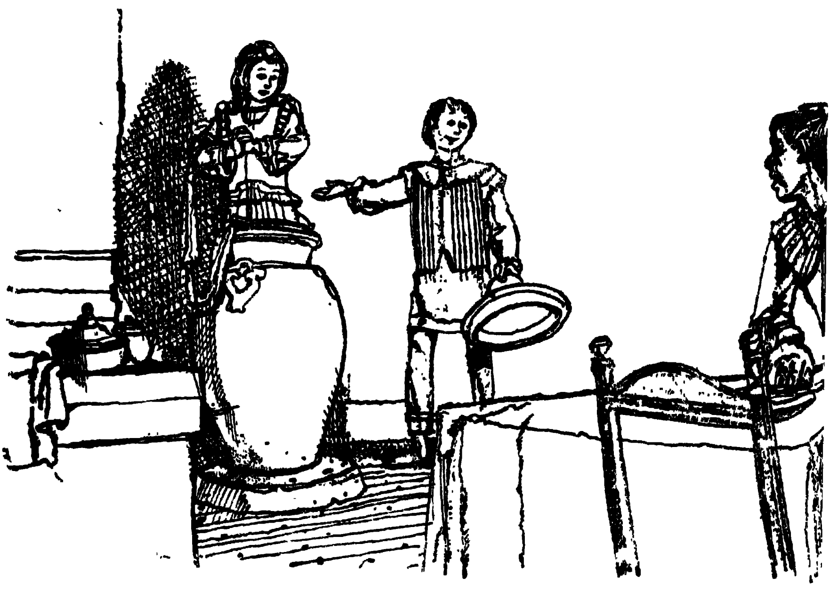
রাজকন্যে অবাক হয়ে বলল, "আমার বারো ভাই? তাদের কথা এতদিন শুনি নি কেন? কোথায় তারা?"

রানী বললেন, "ভগবান জানেন! পৃথিবীতে কোথাও তারা ভবঘুরের মতো রয়েছে।" এই-না বলে সেই তালা-বন্ধ ঘরে মেয়েকে নিয়ে গিয়ে তিনি দেখালেন সেই বারোটা কফিন। তার পর বললেন, "এই কফিনগুলো তোর ভাইদের জন্যে বানানো হয়েছিল। কিন্তু তুই জন্মাবার আগেই তারা লুকিয়ে পালায়।" মেয়েকে সব কথা তিনি জানালেন।

রানীর কথা শেষ হলে তাঁর মেয়ে বলল, "মামণি কেঁদো না। ভাই-দের আমি খুঁজতে যাব।"

বারোটা শার্ট নিয়ে সে বেরুল বনের দিকে। সারা দিন ঘুরে সন্ধের মুখে সে পৌঁছল সেই মায়াবী কুটিরে। ভিতরে গিয়ে সে দেখে একটি ছেলেকে। ছেলেটি তাকে প্রশ্ন করল—কোথা থেকে সে আসছে, কোথায় বা চলেছে। অবাক হয়ে ছেলেটি তাকাল তার সুন্দর মুখ, রাজকন্যের পোশাক আর কপালে তারার মতো সোনার টিকলির দিকে।

মেয়েটি বলল, "আমি রাজার মেয়ে। আমার বারো ভাইয়ের খোঁজে বেরিয়েছি। যতদিন না তাদের খোঁজ পাব আমি যাব নীল আকাশ যেখানে মাটিতে মিশেছে সেই পর্যন্ত।" তার পর তার বারো ভাইয়ের বারটা শার্ট তাকে সে দেখাল।



বেন্‌জামিন সঙ্গে সঙ্গে বুঝল এ তাদের বোন। তাই সে বলল, "আমি তোমার সব চেয়ে ছোটো ভাই বেন্‌জামিন।" আনন্দে তাদের দু-জনের চোখেই জল এল। দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। তার পর বেন্‌জামিন বলল, "বোনটি, কিন্তু একটা কথা ভাবার আছে। আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি মেয়ে দেখলেই মেরে ফেলব, কারণ একটি মেয়ের জন্যেই আমাদের রাজ্য ছাড়তে হয়েছে।"

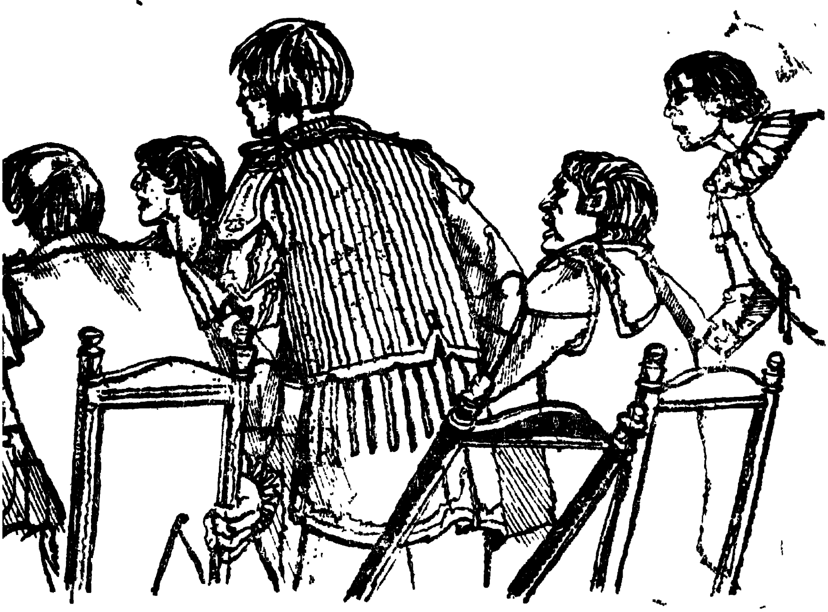
তাই-না শুনে মেয়েটি বলল, "আমি মরলে আমার ভাইদের যদি প্রাণ বাঁচে তা হলে মরতে আমি রাজি।"

বেন্‌জামিন বলল, "না। আমি দেখব যাতে তুমি না মর। এগারো ভাই না ফেরা পর্যন্ত এই জালাটার মধ্যে তুমি লুকিয়ে বসে থাক। তারা ফিরলে একটা ব্যবস্থা হবে।"

তার কথামতো মেয়েটি সেখানে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। রাতে তার ভাইরা শিকার নিয়ে ফিরল ; রান্নাবান্না শেষ হল। টেবিলের চারপাশে সবাই মিলে যখন খেতে শুরু করছে একজন প্রশ্ন করল :

"আজ কোনো খবর আছে ?"

বেন্‌জামিন প্রশ্ন করল, "তোমরা কোনো খবর শোনো নি ?"



তারা বলল, "না।"

বেন্‌জামিন বলে চলল, "তোমরা সারা দিন বনে বনে ঘুরছ। আর আমি তো এখানে ঠায় বসে। তবু তোমাদের চেয়ে আমি বেশি খবর রাখি।"

তারা সবাই চেঁচিয়ে উঠল, "কী খবর বল।"

"আমি বলার আগে কথা দাও, যে মেয়ের প্রথম দেখা পাবে তাকে মারবে না।"

তারা সবাই সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে বলল, "বেশ—কথা দিলাম তাকে আমরা মারব না। এখন বল খবরটা কী?"

"আমাদের বোন এখানে এসেছে", বলে বেন্‌জামিন সেই জালার ঢাকা খুলল। আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল তাদের বোন। পরনে তার রাজকন্যের পোশাক। কপালে তারার মতো সোনার টিকলি। ভারি মিষ্টি সুন্দর চেহারা। তাকে দেখে সবাই খুব খুশি। তার গলা জড়িয়ে সবাই তাকে চুমু খেল, আদর করল আর সঙ্গে সঙ্গে ফেলল দারুণ ভালোবেসে।

বেন্‌জামিনের সঙ্গে তাদের বোন থাকে বাড়িতে। সংসারের কাজ-কর্মে তাকে করে সাহায্য। আর এগারো ভাই বনে গিয়ে শিকার করে আনে। বেন্‌জামিন আর তাদের বোন করে রান্নাবান্না।

আগুনের জন্য কাঠকুটো আর তরকারির জন্য ফলমূল জোগাড় করে উনুনে হাঁড়িকুড়ি মেয়েটি চড়িয়ে রাখে। এগারো ভাই ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তৈরি খাবার পায়। ঘরদোর সে ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে করে রাখে, বিছানাপত্র রাখে ধব্‌ধবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ভাইরা সবাই খুব খুশি। মিলেমিশে ভারি আনন্দে তাদের দিন কাটে।

একদিন তারা দু ভাইবোন মিলে খুব ভালো রান্নাবান্না করেছে। অন্য ভাইরা ফিরলে সবাই মিলে মহা আনন্দে খাওয়া দাওয়া সারল। সেই মায়াবী কুটিরের সামনে ছিল ছোট্টো একটা বাগান। সেখানে ফুটে-ছিল বড়ো-বড়ো বারোটা পদ্মফুল। খাওয়া-দাওয়ার পর তাদের বোন গেল ভাইদের জন্য সেই পদ্মগুলো তুলতে। কিন্তু যেই-না ফুলগুলো সে তুলেছে সঙ্গে সঙ্গে তার বারো ভাই বারোটা দাঁড়কাক হয়ে বনে উড়ে গেল। আর ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেল সেই কুটির আর বাগান। সেই গহন বনে বেচারি মেয়েটি একেবারে একা হয়ে পড়ল। চারি দিকে তাকিয়ে সে দেখল কাছে এক বুড়ি রয়েছে দাঁড়িয়ে।

বুড়ি বলল, "বাছা! ফুলগুলো তুলতে গেলে কেন? ওগুলো ছিল তোমার ভাই যারা এখন চিরকালের জন্যে দাঁড়কাক হয়ে গেল।"

মেয়েটির দু গাল বেয়ে ঝর্‌ঝর্‌ করে চোখের জল ঝরতে লাগল। কাঁদতে-কাঁদতে সে প্রশ্ন করল, "তাদের কি আবার মানুষ করার কোনো উপায় নেই?"

বুড়ি বলল, "একটা মাত্র উপায় আছে। কিন্তু সেটা খুব কঠিন কাজ। ওদের মানুষের চেহারায় ফিরিয়ে আনতে হলে সাত বছর তোমাকে বোবা হয়ে থাকতে হবে। একটি কথা কইতে পাবে না। একটি বার হাসতে পাবে না। এই নিয়ম ভঙ্গ করলে সব-কিছু বৃথা হবে। একটি কথা বললেই মারা পড়বে তোমার ভাইরা।"

মেয়েটি মনে মনে বলল, 'ভাইদের যে মুক্তি দিতে পারব তাতে আমার কোনো সন্দেহ নাই।' এই-না বলে একটা উঁচু গাছের চুড়োয় উঠে সে শুরু করল তকলি দিয়ে সুতো কাটতে। একটি কথা সে কয় না, একটি বার হাসে না। একদিন হল কি, এক রাজা সেই বনে এলেন মৃগয়ায়। মেয়েটি যে-গাছের চুড়োয় বসে, সেই গাছটার কাছে দৌড়ে গিয়ে রাজার গ্রেহাউণ্ড কুকুর রাজকন্যের দিকে তাকিয়ে হাঁক-ডাক-লাফ শুরু করে দিল। তাই-না দেখে রাজা গেলেন সেই গাছতলায়। তার পর রাজকন্যেকে সেখানে দেখে রাজা তো একেবারে মোহিত। তাকে প্রশ্ন করলেন, "আমাকে বিয়ে করবে?" রাজকন্যে সামান্য মাথা হেলিয়ে জানাল, "করব।"

গাছে উঠে মেয়েটিকে নামিয়ে তাকে নিজের ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে রাজা তো নিয়ে এলেন নিজের রাজপুরীতে। খুব ধুমধাম করে তাঁদের বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু মেয়েটি না হাসে, না কয় একটি কথা। রাজার সৎমা ছিলেন ভারি কুচুটে। তরুণী রানী সম্বন্ধে নানা কেচ্ছা রটাতে তিনি শুরু করলেন। রাজার কান ভাঙাবার জন্য রাজাকে তিনি বলতে শুরু করলেন:

"একটা ভিখিরি মেয়েকে তুই বিয়ে করে ঘরে তুলেছিস। লুকিয়ে কী সব মতলব সে ভাঁজছে—কে জানে। মেয়েটা বোবা হলে অন্তত হাসতে পারে। সে হাসে না, জানিস—মনটা তার খুবই খারাপ।"

মায়ের কথায় প্রথমে রাজা মোটেই কান দেন নি। কিন্তু রাজার সৎমায়ের বকবকানি আর থামে না। রানীর বিরুদ্ধে অনবরত কুৎসা



রটিয়ে সে যায়। শেষটায় ঝালাপালা হয়ে রাজা দিলেন মেয়েটির প্রাণদণ্ড।

রানীকে পুড়িয়ে মারার জন্য রাজপুরীর অঙ্গনে বিরাট একটা অগ্নি-কুণ্ড দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। জানলায় দাঁড়িয়ে রাজা দেখতে লাগলেন। চোখ তাঁর জলে টলটলে। কারণ রানীকে খুবই ভালো-বাসতেন তিনি। চিতায় তোলার জন্য রানীকে তখন বাঁধা হয়েছে। আগুনের শিখা রানীর পোশাক-আশাক ছোঁয়-ছোঁয়। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই উত্তীর্ণ হল সেই সাতটা বছর।

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল আকাশে পাখিদের ডানা ঝাপটানোর শব্দ। আর তার পরেই মাটিতে নেমে এল সেই বারোটা দাঁড়কাক। আর কি আশ্চর্য! তখন তারা আর দাঁড়কাক নয়। মাটি ছোঁবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা তখন হয়ে উঠেছে তাদের বোনের সেই বারোটা ভাই। আগুন নিভিয়ে, রাজকন্যের বাঁধন খুলে বারো ভাই তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল।

তাদের বোনের তখন আর কথা বলার কোনো বাধা নেই। রাজাকে

মেয়েটি তখন বলল—কেন সে কথা বলে নি, কেন সে একটিবারের জন্যও হাসে নি।

রানী কোনো দোষ করে নি দেখে রাজা তো ভারি খুশি।

আজীবন তারা বেঁচে রইল সুখে-স্বচ্ছন্দে।

কিন্তু সেই পাজি শাশুড়ির বিচার হল বিচারকের সভায়। বিচারক রায় দিলেন সেই সৎমা শাশুড়িকে বিষাক্ত সাপ-ভরা ফুটন্ত তেলের মধ্যে চোবাতে।

অতএব বুঝতেই পারছ রাজার সেই সৎমা খুব একটা আরামে মরে নি।

টুকিটাকি পাখি

এক সময় এক জাদুকর ছিল। ভিখিরি সেজে বাড়ি-বাড়ি সে ভিক্ষে করতে যেত আর চুরি করে নিয়ে পালাত সব সুন্দর-সুন্দর মেয়েদের। কোথায় যে তাদের সে নিয়ে যেত কেউ সে কথা জানত না। কারণ সেই-সব মেয়েদের আর কখনো দেখা যেত না। কখনো শোনা যেত না তাদের কথা। একদিন সেই জাদুকর একটি লোকের বাড়িতে হাজির হল। তার ছিল সুন্দরী তিন মেয়ে। খুব গরিব অসুস্থ এক ভিখিরির ছদ্মবেশে সে গিয়েছিল। কাঁধে তার একটা ঝোলা। দেখে মনে হয় যে, ভিক্ষে করে সামান্য যে খাবার পায় ঝোলাটায় সে রাখে। এসে সে এক টুকরো রুটি চাইল। বড়ো মেয়ে বেরিয়ে এসে রুটির টুকরোটা তাকে যেই-না দিতে গেছে, জাদুকর আলতোভাবে তাকে ছুঁল। আর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি বাধ্য হল টুক করে তার ঝোলার মধ্যে লাফিয়ে পড়তে। সঙ্গে সঙ্গে বড়ো-বড়ো পা ফেলে তাড়াতাড়ি সে মেয়েটিকে নিয়ে এল ঘন এক বনে। সেখানেই তার বাড়ি। বাড়ির সব-কিছুই ভারি চমৎকার। মেয়েটি যা চাইল সব-কিছু দিয়ে তাকে সে বলল, "মানিক আমার! এখানে থাকতে নিশ্চয়ই তোমার খুব ভালো লাগবে। যা চাইবে তাই দেব।" এভাবে কিছুদিন কাটার পর জাদুকর বলল, "আমি কয়েকদিনের জন্য বাইরে বেরুচ্ছি। কটা দিন তোমায় একলা থাকতে হবে। এই নাও বাড়ির চাবিগুলো। বাড়ির মধ্যে যেখানে খুশি যেতে পার, সব-কিছু দেখতে পার। কিন্তু এই ছোট্টো চাবিটা দিয়ে যে ঘর খোলা যায় শুধু সেই ঘরটায় যাওয়া বারণ।

গেলে মারা পড়বে।” সেইসঙ্গে মেয়েটিকে একটি ডিমও সে দিল। দিয়ে বলল, “ডিমটা যত্ন করে সব সময় সঙ্গে রেখো। নইলে বিপদ ঘটতে পারে।”

ডিম আর চাবিগুলো নিয়ে মেয়েটি কথা দিল—তার নির্দেশ মেনে চলবে। জাদুকর চলে যেতে বাড়ির মধ্যে ঘুরে ঘুরে সব-কিছু সে দেখল। ঘরে ঘরে ঝক্‌ঝক্‌ করছে রুপো আর সোনার জিনিসপত্র। মেয়েটির মনে হল এমন ঐশ্বর্য আগে কখনো দেখে নি। শেষটায় সে পৌঁছাল সেই নিষিদ্ধ দরজার কাছে। সেটার পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়েও সে যেতে পারল না। পারল না তার কৌতূহল দমন করতে। চাবিটার দিকে সে তাকাল। অন্য চাবিগুলোর মতোই সেটা দেখতে। তার পর সেটা দরজায় লাগিয়ে সামান্য চাপ দিতেই সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজাটা। আর দরজা খুলতে সে দেখে ঘরের মাঝখানে রয়েছে প্রকাণ্ড একটা রক্তাক্ত গামলা আর সেটার মধ্যে কুচিকুচি করে কাটা মানুষের দেহ। কাছেই কাঠের বিরাট একটা টুকরো আর চকচকে একটা কুড়ুল। এই বীভৎস দৃশ্য দেখে মেয়েটি এমন জোরে শিউরে উঠল যে, তার হাতের ডিমটা পড়ে গেল গামলার মধ্যে। সেটা তুলে নিয়ে রক্তটা ধুতে সে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। ধুয়ে ফেলার পরের মিনিটেই সেই রক্তের দাগ আবার ফুটে ওঠে। বার বার সে ধুলো বার বার মুছল। কিন্তু কিছুতেই গেল না রক্তের দাগ।

কিছুদিন পরে জাদুকর ফিরল। ফিরেই প্রথম চাইল সে সেই ডিম আর চাবিটা। কাঁপতে কাঁপতে মেয়েটি সেগুলো তার হাতে দিল। আর ডিমের গায়ে রক্তের ছোপ দেখে জাদুকর সঙ্গে সঙ্গে বুঝল—মেয়েটি রক্ত-ঘরে গিয়েছিল। তখন মেয়েটিকে সে বলল, “আমার আদেশ অমান্য করে ঘরটার মধ্যে তুমি গিয়েছিলে। তোমার ভালো লাগুক চাই নাই লাগুক—আবার সেখানে তোমায় যেতে হবে। তোমার জীবন শেষ হয়ে এসেছে।” মেয়েটিকে মাটিতে ফেলে তার চুলের মুঠি ধরে হিড়্‌হিড়্‌ করে টানতে টানতে তাকে সে নিয়ে গেল সেই ঘরে। তার পর সেই কাঠের টুকরোয় তার মাথা রেখে কুড়ুলটা দিয়ে কুপিয়ে চলল। দেখতে দেখতে—ঝরঝর করে রক্ত ঝরে ভিজিয়ে ফেলল ঘরের মেঝে। তার পর সেই গামলার মধ্যে তাকে ছুঁড়ে ফেলে সে ভাবল, ‘এইবার মেজো মেয়েটাকে আনব।’

জাদুকর তাই আবার গরিব লোকের ছদ্মবেশে গেল সেই বাড়িতে ভিক্ষে করতে। বড়ো মেয়েটির মতো মেজো মেয়েটিও এল এক টুকরো রুটি নিয়ে। তাকেও একবারমাত্র আলতোভাবে ছুঁয়ে ঝুলিতে ভরে নিয়ে গেল জাদুকর। তার বেলাতেও ঘটল একই ঘটনা। কারণ সে-ও কৌতূহল দমন করতে না পেরে তাকিয়েছিল সেই বিভীষিকার ঘরে। ফলে জাদুকর ফেরার পর পেল একই শাস্তি। তার পর জাদুকর গিয়ে নিয়ে এল ছোটো মেয়েকে। কিন্তু ছোটো মেয়েটি ছিল জাদুকরের মতোই ধূর্ত। সেই চাবি আর ডিম নিয়ে বাড়িময় ঘুরে শেষটায় সে এল সেই নিষিদ্ধ ঘরের সামনে। তার দুই সুন্দরী বোনকে নৃশংসভাবে খুন হয়ে গামলাটার মধ্যে পড়ে থাকতে দেখে সে আঁতকে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে তাদের কাটা হাত পা ইত্যাদি প্রত্যেকটি অঙ্গ ঠিক ঠিক জায়গায় বসাতে শুরু করে দিল আর ঠিকমতো জোড়া লাগার পর তার দুই বোন চোখ মেলে তাকিয়ে নিশ্বেস নিয়ে আবার বেঁচে উঠে ভারি খুশি হয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল।

বাড়ি ফিরে জাদুকর চাইল সেই চাবি আর ডিম। ডিমের উপর রক্তের ছোপ না দেখে সে বলল, "পরীক্ষায় তুমি উতরেছ। তুমিই আমার বউ হবে।"

তার পর থেকে ছোটো মেয়ের উপর জাদুকরের আর কোনো জাদুর প্রভাব রইল না। মেয়েটির সব কথা বাধ্য হয়ে তাকে শুনতে হয়। মেয়েটি বলল, "এক ঝুড়ি মোহর প্রথমে তোমায় পিঠে বেঁধে নিয়ে যেতে হবে আমার মা-বাবার কাছে। তুমি যাবার পর ভোজের ব্যবস্থা আমি করে রাখব।" তার পর সে উপরতলার ছোট্টো এক ঘরে ছুটে গেল। বোনেদের সেখানে সে লুকিয়ে রেখেছিল। তাদের বলল, "এবার তোমাদের আমি বাঁচাতে পারব। হতভাগাটা নিজেই পিঠে করে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে। কিন্তু বাড়ি পৌঁছেই আমাকে উদ্ধার করার জন্যে লোকজন পাঠাতে ভুলো না।" বোনেদের একটা ঝুড়িতে রেখে এমনভাবে তাদের সে মোহর দিয়ে ঢেকে দিল যে, তাদের শরীরের কোনো অংশ দেখা গেল না। তার পর জাদুকরকে ডেকে সে বলল ঝুড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে। বলল, "পথে কোথাও বিশ্রাম নেবে না। আমার ছোট্টো জানলা দিয়ে লক্ষ্য রাখব তুমি কী কর! অতএব সাবধান!"

ঝুড়িটা পিঠে বেঁধে জাদুকর যাত্রা করল। কিন্তু সেটা খুব ভারী বলে দর্ দর্ করে তার কপাল বেয়ে ঘাম ঝরতে লাগল। এক মিনিট বিশ্রাম নেবার জন্য যেই-না সে থেমেছে অমনি ঝুড়ি থেকে একটা স্বর শোনা গেল, "আমার ছোট্টো জানলা দিয়ে দেখছি, তুমি বিশ্রাম করছ। এক্ষুনি চলতে শুরু কর।"

জাদুকর ভাবল, তার ভাবী বউ কথাগুলো বলছে। তাই সে পা হাঁকিয়ে চলতে শুরু করল। খানিক পরে আবার তার ইচ্ছে হল বসতে। কিন্তু আবার শোনা গেল সেই স্বর, "আমার ছোট্টো জানলা দিয়ে দেখছি, তুমি বিশ্রাম করছ। এক্ষুনি চলতে শুরু কর।" এই-ভাবে যখনি সে থামে তখনি সেই স্বর তাকে তাড়া দিয়ে বলে এগিয়ে যেতে। মেয়েদের বাড়িতে জাদুকর পৌঁছল টলতে টলতে, হাঁফাতে হাঁফাতে। এইভাবে এক ঝুড়ি মোহর নিয়ে দুই মেয়ে নিরাপদে পৌঁছল তাদের বাবার বাড়িতে।

ইতিমধ্যে বিয়ের কনে বিয়ের ভোজের আয়োজন করতে শুরু করে দিয়েছিল। জাদুকরের সব আত্মীয়স্বজনকে সে নেমন্তন্ন করে পাঠাল। তার পর সে একটা দাঁত বার করা হাসি হাসি মড়ার খুলি এনে সেটায় ইয়ারিং, গয়না আর ফুলের মুকুট পরিয়ে উপরে নিয়ে গিয়ে জানলার সামনে দিল রেখে। এই-সব তোড়জোড় শেষ হবার পর এক পিপে মধুর মধ্যে সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে নিয়ে বিছানার চাদর ছিঁড়ে ছিঁড়ে গায়ে সে জড়িয়ে নিল। তাকে দেখাতে লাগল একটা অদ্ভুত পাখির মতো। তাকে দেখে কারুরই চেনার জো রইল না। তার পর সে গেল বাড়ির বাইরে। বিয়ের জন্য নিমন্ত্রিত অতিথিরা তখন আসতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের কয়েকজন প্রশ্ন করল, "টুকিটাকি পাখি, কোথা থেকে আসছ ?"

"আমি আসছি মিস্টার ফ্রিট্জ টুকিটাকির বাড়ি থেকে।"

"বিয়ের কনে কী করছে ?"

ঘর-সংসার ছারখার,
জানলায় দেখোগে—
মুখ তার।"

খানিক পরে দেখা হল তার বিয়ের বর সেই জাদুকরের সঙ্গে।

ধীরে ধীরে সে ফিরছিল বাড়ির দিকে। অন্যদের মতো সে-ও প্রশ্ন করল, "টুকিটাকি পাখি, কোথা থেকে আসছ?"

"আমি আসছি ফিট্‌জ টুকিটাকির বাড়ি থেকে।"

"আমার ভাবী বউ কী করছে?"

"ঘর-সংসার ছারখার,
জানলায় দেখোগে—
মুখ তার।"

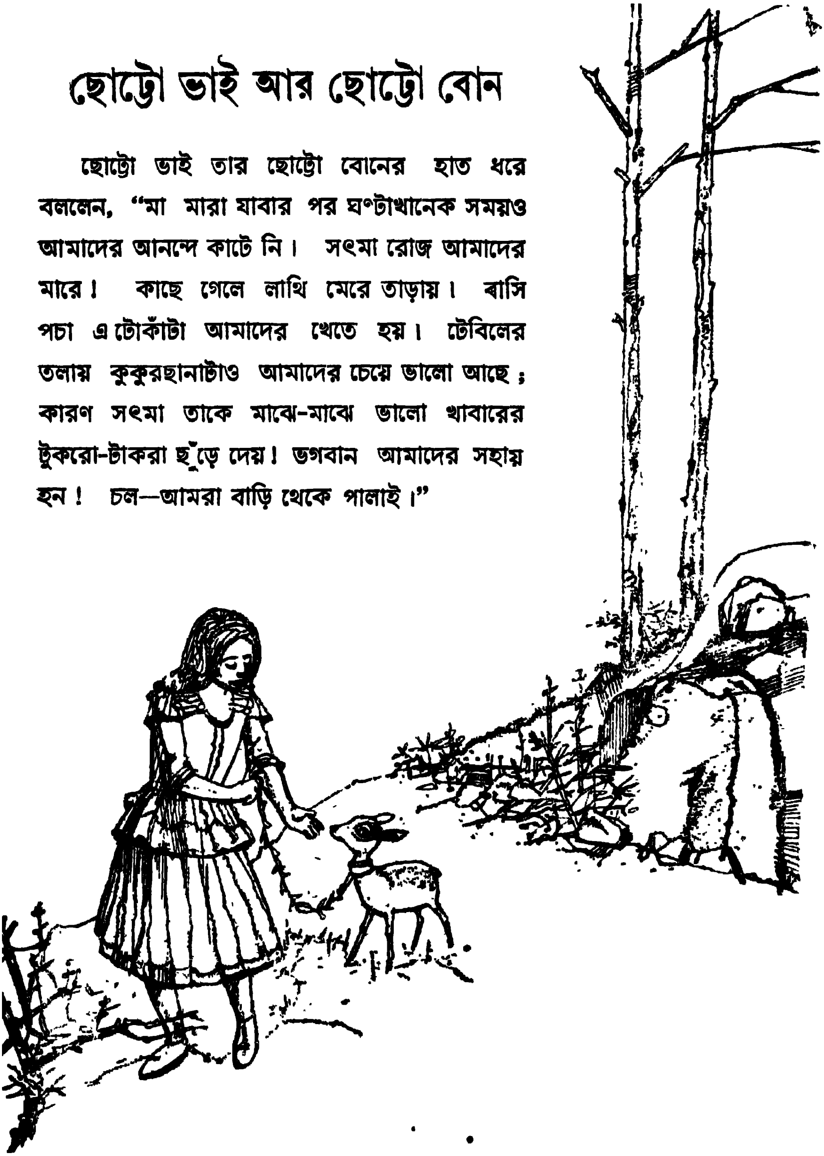
জাদুকর উপর দিকে তাকিয়ে দেখল ফুলের মুকুট পরা মড়ার সেই খুলিটা। সেটাকে সে ভাবল তার ভাবী বউ-এর মুখ। তাই সে মাথা হেলিয়ে চেঁচিয়ে জানাল প্রীতি-সম্ভাষণ। কিন্তু নিমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে যেই-না সে বাড়ির মধ্যে ঢুকেছে অমনি বিয়ের কনের ভাই আর আত্মীয়-স্বজনরা ভিতরে এল হুড়্‌মুড়িয়ে। তারা এসেছিল ছোটো মেয়েকে উদ্ধার করতে। তার পর তারা বাড়ির সব জানলা দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে এঁটে দিল কুলুপ, যাতে জাদুকর আর তার আত্মীয়-স্বজনদের কেউ না বেরিয়ে আসতে পারে।

কুলুপ আঁটা শেষ হলে বাড়িটায় তারা আগুন ধরিয়ে দিল।

আর এইভাবে পুড়ে মরল জাদুকর আর তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী।

ছোট্টো ভাই আর ছোট্টো বোন

ছোট্টো ভাই তার ছোট্টো বোনের হাত ধরে বললেন, "মা মারা যাবার পর ঘণ্টাখানেক সময়ও আমাদের আনন্দে কাটে নি। সৎমা রোজ আমাদের মারে। কাছে গেলে লাথি মেরে তাড়ায়। বাসি পচা এঁটোকাঁটা আমাদের খেতে হয়। টেবিলের তলায় কুকুরছানাটাও আমাদের চেয়ে ভালো আছে; কারণ সৎমা তাকে মাঝে-মাঝে ভালো খাবারের টুকরো-টাকরা ছুঁড়ে দেয়। ভগবান আমাদের সহায় হন! চল—আমরা বাড়ি থেকে পালাই।"



এই-না বলে বোনকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। মাঠ-ঘাট ঘাস—পাথর পেরিয়ে সারা দিন তারা হাঁটল। বৃষ্টি পড়লে ছোট্টো বোনটি বলে, "আকাশও আমাদের দুঃখে কাঁদছে!"

সন্ধেয় তারা পৌঁছল গহন এক বনে। এত দূর হেঁটে তারা বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়ল। খিদের জ্বালায়, মনের দুঃখে একটা গাছের কোটরে সেঁধিয়ে তারা পড়ল ঘুমিয়ে।

পরদিন ঘুম ভাঙতে তারা দেখে সূর্য আকাশের অনেক উপরে উঠে গেছে। গরম রোদ পড়েছে গাছের মাথায়। ছোট্টো ভাই বলল, "বোনটি, আমার ভারি তেষ্টা পেয়েছে। কোথায় ঝর্না আছে জানলে জল খেয়ে আসতাম। মনে হচ্ছে যেন জলের কলকল শব্দ শুনতে পাচ্ছি।"

এই-না বলে ছোট্টো বোনের হাত ধরে সে বেরুল ঝর্নার খোঁজে। কিন্তু তাদের শয়তান সৎমা ছিল ডাইনি। ছেলেমেয়েদের পালাতে দেখে তাদের পিছু নিয়ে এসে বনের সব ঝর্নাগুলোর উপর জাদুমন্ত্র সে পড়ে দিয়েছিল। যেতে যেতে তারা দেখে ঝকমকে একটা ঝর্না পাথরের উপর দিয়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে চলেছে। ছোট্টো ভাই গেল সেটার জল খেতে। কিন্তু ছোট্টো বোন শুনতে পেল কলকল করে ক্রমাগত ঝর্নাটা বলে চলেছে, "যে আমার জল খায়, সে বাঘ হয়ে যায়। যে আমার জল খায়, সে বাঘ হয়ে যায়।"

তাই-না শুনে ছোট্টো বোন চেঁচিয়ে উঠল, "দোহাই দাদা, এটার জল খেয়ো না। খেলে বাঘ হয়ে আমায় তুমি ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়ে ফেলবে।"

দ্বিতীয় ঝর্নার কাছে পৌঁছে ছোট্টো বোন শুনল কলকল করে ক্রমাগত সেটা বলে চলেছে, "যে আমার জল খায়, সে নেকড়ে হয়ে যায়। যে আমার জল খায়, সে নেকড়ে হয়ে যায়।"

তাই-না শুনে ছোট্টো বোন আবার চেঁচিয়ে উঠল, "দোহাই দাদা, এটার জল খেয়ো না। খেলে নেকড়ে হয়ে আমায় তুমি খেয়ে ফেলবে।"

ছোট্টো ভাই সেই ঝর্নার জল খেল না। কিন্তু বোনকে বলল, "পরের ঝর্নার জল আমি খাবোই—তুই যাই বলিস-না কেন। তেষ্টায় আমার গলা কাঠ হয়ে গেছে।"

তৃতীয় ঝর্নার কাছে পৌঁছে ছোট্টো বোন শুনল কলকল করে ক্রমাগত সেটা বলে চলেছে, "যে আমার জল খায়, সে হরিণ হয়ে যায়। যে আমার জল খায়, সে হরিণ হয়ে যায়।"

তাই-না শুনে ছোট্টো বোন চেঁচিয়ে উঠল, "দোহাই দাদা, এটার জল খেয়ো না। খেলে হরিণ হয়ে আমার কাছ থেকে তুমি পালিয়ে যাবে।"

ছোট্টো ভাই কিন্তু তার কথা না শুনে ঝর্নার পাশে হাঁটুগেড়ে বসে আঁজলা ভরে সেই ঝর্নার জল খেলো। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখল হরিণ-ছানা হয়ে ঝর্নাটার পাশে সে শুয়ে রয়েছে।

ভাইকে বদলে যেতে দেখে ছোট্টো বোন হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল। হরিণ ছানাও তার পাশে বসে লাগল কাঁদতে। শেষটায় মেয়েটি বলল, "কেঁদো না, ভাই হরিণ। তোমাকে কখনো আমি ছেড়ে যাব না।" নিজের মোজা বাঁধার সোনার ফিতে খুলে হরিণ-ছানার গলায় পরিয়ে বুনো ঘাস ছিঁড়ে সে বুনল নরম একটা দড়ি। সেই দড়ি দিয়ে হরিণ-ছানাকে বেঁধে তাকে নিয়ে সে চলে গেল বনের গভীর থেকে গভীরে। যেতে যেতে যেতে যেতে শেষটায় তারা পৌঁছল ছোট্টো এক কুটিরে। সেটা খালি দেখে মেয়েটি বলল, "এখানেই আমরা থাকব।"

কচি পাতা আর শ্যাওলা তুলে এনে হরিণ-ছানার জন্য নরম একটা বিছানা সে বানাল। প্রতি সকালে সে যায় নিজের জন্য বাদাম বৈঁচি আর ফলমূল জোগাড় করতে। হরিণ-ছানার জন্য সে নিয়ে আসে কচিকচি ঘাস। তার হাত থেকে সেই ঘাস খেয়ে হরিণ-ছানা মনের আনন্দে তাকে ঘিরে লাফিয়ে-লাফিয়ে বেড়ায়। সন্ধেবেলায় ক্লান্ত হয়ে ঠাকুর-নাম সেরে হরিণ-ছানার পিঠে মাথা রেখে মেয়েটি পড়ে ঘুমিয়ে। ছোট্টো ভাইটির মানুষের চেহারা থাকলে খুব আনন্দেই সেখানে তাদের দিন কাটত।

এইভাবে কিছুদিন একা-একা তাদের সেই বনে কাটল। তার পর একদিন সে-দেশের রাজা দলবল নিয়ে সেখানে এলেন শিকার করতে। চার দিকে শিঙা লাগল বাজতে, শোনা যেতে লাগল শিকারী-কুকুরদের ডাক আর শিকারীদের প্রাণ-খোলা হৈ-হল্লা। তাই-না শুনে হরিণ-ছানার খুব ইচ্ছে হল সেখানে যেতে। ছোট্টো বোনকে সে বলল, "শিকার দেখতে যেতে দাও। শিকারের বাজনা শুনে আমি আর থাকতে পারছি না।" সে এমন কাকুতি-মিনতি করতে লাগল যে, শেষপর্যন্ত ছোট্টো বোনকে মত দিতে হল।

সে বলল, "সন্ধেয় কিন্তু বাড়ি ফিরতে ভুলো না। শিকারীদের ভয়ে দরজা আমি বন্ধ করে রাখব। ফিরে এসে দরজায় টোকা দিয়ে বোলো, 'ছোট্টো বোন, আমাকে ঢুকতে দাও।' তা হলে বুঝব তুমি ফিরেছ। কথাগুলো না শুনলে দরজা খুলব না।"

হরিণ-ছানা দৌড়ে বেরিয়ে খোলামেলা জায়গায় গিয়ে ভারি খুশি হল। সেই সুন্দর জন্তুটাকে দেখতে পেয়ে রাজা আর শিকারীর দল তাড়া করল। কিন্তু কিছুতেই তার নাগাল তারা পেল না। যখনই তারা ভাবে, এইবার ধরেছি—তখনি সেটা ঝোপঝাড় টপকে অদৃশ্য হয়ে যায়। অন্ধকার হতে হরিণ-ছানা দৌড়ে বাড়ি ফিরে দরজায় টোকা দিয়ে বলল, "ছোট্টো বোন, আমাকে ঢুকতে দাও।" দরজা খুলতে লাফিয়ে ভিতরে এসে সারা রাত সে ঘুমলো তার নরম বিছানায়।

পরদিন সকালে আবার শিকার শুরু হল। শিঙার শব্দ আর শিকারীদের চীৎকার শুনে, হরিণ-ছানা অস্থির হয়ে উঠে বলল, "ছোট্টো বোন, দরজা খোলো। আমাকে বেরুতেই হবে।"

ছোট্টো বোন দরজা খুলে বলল, "সন্ধেয় ফিরতে কিন্তু ভুলো না। ফিরে দরজায় টোকা দিয়ে ঐ কথাগুলো বলবে।"

রাজা আর শিকারীর দল গলায় সোনার পাত জড়ানো সেই হরিণ-ছানাকে আবার দেখতে পেয়ে তাড়া করল। কিন্তু কিছুতেই তার নাগাল পেল না। সারাদিন তাড়া করার পর সন্ধের মুখে শিকারীর দল তাকে ঘিরে ফেলল। এক শিকারীর তীরে তার পা সামান্য আহত হওয়ায় আগের মতো জোরে সে আর ছুটতে পারল না। ধীরে ধীরে ছুটে সে বাড়ি ফিরল। এক শিকারী পিছু নিয়ে সেই পর্যন্ত এসে হরিণ-ছানাকে বলতে শুনল, "ছোট্টো বোন, আমাকে ঢুকতে দাও।" আর দেখল দরজাটা খুলে বন্ধ হয়ে যেতে।

রাজার কাছে ফিরে যা দেখেছে, যা শুনেছে—সব কথা সেই শিকারী জানাল। শুনে রাজা বললেন, "কাল আবার আমরা হরিণ-ছানাকে তাড়া করব।"

হরিণ-ছানাকে আহত দেখে ছোট্টো বোন গেল দারুণ ঘাবড়ে। পায়ের রক্ত ধুয়ে তার উপর শিকড়-বাকড়ের ওষুধ লাগিয়ে সে বলল, "তোমার বিছানায় গিয়ে বিশ্রাম কর, লক্ষ্মী হরিণ-ভাই তা হলেই সেরে উঠবে।"

হরিণ-ছানার পা সামান্যই কেটেছিল। তাই পরদিন সকালে ব্যথাট্যথা সে টের পেল না। বনে আবার শিকারের হৈচৈ শুনে সে বলল, "বাড়িতে কিছুতেই টিঁকতে পারছি না। আমাকে ওখানে যেতেই হবে। লক্ষ্য রাখব কেউ যাতে আবার কাছে আসতে না পারে।



তাই শুনে ছোট্টো বোন কাঁদতে কাঁদতে বলল, "এবার ওরা তোমায় নিশ্চয়ই মেরে ফেলবে। পৃথিবীতে আপনার বলতে কেউ আমার থাকবে না। কিছুতেই তোমায় আমি বেরুতে দেব না।"

হরিণ-ছানা বলল, "তা হলে মনের দুঃখে আমি মরে যাব। শিকারের শিঙার আওয়াজ শুনলে মনে হয় আমার পাগুলো যেন পুড়ে যাচ্ছে।"

ছোট্টো বোন তার কাকুতি-মিনতি ঠেলতে পারল না। দুরুদুরু বুকে দরজা সে খুলে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে বেজায় খুশি হয়ে লাফাতে-লাফাতে হরিণ-ছানা চলে গেল বনে।

তাকে দেখে রাজা শিকারীদের বললেন, "সন্ধে পর্যন্ত ওকে তাড়া করে যাও। কিন্তু কেউ ওর কোনো ক্ষতি করবে না।"

সূর্য ডোবার পর সেই শিকারীকে রাজা বললেন, "যে বাড়িটার কথা বলেছিলে, আমাকে সেখানে নিয়ে চলো।"

সেই দরজার কাছে পেঁাছে টোকা দিয়ে বললেন, "ছোট্টো বোন, আমাকে ঢুকতে দাও।" দরজা খুলতে ভিতরে গিয়ে রাজা তো অবাক! দেখেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়ে। সে-রকম সুন্দরী মেয়ে জীবনে কখনো তিনি দেখেন নি।

হরিণ-ছানার বদলে সোনার মুকুট পরা রাজাকে আসতে দেখে মেয়েটি দারুণ ভয় পেয়ে গেল। রাজা কিন্তু সদয় চোখে তার দিকে তাকিয়ে তার হাত ধরে বললেন, "আমার সঙ্গে রাজপুরীতে এসে আমায় তুমি বিয়ে করতে রাজি?"

মেয়েটি বলল, "খুব রাজি! কিন্তু হরিণ-ছানাকেও নিয়ে যেতে হবে। তাকে আমি কিছুতেই ফেলে যাব না।"

রাজা বললেন, "আজীবন সে তোমার সঙ্গে থাকবে। কোনো কিছুর অভাব তার হবে না।"

রাজার কথার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ঘরে এল হরিণ-ছানা। ছোট্টো বোন সেই ঘাসের দড়ি দিয়ে তাকে বেঁধে, হাতে দড়ি নিয়ে বনের সেই ছোটো কুটির ছেড়ে হরিণ-ছানাকে নিয়ে রাজার সঙ্গে চলে গেল রাজপুরীতে।

মহা ধুমধাম করে রাজার সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল। ছোট্টো বোন হয়ে উঠল রাজরানী। তার পর অনেকদিন তারা কাটাল সুখে-স্বচ্ছন্দে। হরিণ-ছানাও রইল খুব আদর-যত্নে। রাজপুরীর বাগানে সে বেড়ায় দৌড়ঝাঁপ করে।

এদিকে সেই যে শয়তান সৎমা, যার জ্বালায় ছেলেমেয়েদের বাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়—সে ভেবেছিল, বনের জন্তু-জানোয়ার ছোট্টো বোনকে ছিঁড়ে খুঁড়ে শেষ করে ফেলেছে আর হরিণ-ছানা-রূপী ছোট্টো ভাইকে গুলি করে মেরেছে শিকারীরা। তাই যখন শুনল তারা খুব সুখে আছে

তখন হিংসেয় সে জ্বলতে-পুড়তে লাগল। তার মাথায় তখন একমাত্র চিন্তা—কী করে তাদের সর্বনাশ করা যায়। তার নিজের মেয়ে কালো কুচ্ছিত। একটা চোখ তার কানা। দাঁত খিঁচিয়ে নিজের মাকে কেবলই সে বলে, "রানী হবার কথা তো আমারই।"

সেই বুড়ি ডাইনি তাকে শান্ত করার জন্য বলল, "একটু ধৈর্য ধর। সময় হলেই আমি ব্যবস্থা করছি।"

সময় কাটে। রানী হয়ে উঠল একটি ফুটফুটে ছেলের মা। রাজা তখন বেরিয়েছেন শিকারে। সেই বুড়ি ডাইনি দাসীর বেশে রানীর শোবার ঘরে এসে বলল, "আসুন রানীমা, আপনার চানের গরম জল তৈরি। চান করলে নতুন করে বল পাবেন, দেরি করলে জল জুড়িয়ে যাবে।" ডাইনির সঙ্গে ছিল তার মেয়ে। তারা দুজন ধরাধরি করে রানীকে স্নানের ঘরে নিয়ে গিয়ে টবে শুইয়ে স্নানের ঘরের দরজায় কুলুপ দিয়ে পালাল। সেই স্নানের ঘরে চুল্লির মতো আগুন তারা ধরিয়েছিল। ভেবেছিল দেখতে দেখতে দম বন্ধ হয়ে রানী মরবে।

তার পর সেই ডাইনি করল কি—নিজের মেয়ের মাথায় রাত-টুপি পরিয়ে রানীর জায়গায় তাকে শোয়াল। জাদুমন্ত্রে তার চেহারা করে দিল রানীর মতো। কিন্তু মেয়ের কানা-চোখটা সে বদলাতে পারল না। রাজার যাতে চোখে না পড়ে তার জন্য যেদিকে কানা-চোখ, বালিশের উপর মুখের সেদিকটা ফিরিয়ে তাকে সে শোয়াল।

সন্ধেয় বাড়ি ফিরে রাজা শুনলেন তাঁর একটি ফুটফুটে ছেলে জন্মেছে। শুনে তিনি তো ভারি খুশি। রানী কেমন আছে দেখার জন্য তক্ষুনি তিনি যেতে চাইলেন রানীর শোবার ঘরে। বুড়ি ডাইনি সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "দোহাই রাজামশাই, পর্দা তুলবেন না। রানীমাকে এখন অন্ধকারে রাখা দরকার।" তাই শুনে রাজা চলে গেলেন। মিথ্যে রানী সেজে বিছানায় কেউ শুয়ে বলে তাঁর একটিবারও সন্দেহ হল না।

তখন মাঝ রাত। সবাই অসাড়ে ঘুমুচ্ছে। বাচ্চা যে-ঘরে দোলনায় শুয়ে সে ঘরে জেগে বসেছিল দাই। দরজা খুলে যেন বাতাসে ভাসতে-ভাসতে আসল রানীকে ঘরে আসতে সে দেখল। দোলনা থেকে শিশুকে নিজের বুকে চেপে সেই আসল রানী তাকে অনেক আদর করল। তার পর শিশুর বালিশ ঠিকঠাক করে, দোলনায় তাকে শুইয়ে, তার

গায়ে সে চাদর ঢাকা দিয়ে দিল। হরিণ-ছানার কথাও সে ভুলল না। যেখানে হরিণ-ছানা শুয়েছিল সেখানে গিয়ে তার পিঠে হাত বোলাল। তার পর চুপচাপ বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। পরদিন সকালে প্রহরীদের দাই প্রশ্ন করল—রাতে রাজপুরীতে কেউ এসেছিল কি না। তারা বলল, "না, কাউকে তো আমরা দেখি নি।" এইভাবে আসল রানী রাতের পর রাত আসতে লাগল। কিন্তু কোনো কথা সে বলে না। প্রতিবারই দাই তাকে দেখে। কিন্তু কথাটা কাউকে বলতে তার সাহস হয় না।

কিছুদিন পর রাতে আসল রানী কথা বলতে শুরু করল। সে বলল :

কেমন আমার ছেলে, কেমন হরিণ-ছানা ?
একটিবার আসব কিন্তু আর আসব না।"

দাই তার কথার উত্তর দিল না। কিন্তু রানী অদৃশ্য হবার পর রাজার কাছে গিয়ে সব কথা জানাল।

রাজা বললেন, "কী সর্বনাশ! এ-সবের মানে কী? কাল রাতে নিজে আমি ছেলের ঘর পাহারা দেব।"

সন্ধেয় তিনি গেলেন ছেলের শোবার ঘরে। মাঝরাতে আবার এসে আসল রানী বলল :

"কেমন আমার ছেলে, কেমন হরিণ-ছানা ?
একটিবার আসব কিন্তু আর আসব না।"

তার পর যথারীতি ছেলেকে চুমু খেয়ে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। রানীকে বাধা দেবার সাহস হল না রাজার। কিন্তু পরের রাতেও পাহারা দিতে গিয়ে রানীকে বলতে শুনলেন রাজা :

"কেমন আমার ছেলে, কেমন হরিণ-ছানা ?
একটিবার আসব কিন্তু আর আসব না।"

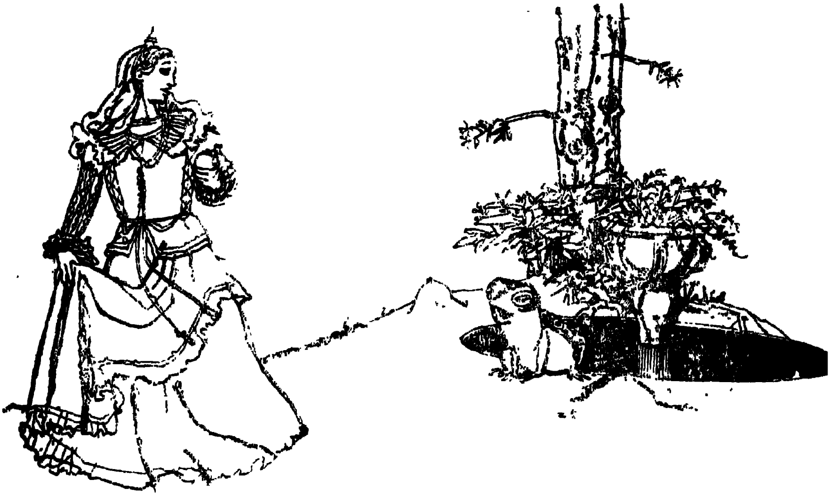
শুনে রাজা আর নিজেকে সামলাতে পারল না। দৌড়ে গিয়ে তার হাত ধরে তিনি বললেন, "তুমিই যে আসল রানী তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।"

আসল রানী বলল, "হ্যাঁ রাজা, আমিই আসল রানী।"

রাজা তাকে চিনতে পারলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ডাইনির মোহ-জাল ছিঁড়ে গেল। আর রাজার সামনে সুস্থ জীবন্ত চেহারায় দাঁড়িয়ে

রইল সেই ছোট্টো বোন, আসল যে রানী। সেই শয়তান ডাইনি আর হতকুচ্ছিত মেয়ের সব কথা রাজাকে সে বলল।

বিচার করে রাজা তাদের দিলেন প্রাণদণ্ড। ডাইনির মেয়েকে বনে ছেড়ে দেওয়া হল। আর ছাড়বার পরেই বুনো জানোয়ারের দল তাকে ফেলল টুকরো-টুকরো করে! বুড়ো ডাইনিটাকে ফেলা হল এক চুল্লিতে। সেখানে দগ্ধে-দগ্ধে মরল সে। আর সে মরে পুড়ে ছাই হবার সঙ্গে সঙ্গে ছোট্টো ভাই-এর উপর ডাইনিটার জাদুর প্রভাব মিলিয়ে গেল! আবার ফিরে পেল সে মানুষের দেহ। আর তার পর থেকে সুখে-স্বচ্ছন্দে রইল সেই ছোট্টো বোন আর সেই ছোট্টো ভাইটি।



ব্যাঙ-রাজা

বহুকাল আগে এক রাজা ছিলেন। তাঁর সব মেয়েরাই সুন্দরী। কিন্তু তাদের মধ্যে ছোটোটির রূপের তুলনা নেই। সূর্য অনেক সুন্দর জিনিস দেখেছে। কিন্তু এই ছোটো মেয়েটির দিকে সর্য যতবার তাকাত ততবারই অবাক হয়ে যেত! রাজার দুর্গের কাছে ছিল বিরাট একটা অন্ধকার বন। সেই বনে বুড়ো একটা লিন্‌ডেন গাছের নীচে ছিল একটা কুয়ো। গরমের দিনে সেই ঠাণ্ডা কুয়োপাড়ে গিয়ে বসত ছোটো রাজকন্যে। একঘেয়ে লাগলে সোনার একটা বল শূন্যে ছুঁড়ে সে লোফালুফি করত। এটাই ছিল তার প্রিয় খেলা।

একবার হল কি—সেই সোনার বলটা তার হাত ফস্‌কে মাটির উপর গড়িয়ে গিয়ে পড়ল সেই কুয়োর জলে। তার চোখের সামনে দিয়ে বলটা অদৃশ্য হয়ে গেল। কুয়োটা খুব গভীর। এত গভীর যে তলা দেখা যায় না। রাজকন্যে কাঁদতে শুরু করল। আর তার কান্না ক্রমশই চলল বেড়ে। কিছুতেই আর থামতে পারে না। এমন সময় কে যেন বলে উঠল, "কী হয়েছে রাজকন্যে? তোমার কান্না শুনে যে পাথর গলে যায়!" স্বরটা কোথা থেকে আসছে দেখার জন্য চারি দিকে সে, তাকাল। তার পর তার চোখে পড়ল একটা ব্যাঙ—জলের উপর তার কুচ্ছিত ফোলা-ফোলা মুখটা ভেসে।

রাজকন্যে বলল, "কী কাণ্ড! তুই কথা বলছিস, বুড়ো ব্যাঙ? আমি কাঁদছি আমার সোনার বলটার জন্যে। কুয়োয় সেটা পড়ে গেছে।"

ব্যাঙ বলল, "কেঁদো না। আমি তোমায় সাহায্য করতে পারি। তোমার খেলনাটা এনে দিলে কী দেবে, বল।"

রাজকন্যে বলল, "যা চাইবে তাই দেব। আমার পোশাক, আমার হীরে-মুক্তো-জহরত, এমন-কি, আমার সোনার মুকুটটাও।"

ব্যাঙ বলল, "তোমার পোশাক, তোমার হীরে-মুক্তো-জহরত, তোমার সোনার মুকুট—ওগুলোর কোনোটাই চাই না। আমায় যদি ভালোবাসো, তোমার খেলার সঙ্গী করে নাও, খাবার টেবিলে তোমার পাশে বসতে দাও, তোমার ছোট্টো সোনার প্লেট থেকে খাবার আর ছোট্টো গেলাস থেকে জল খেতে দাও, তোমার ছোট্টো বিছানায় শুতে দাও—তা হলে ডুবে গেলে তোমার সোনার বলটা এনে দেব।"

রাজকন্যে বলল, "বেশ। কথা দিচ্ছি—বলটা এনে দিলে যা চাইবে তাই দেব।" মনে মনে ভাবল, 'ব্যাঙটার যত সব হাবিজাবি কথা! ওটা তো শুধু জলে বসে অন্য ব্যাঙদের সঙ্গে মক্‌মক্‌ করে ডাকতে পারে। কোনো মানুষের বন্ধু হবে কী করে?'

রাজকন্যের কথা আদায় করে ব্যাঙটা জলে ডুব দিল আর খানিক পরে বল মুখে নিয়ে ভেসে উঠে সেটা ছুঁড়ে দিল ঘাসের উপর। প্রিয় খেলনাটা আবার দেখতে পেয়ে বেজায় খুশি হল রাজকন্যে। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে সে দৌড়ে চলে গেল।

ব্যাঙ চেঁচিয়ে উঠল, "থামো! থামো! আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল। অত জোরে আমি ছুটতে পারি না।"

কিন্তু তার চেঁচামেচিতে কোনো ফল হল না। রাজকন্যে কানেই তুলল না তার কোনো কথা! এক দৌড়ে বাড়ি ফিরে সব কথা বেমালুম সে ভুলে গেল! বেচারা ব্যাঙ কী আর করে—আবার সে তার কুয়োয় গিয়ে নামল।

পরের দিন রাজা আর সব সভাসদের সঙ্গে রাজকন্যে খাবার টেবিলের সামনে বসে নিজের ছোটো সোনার প্লেট থেকে সবে খেতে শুরু করেছে এমন সময় শোনা গেল একটা থপ্‌থপ্ থপ্‌থপ্ শব্দ। কে যেন শ্বেতপাথরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে দরজায় টোকা দিয়ে বলল, "ছোটো রাজকন্যে! ছোটো রাজকন্যে! আমাকে ঢুকতে দাও!"

বাইরে কে এসেছে দেখার জন্যে দরজার কাছে ছুটে গেল ছোটো রাজকন্যে ; আর দরজা খুলতেই দেখে—ও মা ! সেই ব্যাঙটা সেখানে বসে ! দড়াম্ করে দরজা বন্ধ করে দারুণ ঘাবড়ে তাড়াতাড়ি সে ফিরে এল নিজের জায়গায় ! রাজা লক্ষ্য করলেন তার বুক বেজায় ঢিব্‌ঢিব্ করছে । তিনি বললেন :

"ভয় পেয়েছিস কেন ? তোকে নিয়ে পালাবার জন্যে দোরগোড়ায় কি একটা দৈত্য এসে হাজির হয়েছে ?"

সে বলল, "না-না । কোনো দৈত্যদানা নয়—কুচ্ছিত একটা ব্যাঙ ।"

"তোর কাছে ব্যাঙটা কী চায় ?"

"জানো বাবা, গতকাল বনের মধ্যে কুয়োপাড়ে খেলা করার সময় আমার সোনার বলটা জলে পড়ে যায় । আমি খুব কাঁদি । তাই ব্যাঙটা সোনার বল নিয়ে আসে । সে বলে তাকে আমার সঙ্গী করে নিতে । তাকে কথা দিয়েছিলাম আমার সঙ্গী করব বলে । কিন্তু কক্ষনো ভাবি নি জল ছেড়ে এত দূরে সে আসতে পারবে । এখন সে বাইরে । ভেতরে আসতে চায় ।"

আবার দরজায় টোকা পড়ল আর শোনা গেল এই কথাগুলো !

"ছোটো রাজকন্যে,
ছোটো রাজকন্যে,
আমায় আসতে দাও ।
ঠাণ্ডা কুয়োতলে
কাল যে কথা দিয়েছিলে ।
ছোটো রাজকন্যে,
ছোটো রাজকন্যে,
আমায় আসতে দাও ।"

রাজা বললেন, "কথার খেলাপ করতে নেই । ওকে ভেতরে নিয়ে আয় ।"

ছোটো রাজকন্যে দরজা খুলতে থপ্‌থপ্ করে তার পিছন-পিছন চেয়ারের কাছে এসে ব্যাঙ বলল, "তোমার কাছে আমাকে তুলে নাও ।"

ছোটো রাজকন্যে শিউরে উঠল । কিন্তু রাজা তাকে আদেশ দিলেন ব্যাঙের কথা শুনতে । ব্যাঙ কিন্তু চেয়ারে বসে সন্তুষ্ট হল না । বলল তাকে টেবিলে তুলে দিতে । টেবিলে উঠে সে বলল, "তোমার সোনার ছোটো প্লেটটা কাছে সরিয়ে আনো যাতে একসঙ্গে আমরা খেতে পারি ।" ছোটো রাজকন্যে তাই করল । কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল

মোটেই এটা সে পছন্দ করছে না। চেটেপুটে ব্যাঙ খেল। কিন্তু ছোটো রাজকন্যে প্রায় কিছুই মুখে তুলতে পারল না। খাওয়া শেষ হলে ব্যাঙ বলল, "আমার পেট ভরে গেছে। আমি এখন ক্লান্ত। এবার তোমার ছোট্টো ঘরে নিয়ে গিয়ে সিল্কের বিছানা পেতে দাও। আমরা পাশাপাশি শুয়ে ঘুমব।" ঠাণ্ডা ব্যাঙ—যাকে ছুঁতে তার গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করে—সে তার সুন্দর পরিষ্কার বিছানায় ঘুমুবে ভেবে ছোটো রাজকন্যে এবার কাঁদতে শুরু করল।

তার উপর চটে উঠে রাজা বললেন, "দরকারের সময় আমাদের যারা সাহায্য করেছে, পরে তাদের ঘেন্না করতে নেই?"

তাই ছোটো রাজকন্যে তার সুন্দর দুটো আঙুল দিয়ে ব্যাঙকে তুলে উপরতলায় এনে এক কোণে নামিয়ে দিল। কিন্তু সে বিছানায় শোবার পর বিছানার পাশে এসে ব্যাঙ বলল, "আমি ক্লান্ত। আমিও বিছানায় শুতে চাই। আমাকে তুলে নাও। নইলে তোমার বাবাকে বলে দেব।" এইবার সত্যি-সত্যি ক্ষেপে উঠল ছোটো রাজকন্যে। ব্যাঙটাকে-তুলে সজোরে দেয়ালে আছড়ে সে বলল—

"হতকুচ্ছিৎ ব্যাঙ। এবার যত খুশি ঘুমো।"

কিন্তু মাটিতে পড়ার পর দেখা গেল সে আর ব্যাঙ নেই—এক রাজপুত্তুর। চোখ দুটি ভারি সুন্দর, হাসিহাসি। রাজার কথায় সে হয়ে উঠল ছোটো রাজকন্যের প্রিয় বন্ধু আর খেলার সঙ্গী। তাকে রাজপুত্তুর বলল, কী করে এক বুড়ি শয়তান ডাইনি তুকতাক করে তাকে ব্যাঙ বানিয়ে দিয়েছিল। জানাল ছোটো রাজকন্যে ছাড়া আর কেউই কুয়ো থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারত না। আরো বলল, আগামী কাল ছোটো রাজকন্যেকে সে সঙ্গে নিয়ে যাবে নিজের রাজত্বে। তারা ঘুমিয়ে পড়ল আর পরের দিন সকালে সূর্য ওঠার পর দেখা গেল আটটা সাদা ঘোড়ায়-টানা একটা গাড়ি দোড়গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। ঘোড়াগুলোর মাথায় সাদা পালক দুলছে। তাদের গায়ে সোনার সাজ। পিছনে দাঁড়িয়ে তরুণ রাজার বিশ্বস্ত ভৃত্য হেন্‌রি। তার প্রভু ব্যাঙ হয়ে যাবার পর সে এমন দুঃখ পায় যে, তিনটে লোহার পাত দিয়ে নিজের বুক সে বাঁধে—যাতে শোকে তার বুকটা না ভাঙে।

বিশ্বস্ত হেন্‌রি তার প্রভু আর ছোটো রাজকন্যেকে উঠতে সাহায্য করে নিজে আবার গিয়ে উঠল গাড়িটার পিছনে। গাড়িটা তাদের নিয়ে

চলল রাজপুত্তুরের রাজত্বে। গাড়িটা খানিক এগুতেই শোনা গেল মট্ করে একটা শব্দ, যেন কিছু একটা ভাঙতে চলেছে। রাজপুত্তুর চারি দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল :

"হেন্‌রি, গাড়ির স্প্রিঙ ভাঙল নাকি?"

"না রাজা, গাড়ির স্প্রিঙ নয়,
আমার বুকের লোহার বলয়।
ডাইনি-মন্ত্রে যখন তুমি কুয়োর তলা;
বুক সয়েছে অনেক জ্বালা।"

পথে আরো দুবার মট্ মট্ শব্দ শোনা গেল। আর প্রত্যেক বারই রাজপুত্তুর আর রাজকন্যের মনে হতে লাগল; বুঝি গাড়ির স্প্রিঙ ভাঙছে। কিন্তু আসলে সে দুটো শব্দ হেন্‌রির বুকে জড়ানো আরো দুটো লোহার পাত ভাঙার শব্দ। কারণ তার প্রভুর আনন্দ দেখে আজ আর তার বুকে আনন্দ ধরছে না।

র‍্যাম্‌পিয়ন*

অনেক দিন আগেকার কথা। একটি লোক আর তার বউ সংসার চালাত। সুখের তাদের সংসার। শুধু একটিমাত্র অভাব। তাদের সংসারে কোনো ছেলেপুলে ছিল না। সেই লোকটির বউ দিনরাত ভগবানকে ডাকে ছেলেপুলে দেবার জন্য। বউটির বিশ্বাস ভগবান তার প্রার্থনা পূর্ণ করবেন।

তাদের বাড়ির পিছনে ছোট্টো একটা জানালা ছিল। সেটা দিয়ে তাকালে চোখে পড়ে আশ্চর্য একটা বাগান। সেই বাগানে ভারি সুন্দর হরেক রকমের ফুল আর গাছ। বাগানটার চার দিকে উঁচু দেয়াল। লোকে সেখানে ঢুকতে ভয় পায়। কারণ বাগানটা ছিল এক ডাইনির। অনেক তুকতাক সে জানত। তাই সবাই তাকে ভয় পেত।

একদিন বউটি তাদের বাড়ির পিছনকার সেই ছোট্টো জানলা দিয়ে আশ্চর্য বাগানটার দিকে তাকিয়ে দেখে সেখানে ভারি সুন্দর রসাল র‍্যাম্‌পিয়ন রয়েছে। এত সবুজ আর তাজা যে দেখলেই খেতে ইচ্ছে করে। তাই সেগুলো খাবার ভারি লোভ হল বউটির। আর তার লোভ দিনকের দিন বেড়েই চলল। সে জানত ঐ র‍্যাম্‌পিয়ন পাওয়া তার সাধ্যের অতীত। তাই, দেখতে-দেখতে বউটির শরীর শুকিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে উঠতে লাগল। সেটা লক্ষ্য করে তার বর খুব ভয় পেয়ে বলল, "বউ, কেন তোমার শরীরের এরকম হাল?"

বউটি বলল, "আমাদের বাড়ির পেছনকার বাগানের গোটা কয়েক র‍্যাম্‌পিয়ন খেতে না পেলে আমি আর বাঁচব না।"

* এক ধরনের বারোমেসে বিদেশী গাছ। তার শেকড় খেতে খুব ভালো।

লোকটি তার বউকে খুব ভালোবাসত। তাই ভাবল 'বউকে তো মরতে দিতে পারি না। তার জন্যে গোটা কয়েক র‍্যাম্‌পিয়ন যেমন করে পারি নিয়ে আসবই।' সন্ধের ঝাপসা আলোয় সেই ডাইনির বাগানের পাঁচিল টপ্‌কে গিয়ে তাড়াহুড়ো করে এক মুঠো র‍্যাম্‌পিয়ন তুলে সে এনে দিল তার বউকে। সঙ্গে সঙ্গে তার বউ সেগুলো দিয়ে স্যালাড বানিয়ে খুব তারিয়ে-তারিয়ে খেল। বউটির এত ভালো লেগেছিল যে পরের দিন র‍্যাম্‌পিয়ন খাবার লোভ তার বেড়ে গেল তিনগুণ। তার বর আবার পাঁচিল টপ্‌কে গিয়ে তার জন্যে আর কিছু র‍্যাম্‌পিয়ন এনে দিল।

তার পর দিন সন্ধেয় আবার সে গেছে বাগানে—এমন সময় সেই ডাইনির সঙ্গে তার একেবারে মুখোমুখি দেখা। ডাইনিকে দেখে ভয়ে তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগল।

তার দিকে কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে ডাইনি বললে, "তোমার সাহস তো কম না—আমার বাগান থেকে চোরের মতো র‍্যাম্‌পিয়ন চুরি করা। দাঁড়াও তোমায় মজা দেখাচ্ছি।"

লোকটি বলল, "দোহাই তোমার, আমার প্রতি সদয় হও। এখানে না এসে আমার উপায় ছিল না। জানলা দিয়ে আমার বউ তোমার র‍্যাম্‌পিয়নগুলো দেখে। দেখে খাবার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে। খেতে না পেলে সে বাঁচত না।"

তার কথাগুলো শুনে ডাইনির রাগ খানিক কমল। সে বলল, "বেশ—তাই যদি হয় যত খুশি র‍্যাম্‌পিয়ন নিয়ে যেতে পার। কিন্তু একটা শর্তে—তোমার বউয়ের ছেলেপুলে হলে আমাকে দিয়ে দিতে হবে। তাকে আমি মানুষ করব।"

লোকটি দারুণ ঘাবড়ে গিয়েছিল। তাই ডাইনির শর্তে রাজি হয়ে গেল। যথা সময়ে তার বউয়ের একটি মেয়ে জন্মাল। সঙ্গে সঙ্গে ডাইনি হাজির হয়ে মেয়েটির নাম দিল, 'র‍্যাম্‌পিয়ন'। তার পর তাকে নিয়ে চলে গেল।

ভারি সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে র‍্যাম্‌পিয়ন। মেয়েটির যখন বারো বছর বয়েস বনের মধ্যে এক উঁচু দুর্গে তাকে বন্দী করে রাখল ডাইনি। সেই দুর্গে কোনো সিঁড়ি বা দরজা ছিল না। থাকবার মধ্যে ছিল শুধু

ছোট্টো একটা জানলা। সেই দুর্গের উপর ওঠবার দরকার হলে ডাইনি নীচে দাঁড়িয়ে বলত :

"র‍্যাম্‌পিয়ন, র‍্যাম্‌পিয়ন
তোমার চুল খুলে দাও।"

র‍্যাম্‌পিয়নের ছিল ভারি সুন্দর সোনালী লম্বা চুল। কথাগুলো শুনলেই র‍্যাম্‌পিয়ন তার বিনুনিগুলো খুলে পর্দার আংটায় জড়িয়ে জানলা দিয়ে কুড়ি হাত নীচে ঝুলিয়ে দিত আর সেগুলো ধরে ডাইনি আসত উঠে।

বছর কয়েক বাদে একদিন রাজার বড়ো ছেলে ঘোড়ায় চড়ে সেই বনের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে দুর্গটার কাছে পৌঁছল। সেটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার কানে ভেসে এল ভারি মিষ্টি সুরের গান। গানটা শোনার জন্য সে থামল। নিঃসঙ্গ সময় কাটাবার জন্য গান গাইছিল র‍্যাম্‌পিয়ন।

রাজপুত্রের খুব ইচ্ছে হল উপরে উঠে মেয়েটিকে দেখতে। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও দুর্গের কোনো দরজা তার চোখে পড়ল না। ঘোড়ায় চড়ে সে বাড়ি ফিরল। কিন্তু গানের সেই মিষ্টি সুর সে কিছুতেই ভুলতে পারল না। সেটা শোনার জন্য প্রতিদিন সে যেতে লাগল সেই বনে। একদিন একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে গান শুনছে—এমন সময় সেই ডাইনিকে এসে সে বলতে শুনল :

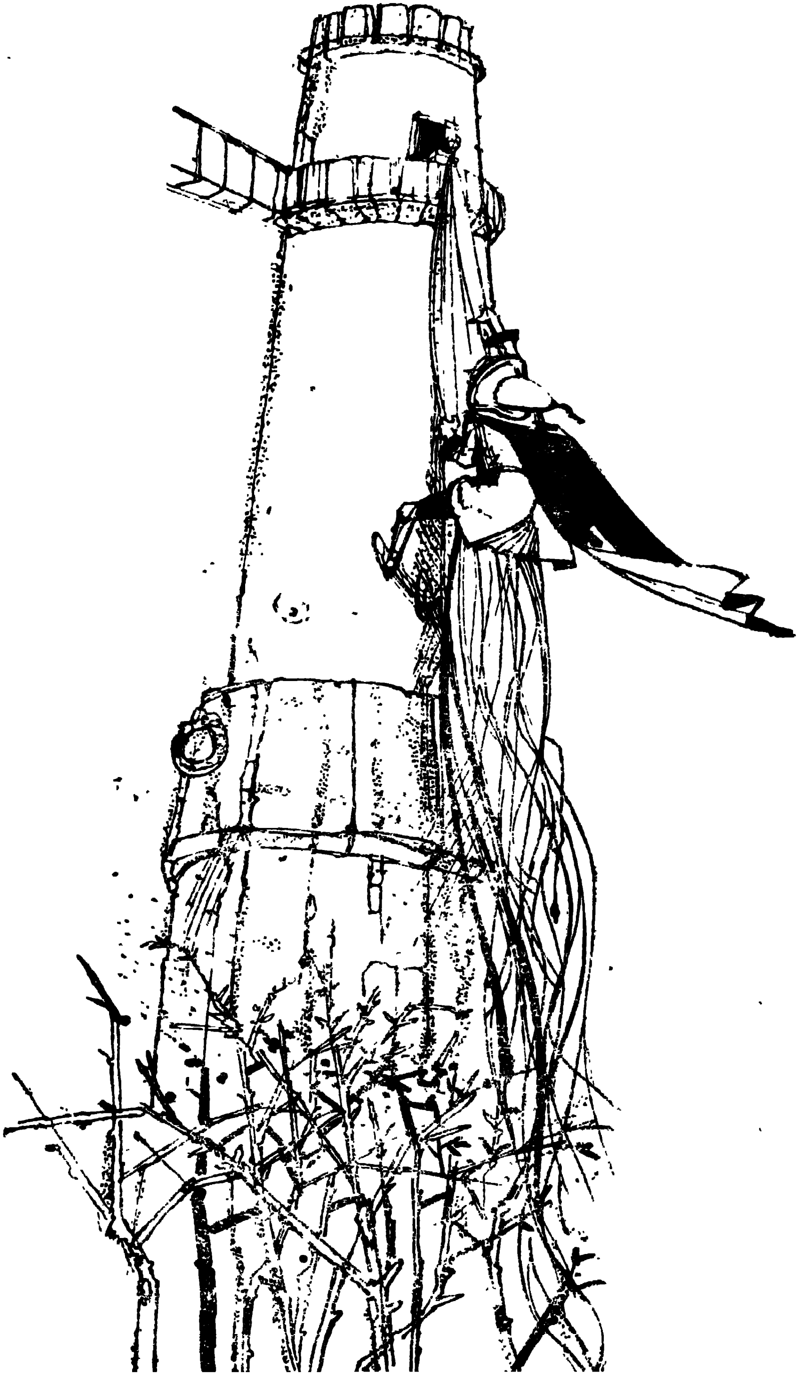
"র‍্যাম্‌পিয়ন, র‍্যাম্‌পিয়ন,
তোমার চুল খুলে দাও।"

সঙ্গে সঙ্গে সে দেখল সেই বিনুনিগুলো ঝুলে পড়তে আর সেগুলো ধরে ডাইনিকে উপরে উঠে যেতে।

রাজপুত্র মনে মনে বলল, 'এই মই দিয়ে ওপরে উঠতে হয় দেখছি। পরের বার আমিও চেষ্টা করে দেখব।'

পরদিন—তখন সন্ধে হয়ে আসছে—রাজপুত্র সেই দুর্গের কাছে গিয়ে বলল :

"র‍্যাম্‌পিয়ন, র‍্যাম্‌পিয়ন,
তোমার চুল খুলে দাও।"





সঙ্গে সঙ্গে সেই বিনুনিগুলো ঝুলে পড়ল আর সেগুলো ধরে উঠে এল রাজপুত্র।

একজন পুরুষ মানুষকে উঠে আসতে দেখে র‍্যাম্‌পিয়ন প্রথমটায় দারুণ ভয় পেয়ে গেল। কারণ আগে কখনো কোনো পুরুষ মানুষকে সে দেখে নি। কিন্তু রাজপুত্রকে মিষ্টি হেসে সে যখন বলতে শুনল—তার গান শুনে সে মোহিত হয়েছে, তাকে দেখবার জন্য মন তার আকুলি-বিকুলি করছে—তখন র‍্যাম্‌পিয়নের সব লজ্জা ভয় কেটে গেল। রাজপুত্র জিগ্‌গেস করল তাকে সে বিয়ে করতে রাজি কি না। র‍্যাম্‌পিয়ন দেখল রাজপুত্র বয়সে তরুণ আর দেখতেও খুব সুন্দর। তার মনে হল, বুড়ি ডাইনির চেয়ে নিশ্চয়ই আমাকে সে অনেক বেশি ভালোবাসবে। তার হাতে হাত রেখে র‍্যাম্‌পিয়ন তাই বলে উঠল, "হ্যাঁ, খুব রাজি। সানন্দেই তোমার সঙ্গে যাব। কিন্তু এখান থেকে নামি কী করে? প্রতিবার তুমি যখন আসবে সঙ্গে এনো খানিকটা করে রেশম। সেটা পাকিয়ে আমি একটা মই বানাতে শুরু করব। মই শেষ হলে সেটা বেয়ে আমি নেমে আসব। তখন তোমার ঘোড়ায় আমাকে তুমি নিয়ে যেতে পারবে।

ঠিক হল রাজপুত্র আসবে রোজ সন্ধেয়। কারণ বুড়ি ডাইনি আসে দিনের বেলায়।

প্রথমটায় ডাইনি কিছুই টের পেল না। কিন্তু একদিন র‍্যাম্‌পিয়ন তাকে প্রশ্ন করল, "মাদাম গথেল! তোমাকে টেনে তুলতে অত কষ্ট হয় কেন? রাজপুত্তুর তো চক্ষের নিমেষে উঠে আসে?"

শুনে ডাইনি ব্যাপারটা বুঝল। দারুণ রেগে সে চেঁচিয়ে উঠল, "শয়তান মেয়ে, বলছিস কী? আমার ধারণা ছিল তোকে আমি সবাইকার কাছ থেকে আলাদা করে রেখেছি—আর এদিকে তুই কিনা আমায় ঠকিয়ে চলেছিস!" এই-না বলে ভীষণ রেগে তার সুন্দর চুলের গোছা বাঁ হাতে জড়িয়ে ডান হাতে একটা কাঁচি ধরে সেই ডাইনি কুচ্‌কুচ্‌ করে কেটে দিল। সেই লম্বা চুলের গোছাগুলো পড়ল মেঝেয় লুটিয়ে। ডাইনির স্বভাবটা ছিল ভারি নিষ্ঠুর। তাই সেখান থেকে সরিয়ে একটা মরুভূমির মধ্যে নিয়ে গিয়ে সে রাখল র‍্যাম্‌পিয়নকে। সেখানে ভারি কষ্টে তার দিন কাটে।

র‍্যাম্‌পিয়নকে মরুভূমিতে রেখে এসে সেদিনই ডাইনি সেই কাটা

বিনুনিগুলো পর্দার আংটায় জড়াল আর সন্ধেয় রাজপুত্র এসে বলল :

"র‍্যাম্‌পিয়ন, র‍্যাম্‌পিয়ন,
তোমার চুল খুলে দাও।"

তখুনি সে ঝুলিয়ে দিল বিনুনিগুলো।

উপরে উঠে রাজপুত্র দেখে র‍্যাম্‌পিয়নের জায়গায় রয়েছে এক বুড়ি ডাইনি। ভীষণ রেগে হিস্‌হিস্‌ করতে করতে ডাইনি বলল, "হা-হা! তুমি দেখছি এসেছ তোমার বউকে নিয়ে যেতে! কিন্তু সেই সুন্দর পাখিটা এখন আর তার বাসায় বসে গান গাইছে না। একটা বেড়াল এসে তাকে নিয়ে গেছে। সাবধান না হলে বেড়ালটা তোমার চোখদুটো উপড়ে ফেলবে। র‍্যাম্‌পিয়নের দেখা জীবনে আর পাবে না।"

দুঃখে-শোকে পাগল হয়ে রাজপুত্র সেই দুর্গ থেকে ঝাঁপ দিল। প্রাণে সে বাঁচল বটে, কিন্তু ঝোপঝাড়ের কাঁটায় তার চোখদুটো উপড়ে গেল। অন্ধ হয়ে বনে বনে সে ঘুরে বেড়ায়। ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকে। আর র‍্যাম্‌পিয়নকে হারাবার জন্য সব সময় সে কাঁদে। এইভাবে এক বছর ঘুরে বেড়াবার পর শেষটায় একদিন সে পৌঁছল একটা মরুভূমিতে। সেই মরুভূমিতেই র‍্যাম্‌পিয়নের জন্মেছিল যমজ শিশু— একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ভারি দুঃখে-কষ্টে সেখানে তাদের দিন কাটছিল। সেখানে পৌঁছে রাজপুত্রের কানে ভেসে এল একটা স্বর। সেই স্বর শুনে এগিয়ে যেতে র‍্যাম্‌পিয়ন তাকে দেখতে পেল। আর দেখেই চিনল। দৌড়ে এসে রাজপুত্রের গলা জড়িয়ে ধরে সে কাঁদতে লাগল। তার দু ফোঁটা চোখের জল পড়ল গিয়ে রাজপুত্রের অন্ধ দুই চোখে। আর সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্র ফিরে পেল তার দৃষ্টিশক্তি। আগের মতো ভালো হয়ে গেল তার দু চোখ। নিজের রাজত্বে নিয়ে গেল সে র‍্যাম্‌পিয়নকে। সমস্ত রাজ্য জুড়ে আনন্দের বাণ ডাকল। আর তার পর অনেক বছর ধরে রইল তারা সুখে-শান্তিতে।

বাদামগাছ

সে আজ অনেক কাল আগেকার কথা—মনে হয় ডজন দুয়েক বছর আগেকার। এক ছিল ধনী লোক আর তার ছিল এক বউ। বউটি যেমন রূপের তেমনি গুণের। তারা দুজনেই দুজনকে খুব ভালোবাসত। কিন্তু তাদের কোনো ছেলেপুলে না থাকায় বউটি দিনরাত মনের দুঃখে গুমরে-গুমরে থাকত। তবু তাদের সংসারে কোনো শিশু এল না। তাদের বাড়ির সামনে ছিল এক আঙিনা আর সেই আঙিনায় একটা বাদামগাছ। শীতকালে একদিন সেই বউ গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে একটা বাদাম পাড়ল। বাদামটার খোসা ছাড়াতে গিয়ে কেটে গেল তার একটা আঙুল। আর সেই আঙুল থেকে টপ্‌টপ্‌ করে রক্ত ঝরল তুষারের উপর। সেই রক্ত দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বউটি বলল, "এই রক্তের মতো লাল আর তুষারের মতো সাদা আমার যদি কোনো সন্তান থাকত—!" কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ তার মন আনন্দে ভরে উঠল। তার মনে হল সত্যিই বুঝি তার কোলে শিশু আসবে। তার পর সে চলে গেল বাড়ির মধ্যে। এক মাস কাটল, তুষার গলল। দু মাস পরে পৃথিবী হয়ে উঠল সবুজ। তিন মাস পর ফুল ফুটল, পাখিরা উঠল গান গেয়ে। চার মাস পর আঙিনাময় সব গাছে ঘন সবুজ পাতা, ফুলে ফুলে ঢেকে গেল ডালপালা। আঙিনাময় শুধু পাখির ডাকের প্রতিধ্বনি। গাছের ডাল থেকে বৃষ্টির মতো ঝরতে লাগল ফুলের পাপড়ি। পাঁচ মাসের মাস বউটি দাঁড়াল গিয়ে সেই বাদামগাছের তলায় আর সুগন্ধের আমেজে আনন্দে কানায়-কানায় ভরে উঠল তার হৃদয়। নতজানু হয়ে বসে

ঈশ্বরকে সে জানাল ধন্যবাদ। পঞ্চম মাস শেষ হবার পর গাছে গাছে ফল পেকে রসে ভারী হয়ে লাগল ঝুলতে। আর বউটি হয়ে উঠল আগের চেয়ে শান্ত। সপ্তম মাসে সেই বাদামগাছের ফল এমন আগ্রহ নিয়ে সে খেতে শুরু করল যে, তার মন হয়ে উঠল বিষণ্ণ আর শরীর খারাপ। আট মাসের মাস বরকে সে বলল, "আমি যদি মরে যাই তা হলে ঐ বাদামগাছের তলায় আমাকে কবর দিয়ো।" কথাটা বলে মনে হল সে শান্তি পেয়েছে। আবার সে হয়ে উঠল হাসিখুশি। আর ন মাসের মাস তার কোলে এল এক শিশু—তুষারের মতো সাদা, রক্তের মতো টুকটুকে। শিশুটিকে দেখে তার এত আনন্দ হল যে, আনন্দের আবেগে তার হল মৃত্যু।

বর তাকে সেই বাদামগাছের তলায় কবর দিয়ে অনেকদিন তার জন্য খুব কান্নাকাটি করল। কিন্তু শেষটায় তার মনের ফুর্তি আবার ফিরে এল—আবার সে বিয়ে করল। এই দ্বিতীয় বউয়ের হল একটি মেয়ে। প্রথম বউয়ের সন্তানটি ছেলে— তুষারের মতো ফরসা আর রক্তের মতো টুকটুকে। দ্বিতীয় বউ তার ছোটো মেয়ের দিকে তাকালে তার মনে হত নিজের মেয়েকে সে খুব ভালোবাসে। কিন্তু ছেলেটির দিকে তাকালে তার মনে কোনো আনন্দ জাগত না। দ্বিতীয় বউ ভাবত ছেলেটি তার মেয়েকে বঞ্চিত করে বাপের সব সম্পত্তি পাবে। এই কথা ভাবতে ভাবতে শেষটায় ছোট্টো ছেলেটিকে সে ঘৃণা করতে শুরু করল। তাকে সে চড়চাপড় মেরে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত। ফলে ছোট্টো ছেলেটি তাকে ভীষণ ভয় পেত। ইস্কুল থেকে ফিরে বুঝতে পারত না কোন্ নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নেওয়া যায়।

একদিন দ্বিতীয় বউ যখন তার ঘরে গেছে তার ছোট্টো মেয়ে তার কাছে দৌড়ে গিয়ে বলল, "আমাকে একটা আপেল দাও।"

"এই নে বাছা", বলে তার মা তাকে দিল একটা বাক্স করে সুন্দর একটা আপেল। বাক্সর ডালাটা খুব ভারী, ডালাটায় ধারাল দাঁত।"

মেয়েটি বলল, "মা, আমার ছোট্টো ভাইটিকে একটা আপেল দেবে না?"

মেয়েটির কথা শুনে দ্বিতীয় বউয়ের মুখ রাগে টকটকে হয়ে উঠল। কিন্তু মেয়েকে সে বলল, "ইস্কুল থেকে ফিরলে তাকে দেব।" কথাটা বলতে বলতে সে দেখল ছেলেটি ইস্কুল থেকে ফিরছে। মেয়ের কাছ

থেকে আপেলটা ছিনিয়ে নিয়ে সে বলে উঠল, "তোর ভাইকে এটা দিলে তুই কিন্তু পাবি না।" "এই-না বলে দ্বিতীয় বউ আপেলটা বাক্সয় ভরে ডালা বন্ধ করে দিল। ছোট্টো ছেলেটি দোরগোড়ায় এলে শয়তান বউ নকল মধুর গলায় তাকে বলল, "বাছা, তুই একটা আপেল নিবি ?"

ছেলেটি বলল, "মা। তোমার মুখটা ভয়ংকর রাগী-রাগী দেখাচ্ছে ! হ্যাঁ, আমাকে আপেল দাও।"

বাক্সর ডালাটা তুলে তার সৎমা বলল, "নিবি তো এখানে আয় ! —বাক্স থেকে আপেলটা বার করে নে।" আর ছোট্টো ছেলেটি আপেল নেবার জন্য যেই-না বাক্সর মধ্যে মাথা ঢুকিয়েছে, অমনি তার সৎমা সজোরে ডালাটা দিল বন্ধ করে। খুট্ শব্দ করে ধারাল দাঁতওয়ালা ডালাটা হয়ে গেল বন্ধ। আর সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটির মুণ্ডু গড়িয়ে পড়ল আপেলটার পাশে। তার পর সে যা করেছে সে কথা জানাজানি হয়ে যেতে পারে ভেবে বউ পড়ল দারুণ উৎকণ্ঠায়। ড্রয়ার হাতড়ে সে বার করল খানিকটা স্টিকিং প্লাস্টার আর একটা রুমাল। ছেলেটির ধড়ে তার মুণ্ডুটা বসিয়ে সে তার গলাটা জড়িয়ে দিল কাপড় দিয়ে যাতে জোড়ের জায়গাটা দেখা না যায়। তার পর দরজার সামনে তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে আপেলটা তার হাতে রাখল।

ছোট্টো মেয়েটির নাম মার্‌লিঙ্কা। খানিক পরে রান্নাঘরে গেল সে তার মায়ের কাছে। উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড একটা পাত্রের মধ্যে গরম জল সে নাড়াচ্ছিল।

মার্‌লিঙ্কা বলল, "মা, দরজার সামনে ভাইটি বসে আছে। মুখটা ভয়ানক ফ্যাকাশে। হাতে একটা আপেল। আমায় সেটা দিতে বললাম। কিন্তু সে কোনো উত্তরই দিল না। তাই আমার গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল।"

তার মা বলল, "আবার যা। এবার সে উত্তর না দিলে তার কান মুলে দিস।"

তাই মার্‌লিঙ্কা আবার গিয়ে বলল, "ভাইটি, আমাকে আপেলটা দাও।"

কিন্তু তখনো চুপচাপ থাকতে দেখে মেয়েটি তার কান মুলে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে দারুণ আতঙ্কে সে দেখল ভাইয়ের মাথাটা খসে পড়েছে। তাই-না দেখে গলা ছেড়ে সে লাগল চেঁচাতে। তার পর চেঁচাতে চেঁচাতে

তার মার কাছে দৌড়ে গিয়ে সে বলল, "মা, মা, ভাইয়ের মুণ্ডুটা আমি খসিয়ে ফেলেছি!" বলে ক্রমাগত চলল কেঁদে। তার কান্না আর থামতেই চাইল না।

তার মা বলল, "মার্লিঙ্কা, এটা খুব বিপদের কথা। কিন্তু অমন হৈ চৈ করিস না। তোর ভাইয়ের কী হয়েছে সে কথা কাউকে জানাতে দেওয়া ঠিক হবে না। আমি তাকে দিয়ে স্টু বানিয়ে ফেলেছি।" এই-না বলে, তার মা ছেলেটিকে কুচিকুচি করে কেটে সেই গরম জলের পাত্রে ফেলে তাকে দিয়ে স্টু বানায়। আর মার্লিঙ্কা তার মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে চলল কেঁদে। সেই পাত্রে ঝরঝর করে ঝরল তার চোখের জল। তাই সেই স্টু-তে নুন দেবার দরকার হল না।

তার পর বাবা এসে খাবার টেবিলের সামনে বসে প্রশ্ন করল, "আমার ছেলে কোথায়?" তার দ্বিতীয় বউ চামচে করে অনেকটা স্টু তুলল আর মার্লিঙ্কা চলল কেঁদে। বাবা আবার প্রশ্ন করল, "আমার ছেলে কোথায়?"

তার দ্বিতীয় বউ বলল, "সে গ্রামে গেছে তার দাদামশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে। কিছুদিন সেখানে থাকবে।"

"আমাকে না বলেই চলে গেল।"

দ্বিতীয় বউ বলল, "যাবার জন্যে ভারি সে ঝোঁক ধরেছিল। তোমায় বলতে বলেছে, বেশ কিছুদিন সে ফিরবে না।"

তার বর বলল, "সে যাওয়ায় আমি খুব দুঃখিত হয়েছি। আমাকে অন্তত বলে যাওয়া উচিত ছিল।" তার পর তৃপ্তি করে খেতে খেতে সে বলল, "মার্লিঙ্কা, তুই কাঁদছিস কেন? ভাই নিশ্চয়ই ফিরে আসবে।" আরো খানিক পরে সে বলল, "বউ, ভারি সুন্দর স্বাদ হয়েছে! আমাকে আরো খানিকটা দাও।" দ্বিতীয়বার স্টু নিয়েও তার তৃপ্তি হল না। কারণ যত সে খায়, তার ক্ষিদে ততই বাড়ে। "এমন তৃপ্তি করে কখনো খাই নি", বলে খেতে খেতে টেবিলের তলায় হাড়গুলো সে ফেলতে লাগল। তার বাবা সব স্টু শেষ করার পর মার্লিঙ্কা তার দেরাজের কাছে গিয়ে সিল্কের সব চেয়ে ভালো রুমালটা বার করে টেবিলের তলা থেকে সব হাড় আর ছিবড়েগুলো কুড়িয়ে সেগুলো জড়িয়ে রাখল। তার পর কাঁদতে কাঁদতে সেগুলো নিয়ে গেল আঙিনায়। সেই বাদাম গাছটার তলায় সবুজ ঘাসের উপর সে রাখল পুঁটলিটা আর রাখবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ মন তার হয়ে উঠল অনেক হাল্কা, কান্না গেল থেমে। ধীরে ধীরে দুলতে শুরু করল

বাদামগাছটি। তার পর সেটার ডালপালা উঠল আগুনের মতো ঝলসে। আর সেই আগুনের মধ্যে থেকে ভারি চমৎকার গান গাইতে-গাইতে উড়ে গেল সুন্দর একটি পাখি। পাখিটি আকাশের অনেক উঁচুতে ঘুরে ঘুরে উড়ল। আর সেটি চ'লে যাবার পর বাদামগাছ হয়ে উঠল আগেকার মতো। আর হাড়-জড়ানো সেই রুমালটা হল অদৃশ্য। মার্‌লিঙ্কা মনে শান্তি পেল। এমন খুশি হয়ে উঠল যেন তার ভাই বেঁচে রয়েছে। হাসিমুখে সে আবার বাড়ি ফিরল আর খেল তার রাতের খাবার।

পাখিটা উড়ে গিয়ে এক স্যাকরার বাড়ির ছাতে বসে গাইতে লাগল।

"সৎমা আমায় মেরেছে,
বাবা আমায় খেয়েছে।
মার্‌লিঙ্কা বোনটি
আমার হাড় কুড়িয়ে
সিল্ক-রুমাল মুড়িয়ে
বাদাম তলায়
—রেখেছে।
কুহু-কুহু পিউ-পিউ
আমার মতো সোনার পাখি
কেউ কখনো
—দেখেছে?"

স্যাকরা তার কারখানায় বসে একটা সোনার হার গড়ছিল। এমন সময় তার ছাতে পাখিটির গান শুনে সে মুগ্ধ হল। তার পর উঠে ঘরের চৌকাঠ পার হতে গিয়ে সে হারিয়ে ফেলল তার কাজের একটা যন্ত্র। সেই যন্ত্রটা অন্য লোকের কাছে ধার করে আনার জন্য সে বেরুল পথে। তার পোশাকের উপর ছিল 'এপ্রন' আর হাতে সেই সোনার হারছড়া। পথে তখন রোদ ঝলমল করছিল। পাখিটিকে দেখার জন্য থেমে উপর দিকে তাকিয়ে সে বলল, "ভারি মিষ্টি গান গাইছিস, পাখি। আর একবার গেয়ে শোনাবি?"

পাখি বলল, "না, এক গান দু বার আমি গাই না। তবে সোনার ঐ হারছড়া দিলে গানটা আবার গাইতে পারি।"

হারছড়াটা তাকে দিয়ে স্যাকরা বলল, "এই নে। গানটা আর-এক বার গেয়ে শোনা।"

নেমে এসে হারছড়া নিয়ে পাখি আবার গেয়ে উঠল :

"সৎমা আমায় মেরেছে,
বাবা আমায় খেয়েছে।
মার্‌লিঙ্কা বোনটি
আমার হাড় কুড়িয়ে
সিল্ক-রুমালে মুড়িয়ে
বাদাম তলায়
—রেখেছে।
কুহু-কুহু পিউ-পিউ
আমার মতো সোনার পাখি
কেউ কখনো
—দেখেছে?"

গান গেয়ে পাখিটি উড়ে এক মুচির বাড়ির ছাতে বসে গেয়ে উঠল :

"সৎমা আমায় মেরেছে,
বাবা আমায় খেয়েছে।
মার্‌লিঙ্কা বোনটি
আমার হাড় কুড়িয়ে
সিল্ক-রুমাল মুড়িয়ে
বাদাম তলায়
—রেখেছে।
কুহু-কুহু পিউ-পিউ
আমার মতো সোনার পাখি
কেউ কখনো
—দেখেছে?"

গান শুনে লাফিয়ে উঠে মুচি ঘর থেকে বেরুল। রোদ চোখ-ধাঁধানো ঝলমলে বলে হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে ছাতের দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, "পাখি, কী সুন্দর মিষ্টি গান রে!" তার পর আবার দৌড়ে বাড়ির মধ্যে গিয়ে সে ডাকতে লাগল, "বউ—অ বউ—

একবারটি এখানে এসে পাখিটিকে দেখো। কী সুন্দর গাইছে! এমন গান কখনো শুনি নি।”

তার হাঁক-ডাক শুনে রাস্তায় বেরিয়ে এল তার বউ, ছেলেমেয়ে, চাকর-বাকর আর পাড়া-পড়শি সবাই। তারা দেখে, মুচির বাড়ির ছাতে বসে রয়েছে ভারি সুন্দর একটি পাখি। তার ডানা সবুজ আর লাল। গলায় সোনার হার। চোখদুটো তারার মতো জ্বলজ্বলে।

মুচি অনুনয় করে বলল, “যে-গানটা গাইলি, আর-এক বার সে-গানটা গা।”

পাখি বলল, “না, বিনা দামে এক গান দু বার গাই না। আগে আমায় একটা উপহার দাও।”

মুচি বলল, “বউ, গোলাবাড়িতে যাও। সেখানকার তাকে দেখবে এক জোড়া লাল জুতো। সেগুলো নিয়ে এসো।” তার বউ জুতো জোড়া নিয়ে এলে মুচি বলল, “পাখি, এই নে। এবার গানটা আর-এক বার গেয়ে শোনা।”

পাখি নেমে এসে বাঁ পা দিয়ে জুতোজোড়া নিয়ে আবার ছাতে উড়ে গিয়ে বসে গাইতে লাগল :

“সৎমা আমায় মেরেছে,
বাবা আমায় খেয়েছে।
মার্‌লিন্কা বোনটি
আমার হাড় কুড়িয়ে
সিল্ক-রুমাল মুড়িয়ে
বাদাম তলায়
—রেখেছে।
কুহু-কুহু পিউ-পিউ
আমার মতো সোনার পাখি
কেউ কখনো
—দেখেছে?”

গান শেষ করে পাখিটি উড়ে গেল। তার বাঁ পায়ে ধরা সোনার হারছড়া, ডান পায়ে লাল জুতোজোড়া। তার পর সে নামল এক জাঁতাকলের সামনেকার বাতাবি লেবুর গাছের ডালে। জাঁতাকলের মধ্যে

কুড়িজন তরুণ ছেলে পাথর কাটছিল। শব্দ হচ্ছিল খুট্ খুট্ খটাখট্। তাদের হাতুড়ির বাড়িতে শব্দ হচ্ছিল : ঠুক্ ঠুক্, ধকাধক্।

সেই বাতাবিলেবুর গাছের ডালে বসে পাখিটি গেয়ে উঠল :

"সৎমা আমায় মেরেছে,"

শুনেই একটি ছেলে কান খাড়া করে রইল—

"বাবা আমায় খেয়েছে!"

দুজন ছেলে তখন দাঁড়িয়ে উঠল গান শোনার জন্য—

"মারলিঙ্কা বোনটি"

তখন আরো চারজন ছেলে পাথর কাটা বন্ধ করল—

"আমার হাড় কুড়িয়ে
সিল্ক-রুমাল মুড়িয়ে"

আটজন ছেলে শুধু তখন কাজ কর'ছ—

"বাদাম তলায়"

সাতজন ছেলে তখন হাতুড়ি ঠোকা বন্ধ করল—

"—রেখেছে।"

নজন কাজ বন্ধ করল—

"কুহু-কুহু পিউ-পিউ
আমার মতো সোনার পাখি
কেউ কখনো
—দেখেছে?"

শেষ ছেলেটি এবার কাজ বন্ধ করে গান শুনে বলল, "ভারি মিষ্টি গান গাইছিলি পাখি। আর-এক বার গেয়ে শোনাবি?"

পাখি বলল, "না, বিনা দামে এক গান দু বার গাই না। তোমাদের জাঁতা-পাথরটা দিলে আবার আমি গাইব।"

ছেলেটি বলল, "আবার গাইলে নিশ্চয়ই সেটা দেব।"

পাখি তখন নেমে এল। জাঁতাওয়ালা আর সেই কুড়িজন তরুণ পাথরটা ধরাধরি করে তুলল। পাথরের মাঝখানের গর্তে মাথা গলিয়ে মাফ্লারের মতো সেটা গলায় পরে আবার বাতাবিলেবুর ডালে উড়ে গিয়ে বসে সে গাইতে লাগল :

"সৎমা আমায় মেরেছে,
বাবা আমায় খেয়েছে!

মারলিঙ্কা বোনটি
আমার হাড় কুড়িয়ে
সিল্ক-রুমালে মুড়িয়ে
বাদাম তলায়
—রেখেছে।
কুহু-কুহু পিউ-পিউ
আমার মতো সোনার পাখি
কেউ কখনো
—দেখেছে?"

গান শেষ হলে তাদের কাছে বিদায় নিয়ে সে উড়ে চলল সোজা তার বাবার বাড়িতে। সোনার হারছড়া তার ডান পায়ে, লাল জুতো-জোড়া তার বাঁ পায়ে আর গলায় ঝোলান সেই জাঁতা-পাথরটা।

তার বাবা, সৎমা আর মারলিঙ্কা খাবার ঘরে বসে তখন ডিনার খাচ্ছিল।

বাবা বলল, "কেন জানি না আমার মনটা আজ কেমন যেন হালকা আর ফুর্তি-ফুর্তি লাগছে।"

সৎমা বলল, "তাই নাকি? আমার কিন্তু লাগছে ঠিক উলটো। মনে হচ্ছে একটা যেন কালবৈশাখী ঘনিয়ে আসছে।"

মারলিঙ্কার কান্না থামতে চাইল না। আর ঠিক সেই সময় পাখিটি উড়ে এসে বসল তাদের ছাতে।

বাবা বলল, "আমার ভারি ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে বুঝি কোনো পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে।

তার দ্বিতীয় বউ বলল, "তাই নাকি? আমার তো দাঁতে দাঁতে লেগে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে রক্তে আগুন ধরেছে।" এই-না বলে টেবিল ছেড়ে সে উঠে পড়ল। মারলিঙ্কা আগেই উঠে গিয়েছিল। এক কোণে দাঁড়িয়ে দুই বিনুনি দিয়ে চোখ ঢেকে এমন কান্না সে কাঁদছিল যে, চোখের জলে সপসপে হয়ে ভিজে উঠেছিল বিনুনি দুটো।

পাখি তখন সেই বাদামগাছে বসে গেয়ে উঠল:

"সৎমা আমায় মেরেছে,"

গান শুনে সৎমা দু হাতে কান চেপে বলল—তার কানের মধ্যে

যেন জলপ্রপাতের গর্জন, চোখ দুটো জ্বলছে আর যেন দেখছে সাপের মতো আঁকাবাঁকা বিদ্যুতের ঝিলিক।

"বাবা আমায় খেয়েছে,"

লোকটি বলে উঠল, "শুনছ গো! একটা পাখি কী চমৎকার গাইছে। সূর্য ঝলমল করছে। পাখিটা তার আনন্দ চাপতে পারছে না।"

"মার্লিঙ্কা বোনটি"

মার্লিঙ্কা তখন মুখ তুলে চোখ মুছল।

তার বাবা বলল, "কাছে গিয়ে দেখতেই হবে পাখিটা কী রকম।"

তার দ্বিতীয় বউ চেঁচিয়ে উঠল, "না-না, যেয়ো না! মনে হচ্ছে সমস্ত বাড়িটা যেন দাউ-দাউ করে জ্বলছে।"

কিন্তু তার বর গেল পাখিকে দেখতে আর পাখি গেয়ে চলল :

"আমার হাড় কুড়িয়ে
সিল্ক-রুমালে মুড়িয়ে
বাদাম তলায়
—রেখেছে।
কুহু-কুহু পিউ-পিউ
আমার মতো সোনার পাখি
কেউ কখনো
—দেখেছে?"

শেষ কথাগুলো বলে পাখি সেই সোনার হারছড়া ফেলে দিল। সেটা লোকটির গলায় একেবারে মানানসই হয়ে পড়ল। বাড়ির মধ্যে গিয়ে সে বলল, "দেখো, দেখো—সুন্দর পাখিটা আমায় কেমন চমৎকার সোনার একছড়া হার উপহার দিয়েছে।"

তার বউয়ের মানসিক উত্তেজনা তখন কিন্তু বেড়ে গিয়েছিল। মেঝেয় সে পড়ে গেল। খসে গেল তার মাথার পাতলা টুপি। পাখি গেয়ে চলল :

"সৎমা আমায় মেরেছে—"

সৎমা চেঁচিয়ে উঠল, "দশ গজ তুলো যদি আমার কানে গুঁজতে পারতাম! আর শুনতে পারছি না।"

"বাবা আমায় খেয়েছে—"

সৎমা মেঝেয় গড়াগড়ি খেতে লাগল।

"মার্‌লিঙ্কা বোনটি—"

মার্‌লিঙ্কা বলে উঠল, "আমিও বাইরে গিয়ে দেখি—পাখি আমায় কিছু দেয় কি না।" এই-না বলে সে বেরিয়ে এল।

"আমার হাড় কুড়িয়ে
সিল্ক-রুমালে মুড়িয়ে"

সেই লাল জুতোজোড়া নীচে ফেলে দিল পাখি।

"বাদাম তলায়
—রেখেছে।
কুহু-কুহু পিউ-পিউ
আমার মতো সোনার পাখি
কেউ কখনো
—দেখেছে?"

মার্‌লিঙ্কার মন হালকা খুশিতে ভরে উঠল। লাল জুতোজোড়া পরে সে শুরু করে দিল নাচতে। চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে সে বলতে লাগল, "যখন বেরিয়ে আসি তখন ভারি মনমরা হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু এখন আমি—খুশি-খুশি-খুশি। কারণ সোনার পাখি আমাকে দিয়েছে এই সুন্দর জুতোজোড়া।"

তার মা মেঝে থেকে উঠে চেঁচিয়ে উঠল, "কী অসহ্য গরম! আমি আর সইতে পারছি না। বাইরে বেরিয়ে দেখি ঠাণ্ডা হতে পারি কি না।"

কিন্তু যেই-না সে দরজার বাইরে বেরিয়েছে অমনি—দুম্‌। কারণ জাঁতা-পাথরটা পাখি তার মাথায় ছুঁড়ে ফেলল আর সঙ্গে সঙ্গে সৎমা গেল পড়ে মরে।

মার্‌লিঙ্কা আর তার বাবা শব্দটা শুনেছিল। ব্যাপারটা কী দেখার জন্য তারা বেরিয়ে এল। বেরিয়ে দেখে চার দিকে ঘন মেঘের মতো ধোঁয়া আর তার মধ্যে লকলক করছে আগুনের শিখা। সেই ধোঁয়ার মেঘ আর আগুনের শিখা মিলিয়ে যেতে তারা দেখে—কী আশ্চর্য! সামনে দাঁড়িয়ে মার্‌লিঙ্কার সেই হারিয়ে-যাওয়া ভাই। এক হাত সে বাড়িয়ে রয়েছে মার্‌লিঙ্কার দিকে, আর-একটি হাত তার বাবার দিকে।

তারা তিনজনে খুশি হয়ে বাড়ির মধ্যে গেল আর তার পর অনেক ভালো-ভালো খাবার নিয়ে বসল খেতে।



বনের তিনটি ছোট্টো মানুষ

অনেক দিন আগে একটি লোক ছিল। তার বউ গিয়েছিল মারা। আর ছিল এক বিধবা মহিলা। লোকটির একটি মেয়ে ছিল। বিধবারও ছিল একটি মেয়ে। এই দুটি মেয়ের বেশ ভাবসাব। এক সঙ্গে তারা বেড়াতে যেত। আর বেড়িয়ে ফিরে তারা যেত বিধবার বাড়িতে চা খেতে। একদিন সেই বিধবা লোকটির মেয়েকে বলল, "শোন, তোর বাবাকে গিয়ে বলিস আমি তাকে বিয়ে করতে চাই। বিয়ে হলে রোজ সকালে তুই দুধে চান করবি আর খেতে পাবি আঙুর-রসের মদ। কিন্তু আমার মেয়ে চান করবে জলে আর খাবে জল।" মেয়েটি বাড়ি ফিরে তার বাবাকে বিধবার কথাগুলো জানাল।

লোকটি বলল, "কী করা যায়? বিয়ে করাটা আনন্দের হতে পারে আবার যন্ত্রণার ব্যাপারও হতে পারে। শেষটায় মনস্থির করতে না পেরে নিজের পা থেকে একটা বুট খুলে মেয়েকে সে বলল, "এই বুটটা নে। এটার শুকতলায় একটা ফুটো আছে। এটা পায়ে দিয়ে মেঝেয় খানিক হাঁট। তার পর ঐ বড়ো পেরেকে ঝুলিয়ে এটার মধ্যে জল ঢাল। এটায় জল থাকলে আবার আমি বিয়ে করব। কিন্তু জল ঝরে গেলে বিয়ে করব না।"

মেয়েটি তার বাবার কথামতো কাজ করল। জল কিন্তু ঝরে গেল না। জলে বুজে গেল সেই ফুটো আর কানায়-কানায় ভরে উঠল

বুটটা। সে কথা মেয়েটি জানাতে তার বাবা নিজে গেল দেখতে। যখন দেখল মেয়েটির কথা ঠিক তখন সেই বিধবাকে বিয়ে করে সে নিয়ে এল।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠলে লোকটির মেয়েকে স্নানের জন্য দেওয়া হল দুধ আর খাবার জন্য আঙুর-রসের মদ। কিন্তু সেই বিধবার মেয়ের স্নানের আর খাবার জন্য ছিল শুধু জল। দ্বিতীয় সকালে স্নান করার জন্য দুটি মেয়েকেই দেওয়া হল শুধু জল। কিন্তু তৃতীয় দিন সকালে সেই লোকটির মেয়ের স্নান আর খাবার জন্য এল শুধু জল। আর বিধবার মেয়ের স্নানের জন্য এল দুধ, খাবার জন্য আঙুর-রসের মদ। এইভাবে দিন কাটে। ক্রমশ সেই বিধবার সৎ-মেয়ে হয়ে উঠল তার দু চক্ষের বিষ। তাকে এমন সে কষ্ট দিতে শুরু করল যার লেখাজোখা নেই। তার যত হিংসে গিয়ে পড়ল সেই মেয়েটির উপর। কারণ তার সৎমেয়ে ছিল সুন্দরী আর নিজের মেয়ে কুচ্ছিত।

তখন শীতকাল। বরফে ঢেকে গেছে পাহাড় আর উপত্যকা। এমন সময় একদিন কাগজের পোশাক বানিয়ে লোকটির মেয়েকে ডেকে সৎমা বলল, "এটা পরে বনে গিয়ে আমার জন্যে এক ঝুড়ি স্ট্রবেরি নিয়ে আয়—সেগুলো খেতে আমার খুব ইচ্ছে করছে।"

মেয়েটি আঁতকে উঠে বলল, "কী সর্বনাশ! শীতকালে স্ট্রবেরি ফলে না—মাটি এখন ঠাণ্ডায় জমে গেছে, বরফে সব-কিছু ঢাকা। তা ছাড়া কাগজের পোশাক পরে যাব কেন? বাইরে এমন ঠাণ্ডা যে নিশ্বেস পর্যন্ত জমে যায়। বাতাসে পোশাকটা যে ছিঁড়ে যাবে, ঝোপ-ঝাড়ের কাঁটায় গা থেকে এটা যে খসে পড়বে!"

তার সৎমা চেঁচিয়ে ধমকে উঠল, "তোর এত সাহস—আমার মুখে-মুখে চোপা করিস? এক্ষুনি বেরিয়ে পড়। স্ট্রবেরিতে ঝুড়িটা ভরার আগে তোর মুখ যেন না দেখি।" তার পর তাকে এক টুকরো বাসি রুটি দিয়ে বলল, "এই রইল তোর আজকের মতো খাবার।" আর মনে মনে ভাবল, 'বনের মধ্যে ক্ষিদেয় আর ঠাণ্ডায় নিশ্চয়ই মেয়েটা মরবে—ওর মুখ আমাকে আর দেখতে হবে না।'

মেয়েটি আর কোনো আপত্তি না করে কাগজের পোশাক পরে ঝুড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

চার দিকে শুধু বরফ আর বরফ। সবুজ ঘাসের একটা ডগাও চোখে পড়ে না। বনে পৌঁছে মেয়েটি দেখল ছোট্টো একটা বাড়ি আর তার ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে ছোট্টো তিনটি মানুষ, বনেই যাদের বাস। মেয়েটি তাদের শুভকামনা জানিয়ে ভয়ে-ভয়ে দরজায় টোকা দিল। তারা দরজা খুলে মেয়েটিকে নিয়ে গেল তাদের বসার ঘরে। মেয়েটি গিয়ে বসল উনুনের পাশে। ভাবল সেখানে শরীরটা সেঁকে নিয়ে রুটির টুকরোটা খাবে।

বনের সেই ছোট্টো তিনটি মানুষ বলল, "তোমার রুটি থেকে আমাদের খানিকটা দাও।"

মেয়েটি বলল, "নিশ্চয়ই।" রুটির টুকরো দু ভাগ করে অর্ধেকটা তাদের দিল মেয়েটি। তারা জানতে চাইল ঐরকম পাতলা পোশাকে এই শীতকালে বনের মধ্যে সে কী করছে?

মেয়েটি বলল, "আমাকে এক ঝুড়ি স্ট্রবেরি তুলতে হবে। না হলে বাড়ি ফেরা বারণ।"

মেয়েটির রুটি খাওয়া হলে একটা ঝাঁটা দিয়ে তাকে তারা বলল খিড়কি-দরজার সামনেকার তুষার ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করতে। মেয়েটি বাইরে যেতে সেই ছোট্টো তিনটি মানুষ আলোচনা করতে লাগল—তাকে কী বর দেওয়া যায়। কারণ তার স্বভাব ভারি মিষ্টি আর নম্র। আর রুটি ভাগ করে দেবার ব্যাপারে বোঝা গেছে মোটেই সে স্বার্থপর নয়।

প্রথমজন বলল, "আমি বর দিলাম—তার জীবনের সব দিন যেন আগের দিনের চেয়ে বেশি আনন্দময় হয়।"

দ্বিতীয়জন বলল, "আমি বর দিলাম—প্রতিটি কথার সঙ্গে তার মুখ দিয়ে যেন মোহর ঝরে।"

তৃতীয়জন বলল, "আমি বর দিলাম—এক রাজা এসে যেন তাকে বিয়ে করে।"

বনের সেই ছোট্টো তিনটি মানুষের কথামতো ঝাঁটা দিয়ে ঝেঁটিয়ে বরফ সরিয়ে মেয়েটি এক জায়গায় জড় করল। আর তার পর সে কী দেখল ভাবতে পার? দেখল—বরফের মধ্যে রয়েছে টুকটুকে লাল অজস্র পাকা স্ট্রবেরি। মনের আনন্দে ঝুড়ি ভরে, সেই ছোট্টো তিনটি মানুষের হাত ঝাঁকিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে, সৎমাকে খুশি করার

জন্য দৌড়ে সে বাড়ি ফিরল। যেই-না "শুভ সন্ধ্যা" বলার জন্য সে মুখ খুলেছে অমনি সোনার একটা মোহর গড়িয়ে পড়ল তার মুখ দিয়ে। বনের সব ঘটনার কথা সে জানাল আর তার প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে ঝরতে লাগল মোহর। দেখতে-দেখতে মোহরে-মোহরে ছেয়ে গেল সমস্ত মেঝে।

মুখ ঝামটা দিয়ে তার সৎবোন বলল, "দেমাকে একেবারে মট্‌মট্‌ করছেন—কথায়-কথায় মোহর ছড়ান!" কিন্তু মনে মনে হিংসেয় সে জ্বলতে-পুড়তে লাগল। তারও ইচ্ছে হল স্ট্রবেরির খোঁজে বনে যেতে।

তার কথা শুনে প্রথমটায় তার মা বলল, "না বাছা। এখন ভারি ঠাণ্ডা। গেলে হয়তো ঠাণ্ডায় জমে মারা পড়বি।" কিন্তু বায়নার জ্বালায় শেষপর্যন্ত তার মা রাজি হল। ফার-এর একটা মোটা কোট পরিয়ে পথে খাবার জন্য তার সঙ্গে দিল রুটি, মাখন আর কেক।

বনে পৌঁছে সৎবোন সোজা গিয়ে হাজির হল সেই ছোট্টো বাড়িতে। আবার সেই ছোট্টো তিনটি মানুষ উঁকি দিয়ে মুখ বাড়াল। কিন্তু তাকে কোনোরকম সাদর সম্ভাষণ জানাল না।

দরজায় টোকা না দিয়ে দড়াম্‌ করে দরজা খুলে সে ভিতরে গেল। তার পর তাদের অনুমতি না নিয়েই সোজা বসার ঘরে গিয়ে উনুনের পাশে বসে সে খেতে শুরু করল তার কেক রুটি আর মাখন। সেই ছোট্টো তিনটে মানুষ বলল, "আমাদের কিছুটা দাও।" সৎবোন বলল, "আমারই পেট ভরবে না—এর থেকে তোমাদের দি কী করে?"

সৎবোনের খাওয়া শেষ হলে তারা বলল, "ঝাঁটাটা নিয়ে খিড়কি-দরজার সামনেকার দুয়ার ঝেঁটিয়ে সরাও।"

শুনে সৎবোন খেঁকিয়ে উঠল, "তোমরা নিজেরা ঝাঁট দাও গে। আমি তোমাদের দাসী নই।" যখন সে দেখল তারা তাকে কিছুই দেবে না তখন বাড়ি থেকে সে বেরিয়ে পড়ল।

সৎবোন চলে যেতে সেই ছোট্টো তিনটি মানুষ আলোচনা করতে লাগল—তাকে কি অভিশাপ দেওয়া যায়। কারণ সে ভারি দাম্ভিক, অবাধ্য আর অভদ্র।

প্রথমজন বলল, "আমি অভিশাপ দিলাম—তার জীবনের সব দিন যেন আগের দিনের চেয়ে বেশি দুঃখের হয়।"

দ্বিতীয়জন বলল, "আমি অভিশাপ দিলাম—প্রতিটি কথার সঙ্গে তার মুখ দিয়ে যেন ব্যাঙ লাফিয়ে পড়ে।"

তৃতীয়জন বলল, "আমি অভিশাপ দিলাম—তার মৃত্যু যেন খুব দুঃখের হয়।"

সৎবোন স্ট্রবেরির জন্য অনেক খোঁজাখুঁজি করল, কিন্তু একটাও না পেয়ে দারুণ চটে সে বাড়ি ফিরল। তার মাকে সব কথা বলার জন্য যেই-না সে মুখ খুলেছে অমনি তার প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে থপ্‌থপ্‌ করে লাফিয়ে বেরুতে লাগল ব্যাঙ। ফলে ঘেন্নায় সবাই তার কাছ থেকে সিঁটিয়ে সরে গেল।

তার পর থেকে সেই সৎমা তার স্বামীর মেয়ের উপর ভীষণ খাপ্পা হয়ে উঠল। তার মাথায় তখন একমাত্র চিন্তা—কী করে মেয়েটিকে যন্ত্রণা দেওয়া হয়। এদিকে দিনকের দিন মেয়েটি হয়ে উঠতে লাগল আরো বেশি সুন্দর। শেষটায় সেই সৎমা একটা কেতলিতে টোন্ সুতো ভরে উনুনে চাপিয়ে সেটা ফোটাল। সেটা ফোটবার পর কেতলিটা সেই বেচারি মেয়ের কাঁধে ঝুলিয়ে একটা কুড়ুল দিয়ে বলল, ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া নদীতে গিয়ে কুড়ুলটা দিয়ে গর্ত করে মাছ ধরতে।



সৎমার কথামতো নদীতে গিয়ে কুড়ুল দিয়ে বরফ খুঁড়ে সে যখন গর্ত করছে—সেখানে পৌঁছল ঘোড়ায়-টানা ভারি সুন্দর চার চাকার একটা গাড়ি। সেই গাড়ির মধ্যে ছিলেন স্বয়ং রাজা।

রাজা বললেন, "বাছা, কে তুমি? কী এখানে করছ?"

মেয়েটি বলল, "আমি গরিব মেয়ে। টোন্ সুতো দিয়ে মাছ ধরছি।"

মেয়েটির জন্য ভারি দুঃখ হল রাজার। তার পর তার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি বললেন, "আমার সঙ্গে গাড়িতে চেপে যাবে?"

মেয়েটি বলল, "হ্যাঁ যাব। আমাকে নিয়ে গেলে খুব খুশি হব।"

তার সৎমা আর সৎবোনের কাছ থেকে চলে যাবার কথা ভেবে সে খুব খুশি হয়ে উঠল।

সেই গাড়িতে উঠে রাজার সঙ্গে সে পৌঁছল রাজবাড়িতে। আর তার পর বনের সেই তিনটি ছোট্টো মানুষের বর অনুযায়ী খুব ধুমধাম করে রাজার সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল। বছর খানেক বাদে সেই তরুণী রানীর জন্মাল একটি ছেলে। তার স্বামীর মেয়ের এই-সব সৌভাগ্যের কথা শুনে সেই সৎমা নিজের মেয়েকে নিয়ে একদিন রাজপুরীতে হাজির হল। বলল বেড়াতে এসেছে। কিন্তু রাজপুরী থেকে রাজা বেরুবার পর, কেউ যখন তাকে লক্ষ্য করছিল না—সেই পাজি সৎমা রানীর মাথায় আর পায়ে লাঠির বাড়ি মেরে টানতে টানতে বিছানা থেকে নামিয়ে জানলা দিয়ে তাকে ফেলে দিল নদীর দুরন্ত স্রোতের মধ্যে। তার পর নিজের কুচ্ছিত মেয়েকে বিছানায় শুইয়ে তার মুখে দিয়ে দিল ঢাকা। রাজবাড়িতে ফিরে রানীর সঙ্গে রাজা কথা কইতে গেলে সেই বুড়ি সৎমা বলল, "চুপ! চুপ! রানীর জ্বর হয়েছে। তার সঙ্গে কথা বলা বারণ। এখন তার বিশ্রামের দরকার।"

রাজা কিছু সন্দেহ না করেই চলে গেলেন। কিন্তু পরদিন সকালে তিনি যখন রানীর সঙ্গে কথা কইলেন আর রানী যখন তার কথার উত্তর দিতে লাগল আগের মতো তখন আর মোহর ঝরতে লাগল না। তার বদলে রানীর মুখ দিয়ে থপ্‌থপ্ করে লাফিয়ে বেরুতে লাগল ব্যাঙের পর ব্যাঙ। এটার কারণ কি রাজা জানতে চাইলে সেই বুড়ি সৎমা জানাল অসুখের জন্য এমনটা হচ্ছে। জ্বর ছাড়লেই আবার সব-কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

রাতে কিন্তু বাসন-মাজা দাসী দেখল পুকুরে একটা হাঁস সাঁতার কাটছে। হাঁসটা বলল :

"রাজামশাই জেগে
নাকি রাজামশাই ঘুমিয়ে?"

কোনো উত্তর না পেয়ে আবার সে প্রশ্ন করল :

"কি করছে আমার অতিথিরা?"

বাসন-মাজা দাসী উত্তর দিল :

"গভীর ঘুম ঘুমচ্ছে।"

হাঁস আবার প্রশ্ন করল :

"আমার ছেলে কোথায় আছে ?"

"দোলনায় ঘুমচ্ছে,"

উত্তর দিল বাসন-মাজা দাসী।

তখন সেই হাঁস রানীর বেশে উপরতলায় গিয়ে ছেলেকে দুধ খাওয়াল, বিছানাটা ঠিকঠাক করে তার গায়ের চার পাশে চাদর গুঁজে দিয়ে আবার হাঁস হয়ে পুকুরের মধ্যে সাঁতরে চলে গেল। এই ঘটনা ঘটল পর-পর দু-রাত। তৃতীয় রাতে কিন্তু বাসন-মাজা দাসীকে হাঁসটা বলল, "রাজাকে গিয়ে বল চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে আমার ওপর তাঁর তরোয়াল তিনবার দোলাতে।"

সঙ্গে সঙ্গে বাসন-মাজা দাসী দৌড়ে গিয়ে রাজাকে সব কথা জানাল। রাজা তাই করলেন। আর তৃতীয়বার সেই হাঁসের উপর তরোয়াল দোলাতেই তিনি দেখলেন সুস্থ দেহে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার স্ত্রী।

রাজার আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু রবিবার পর্যন্ত রানীকে তিনি লুকিয়ে রাখলেন একটা আলমারির মধ্যে—যেদিন তাঁর ছেলের নামকরণ উৎসবের কথা। নামকরণ অনুষ্ঠান শেষ হবার পর রাজা বললেন, "কেউ কাউকে বিছানা থেকে নামিয়ে নদীতে ফেলে দিলে—তার কি শাস্তি হওয়া উচিত ?"

সৎমা উত্তর দিল, "আমি জানি কী শাস্তি হওয়া উচিত। সেরকম মানুষকে ভেতর দিকে গজাল-আটকানো পিপেতে ভরে পাহাড় থেকে গড়িয়ে নদীতে ফেলে দেওয়া দরকার।"

শুনে রাজা বললেন, "তবে তাই হোক! নিজের শাস্তির কথা নিজেই তুমি বলেছ।" তিনি আদেশ দিলেন একটা পিপে এনে সেই শয়তান বুড়ি সৎমা আর তার মেয়েকে সেটার মধ্যে পুরতে। পিপের মধ্যে তাদের ভরা হলে সেটার তলায় অসংখ্য গজাল গেঁথে পাহাড়ের উপর থেকে সেটা নদীতে গড়িয়ে ফেলা হল।



সাদা সাপ

সে অনেকদিন আগেকার কথা। এক রাজা ছিলেন। পাণ্ডিত্যের জন্য দিকে দিকে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। কোনো কিছুই অজানা ছিল না তাঁর। মনে হত সব-কিছুর গোপন রহস্যের খবর যেন তাঁর কাছে বাতাসে ভেসে আসে। প্রতিদিন ডিনারের পর টেবিল খালি হলে সবাই যখন চলে যেত রাজার বিশ্বাসী ভৃত্য নিয়ে আসত একটা ডিশ। সেটা ঢাকা থাকত বলে তার মধ্যে কী যে আছে সে কথা রাজার সেই বিশ্বাসী ভৃত্য বা অন্য কেউই জানতে পারত না। কারণ কারুর সামনে রাজা ঢাকনাটা খুলতেন না বা সেটা থেকে খেতেন না। এইভাবে দিন কাটে। একদিন সেই ভৃত্য তার কৌতূহল আর চাপতে পারল না। কী আছে দেখার জন্য ডিশটা সে নিজের ঘরে নিয়ে গেল, তার পর দরজায় হুড়কো দিয়ে ঢাকনি তুলে দেখে সেটায় রয়েছে সাদা একটা

সাপ। খেতে কেমন দেখার জন্য সাপটা থেকে একটা টুকরো কেটে সে মুখে ভরল। আর সেটায় তার জিভ ঠেকাবার সঙ্গে সঙ্গে জানলার বাইরে সে শুনতে পেল অদ্ভুত নানা ফিস্‌ফিসে স্বর। জানলার কাছে গিয়ে সে দেখে কতকগুলো চড়ুই নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করছে—বলাবলি করছে মাঠে আর বনে কে কী করেছিল। সাপের স্বাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গে জীবজন্তুর ভাষা বোঝবার ক্ষমতা সে পেয়েছিল।

আর হল কি, সেদিনই রানীর সব চেয়ে ভালো আংটিটা নিখোঁজ হয়ে গেল। সন্দেহ পড়ল সেই বিশ্বাসী ভৃত্যের উপর, কারণ সব ঘরেই ছিল তার আনাগোনা। রাজা তাকে ডেকে খুব গালিগালাজ করলেন আর বললেন অপরাধ স্বীকার না করলে পরদিন বিচার করে তাকে শাস্তি দেবেন। বার বার সে বলল আংটিটা চুরি সে করে নি। কিন্তু কোনোই ফল হল না। দারুণ উৎকণ্ঠা আর অস্বস্তি নিয়ে উঠোনে সে পায়চারি করতে লাগল। মাথায় তার একমাত্র চিন্তা : কী করে এই বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়?

তির্‌তির করে ছোটো একটা নদী বয়ে যাচ্ছিল। সেখানে দশটা হাঁস বসে বিশ্রাম করতে করতে ঠোঁট দিয়ে নিজেদের পালক আঁচড়াচ্ছিল আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল নানা কথা।

সেই বিশ্বাসী ভৃত্য দাঁড়িয়ে পড়ে তাদের কথাবার্তা শুনতে লাগল। তারা বলাবলি করছিল সেদিন সকালে মাঠে ঘুরে বেড়াবার সময় খুব ভালো ভালো খাবার তারা পেয়েছে। এমন সময় একটা হাঁস বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, "আমার পেটের মধ্যে ভারি একটা জিনিস গজ্‌গজ্‌ করছে। রানীর জানলার নীচে একটা আংটি পড়েছিল। ভুট্টাদানা ভেবে ভুল করে সেটা গিলে ফেলেছি!"

সেই বিশ্বাসী ভৃত্য সঙ্গে সঙ্গে হাঁসটার গলা মুঠোয় ধরে রান্নাঘরে এনে রাঁধুনিকে বলল, "এটাকে কোতল কর—খেয়েদেয়ে দিব্যি গোলগাল হয়েছে!"

রাঁধুনি বলল, "তা যা বলেছ! দেখেই বোঝা যায় খেতে-দেতে এটা কসুর করে নি—রোস্ট হবার জন্যে অনেকদিনই তৈরি হয়ে গেছে!" হাঁসটাকে কেটে রাঁধুনি সেটার নাড়িভুঁড়ি পরিষ্কার করার সময় রানীর সেই আংটি বেরিয়ে পড়ল।

সহজেই প্রমাণ হল সেই বিশ্বাসী ভৃত্য নির্দোষ। তার প্রতি যে

অবিচার করা হয়েছিল সেটার প্রতিকারের জন্যে রাজা বললেন, সে যা চায় তাই দেবেন আর কথা দিলেন রাজসভার সব চেয়ে বড়ো পদে তাকে বহাল করবেন।

সেই বিশ্বাসী ভৃত্য কিন্তু কোনোকিছুই নিল না। শুধু বলল তাকে কিছু টাকাকড়ি আর একটা ঘোড়া দিতে—বাইরের পৃথিবীর খানিকটা সে ঘুরে দেখতে চায়। তার প্রার্থনা রাজা মঞ্জুর করতে সে বেরিয়ে পড়ল। আর ঘুরতে-ঘুরতে একদিন পৌঁছল একটা নদীর তীরে। সেখানে দেখে মাছ ধরার খাঁচায় তিনটে মাছ আটকা পড়ে খাবি খাচ্ছে। যদিও লোক বলে মাছেরা বোবা, তবু তাদের কাতরানি সে শুনতে পেল। শুনল খাবি খেতে খেতে ওরা বলাবলি করছে—খুব কষ্ট পেয়ে আমাদের মরতে হবে। লোকটা ছিল ভারি দয়ালু। তাই ঘোড়া থেকে নেমে মাছ তিনটেকে সে ছেড়ে দিল। আনন্দে তারা কিলবিল করে উঠে জল থেকে মাথা উঁচিয়ে বলল, "তোমার দয়ার কথা আমরা ভুলব না। আমাদের প্রাণ তুমি বাঁচিয়েছ। একদিন তার উপযুক্ত প্রতিদান তোমায় দেব।"

আবার সে ঘোড়ায় চড়ে যেতে শুরু করল। যেতে যেতে হঠাৎ তার মনে হল পায়ের নীচে বালির মধ্যে থেকে কে যেন কথা কইছে। থেমে গিয়ে সে শুনল পিঁপড়ে-রাজাকে নালিশ জানিয়ে বলতে :

"মানুষ আর তাদের জন্তুদের উচিত আমাদের এড়িয়ে যাওয়া। এই বোকা ঘোড়াটার ভারি ভারি খুরের চাপে আমার প্রজাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশ্বাসী ভৃত্য ঘোড়াটাকে এক পাশে সরিয়ে নিল আর পিঁপড়ে-রাজা চেঁচিয়ে বলল, "এটা আমাদের মনে থাকবে। একদিন আমাদের কৃতজ্ঞতার প্রমাণ তুমি পাবে।"

যেতে যেতে পথটা পৌঁছল এক বনে। সেখানে দেখে একটা মা-দাঁড়কাক আর একটা বাবা-দাঁড়কাক বাসা থেকে তাদের বাচ্চাদের ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলে বলছে :

"হতভাগার দল, দূর হ। তোদের আর আমরা পেট পুরে খাওয়াতে পারব না। এখন তো দিব্যি বড়োসড় হয়েছিস। নিজেদের খাবার নিজেরাই জোগাড় করতে পারিস।"

দাঁড়কাকদের ছানাগুলো মাটিতে পড়ে ডানা ঝাপটাতে-ঝাপটাতে

কেঁদে-কেঁদে বলে চলল, "আমরা অসহায় শিশু। আমরা তো উড়তেই পারি না—কী করে নিজেদের খাবার জোগাড় করব? এখানে পড়ে মরা ছাড়া আমাদের আর উপায় কী?"

তাদের কান্না শুনে সেই বিশ্বাসী ভৃত্য ঘোড়া থেকে নেমে বর্শা দিয়ে ঘোড়াটাকে মেরে সেটার মৃতদেহটি দিল দাঁড়কাকের ছানাদের খেতে। ছানাগুলো লাফিয়ে-লাফিয়ে এসে মনের আনন্দে ঠোকরাতে ঠোকরাতে বলল, "এটা আমরা ভুলব না। একদিন উপযুক্ত প্রতিদান আমরা দেব।"

এর পর থেকে তাকে যাত্রা করতে হল পায়ে হেঁটে। অনেক পথ হাঁটার পর সে পৌঁছল বড়ো একটা শহরে। সেখানকার পথে অনেক লোকের ভীড়, দারুণ হৈচৈ। আর সেই ভীড়ের মধ্যে এক ঘোড়সওয়ার ঘোষণা করে চলেছে: রাজকন্যে বর খুঁজছে; কিন্তু যে বিয়ে করতে চাইবে তাকে করতে হবে খুব কঠিন একটা কাজ। সেটা না পারলে তার আবেদন গ্রাহ্য করা হবে না। অনেকেই বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই কঠিন কাজটা করতে কেউই পারে নি।

রাজকন্যের রূপ দেখেই সেই বিশ্বাসী ভৃত্যের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। বিপদের কোনোরকম তোয়াক্কা না করে রাজার কাছে গিয়ে বলল, রাজকন্যেকে বিয়ে করতে সে চায়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে সমুদ্রের তীরে নিয়ে গিয়ে তার চোখের সামনে সমুদ্রের মধ্যে ফেলা হল সোনার একটা আংটি। তার পর রাজা তাকে আদেশ দিলেন সমুদ্রের তলা থেকে সেটা কুড়িয়ে আনতে। বললেন, "সেটা না নিয়ে যতবার ভেসে উঠবে ততবারই তোমাকে পাঠানো হবে সমুদ্রের মধ্যে—যতক্ষণ-না ঢেউয়ের তলায় ডুবে মরছ।"

সমুদ্রের তীরে একলা রেখে আসার সময় সুন্দর চেহারার তরুণ সেই বিশ্বাসী ভৃত্যের জন্য সবাইকারই করুণা হতে লাগল। সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ভাবছে কী করা যায়—এমন সময় দেখে তিনটে মাছ তার দিকে সাঁতরে আসছে—সেই তিনটে মাছ, যাদের প্রাণ সে বাঁচিয়েছিল। মাঝের মাছটার মুখে ছিল একটা ঝিনুক। সমুদ্রের তীরে সেই তরুণের পায়ের কাছে ঝিনুকটা সে রাখল। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে সে দেখে—ঝিনুকের মধ্যে রয়েছে সেই সোনার আংটি। মনের আনন্দে সেটা নিয়ে গেল সে রাজার কাছে। ভেবেছিল রাজকন্যের সঙ্গে এবার তার বিয়ে হবে।

কিন্তু রাজকন্যে ছিল ভারি উদ্ধত প্রকৃতির। যখন সে শুনল রাজবংশে তার জন্ম নয় তখন ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকে দিল দ্বিতীয় একটা কাজ। বাগানে গিয়ে নিজে হাতে ঘাসের উপর দশ বস্তা বালি ছড়িয়ে সে বলল :

"কাল সকালের আগে বালির সব দানাগুলো লোকটাকে তুলতে হবে। আধখানা দানাও যেন না পড়ে থাকে।"

বাগানে বসে সেই তরুণ ভাবতে লাগল এই অসম্ভব কাজটা কী করে করা যায়। কোনো উপায় সে খুঁজে পেল না। মনের দুঃখে ভোরের জন্য সে অপেক্ষা করতে লাগল। জানত তার পর তাকে নিয়ে যাওয়া হবে বধ্যভূমিতে। কিন্তু ভোরের রোদের প্রথম রেখা বাগানে পৌঁছতেই সে দেখে—তার কাছেই রয়েছে বালিতে ভরা সেই দশটা বস্তা, বালির আধখানা দানাও কোথাও পড়ে নেই। পিঁপড়ে-রাজা হাজার-হাজার পিঁপড়ে নিয়ে সমস্ত রাত ধরে কঠিন পরিশ্রম করে বস্তাগুলো ভরে দিয়েছিল।

রাজকন্যে বাগানে এসে অবাক হয়ে দেখে, যেটাকে তার মনে হয়েছিল অসম্ভব—সেই অসম্ভব কাজটাই এই তরুণ করেছে। কিন্তু তখনো তার মনের অহংকার ঘুচল না। সে বলল, "দুটো কঠিন কাজ লোকটা করেছে। কিন্তু তৃতীয় একটা বাকি আছে। জীবনের গাছ থেকে একটা আপেল আমার জন্যে এবার ওকে আনতে হবে।"

জীবনের গাছ কোথায় যে জন্মায় সে-সম্বন্ধে কোনো ধারণাই সেই তরুণের ছিল না। তবু সেটার খোঁজে সে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু সেটার খোঁজ পাবার কোনো আশাই তার মনে ছিল না। তিন রাজার রাজত্ব পার হবার পর সে পৌঁছল একটা বনে। সেখানে এক গাছতলায় সে শুয়ে পড়ল ঘুমোবার জন্য। এমন সময় হঠাৎ তার কানে এল ডালপালার মর্মর শব্দ আর সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে এসে পড়ল সোনার একটা আপেল। আর সেই তিনটে দাঁড়কাক নেমে এসে তার হাঁটুর উপর বসে বলল, "আমরা দাঁড়কাকের সেই তিনটে ছানা যাদের তুমি উপোস করে মরার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলে। বড়ো হয়ে শুনি তুমি একটা সোনার আপেল খুঁজে বেড়াচ্ছ। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে আমরা পৌঁছই। সেখানেই জন্মায় জীবনের গাছ। সেই গাছ থেকে এই সোনার আপেল তোমার জন্যে এনেছি।"

ভারি খুশি হয়ে জীবনের আপেল নিয়ে সেই তরুণ গেল রাজকন্যের কাছে। রাজকন্যের আর কোনো বলার কথা ছিল না। একসঙ্গে তারা খেল জীবনের সেই আপেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসায় নম্র হয়ে এল রাজকন্যের উদ্ধত হৃদয়। আর তার পর থেকে সুখে-স্বচ্ছন্দে বুড়ো বয়েস পর্যন্ত রইল তারা বেঁচে।

বুড়ো সুলতান

এক চাষীর এক বিশ্বস্ত কুকুর ছিল। নাম সুলতান। কুকুরটা বুড়ো হয়েছিল। সব দাঁত পড়ে গিয়েছিল বলে কোনো জিনিস কামড়ে ধরতে পারত না। একদিন চাষী সদর দরজায় বউয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে-ছিল। সে বলল, "কাল বুড়ো সুলতানকে গুলি করে মারব। তাকে দিয়ে আমাদের আর কোনো কাজ হবে না।"

কুকুরটাকে তার বউ খুব ভালোবাসত। তাই সে বলল, "বহু বছর আমাদের সে সাহায্য করেছে। কুকুরটা খুব ভালো আর প্রভুভক্ত। বুড়ো বয়সে আমাদের কোনো কাজে না লাগলেও অনায়াসে ওকে আমরা খেতে দিতে পারি।"

তার বর বলল, "তুমি বলছ কি? ওটার একটাও দাঁত নেই। চোররা ওকে আর ভয় পায় না। এরকম একটা অকেজো জীবকে পোষার কোনো মানে হয় না। আমাদের যেমন বিশ্বস্তভাবে সেবা করেছে তার বদলে তেমনি খেতে পেয়েছেও প্রচুর।"

বেচারা কুকুরটা কাছেই রোদে শুয়েছিল। কথাগুলো সে শুনল। কালকেই পৃথিবীতে শেষ দিন ভেবে তার ভারি দুঃখ হল।

তার ছিল এক ভালো বন্ধু। সে নেকড়ে। সন্ধেয় চুপি চুপি বনে গিয়ে সুলতান তার দুর্ভাগ্যের কথা নেকড়েকে বলল।

নেকড়ে বলল, "বন্ধু, মন খারাপ কোরো না। তোমাকে সাহায্য করার একটা ফন্দি আমার মাথায় এসেছে। কাল ভোরে তোমার প্রভু বউকে নিয়ে ক্ষেতে যাবে। তাদের বাচ্চাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে তারা। সাধারণত

বাচ্চাকে তারা ঝোপের ছায়ায় শুইয়ে রাখে। ঝোপটার পাশে এমনভাবে ঘাপটি মেরে থেকো যেন বাচ্চাকে পাহারা দিচ্ছ। বন থেকে বেরিয়ে বাচ্চাটাকে আমি চুরি করব। আমার উপর তুমি এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে যেন আমাকে মেরে তাড়াতে চাও। বাচ্চাটাকে মুখ থেকে আমি ফেলে দেব। তখন তাকে তুমি নিয়ে যেয়ো তার বাপ-মায়ের কাছে। তারা ভাববে তার জীবন তুমি বাঁচিয়েছ। তারা নিশ্চয়ই তোমার কাছে খুব কৃতজ্ঞ হয়ে পড়বে—তোমাকে আর গুলি করে মারবে না। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই তারা তোমার সঙ্গে খুব সদয় ব্যবহার করবে।"

ফন্দিটা সুলতানের মনে ধরল আর সেইমতো কাজ করল সে। নেকড়ের মুখে বাচ্চাকে দেখে আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল চাষী। আর তার পর সুলতান তাকে নিয়ে এলে ভারি খুশি হয়ে সুলতানের মাথায় হাত বুলিয়ে সে বলল, "তোর মাথার এক গাছা লোমও কেউ ছুঁতে পারবে না। যত দিন বেঁচে থাকবি ততদিন রুটি খেতে পাবি।" বউকে সে বলল, "বাড়ি গিয়ে সুলতানের জন্যে খুব নরম আর কুচিকুচি করে কাটা মাংস আর শাকসবজি দিয়ে মুখরোচক খাবার বানিয়ে দাও, যাতে বেচারার চিবুতে না কষ্ট হয়। বিছানা থেকে আমার বালিশটা বার করে ওকে আরাম করে শুতে দিয়ো।"

সেদিন থেকে সুলতানের কোনো-কিছুর অভাব হত না।

কিছুদিন পরে নেকড়ে এসে সৌভাগ্যের জন্য সুলতানকে অভিনন্দন জানিয়ে বলল, "কিন্তু বন্ধু তোমার প্রভুর মোটা-মোটা ভেড়া মাঝে মাঝে আমি যখন নিয়ে যাব তুমি চোখ বুজে থেকো। আজকাল সেরকম সুযোগ বড়ো-একটা জোটে না।"

সুলতান বলল, "ভায়া, ওটা ভুলে যাও। প্রভুর স্বার্থ আমাকে দেখতেই হবে।"

তার কথাটা কিন্তু নেকড়ের বিশ্বাস হল না। তাই সে-রাতেই এসে সে চেষ্টা করল একটা ভেড়া চুরি করতে। কিন্তু বিশ্বস্ত শিকারী কুকুরটার চীৎকারে চাষীর ঘুম ভেঙে গেল। পালাতে গিয়ে নেকড়ের মাথার লোম গেল শস্য মাড়ানোর কলে আটকে আর গোড়াসদ্ধু সেগুলো গেল উপড়ে। যাবার সময় সে হেঁকে বলল, "দোস্ত, তুমি ভয়ংকর নেমকহারাম। এর জন্যে তোমায় অনুতাপ করতে হবে।"

পরদিন সকালে শুয়োরকে দিয়ে নেকড়ে বনের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে

সুলতানকে আহ্বান জানাল। সুলতানের একমাত্র সহকারী ছিল একটা বেড়াল, যার ছিল তিনটে মাত্র ঠ্যাঙ। বেড়ালকে নিয়ে সুলতান বেরুল বনের দিকে। বেচারা বেড়াল চলল দারুণ খোঁড়াতে খোঁড়াতে। যন্ত্রনায় তার লেজ উঠল খাড়া হয়ে। সহকারীকে নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় নেকড়ে অপেক্ষা করছিল। সুলতানকে আসতে দেখে নেকড়ের মনে হল সে একটা তলোয়ার আনছে—আসলে সেটা কিন্তু বেড়ালটার খাড়া লেজ। তিন পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেড়ালটা যেই-না হুমড়ি খেয়ে পড়ে তারা ভাবে তাদের দিকে ছোঁড়বার জন্য বেড়াল বুঝি পাথর কুড়ুচ্ছে। তাই তারা ভীষণ ঘাবড়ে গেল। বুনো শুয়োরটা চোরের মতো লুকিয়ে পড়ল ঝোপঝাড়ের মধ্যে। নেকড়ে হুড়্‌মুড়িয়ে উঠে পড়ল একটা গাছে। নির্দিষ্ট জায়গায় কাউকে দেখতে না পেয়ে বেড়াল আর কুকুর—দুজনেই অবাক। শুয়োরটা ঝোপের মধ্যে ভালো করে লুকোতে পারে নি—তার কানদুটো বেরিয়ে ছিল। বেড়াল এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, এমন সময় শুয়োর তার একটা কান নাড়াল। বেড়াল ভাবল পাতাগুলোর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা ইঁদুর লুকিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে সে কট্ করে সেটা দিল কামড়ে। হাউমাউ করে চেঁচিয়ে চার পায়ে দাঁড়িয়ে ছুটতে-ছুটতে শুয়োর চেঁচাতে লাগল, "আসল অপরাধী গাছের ওপরে।" বেড়াল আর কুকুর উপর দিকে তাকিয়ে দেখে নেকড়েকে। নিজের কাপুরুষতার জন্য ভীষণ লজ্জা পেল নেকড়ে। তাই গাছ থেকে নেমে সুলতানের সঙ্গে সে আবার ভাব করে নিল।

তিন চরকা-বুড়ি

অনেকদিন আগে ছোটো একটি মেয়ে ছিল। বেজায় সে কুঁড়ে। কিছুতেই সুতো কাটতে চাইত না। মা তাকে অনেক বোঝাত-সোঝাত। কিন্তু কোনো কিছুতেই ফল হত না। একদিন তার মার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। দারুণ রেগে মেয়েকে সে খুব মারল। ফলে মেয়েটি লাগল ডাক ছেড়ে কাঁদতে। তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে রানী গাড়ি করে যাচ্ছিলেন। কান্নার শব্দ শুনে গাড়ি থামিয়ে তাদের বাড়িতে গিয়ে মেয়ের মাকে তিনি জিগ্‌গেস করলেন—মেয়েকে এমন মার সে মারছে কেন যে তার কান্নার শব্দ পথ থেকেও শোনা যায়? মেয়ের কুঁড়েমির কথা বলতে তার মার লজ্জা হল। তাই সে বলল, "দেখুন-না রানীমা—কিছুতেই মেয়েটাকে চরকার কাছ থেকে সরাতে পারি না। সব সময় সে সুতো কাটতে চায়। আমি গরিব মানুষ—অত শণ জোগাই কোত্থেকে?"

রানী বললেন, "সুতোকাটা আমি সব চেয়ে ভালোবাসি। চরকার গুন্‌গুন্‌ শুনলেই সব চেয়ে খুশি হই। রাজবাড়িতে তোমার মেয়ে আমার সঙ্গে চলুক। আমার প্রচুর শণ আছে। যত খুশি সে সুতো কাটতে পারবে।"

মেয়ের মা সানন্দে রাজি হল। রানী মেয়েকে নিয়ে চলে গেলেন।

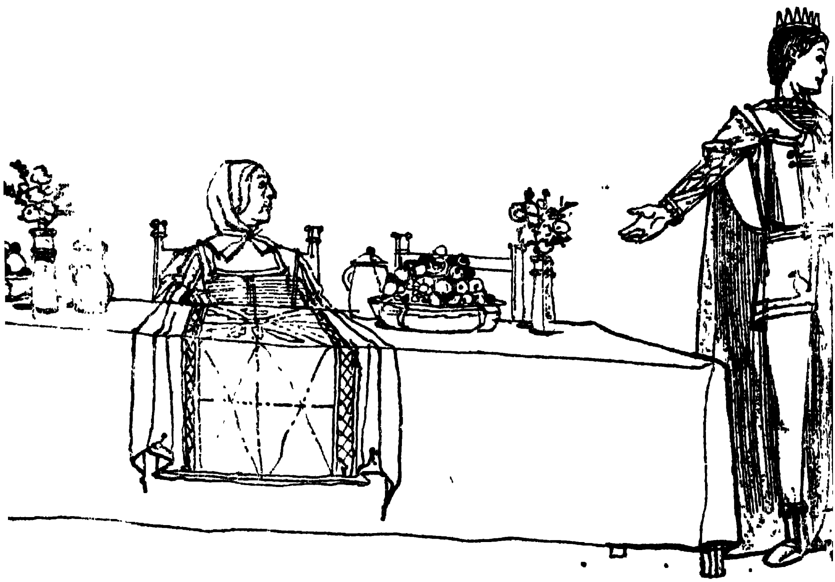
দুর্গে পৌঁছে মেয়েটিকে উপরতলায় নিয়ে গিয়ে তিনটে ঘর তিনি দেখালেন। ঘরগুলোর মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত সব চেয়ে ভালো শণে ঠাসা। রানী বললেন, "এই-সব শণ দিয়ে আমায় সুতো কেটে দাও। সব

শণ শেষ হলে আমার বড়ো ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব। তুমি গরিব হলেও কিছু আসে-যায় না। তোমার অধ্যবসায় আর পরিশ্রমই যৌতুক হিসাবে যথেষ্ট।"

দেখেশুনে মেয়েটি মনে মনে আঁতকে উঠল। কারণ সে বুঝল প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত সুতো কাটলেও যখন তার তিনশো বছর বয়স হবে তখনো সমস্ত শণ ফুরোবে না। রানী চলে গেলে একলা বসে-বসে সে কাঁদতে শুরু করল। তিনদিন একটি আঙুলও নাড়াল না। তৃতীয় দিন রানী এসে কোনো কাজ হয় নি দেখে অবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু মেয়েটি বলল মায়ের বাড়ি থেকে চলে আসার দুঃখের দরুন তখনো সে কাজ শুরু করতে পারে নি।

কথাটা শুনে রানী সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু যাবার আগে বললেন, "কাল থেকে কিন্তু কাজ শুরু করা চাই।"

রানী চলে যেতে সে ভেবে পেল না কী করবে? মনমরা হয়ে জানলার কাছে গিয়ে সে দেখে তিন বুড়িকে আসতে। তাদের মধ্যে প্রথমজনের পায়ের পাতা বেজায় চওড়া, দ্বিতীয়জনের নীচের ঠোঁট এত



বড়ো যে থুতনি পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে, আর তৃতীয়জনের একটা হাতের বুড়ো আঙুল ভীষণ মোটা। তারা তিনজন জানলার সামনে দাঁড়িয়ে উপর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, কী হয়েছে। মেয়েটি তার বিপদের কথা জানাতে তারা বলল তাকে সাহায্য করবে। বলল, "তোমার বিয়েতে আমাদের নেমন্তন্ন করলে আর আমাদের জন্যে লজ্জিত না হয়ে তোমার আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়ে তোমার সঙ্গে এক টেবিলে খেতে দিলে, অল্প সময়ের মধ্যেই তোমার হয়ে এই-সব শণ কেটে আমরা সুতো করে দেব।"



মেয়েটি বলল, "যা-যা বললে নিশ্চয়ই করব। দয়া করে এসে এখনই কাজ শুরু করে দাও।"

এই তিন অদ্ভুত বুড়িকে ভিতরে এনে মেয়েটি প্রথম ঘরের মেঝের অনেকটা ফাঁকা করে দিল। সেখানে বসে তারা শুরু করল সুতো কাটতে। প্রথমজন চাকা ঘুরিয়ে টেনে সুতো বার করতে লাগল, দ্বিতীয়জন লাগল সেই সুতো ঠোঁট দিয়ে ভেজাতে, আর তৃতীয়জন সেই সুতো পাকিয়ে টেবিলে রেখে বুড়ো আঙুল দিয়ে লাগল চাপড়াতে— আর তার প্রতিটি চাপড়ের সঙ্গে সঙ্গে মেঝেয় পড়তে লাগল চমৎকার পাকানো সুতোর এক-একটি ফেটি। এই তিন চরকা-বুড়িকে রানীর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখল মেয়েটি, প্রতিদিন রানী এলে তাঁকে সে দেখায় কতটা সুতো কাটা হয়েছে। রানী দেখেন আর তার খুব প্রশংসা করেন।

প্রথম ঘর খালি হলে তারা গেল দ্বিতীয় ঘরে। দ্বিতীয় ঘরের পর তৃতীয় ঘরে। দেখতে দেখতে তিনটে ঘরই খালি হয়ে গেল।

তার পর তিন বুড়ি মেয়েটির কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় বলল, "আমাদের যে কথা দিয়েছ সেটা কিন্তু ভুলো না। তার ওপরেই নির্ভর করছে তোমার জীবনের সুখ-স্বচ্ছন্দ।"

রানীকে সেই তিনটে খালি ঘর আর সুতোর বিরাট স্তূপ মেয়েটি দেখাল। রানী তখন বিয়ের আয়োজন করতে শুরু করলেন। বুদ্ধিমতী আর পরিশ্রমী বউ হবে জেনে রাজপুত্রও খুব খুশি। মেয়েটির প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

মেয়েটি তখন বলল, "আমার তিনজন আত্মীয় আছে তারা আমার অনেক উপকার করেছে। আমার সুখের দিনে তাদের আমি ভুলতে চাই না। তাদের আমি বিয়েতে নেমন্তন্ন করব। আমার সঙ্গে এক টেবিলে তাদের খাবার অনুমতি দিতে হবে।"

রানী আর রাজপুত্র রাজি হলেন। বিয়ের দিন সেই তিন চরকা-বুড়ি বেজায় হাস্যকর পোশাকে হাজির হল। মেয়েটি ওদের আদর অভ্যর্থনা করে বলল, "এসো, এসো।"

মেয়েটিকে রাজপুত্র প্রশ্ন করল, "তোমার আত্মীয়দের চেহারা এরকম কুচ্ছিত কেন?" তার পর যে-বুড়ির পায়ের পাতা বেজায় চওড়া তাকে সে জিগ্‌গেস করল, "তোমার পায়ের পাতা এরকম চওড়া হল কী করে?"

সে উত্তর দিল, "পা দিয়ে চাকা ঘুরিয়ে, রাজপুত্তুর, পা দিয়ে চাকা ঘুরিয়ে।"

রাজপুত্র দ্বিতীয়জনের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল, "তোমার তলার ঠোঁট এরকম ঝোলা কেন?"

সে উত্তর দিল, "ঠোঁট দিয়ে সুতো ভিজিয়ে, রাজপুত্তুর, ঠোঁট দিয়ে সুতো ভিজিয়ে।"

তার পর তৃতীয়জনকে রাজপুত্র প্রশ্ন করল, "তোমার বুড়ো আঙুলটা এরকম ভীষণ মোটা কেন?"

সে উত্তর দিল, "সুতো পাকাতে আর সুতো চাপড়াতে গিয়ে, রাজপুত্তুর, সুতো পাকাতে আর সুতো চাপড়াতে গিয়ে।"

আঁতকে উঠে রাজপুত্র বলল, "আমার সুন্দরী বউ জীবনে কোনো দিন আর চরকা ছোঁবে না।"

এইভাবে মেয়েটি সুতো কাটা থেকে রেহাই পেল।

জাদুর থলি, টুপি আর শিঙা

এক সময় ছিল তিন ভাই। ক্রমশ তারা ভারি গরিব হয়ে পড়ে। শেষটায় তাদের অবস্থা এমন খারাপ হয়ে পড়ল যে, দু-মুঠো খাবারও জোটে না। নিজেদের মধ্যে তখন তারা বলাবলি করল, "এভাবে আর চলে না। বেরিয়ে পড়ে আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করা যাক।" এই-না বলে তারা বেরিয়ে পড়ল। নানা পাহাড় আর উপত্যকা পেরিয়ে অনেক দূর—তারা গেল। কিন্তু তবুও কপাল তাদের ফিরল না। আরো যেতে-যেতে তারা পৌঁছল এক গহন বনে। সেই বনের মাঝখানে ছিল একটা ঢিবি। কাছে গিয়ে তারা দেখে ঢিবিটা রুপোয় ঠাসা। বড়ো ভাই তখন বলল, "জীবনের সব আনন্দ এখন পেলাম।" এই-না বলে যতটা পারল রুপো নিয়ে সে বাড়ি ফিরে গেল। কিন্তু অন্য দুভাই বলল, "রুপোর চেয়ে বেশি কিছু না পেলে আমরা সুখী হব না।" তাই তারা রুপো না নিয়ে চলল এগিয়ে।

আরো দুদিন হাঁটার পর তারা আর-একটা ঢিবির কাছে পৌঁছল। সেটা সোনায় ঠাসা। মেজো ভাই দাঁড়িয়ে পড়ে ভাবতে লাগল। কী করবে স্থির করতে পারল না। বলল, "কী করি? জীবনে যত সোনার দরকার তত সোনা নেব, নাকি এগিয়ে যাব?" শেষটায় পকেট বোঝাই করে সোনা নিয়ে, ছোটো ভাইকে বিদায় জানিয়ে সে-ও বাড়ি ফিরে গেল।

ছোটো ভাই কিন্তু বলল, "সোনা-রুপোয় আমার দরকার নেই। অন্য জায়গায় আমার আনন্দ খুঁজতে যাই। হয়তো আমার ভাগ্যে আরো

ভালো কিছু আছে।" তিনদিন হাঁটার পর সে পৌঁছল একটা বনে। বনটা এত বড়ো যে, মনে হয় সেটার বুঝি শেষ নেই। তার সঙ্গে খাবার-দাবার কিছুই ছিল না মনে হল ক্ষিদের জ্বালায় সে মারা পড়বে। বনটা কোথায় যে শেষ হয়েছে দেখার জন্য সে একটা গাছে চড়ল। কিন্তু যতদূর চোখ যায় সে দেখে শুধু গাছের চূড়ো। গাছ থেকে সে নেমে পড়ল আর ক্ষিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে এই কথাগুলো না বলে সে পারল না, "ক্ষিদে মেটাবার জন্যে যদি কিছু পেতাম!" আর কি আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে সে দেখে গাছের তলায় একটা টেবিল আর সেই টেবিল ভরা গরম-গরম নানা মুখরোচক খাবারে। গরম খাবারের ধোঁয়া তার মুখে এসে লাগল। "ঠিক সময়েই আমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে", বলে চেঁচিয়ে উঠে সে বসে পড়ে পেট ভরে খেল। খাবারগুলো কোথা থেকে এল বা কে সেগুলো রেঁধেছে—এ-সব প্রশ্ন নিয়ে একবারও সে মাথা ঘামাল না। খাওয়া শেষ হতে সে ভাবল, 'এই সুন্দর টেবিল-ঢাকাটা বনের মধ্যে ফেলে গেলে নষ্ট হয়ে যাবে। সেটা খুব দুঃখের কথা।' এই-না ভেবে টেবিল-ঢাকাটা পরিপাটি করে ভাঁজ করে সে পকেটে পুরল।

তার পর সে হেঁটে চলল। সন্ধেয় আবার ক্ষিদে পেলে সে স্থির করল ছোট্টো টেবিল-ঢাকাটা পরখ করে দেখবে। তাই সেটা বিছিয়ে সে বলল, "আমি চাই আবার ভালো-ভালো খাবারে তুমি ভরে ওঠো।" কথা-গুলো তার মুখ থেকে খসতে-না-খসতেই আবার ভালো-ভালো খাবারে সেটা ভরে গেল। এবার খাবারের পরিমাণ আগের চেয়ে দশগুণ বেশি। কতগুলো যে ডিশ গুণে সে শেষ করতে পারল না।

সে বলে উঠল, "এবার বুঝলাম কোন রান্নাঘরে আমার খাবার রান্না হয়েছে। রুপোর সোনার পাহাড়ের চেয়েও এ-কাপড়টা দামী।" কারণ সে বুঝল এই ছোট্টো কাপড়টার মধ্যে একটা জাদুর ক্ষমতা আছে—নিজে থেকেই এটা পারে খাবারে ভরে উঠতে। কিন্তু এই অমূল্য সম্পদ নিয়ে একই জায়গায় বসে থাকতে তার ইচ্ছে করল না। সে চেয়েছিল ঘুরে ঘুরে পৃথিবীকে দেখতে আর আনন্দকে খুঁজে বার করতে।

এক সন্ধেয় সে পৌঁছল ভারি এক নির্জন নিরানন্দ বনে। সেখানে কুচকুচে কালো একটি লোকের সঙ্গে তার দেখা। লোকটির পেশা কাঠ পুড়িয়ে কাঠকয়লা তৈরি করা। রাতের খাবারের জন্য কয়লার আগুনে

সে আলু ঝলসে নিচ্ছিল। ছোটো ভাই বলল, "শুভসন্ধ্যা নিগ্রোভায়া, এই নির্জন জায়গায় সময় কাটাও কী করে?"

সে বলল, "একটা দিন হুবহু অন্যটার মতো। প্রতি সন্ধেয় আমি আলু দিয়ে খাওয়া সেরে নিই। আলু যদি পছন্দ হয় তা হলে আজ সন্ধেয় আমার অতিথি হবে?"

ছোটো ভাই বলল, "অনেক ধন্যবাদ। তোমার খাবারে আমি ভাগ বসাতে চাই না। আপত্তি না থাকলে আমিই তোমাকে খাওয়াব।" এই-না বলে ঝোলা থেকে টেবিল-ঢাকাটা বার করে সে মাটিতে বিছলো।

লোকটি বলল, "তোমার কাছে ঐ টেবিল-ঢাকা ছাড়া অন্য কিছু না থাকলে আমাকে কী করে তুমি খাওয়াবে জানি না। কাছে পিঠে একটাও বাড়ি নেই যেখান থেকে তুমি খাবার জোগাড় করতে পার।"

ছোটো ভাই বলল, "তা সত্ত্বেও তোমাকে আমি এমন খানা খাওয়াব জীবনে সেরকম খানা খাও নি।" তার পর সে বলল, "ছোটো টেবিল-ঢাকা, ভালো-ভালো খাবারে ভরে ওঠো।" আর কী আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে সেটা ভরে গেল মাংসর নানারকম খাবারে। সেগুলো এত গরম, যেন সবে রান্নাঘর থেকে এসেছে।

কাঠ পুড়িয়ে কাঠকয়লা বানানো যার পেশা সে লোকটি দারুণ অবাক হয়ে গেল। তাকে আর দ্বিতীয়বার বলতে হল না। সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ে কালিঝুলি মাখা মুখের মধ্যে সে ভরতে লাগল মাংসর বড়ো-বড়ো টুকরো। পেট ভরে খেয়ে বোকা হাসি হেসে লোকটি বলল, "টেবিল—ঢাকাটার ওপর আমার শ্রদ্ধা জন্মে গেছে। এই নির্জন বনে এটার সাহায্যে বিনাপয়সায় এরকম ভালো-ভালো খাবার পাওয়া যেতে পারে বলে আমার কাছে এটা এক অমূল্য সম্পদ। তাই আমি একটা বিনিময়ের প্রস্তাব করছি। কাছেই একটা পুরনো মিলিটারি থলি ঝুলছে। দেখতে কুচ্ছিত হলেও সেটার মধ্যে জাদুর গুণ আছে। কিন্তু সেটা সম্বন্ধে আমার আর কোনো কৌতূহল নেই। তাই সেটার বদলে তোমার টেবিল-ঢাকাটা চাই।"

ছোটো ভাই বলল, "আমাকে কিন্তু প্রথমে জানতে হবে সেটার কী ধরনের জাদুর গুণ আছে।"

লোকটি বলল, "খুলেই বলছি। ওটা প্রত্যেকবার হাত দিয়ে

চাপড়ালেই বেরিয়ে আসবে সশস্ত্র এক সেনাপতি আর ছজন সৈনিক। তুমি যা আদেশ দেবে সঙ্গে সঙ্গে তারা সেটা করবে।”

ছোটো ভাই বলল, “বদলাতে আমার আপত্তি নেই।” এই-না বলে লোকটিকে টেবিল-ঢাকাটি দিয়ে গাছের ডাল থেকে ঝুলন্ত থলিটা নিয়ে বিদায় জানিয়ে ছোটো ভাই চলে গেল।

খানিক দূর গিয়ে তার মনে হল থলিটার গুণ পরীক্ষা করে দেখা দরকার। তাই সেটা চাপড়াল আর চাপড়াতেই বেরিয়ে এল সশস্ত্র ছজন সৈনিক আর একজন সেনাপতি। সেনাপতি বলল, “প্রভুর আদেশ কী?”

“যে-লোকটার কাঠ কুড়িয়ে কাঠকয়লা বানানো পেশা, ছুটে গিয়ে তার কাছ থেকে আমার টেবিল-ঢাকাটা নিয়ে এসো।”

সঙ্গে সঙ্গে তারা ঘুরে দাঁড়াল আর মুহূর্তের মধ্যে কাজ হাসিল করে ফিরল। তাদের বিশ্রাম নিতে বলে ছোটো ভাই আবার চলল এগিয়ে। তার মনে হল ভবিষ্যতে তার কপালে আরো ভালো-ভালো জিনিস জুটবে।

সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে। এমন সময় তার সঙ্গে দেখা হল আর একটি লোকের। তারও পেশা কাঠ পুড়িয়ে কাঠকয়লা বানানো। আগুন জ্বালিয়ে সে রাতের খাবার তৈরি করছিল। ছোটো ভাইকে সে বলল, “আমার সঙ্গে খাবে? খাবার বলতে আলু আর নুন। পছন্দ হয় তো বসে পড়।”

ছোটো ভাই বলল, “না না। আমিই তোমায় নেমন্তন্ন করছি।” এই-না বলে টেবিল-ঢাকাটা মাটিতে সে বিছলো আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা ভরে গেল নানা মুখরোচক খাবারে।

খুব তৃপ্তি করে তারা খাওয়া-দাওয়া করল। তার পর কাঠকয়লা বানানো যার পেশা সে বলল, “কাছেই একটা ছেঁড়াখোঁড়া পুরনো টুপি পড়ে আছে। সেটার আশ্চর্য ক্ষমতা। সেটা মাথায় পরে ঘোরালেই এক-এক বারে বারো জনের গোলন্দাজ-বাহিনী বেরিয়ে এসে তাদের সামনের সবাইকে উড়িয়ে দেয়। টুপিটা আমার কোনো কাজে লাগে না। তোমার টেবিল ঢাকার সঙ্গে খুশি হয়েই সেটা আমি বদলাতে রাজি।”

ছোটো ভাই বলল, “ঠিক আছে।” এই-না বলে টুপিটা নিয়ে মাথায় পরে টেবিল-ঢাকা তাকে দিয়ে সে চলে গেল। খানিক গিয়ে থলিটা সে চাপড়াল আর তার সৈন্যরা গিয়ে টেবিল-ঢাকাটা উদ্ধার করে আনল। ছোটো ভাই ভাবল, ‘মনে হচ্ছে আরো ভালো জিনিস কপালে আছে।’

আর সত্যিই তাই। কারণ আর একদিন হাঁটার পর তার সঙ্গে দেখা হল তৃতীয় কাঠকয়লা ব্যবসাদারের। অন্যদের মতো সে-ও তার সঙ্গে সেদ্ধ আলু খাবার নিমন্ত্রণ জানাল। আর অন্য বারের মতো টেবিল-ঢাকা দিয়ে ছোটো ভাই-ই তাকে খাওয়াল দারুণ ভোজ। ভারি খুশি হয়ে কাঠ-কয়লার ব্যবসাদার টেবিল-ঢাকার সঙ্গে বদলাতে চাইল একটা শিঙা, যেটার ছিল আশ্চর্য জাদুর গুণ। সেটা বাজালে সব দেওয়াল ধসে পড়ে, শহর আর গ্রাম যায় গুঁড়িয়ে। শিঙার বদলে ছোটো ভাই তাকে দিল টেবিল-ঢাকাটা, কিন্তু সৈন্যদের পাঠিয়ে আনাল সেটা উদ্ধার করে। এইভাবে শেষপর্যন্ত সে পেল একটা থলি, টুপি আর শিঙা। তখন সে ভাবল, 'জীবনে আমি সফল হয়েছি। এইবার বাড়ি ফিরে ভাইদের সঙ্গে দেখা করা যাক।' বাড়ি ফিরে সে দেখে সেই রুপো আর সোনা দিয়ে একটা সুন্দর বাড়ি বানিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে তার বড়ো দু ভাই রয়েছে। কিন্তু তার গায়ে ছেঁড়া কোট মাথায় ছেঁড়া টুপি আর পিঠে কুচ্ছিত একটা থলি থাকায় তারা তাকে আপন ভাই বলে স্বীকার করতে চাইল না।

"তুই রুপো আর সোনা উপেক্ষা করেছিলি। বলেছিলি তার চেয়েও ভালো জিনিস আনবি। আমরা তো ভেবেছিলাম অন্তত রাজা হয়ে ফিরবি। এখন দেখছি ফিরেছিস ভিখিরি হয়ে!" এই-না বলে তারা তাকে বাড়ি থেকে দিল তাড়িয়ে।

তখন সে ভীষণ রেগে ক্রমাগত চাপড়ে চলল তার থলিটা। দেখতে-দেখতে দেড়শো সৈন্য বেরিয়ে এসে সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের সে আদেশ দিল ভাইদের বাড়িটা ঘিরে ফেলতে। আর দুজনকে বেছে নিয়ে বলল ভাইদের এমন চাবকান চাবকাতে যাতে তাদের গায়ের ছাল-চামড়া উঠে যায়। দারুণ হৈচৈ পড়ে গেল। পাড়া-পড়শি ছুটোছুটি করে চেষ্টা করতে লাগল তার ভাইদের বাঁচাতে। কিন্তু সৈন্যদের জন্যে তারা এগুতে পারল না। শেষপর্যন্ত রাজার কাছে খবরটা গেল। একজন অফিসারের সঙ্গে তিনি সশস্ত্র বাহিনী পাঠালেন জনসাধারণের শান্তি ভঙ্গ-কারীকে শহর থেকে তাড়িয়ে দিতে। কিন্তু ছোটো ভাই থলি থেকে আরো সৈন্য বার করে তাদের হটিয়ে দিল। রাজার সৈন্যদের অনেকেই মরল। রাজা বললেন, "এই ভবঘুরে নচ্ছার লোকটাকে খতম করে দাও।" তিনি আরো সৈন্য পাঠালেন। কিন্তু তারাও কিছু করতে পারল না। থলি থেকে আরো সৈন্য বেরুল। বিপক্ষ দলকে চট্‌পট্‌ খতম

করার জন্য ছোটো ভাই তার টুপিটি বার দুই ঘোরাল। সঙ্গে সঙ্গে কামানের এমন গোলা ছুটতে লাগল যে, রাজার সৈন্যরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। যারা বাঁচল ছত্রভঙ্গ হয়ে তারা গেল পালিয়ে।

ছোটো ভাই তখন বলল, "একমাত্র শর্তে আমি সন্ধি করতে রাজি—রাজকন্যের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে হবে আর রাজ্য-শাসন করার ভার দিতে হবে আমার হাতে।"

এ কথা শুনে রাজা তাঁর মেয়েকে বললেন, "এটা মেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায় কী? শান্তির স্বার্থে আর রাজমুকুট যাতে আমার মাথায় থাকে তার জন্যে লোকটাকে বিয়ে করতে তোকে রাজি হতেই হবে।"

অতএব তাদের বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু একটা ভবঘুরে বাজে লোক-কে বিয়ে করতে বাধ্য হওয়ায়—যে-লোকটার মাথায় ছেঁড়া টুপি আর কাঁধে কুচ্ছিত থলি—রাজকন্যে মনে মনে উঠল ভীষণ চটে। দিন-রাত তার মাথায় একমাত্র চিন্তা—কী করে লোকটাকে দূর করা যায়। সে-ভাবল লোকটার অসাধারণ ক্ষমতার সঙ্গে ঝোলাটার হয়তো কোনো যোগা-যোগ আছে। তাই একদিন বরকে অনেক আদর-টাদর করে তার মন ভিজিয়ে সে বলল, "ঝোলাটা তুমি কাঁধ থেকে নামালে বাঁচি। তোমার কাঁধে ওটা এমন বিশ্রী দেখায় যে আমার লজ্জা করে।"

তার বর বলল, "বউ, এই থলিটাই আমার অমূল্য সম্পদ। এটা কাছে থাকলে পৃথিবীতে কাউকে আমি পরোয়া করি না।" তার পর থলিটার আশ্চর্য ক্ষমতার কথা রাজকন্যেকে সে বলল।

তাই-না শুনে তার গলা জড়িয়ে ধরে রাজকন্যে এমন ভান করল—যেন তাকে চুমু খেতে যাচ্ছে। কিন্তু চুমু খাওয়ার বদলে বরের পিঠ থেকে থলিটা খুলে সেটা নিয়ে দৌড়ে পালাল। আর একলা হয়ে পড়তেই থলিটা চাপড়ে সৈন্যদের সে আদেশ দিল তাদের আগেকার প্রভুকে বন্দী করে রাজপ্রাসাদের বাইরে নিয়ে যেতে। আদেশ তারা পালন করল। তখন সেই কুচুটে মেয়ে একদল লোককে লেলিয়ে দিল ছোটো ভাইয়ের উপর, যাতে তারা তাকে মেরে দেশ থেকে দূর করে দেয়। সেই ছেঁড়া টুপিটা না থাকলে ছোটো ভাই-য়ের নির্ঘাত সর্বনাশ হয়ে যেত। কোনো-রকমে নিজের হাত দুটো মুক্ত করে টুপিটাকে তার মাথার উপর ঘোরাল। সঙ্গে সঙ্গে কামানগুলো গর্জে উঠল। গোলার ঘায়ে মরল প্রত্যেকে। রাজকন্যে তখন বাধ্য হল তার কাছে এসে অনুনয় বিনয়

করে ক্ষমা ভিক্ষে করতে। রাজকন্যে ভারি করুণস্বরে ক্ষমা চাইল আর প্রতিজ্ঞা করল জীবনে কখনো সে আর ওরকম শয়তানী করবে না। তাই ছোটো ভাই তাকে ক্ষমা করল। তার পর রাজকন্যে আবার তাকে খুব আদর-টাদর করে জেনে নিল টুপিটার গোপন রহস্য। তার পর ছোটো ভাই ঘুমিয়ে পড়লে টুপিটা সে খুলে নিয়ে পথে দিল ফেলে। জেগে উঠে রাজকন্যের প্রতারণা দেখে ভীষণ ক্ষেপে গেল ছোটো ভাই। শিঙাটা তখনো তার কাছে ছিল। সেটায় প্রাণপণে সে ফুঁ দিতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়িয়ে যেতে লাগল প্রাচীর, দুর্গ, শহর আর গ্রাম আর মারা পড়লেন রাজা আর তার মেয়ে। শিঙাটা সে বাজিয়ে চললে সমস্ত রাজত্বই ধ্বংস হয়ে যেত। একটা পাথর খাড়া থাকত না। কিন্তু সেটা সে চায় নি। সে চেয়েছিল রাজা হতে। আর শেষপর্যন্ত রাজাই হল সে। কেউ আর বাধা দিতে এল না।

ফ্রেডি আর ক্যাথারিন-লিজ্

এক সময়ে একটি লোক ছিল। নাম তার ফ্রেডি। আর একটি মেয়ে ছিল তার নাম ক্যাথারিন-লিজ্। বিয়ের পর একসঙ্গে তারা সংসার করতে লাগল।

ফ্রেডি একদিন বলল, "ক্যাথারিন-লিজ্, আমি ক্ষেতে যাচ্ছি। ফিরে যেন দেখি টেবিলে গরম খাবার অার তেষ্টা মেটাবার তাজা বিয়ার মজুত থাকে।"

ক্যাথারিন-লিজ্ বলল, "তুমি যাও, ফ্রেডি। দুর্ভাবনা কোরো না। সব-কিছু ঠিকঠাক মজুত থাকবে।"

ডিনারের সময় হলে চিমনি থেকে একটা সসেজ্ পেড়ে কড়াইতে মাখন দিয়ে উনুনে সেটা সে চাপাল ভাজতে। চিড়্‌বিড়্ শব্দ করে ভাজা হতে লাগল সসেজ্‌টা। কড়াই-এর হাতল ধরে ক্যাথারিন-লিজ্ ভাবতে লাগল, 'সসেজ্‌টা যতক্ষণ ভাজা হচ্ছে আমি ততক্ষণ মাটির তলার ঘর থেকে বিয়ার নিয়ে আসি-গে।'

এই-না ভেবে মাটির তলার ঘরে গিয়ে পিপের কল খুলে সে বিয়ার চালতে লাগল। পাত্রের মধ্যে বিয়ার যখন পড়ছে ক্যাথারিন-লিজয়ের হঠাৎ যেন মনে পড়ল, 'কুকুরটা ওপরে ছাড়া আছে কড়াই থেকে সসেজ্‌টা সে চুরি করতে পারে। আর তা হলেই চিত্তির।' সঙ্গে সঙ্গে মাটির তলার ঘর থেকে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে সে উপরে এল। কিন্তু তার আগেই কুকুর সেই সসেজ্‌টা কামড়ে মেঝের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরকে তাড়া করে ক্যাথারিন-লিজ্ ক্ষেতের মধ্যে বেশ খানিকটা দূরে চলে এল। ক্যাথারিন-লিজয়ের

চেয়ে কিন্তু জোরে ছুটতে পারত কুকুরটা। তাই সসেজ্‌টা মুখ থেকে না ফেলে সে পালিয়ে গেল গ্রামের বাইরে। ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে ক্যাথারিন-লিজ্‌ বলে উঠল, "যেটা হারিয়ে গেছে তার জন্যে কেঁদে লাভ নেই।" এই-না বলে ধীরে ধীরে সে ফিরল বাড়িতে।

এদিকে পিপে থেকে বিয়ার পড়ে যাচ্ছিল। কারণ ক্যাথারিন-লিজ্‌ ভুলে গিয়েছিল কল বন্ধ করতে। পাত্র উপচে বিয়ার মেঝেয় পড়তে পড়তে পুরো পিপে হয়ে গেল খালি। সিঁড়ি থেকে ব্যাপারটা দেখে ক্যাথারিন-লিজ্‌ চেঁচিয়ে উঠল, "ফ্রেডির চোখে এটা যাতে না পড়ে তার জন্যে কী করা যায়?" ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মনে পড়ল ভাঁড়ারে রয়েছে এক বস্তা মিহি ময়দা। সে স্থির করল উপচে-পড়া বিয়ার-এর উপর সেই ময়দা ছড়িয়ে দেবে বলে। এই-না ভেবে ময়দার বস্তাটা এনে সে ফেলল বিয়ারয়ের পাত্রের উপর। সঙ্গে সঙ্গে পাত্রটা উলটে গেল। আর ফ্রেডির পানীয় মিশে গেল মেঝের উপরকার উপচে-পড়া বিয়ারয়ের সঙ্গে। ঠিকই হয়েছে, এক জায়গাতেই সব বিয়ার থাকা দরকার—এই-না ভেবে মাটির তলার ঘরের মেঝের সব জায়গায় সে ময়দা ছড়াল। তার পর নিজের কাজ দেখে খুব খুশি হয়ে বলে উঠল, "ভারি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এখন দেখাচ্ছে।"

ডিনারের সময় বাড়ি ফিরে ফ্রেডি প্রশ্ন করল, "আমার জন্যে কী রেঁধেছ?"

ক্যাথারিন-লিজ্‌ বলল, "তোমার জন্যে একটা সসেজ্‌ ভাজতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পিপে থেকে যখন বিয়ার ঢালছি কুকুরটা তখন কড়াই থেকে সসেজ্‌ নিয়ে পালায়। কুকুরের পেছন পেছন যখন দৌড়োই, পিপে থেকে সব বিয়ার তখন পড়ে যায়। ময়দার বস্তাটা দিয়ে বিয়ার মুছতে যেতে বিয়ারয়ের পাত্রটা যায় উলটে। কিন্তু কিছু ভেবো না—মাটির তলার ঘর এখন খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।"

ফ্রেডি বলল, "ক্যাথারিন-লিজ্‌, ক্যাথারিন-লিজ্‌! এ-সব করা তোমার ঠিক হয় নি। —সসেজ্‌ চুরি হতে দেওয়া, বিয়ার উপচে পড়তে দেওয়া—তার ওপর আমাদের মিহি ময়দা নষ্ট করা। এ-সব করা তোমার উচিত হয় নি।"

সে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ, ফ্রেডি। কিন্তু আগে থাকতে তোমার বারণ করে দেওয়া উচিত ছিল।"

ফ্রেডি ভাবল, ‘বউ-এর ওপর কড়া নজর রাখা দরকার।’

ফ্রেডির বেশ কিছু ডলার জমেছিল। সেগুলো দিয়ে মোহর কিনে ক্যাথারিন-লিজ্‌কে সে বলল, “এই হলদে চাকতিগুলো দেখো। এগুলো একটা হাঁড়িতে ভরে গোয়াল-ঘরে গোরুর জাব্‌নার পাত্রের নীচে হাঁড়িটা পুঁতে রাখবে। খবরদার সেটায় হাত দেবে না। দিলে ভালো হবে না, বলে দিলাম।”

ক্যাথারিন-লিজ্‌ বলল, “না ফ্রেডি। কখনো হাত দেব না।”

ফ্রেডি চলে যাবার পর মাটির বাসন-কোসন বিক্রি করতে গ্রামে এল নানা ফেরিওয়ালা। ক্যাথারিন-লিজ্‌কে তারা প্রশ্ন করল, কিছু কিনবে কি না। সে বলল, “আমার টাকাকড়ি নেই। তাই কিছু কিনতে পারব না। কিন্তু হলদে-হলদে চাক্‌তি যদি তোমরা নাও তা হলে কিনতে পারি।”

তারা বলল, “হলদে-হলদে চাকতি! কেন নেব না? কই, দেখি।”

“গোয়ালঘরে গিয়ে গোরুর জাব্‌নার পাত্রের নীচেটা খোঁড়ো। তা হলেই দেখবে হলদে চাক্‌তিগুলো। সেগুলো আমার ছোঁয়া বারণ।”

জোচ্চরগুলো গিয়ে খুঁড়ে দেখে অনেক মোহর। নিজেদের মাটির বাসন-পত্র রেখে মোহরগুলো নিয়ে তারা চম্পট দিল।

ক্যাথারিন-লিজ্‌ ভাবল নতুন বাসন-কোসনগুলো কাজে লাগান দরকার। রান্নাঘরে কিন্তু মাটির বাসন-কোসনের অভাব ছিল না। তাই সেগুলোর তলা ভেঙে নানা খোঁটায় আটকে সে বাড়ি সাজাল। বাড়ি ফিরে সেগুলো দেখে ফ্রেডি বলল, “ক্যাথারিন-লিজ্‌, এ-সব কী করছ?”

“গোরুর জাব্‌নার পাত্রের তলায় যে হলদে চাক্‌তিগুলো লুকনো ছিল সেগুলো দিয়ে এগুলো কিনেছি। আমি নিজে ছুঁই নি। ফেরিওয়ালারা নিজেরা গিয়ে সেগুলো খুঁড়ে বার করেছিল।”

ফ্রেডি চেঁচিয়ে উঠল, “হায় হায় বউ! করেছ কী? ওগুলো হলদে চাকতি নয়। ওগুলো মোহর—আমাদের পুরো সম্পত্তি। ওটা করা তোমার উচিত হয় নি।”

সে বলল, “তুমি ঠিকই বলেছ, ফ্রেডি। কিন্তু আগে থাকতে তোমার বারণ করে দেওয়া উচিত ছিল।”

তার পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিক ভেবে সে বলল, "শোনো ফ্রেডি, মোহরগুলো আমরা ফিরিয়ে আনি। চল, আমরা চোরদের ধাওয়া করি গে।"

ফ্রেডি বলল, "চল তা হলে। কিন্তু পথে খাবার জন্যে সঙ্গে খানিকটা মাখন আর পনির নিয়ো।"

"তাই নেব, ফ্রেডি।"

তারা বেরিয়ে পড়ল। ফ্রেডি জোরে জোরে হাঁটে বলে ক্যাথারিন-লিজ্ পড়ল পিছিয়ে। যেতে যেতে তারা পৌঁছল এক পাহাড়ে। সেখানকার পথের দু পাশে গাড়ির চাকার গভীর গর্তের দাগ। ক্যাথারিন-লিজ্ বলে উঠল, "কী কাণ্ড! বেচারা জমিকে কেটে ছিঁড়ে লোকে কী দুর্ব্যবহারই-না করেছে!" এই-না বলে গভীর মমতার সঙ্গে সেই চাকার দাগে সে মাখনের প্রলেপ লাগাল, যাতে গাড়ির চাকা অতটা ক্ষতি করতে না পারে। ঝুঁকে পড়ে কাজটা যখন সে করছে তার পকেট থেকে পনিরের একটা ড্যালা পড়ে পাহাড় দিয়ে নীচে গড়িয়ে চলল। ক্যাথারিন-লিজ্ বলে উঠল, "একবার এই পথে হেঁটে এসেছি। দ্বিতীয়বার আর যাচ্ছি না। পনিরের আর-একটা ড্যালা গিয়ে ওটাকে ডেকে আনুক।" এই-না বলে আর-এক ড্যালা পনির বার করে সে গড়িয়ে দিল। পনিরের ড্যালা দুটো ফিরল না। তাই আর একটা ড্যালা সে গড়িয়ে দিল। ভেবেছিল আগের ড্যালাদুটো হয়তো অপেক্ষা করছিল সঙ্গীর জন্য। কিন্তু কোনোটাই না ফিরতে সে বলল, "কিছুই বুঝছি না। হয়তো তৃতীয়টা পথ হারিয়ে ফেলেছে। তাই তাদের ডাকতে চতুর্থটাকে পাঠাই।" কিন্তু চতুর্থ ড্যালাটাও তৃতীয়টার চেয়ে ভালো ব্যবহার করল না। তখন ভীষণ রেগে ক্যাথারিন-লিজ্ ছুঁড়ে ফেলল পঞ্চম আর ষষ্ঠ ড্যালাটা। সেটাই ছিল তার পনিরের শেষ ড্যালা। খানিক তাদের জন্য সে অপেক্ষা করল। কিন্তু সেগুলো না ফেরায় সে চেঁচিয়ে বলল, "তোমরা তো আচ্ছা লোক দেখছি! তোমরা কি ভেবেছ তোমাদের জন্যে আর আমি এখানে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকব? আমি এগুচ্ছি। তোমরা আমার পেছনে পেছনে ছুটে আসতে পার। আমার চেয়ে তোমাদের পা অনেক তরুণ।"

এই-না বলে এগিয়ে ফ্রেডির নাগাল ধরল ক্যাথারিন-লিজ্। ফ্রেডি তার জন্য থেমে অপেক্ষা করছিল। কারণ তার খিদে পেয়েছিল। সে

বলল, "যা এনেছ দাও।" ক্যাথারিন-লিজ্ তাকে দিল শুকনো রুটি।

ফ্রেডি প্রশ্ন করল, "মাখন আর পনির কোথায়?"

ক্যাথারিন-লিজ্ বলল, "মাখন দিয়ে আমি পথের চাকার দাগে প্রলেপ দিয়েছি। পনিরের ড্যালাগুলো শিগ্‌গিরই এখানে পৌঁছবে। একটা আমার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। তাই অন্যগুলোকে পাঠিয়েছি সেটাকে ডেকে আনতে।"

ফ্রেডি বলল, "পথে মাখনের প্রলেপ দেওয়া আর পনিরের ড্যালাগুলো পাহাড় থেকে গড়িয়ে ফেলা—কাজটা তুমি ভালো করো নি, ক্যাথারিন-লিজ্।"

সে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ, ফ্রেডি। কিন্তু আগে থাকতে তোমার বারণ করে দেওয়া উচিত ছিল।"

তার পর শুকনো রুটি তারা একসঙ্গে খেলে পর ফ্রেডি বলল, "ক্যাথারিন-লিজ্, বেরুবার সময় ঘরের তালা দিয়ে এসেছিলে তো?"

"না ফ্রেডি, সে কথা তোমার বলে দেওয়া উচিত ছিল।"

"তা হলে আর এগুবার আগে বাড়ি গিয়ে তুমি সেটাকে নিরাপদ করে তালা দিয়ে এসো আর এনো আরো কিছু খাবার। তোমার জন্যে এখানে আমি অপেক্ষা করব।"

ক্যাথারিন-লিজ্ বাড়ি ফিরে ভাবল, 'মনে হয় ফ্রেডি মাখন আর পনির ভালোবাসে না। তার জন্যে এক থলি বাদাম আর এক জাগ্ ভিনিগার নিয়ে যাই।' তার পর দরজার উপরকার অংশে সে তালা দিল আর নীচের অংশটা কবজা থেকে খুলে কাঁধে নিয়ে সে ভাবল—দরজাটা সঙ্গে নিয়েছে বলে বাড়িটা নিশ্চয়ই নিরাপদ থাকবে। বেশ দেরি করে ফিরল ক্যাথারিন-লিজ্। ভাবল, 'দেরি করে ফেরায় ফ্রেডি অনেকক্ষণ বিশ্রাম নেবার সময় পাবে।" তার কাছে পৌঁছে সে বলল, "এই নাও ফ্রেডি দরজাটা। বাড়িটা এবার নিশ্চয়ই নিরাপদে থাকবে।"

ফ্রেডি চেঁচিয়ে উঠল, "হায় ভগবান! বউয়ের আমার কী বুদ্ধি! দরজার নীচের অংশ খুলে এনেছে। এখন যে-কেউ তার মধ্যে যেতে পারে। এখন আবার বাড়ি যাবার সময় নেই।—তুমি, বউ, দরজাটা যখন এতটাই বয়ে এনেছ তখন আরো খানিক বয়ে নিয়ে চল।"

"দরজাটা আমি কাঁধে নিচ্ছি। কিন্তু বাদামের থলি আর ভিনিগারের

জাগ্‌টা বেজায় ভারি। তাই এগুলো দরজায় ঝুলিয়ে দিলাম। দরজাটাই ওদের বয়ে নিয়ে চলুক।"

তার পর বনে গিয়ে চোরদের তারা খোঁজাখুঁজি করল। কিন্তু তাদের দেখা পেল না। অন্ধকার হয়ে যেতে রাত কাটাবার জন্য তারা উঠল একটা গাছে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এল চোরগুলো। যে গাছে ফ্রেডি আর ক্যাথারিন-লিজ্‌ উঠেছিল সেই গাছটারই তলায় বসে আগুন জ্বালিয়ে লুঠের মাল তারা ভাগ-বাঁটারা করতে লাগল। গাছটার অন্য পাশ দিয়ে নেমে ফ্রেডি তার পকেট বোঝাই করে নিল পাথরের টুকরো দিয়ে। তার পর গাছের উপর উঠে চোরদের উপর পাথরগুলো ছুঁড়তে লাগল। কিন্তু একটা পাথরও তাদের গায়ে লাগল না। চোররা বলল, "শিগ্‌গির ভোর হবে, কারণ বাতাসের ঝাপটায় ফার্‌গাছের ফলগুলো ঝরছে।"

ক্যাথারিন-লিজ্‌-এর কাঁধে তখনো ছিল দরজাটা। সেটায় কাঁধে চাপ পড়তে সে ভাবল বাদামগুলোর জন্যই চাপ পড়েছে। তাই সে বলল, "ফ্রেডি, বাদামগুলো আমি ছুঁড়ে ফেলছি।"

ফ্রেডি বলল, "না ক্যাথারিন-লিজ্‌, এখন না। বাদামগুলো পড়লে চোররা আমাদের কথা জেনে যাবে।"

"ফ্রেডি, আমাকে ফেলতেই হবে। ওগুলো আমার ওপর ভীষণ চাপ দিচ্ছে।"

"তা হলে ফেল।" বাদামগুলো ডালপালার মধ্যে দিয়ে গড়িয়ে পড়তে চোররা বলে উঠল, "শিলাবৃষ্টি হচ্ছে।" দরজাটা তখনো তার কাঁধে জোর চাপ দেওয়ায় ক্যাথারিন-লিজ্‌ বলল, "ফ্রেডি ভিনিগারটা আমায় ঢালতে হচ্ছে।"

"না ক্যাথারিন-লিজ্‌, ওটা কোরো না। চোররা আমাদের কথা জেনে যেতে পারে।"

"ফ্রেডি, আমাকে ঢালতেই হবে। ওটা আমার ওপর ভীষণ চাপ দিচ্ছে।"

"তা হলে ঢালো।" উপর থেকে সে ভিনিগার ঢালতে চোরদের উপর সেটা ছড়িয়ে পড়ল আর তারা বলে উঠল, "খুব শিশির পড়ছে।"

শেষটায় ক্যাথারিন-লিজ্‌ ভাবল, 'আসলে দরজাটাই কি এরকম চাপ দিচ্ছে?' তাই সে বলল, "ফ্রেডি, দরজাটা আমায় ফেলতে হচ্ছে।"

"না ক্যাথারিন-লিজ্, এখন না। চোররা আমাদের কথা জেনে যেতে পারে।"

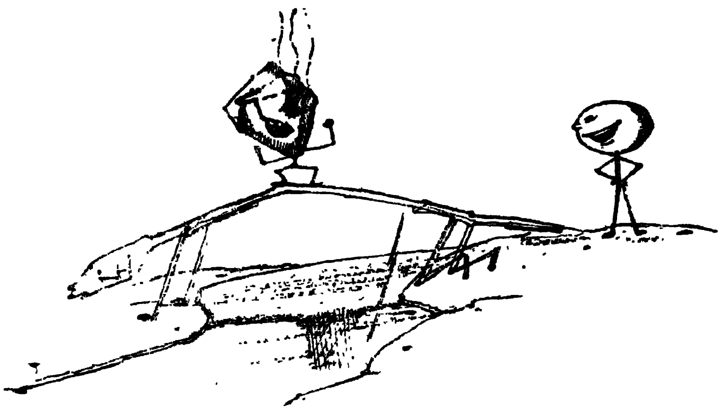
"ফ্রেডি, আমাকে ফেলতেই হচ্ছে। ভীষণ চাপ দিচ্ছে এটা।"

"না ক্যাথারিন-লিজ্, শক্ত করে ধরে থাকো।"

"না ফ্রেডি, আর পারছি না, এই ফেলে দিলাম।"

চটে উঠে ফ্রেডি বলল, "তা হলে ফেল। ঝামেলা চুকে যাক।"

ভীষণ শব্দ করে দরজাটা আছড়ে পড়ল। আর গাছ তলায় চোর-গুলো আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল, "গাছ থেকে একটা দানব নামছে!" এই-না বলে নিজেদের সব জিনিসপত্র ফেলে তারা ছুটে পালাল। সকালে গাছ থেকে নেমে ফ্রেডি আর ক্যাথারিন-লিজ্ পেয়ে গেল নিজেদের সব টাকা আর মনের আনন্দে সেগুলো তারা নিয়ে গেল নিজেদের বাড়িতে।



খড়, মটরশুঁটি আর কয়লা

এক কালে এক গ্রামে থাকত এক বুড়ি। এক থালা মটরশুঁটি তোলার পর সেগুলো রান্না করার তোড়জোড় সে করতে লাগল। উনুনটা ধরিয়ে আঁচ গণগণে করে তোলার জন্য সে তাতে ভরল একমুঠো খড়। মটরশুঁটিগুলো হাঁড়িতে ফেলার সময় তাদের একটা মেঝের উপর একটা খড়ের পাশে গিয়ে পড়ল, বুড়ি সেটা লক্ষ্য করে নি। খানিক পরে গণগণে এক টুকরো কয়লা উনুন থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল তাদের কাছে।

খড়টা বলতে শুরু করল, "বন্ধু, কোথা থেকে আসছ?"

কয়লা বলল, "ভাগ্যি ভালো—আগুনের কাছ থেকে পালাতে পেরেছি। পালাতে চেষ্টা না করলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতাম।"

মটরশুঁটি বলল, "গোটা চামড়া নিয়ে আমিও পালাতে পেরেছি। না পারলে বুড়ি আমাকে হাঁড়িতে ভরত আর আমার সঙ্গীদের সঙ্গে আমাকেও সুপ্ হয়ে মরতে হত।"

খড় বলল, "আমারও হত একই দশা। আমার সব ভাইরা কুঁচকে কুঁকড়ে ধোঁয়া হয়ে গেছে। বুড়ির আঙুলের ফাঁক দিয়ে ফস্কে পড়তে না পারলে আমাকেও মরতে হত।"

কয়লা প্রশ্ন করল, "এখন আমরা করি কী?"

উত্তরে মটরশুঁটি বলল, "আমার মনে হয় প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছি বলে ভবিষ্যতে একসঙ্গেই আমাদের থাকা দরকার। এখানে থাকলে হয়তো নতুন একটা বিপদে পড়ব। তাই এখনই অন্য কোনো দেশে যাত্রা করা যাক।"

তার প্রস্তাবে সবাই রাজি হল আর সঙ্গে সঙ্গে তারা পড়ল বেরিয়ে। খানিক পরে তারা পৌঁছল ছোট্টো একটা নদীর তীরে। সেখানে কোনো সাঁকো না থাকায় তারা ভেবে পেল না কী করে পেরুবে। খড় বলল, সে শুয়ে পড়বে, তা হলে অন্যরা তাকে ব্যবহার করতে পারবে সাঁকো হিসেবে। তার কথায় সবাই রাজি হতে খড় নদীর এ-তীর থেকে ও তীর পর্যন্ত আড়াআড়ি শুয়ে পড়ল। ভারিক্কি চালে সেই নতুন সাঁকোর উপর দিয়ে যেতে শুরু করল কয়লা। মাঝামাঝি এসে নীচে জল দেখে দারুণ ঘাবড়ে সে থেমে গেল, এক ইঞ্চি এগুবার সাহস হল না। ফলে খড় পুড়তে শুরু করল আর দেখতে দেখতে দু টুকরো হয়ে পড়ে গেল নদীতে। তার পরেই গড়িয়ে পড়ল কয়লা আর জলের ছোঁয়া লাগতেই হিস্‌হিস্ করে অক্কা পেল। অতি সন্তর্পণে তীরে দাঁড়িয়ে ছিল মটরশুঁটি। তামাশাটা দেখে হেসে সে গড়িয়ে পড়ল আর হাসতে হাসতে সেটা গেল ফেটে। তারও দফা রফা হয়ে যেত; কিন্তু নদীটার তীরে বিশ্রাম করছিল এক দর্জি। লোকটা খুব দয়ালু। তাই ছুঁচ সুতো বার করে মটরশুঁটিকে সে সেলাই করে দিল। মটরশুঁটি তাকে জানাল আন্তরিক ধন্যবাদ। কিন্তু কালো সুতো দিয়ে সেলাই করে দিয়েছিল বলে তার পর থেকে মটরশুঁটির দানাগুলোর চার পাশে থাকে কাল একটা দাগ।

দুই ভাই

এক সময় দুই ভাই ছিল। একজন ধনী, একজন গরিব। ধনী ভাই স্যাকরা। লোকটাও পাজি। গরিব ভাই ঝাঁটা বানিয়ে সংসার চালায়। লোকটা ভালো আর সৎ। গরিব ভাইয়ের দুই ছেলে। তারা যমজ। চেহারা হুবহু এক—যেন দু ফোঁটা জল। মাঝে মাঝে ধনী স্যাকরার বাড়ি যায়, এঁটোকাঁটা কুড়িয়ে আনে। এখন হল কি, গরিব লোকটি একদিন বনে গেছে কাঠকুটো কুড়ুতে। সেখানে দেখে সোনার একটা পাখি। জীবনে অমন সুন্দর পাখি সে দেখে নি। একটা ছোটো পাথর তুলে পাখিটার দিকে সে ছুঁড়ল আর অবাক হয়ে দেখল পাখির গায়ে সেটা লেগেছে। পাথর লাগতে সোনার একটা পালক পড়ল আর পাখিটা গেল উড়ে। সোনার পালকটা কুড়িয়ে নিয়ে সে গেল তার স্যাকরা ভাইয়ের কাছে। ভাই তাকে দিল অনেক টাকাকড়ি। কারণ পালকটা ছিল খাঁটি সোনার। পরদিন ডালপালা কাটার জন্য লোকটি উঠল এক বার্চগাছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই পাখিটাই গেল উড়ে। এদিক-ওদিক তাকাতে তার চোখে পড়ল পাখির বাসায় রয়েছে সোনার একটা ডিম। স্যাকরা-ভাইয়ের কাছে ডিমটা নিয়ে যেতে তাকে সে বলল, "এটা খাঁটি সোনা।" তার পর ডিমের বদলে তাকে দিল অনেক টাকাকড়ি। তার পর স্যাকরা বলল, "এবার কিন্তু আসল পাখিটা চাই।" গরিব লোকটি তৃতীয়বার বনে গিয়ে দেখে একটা ডালে বসে আছে পাখিটা। পাথর ছুঁড়তেই পাখিটা মরে পড়ে গেল। স্যাকরার কাছে সেটা নিয়ে যেতে গরিব ভাইকে সে দিল অনেক-অনেক টাকাকড়ি।

গরিব ভাই ভাবল, "যাক, এবার আমার দুঃখ-দুর্দশা ঘুচবে।" খুব খুশি হয়ে সে বাড়ি ফিরল।

স্যাকরা ছিল খুব চালাক আর ধূর্ত। বউকে ডেকে সে বলল, "পাখিটাকে আগুনে ঝলসে আমায় খেতে দাও। এটার কোনো-কিছু যেন বাদ না পড়ে। একলা বসে আমি এটা খাব। এটা সাধারণ পাখি নয়। এটার কলজে আর মেটুলি যে খাবে প্রতিদিন সকালে বালিশের নীচে সে পাবে একটা করে মোহর। পাখিটার পালক ছাড়িয়ে শিকে বেঁধে ঝলসাবার জন্য তার বউ সেটা উনুনে চড়াল। তার পর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে তাকে যেতে হল অন্য কাজে। আর ঠিক সেই সময় রান্নাঘরে হাজির হল ঝাঁটাওয়ালার যমজ ছেলেরা। শিকটার দু পাশে দাঁড়িয়ে বার দুই সেটা তারা ঘোরাল।

শিকের তলার চাটুতে পাখির ছোট্টো দুটো টুকরো পড়তে একজন অন্য জনকে বলল, "এই ছোট্টো দুটো টুকরো খেলে কেউ টের পাবে না। আমার ভারি ক্ষিদে পেয়েছে। আয়, খেয়ে নি।"

এই-না বলে সেই ছোট্টো টুকরো দুটো তারা খেয়ে ফেলল। এমন সময় স্যাকরা-বউ রান্নাঘরে এসে দেখে কী যেন তারা চিবুচ্ছে। সে প্রশ্ন করল, "কী তোরা নিয়েছিস?"

তারা বলল, "ছোট্টো দুটো টুকরো—পাখিটার গা থেকে পড়ে গিয়েছিল।

তাই-না শুনে স্যাকরা বউ চেঁচিয়ে উঠল, "কী সর্বনাশ! তোরা দেখছি কলজে আর মেটুলি খেয়ে ফেলেছিস!" তার পর স্যাকরা যাতে টের না পায় তার জন্য একটা মোরগ মেরে সেটার কলজে আর মেটুলি সে ভরে দিল সোনার পাখির মধ্যে। ভালো করে ঝলসাবার পর পাখিটা সে নিয়ে গেল স্যাকরার কাছে। চেটেপুটে সবটা একাই খেল স্যাকরা, প্লেটে ছোট্টো একটি টুকরোও পড়ে রইল না। পরদিন সকালে কিন্তু মোহরের জন্য বালিশের তলা হাতড়ে কিছুই সে পেল না।

নিজেদের সৌভাগ্যের কথা যমজ ছেলে দুটি জানত না। পরদিন সকালে বিছানা থেকে ওঠার পর মেঝেয় ঠং করে শব্দ শুনে ঝুঁকে তারা দেখে সোনার দুটো মোহর পড়ে রয়েছে। মোহর দুটো তাদের বাবার কাছে নিয়ে যেতে সে ভীষণ অবাক হল। ভেবে পেল না সেগুলো কোথা থেকে এসেছে। পরদিন সকালে আবার একই ঘটনা ঘটতে দেখে সে হল আরো অবাক। তার পর থেকে প্রতি সকালেই আসতে

লাগল দুটো করে মোহর। শেষটায় ঝাঁটাওয়ালা তার ভাইয়ের কাছে গিয়ে এই অদ্ভুত ঘটনার সব কথা জানাল।

স্যাকরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝল ছেলেরা তার সোনার পাখির কলজে আর মেটুলি খেয়েছে। লোকটা ছিল ভারি পাজি আর হিংসুটে প্রতিহিংসা নেবার জন্য ভাইকে সে বলল, "শয়তানের সঙ্গে তোমার ছেলেরা ষড় করেছে। মোহরগুল নিয়ো না। ছেলেদেরও বাড়িতে রেখো না। রাখলে তোমার সর্বনাশ হবে।"

ধনী লোককে গরিব ভাই খুব ভয় করত। বিষন্ন মনে ছেলেদের সে বনে ছেড়ে দিয়ে এল। পাগলের মতো ছেলেরা এদিক-সেদিক ছুটো-ছুটি করল। কিন্তু বাড়ি ফেরার পথ খুঁজে না পেয়ে বেজায় ঘাবড়ে পড়ল। এমন সময় তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এক শিকারীর। সে জিগ্‌গেস করল, কার ছেলে তারা।

তারা বলল, "আমাদের বাবা গরিব ঝাঁটাওয়ালা।" তার পর একে-একে জানাল সব কথা। বলল, রোজ সকালে তাদের বালিশের তলায় মোহর পাওয়া যায় বলে বাবা তাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

শিকারী বলল, "রোজ-রোজ মোহর পাওয়া তো খুবই ভালো কথা। আর তোমরাও দেখছি কুঁড়ে নও।"

ছেলে দুটিকে শিকারীর খুব ভালো লাগল। তার কোনো ছেলেপুলেও ছিল না। তাই তাদের নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বলল, "আজ থেকে আমিই তোমাদের বাবা হলাম। তোমাদের আমি মানুষ করব।"

তাদের সে বনরক্ষীর কাজ শেখাল। প্রতিদিন সকালে তাদের বালিশের তলায় যে মোহরগুলো পাওয়া যেত, সেগুলো সে জমিয়ে রাখল ছেলেদের ভবিষ্যতের জন্য।

তারা বড়ো হয়ে ওঠার পর শিকারী একদিন তাদের বনে নিয়ে গিয়ে বলল, "এবার তোমাদের বন্দুক ছোঁড়ার পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষায় পাশ করতে পারলেই বলব তোমরা দক্ষ শিকারী হয়েছ।"

বনের মধ্যে তারা অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু অনেকক্ষণ শিকারের কোনো জীবজন্তুর দেখা পাওয়া গেল না। শিকারী এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল একদল তুষার-ধবল হাঁস ত্রিভুজের আকারে আসছে উড়ে। শিকারী তখন এক ভাইকে বলল, "প্রত্যেক কোণের একটা করে হাঁসকে গুলি করো।" সেই ভাই

শিকারীর কথামতো গুলি ছুঁড়ে বন্দুক চালানোর পরীক্ষায় পাশ করল। খানিক পরে আর-এক দল হাঁস উড়ে আসতে অন্য ভাইকেও শিকারী বলল, প্রত্যেক কোণের একটা করে হাঁসকে গুলি করতে। বন্দুক চালানোর পরীক্ষায় সেই ভাইও পাশ করল।

তাদের পালক-পিতা তখন বলল, "তোমরা দুজনেই ভালো করে সব-কিছু শিখেছ। তোমরা দুজনেই দক্ষ শিকারী হয়েছ বলে স্বীকার করলাম।"

তার পর দুভাই বনের মধ্যে আরো খানিকটা গিয়ে পরামর্শ করে নিল আর সন্ধেয় পালক-পিতার সঙ্গে খেতে বসে তাকে তারা বলল, "আপনার কাছে আমাদের একটা অনুরোধ আছে। সেটা রক্ষা না করলে আমরা খাব না।"

শিকারী প্রশ্ন করল, "কী তোমাদের অনুরোধ?"

তারা বলল, "আমরা সব-কিছু শিখেছি। দেশ-বিদেশ তাই ঘুরে আসতে চাই। আমাদের যেতে অনুমতি দিন।"

বুড়ো শিকারী বলল, "আনন্দের সঙ্গেই তোমাদের অনুমতি দিলাম। সাহসী লোকের মতোই তোমরা অনুরোধ করেছ। তোমরা যে দেশ-ভ্রমণে বেরোও—আমিও সেটা চাই। তোমরা বেরিয়ে পড়। তোমাদের মনে-প্রাণে আশীর্বাদ করছি।"

তার পর হাসিখুশি গল্প-গুজবের মধ্যে তারা রাতের খাওয়া শেষ করল। যাত্রার দিন শিকারী তাদের প্রত্যেককে দিল একটা করে বন্দুক আর কুকুর আর বলল তাদের জমানো মোহর যত খুশি নিতে। পালক-পিতা খানিকটা পথ তাদের সঙ্গে গেল। বিদায় নেবার সময় প্রত্যেককে একটা করে ধারাল ছুরি দিয়ে বলল, "কখনো তোমাদের ছাড়াছাড়ি হলে ছুরিটা গাছে গেঁথে দিয়ো। তা হলে অন্যজন জানতে পারবে অনুপস্থিত ভাই কেমন আছে। ছুরির খোলা দিকে মর্চে পড়লে বুঝবে, সে মরে গেছে। কিন্তু ধারাল আর চকচকে থাকলে বুঝবে, সে আছে বেঁচে।"

যেতে যেতে যেতে যেতে দু ভাই পেঁাছল প্রকাণ্ড এক বনে। সেটা এমনই বিরাট যে এক দিনে পার হওয়া অসম্ভব। তাই তারা নিজেদের থলি থেকে খাবার বার করে খেয়ে সেখানে রাত কাটাল। দ্বিতীয় দিনেও কিন্তু বন থেকে তারা বেরুতে পারল না। এদিকে খাবারও গিয়েছিল ফুরিয়ে। তাই এক ভাই অন্য ভাইকে বলল, "কোনো-কিছু শিকার

করতে না পারলে আমাদের উপোস করতে হবে।" এই-না বলে বন্দুকে গুলি ভরে চার দিকে সে লাগল তাকাতে।

এমন সময় সামনের একটা ঝোপ থেকে বেরুল বুড়ো একটা খরগোশ। তার দিকে বন্দুক টিপ করতেই খরগোশ চেঁচিয়ে উঠল, "শিকারী-ভায়া, আমাকে মেরো না। আমার বাচ্চাদের দিচ্ছি।" এই-না বলে ঝোপের মধ্যে দৌড়ে গিয়ে বুড়ো খরগোশ নিয়ে এল তার ছোট্টো বাচ্চাকে। বাচ্চাদুটো এমন খুশি হয়ে লুটোপুটি করে খেলতে লাগল যে, ভাইরা প্রাণ ধরে তাদের গুলি করতে পারল না।

খরগোশের বাচ্চাদুটো তাদের পিছন-পিছন চলল। খানিক পরে এক শেয়ালকে দেখে তারা বন্দুক তুলল। কিন্তু শেয়াল চেঁচিয়ে উঠল, "শিকারী ভায়া আমাকে মেরো না। আমার বাচ্চাদের দিচ্ছি।" এই-না বলে শেয়াল তার দুটো ছানাকে এনে তাদের পায়ের কাছে রাখল। সে দুটোকেও তারা মারল না। খরগোশ বাচ্চাদের সঙ্গী হিসাবে তাদের তারা নিল।

খানিক পরে ঝোপ থেকে বেরুল এক নেকড়ে। তারা বন্দুক তুলতেই নেকড়ে চেঁচিয়ে উঠল, "শিকারী ভায়া, আমাকে মেরো না। আমার বাচ্চাদের দিচ্ছি।" নেকড়ে তার ছানাদুটাকে তাদের পায়ের কাছে রাখল। তারাও অন্য বাচ্চাদের সঙ্গী হল।

তার পর এল এক ভালুক। সেও বলল, "শিকারী ভায়া আমাকে মেরো না। আমার বাচ্চাদের দিচ্ছি।" ভালুক ছানারাও অন্যদের সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলতে লাগল। তার পর ভাব দিকিনি কোন জন্তু এল?—এল কেশর নাড়িয়ে এক সিংহ।

শিকারীরা কিন্তু ভয় না পেয়ে বন্দুক তুলতেই অন্যদের মতো সিংহও বলে উঠল, "শিকারী-ভায়া, আমাকে মেরো না। আমার বাচ্চাদের দিচ্ছি।" এই-না বলে বাচ্চাদের সে এনে দিল। শিকারীদের সঙ্গে তখন রইল দুটো সিংহ, দুটো ভালুক, দুটো নেকড়ে, দুটো শেয়াল আর দুটো খরগোশ। তারা চলল তাদের পিছন-পিছন।

এদিকে ভাইদের তখন খিদেয় পেট চুঁই চুঁই করছে। তাই শেয়াল-ছানাদের তারা বলল, "শেয়ালরা তো ভারি ধূর্ত হয়। আমাদের জন্যে কিছু খাবার এনে দে। খাবার কোথায় পাওয়া যায় নিশ্চয়ই তোদের জানা আছে।"

শেয়াল-ছানারা বলল, "কাছেই একটা গ্রাম আছে। সেখান থেকে অনেক মোরগ আমরা এনেছিলাম। সেই গ্রামের পথ তোমাদের দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।"

গ্রামটায় পৌঁছে নিজেদের আর তাদের জন্তু-জানোয়ারদের জন্যে খাবার কিনে তারা চলল এগিয়ে। কাছেপিঠের সব গোলাবাড়ির খবর জানত শেয়ালরা। শিকারী যমজ-ভাইদের সব-কিছু খবরাখবর তারা দিতে লাগল।

কিছুদিন এইভাবে তারা চলল। কিন্তু একসঙ্গে থেকে তারা দেখল, কোনোরকম কাজকর্ম পাচ্ছে না। শেষটায় তাই এ ওকে বলল, "এভাবে আর চলে না। আমাদের আলাদা আলাদা পথে এবার থেকে যেতে হয়।" জন্তুগুলোকে তারা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিল। প্রত্যেকেই তারা নিল একটা করে সিংহ, ভালুক, নেকড়ে, শেয়াল আর খরগোশ। তার পর বিদায় নেবার সময় তারা বলল, চিরকাল পরস্পরকে তারা ভালোবাসবে। পালক-পিতা যে-ছুরি তাদের দিয়েছিল সেটা গাছে গেঁথে একজন গেল পুবে, অন্যজন পশ্চিমে।

জন্তুদের নিয়ে এক ভাই পৌঁছল এক শহরে। আগাগোড়া শহরটা পাতলা কালো রেশমী শোকের কাপড়ে মোড়া। এক সরাইখানায় গিয়ে সরাইখানার মালিককে সে বলল, তার জন্তু-জানোয়ারদের আস্তাবলে রাখতে। মালিক তাকে দিল একটা আস্তাবল। সেটায় ছিল একটা গর্ত। সেই গর্ত দিয়ে গিয়ে তার জন্য খরগোশ নিয়ে এল একটা বাঁধাকপি। শেয়াল নিয়ে এল একটা মুরগি। আর তার পর একটা মোরগ। সেগুলো সব রান্নাবান্না করে সে খেল। কিন্তু গর্তটা এতই ছোটো যে, সেটার ভিতর দিয়ে গলতে পারল না নেকড়ে, ভালুক আর সিংহ। সরাইখানার মালিক তাই তাদের নিয়ে গেল একটা মাঠে। সেখানে একটা গোরু শুয়েছিল। পেট ভরে খেল তারা গোরুটার মাংস। জন্তু-জানোয়ারদের খাবার দাবার খাইয়ে সরাইখানার মালিককে সে প্রশ্ন করল,—"শহর আর সরাইখানার সবাই শোকে মুষড়ে পড়েছে কেন?"

সরাইখানার মালিক বলল, "কারণ কাল আমাদের রাজার একমাত্র মেয়েকে মরতে হবে।"

সে প্রশ্ন করল, "রাজকন্যের কি খুব অসুখ?"

সরাইখানার মালিক বলল, "না, না! রাজকন্যের স্বাস্থ্য খুব ভালোই। কিন্তু তা হলেও তাকে মরতে হবে!"

"কেন মরতে হবে!"

"শহরের বাইরেকার উঁচু পাহাড়ে একটা ড্রাগন থাকে। প্রতি বছরেই তার দরকার একটি করে কুমারী মেয়ের। তা না হলে সমস্ত রাজ্য সে ধ্বংস করে ফেলবে। এখন এখানে আর কোনো কুমারী নেই। বাকি শুধু রাজকন্যে। কাল তাই রাজকন্যেকে যেতে হবে ড্রাগনের কাছে।"

শিকারী-ভাই জানতে চাইল, ড্রাগনটাকে কেন মেরে ফেলা হয় নি।

সরাইখানার মালিক বলল, "অনেক রাজপুত্তুর তাকে মারতে গিয়ে মরেছে। রাজা ঘোষণা করেছেন ড্রাগনটাকে যে মারতে পারবে তার সঙ্গে রাজকন্যের বিয়ে দেবেন আর তাঁর মৃত্যুর পর সেই বসবে সিংহাসনে।

সেই শিকারী-ভাই তখন আর কিছু বলল না। কিন্তু পরদিন সকালে নিজের জন্তুদের নিয়ে সে গিয়ে উঠল ড্রাগনের পাহাড়ে। পাহাড়ের চুড়োয় ছিল ছোট্টো একটি গির্জে আর তার বেদীর উপর কানায় কানায় ভরা তিনটি গব্‌লেট[১]। সেগুলোয় লেখা ছিল: 'যে কেউ এই পানপাত্রগুলো নিঃশেষ করতে পারবে সে-ই হবে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে শক্তিশালি লোক। দরজার চৌকাঠের নীচে যে তরোয়াল পোঁতা আছে দক্ষতার সঙ্গে সেটা সে পারবে চালনা করতে।'

গব্‌লেটগুলো থেকে পান না করে শিকারী গেল তরোয়ালটার খোঁজে। কিন্তু সেটাকে নাড়াতে না পেরে আবার গির্জের মধ্যে সে ফিরে গব্‌লেট-গুলো নিঃশেষ করল। সঙ্গে সঙ্গে সহজেই তরোয়ালটা ঘোরাবার শক্তি তার দেহে এল। তার পর নির্দিষ্ট সময়ে রাজকন্যেকে নিয়ে এলেন রাজা আর সভাসদ্‌বর্গ। দূর থেকে ড্রাগনের পাহাড়ে শিকারীকে দেখতে পেয়ে রাজকন্যের মনে হল, স্বয়ং ড্রাগন বুঝি তার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। ভয় পেয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু সে না গেলে সমস্ত শহর ছারখার হয়ে যাবে জানত বলে ধীরে-ধীরে সেই বিপজ্জনক পথ দিয়ে রাজকন্যে উঠে গেল। রাজা আর তার সভা-

[১] হাতলহীন বাটির মতো বড়ো পানপাত্র।

সদবর্গ বিষণ্ণ মনে বাড়ি ফিরে গেলেন। কিন্তু কী ঘটে দেখার জন্য দূরে দাঁড়িয়ে রইল রাজার মার্‌শাল্‌[1]। পাহাড়ে উঠে ড্রাগনের বদলে রাজকন্যে দেখল সেই শিকারীকে। রাজকন্যেকে সান্ত্বনা দিয়ে সে বলল, নিশ্চিত সে তার জীবন রক্ষা করবে। আর তার পর রাজকন্যেকে সেই গির্জের মধ্যে নিয়ে গিয়ে সে কুলুপ দিয়ে রাখল বন্ধ করে।

কয়েক মুহূর্ত পরে সাত-মাথাওয়ালা ড্রাগন ভয়ংকর হুংকার করতে-করতে এসে প্রশ্ন করল, "এখানে কী তোমার দরকার?"

শিকারী বলল, "আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই।"

ড্রাগন বলল, "তাই নাকি! আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে অনেক নাইট্‌[2] এইখানে মরেছে।" এই-না বলে চোদ্দোটা নাক দিয়ে সে আগুন ছিটোতে লাগল। ড্রাগনের উদ্দেশ্য ছিল শুক্‌নো ঘাসে আগুন ধরিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে শিকারীকে দম বন্ধ করে মারার। কিন্তু তার বিশ্বস্ত জন্তুর দল পড়িমরি করে ছুটে এসে পা দিয়ে মাড়িয়ে নিভিয়ে দিল সেই আগুন। ড্রাগন তখন শিকারীর দিকে ছুটে গেল, আর শিকারী তরোয়ালটা ঘুরিয়ে কেটে ফেলল তার তিনটে মাথা। এইবার সত্যি-সত্যি ক্ষেপে গিয়ে লাফ দিয়ে উঠে শিকারীর উপর সে ছড়াতে লাগল আগুনের স্রোত। কিন্তু শিকারী আবার তরোয়াল ঘুরিয়ে কেটে ফেলল তার আরো তিনটে মাথা। রক্তপাতের ফলে একেবারে কাবু হয়ে ড্রাগন তখন পৃথিবীতে আছড়ে পড়ল। তার পর যেই-না উঠে শিকারীকে সে আক্রমণ করতে যাবে, শিকারী তার তরোয়ালের প্রচণ্ড এক কোপে কেটে ফেলল তার শেষ মাথা আর লেজটা। সঙ্গে সঙ্গে শিকারীর বিশ্বস্ত জন্তুর দল ছুটে এসে টুকরো টুকরো করে ফেলল ড্রাগনের মৃতদেহটা।

যুদ্ধ শেষ হবার পর শিকারী গির্জের দরজা খুলে দেখে ভয়ে আর উৎকণ্ঠায় রাজকন্যে মেঝের উপর অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়েছে। তাকে সে কোলে করে খোলা বাতাসের মধ্যে নিয়ে এল আর তার জ্ঞান হতে ড্রাগনের কাটা-ছেঁড়া মৃতদেহ তাকে দেখিয়ে বলল—আর তার ভয় নেই।

[1] রাজকর্মচারী বিশেষ (আগে রাজার ঘোড়ার চিকিৎসার ভার তার উপর থাকত। পরে সামরিক ব্যবস্থা, অনুষ্ঠানাদির বিধিনিয়ম প্রণয়ন, শান্তি রক্ষা, আদব-কায়দার সংরক্ষণ প্রভৃতির ভার তার উপর পড়ে)।

[2] সামন্ততান্ত্রিক যুগের ভদ্রবংশের ও সম্মানজনক সামরিক পদে অধিষ্ঠিত সৈনিক।

রাজকন্যের তখন আনন্দ আর ধরে না। শিকারীকে সে বলল, "আমার বাবা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ড্রাগনকে যে মারবে তার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন। তাই এবার তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।" এই-না বলে তার প্রবালের হার খুলে সেই বিশ্বস্ত জন্তুদের সে ভাগ করে দিল দশটা গুটি। সিংহকে দিল সোনার ছোট্টো বক্‌লস্‌টা। শিকারীকে রাজকন্যে দিল সুতোয় তার নাম-লেখা পকেট-রুমাল। আর শিকারী গিয়ে ড্রাগনের সাতটা মাথা থেকে সাতটা জিভ কেটে সেই রুমালে জড়িয়ে নিজের কাছে রেখে দিল।

সেই আগুনের হলকায় আর যুদ্ধের পরিশ্রমে ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল শিকারী। রাজকন্যেকে তাই সে বলল—খানিক ঘুমিয়ে নেবে।

রাজকন্যে রাজি হতে তারা দুজন মাটির উপর শুয়ে পড়ল। সিংহকে শিকারী বলল, "তুমি পাহারা দিয়ো।" এই-না বলে শিকারী আর রাজকন্যে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

তাদের পাশে শুয়ে সিংহ পাহারা দিতে লাগল। কিন্তু সারাদিনের পরিশ্রমে সে-ও খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই ভালুককে সে বলল, "আমার পাশে শুয়ে পড়ো। আমি একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছি। কেউ এলে আমায় জাগিয়ে দিয়ো।"

সিংহর পাশে ভালুক শুয়ে পড়ল। কিন্তু সে-ও খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বলে নেকড়েকে ডেকে বলল, "আমার পাশে শুয়ে পড়ো। আমি একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছি। কেউ এলে আমায় জাগিয়ে দিয়ো।"

নেকড়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু সে-ও খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বলে শেয়ালকে বলল, "আমার পাশে শুয়ে পড়ো। আমি একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছি কেউ এলে আমায় জাগিয়ে দিয়ো।"

শেয়াল শুয়ে পড়ল। কিন্তু সে-ও খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বলে খরগোশকে বলল, "আমার পাশে শুয়ে পড়ো। আমি একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছি। কেউ এলে আমায় জাগিয়ে দিয়ো।"

খরগোশ তার পাশে গিয়ে বসল। কিন্তু সে বেচারার ফরমাশ করার কেউ ছিল না। আর সে-ও পড়েছিল ক্লান্ত হয়ে। তাই সে-ও পড়ল ঘুমিয়ে। এইভাবে সবাই তারা ঘুমিয়ে পড়ল—শিকারী, রাজকন্যে, সিংহ, ভালুক, নেকড়ে, শেয়াল আর খরগোশ।

মার্‌শাল্‌ সর্বক্ষণ ছিল কাছেই দাঁড়িয়ে। সে দেখেছিল রাজকন্যেকে

ড্রাগন নিয়ে যায় নি। পাহাড়ের মধ্যে সব-কিছু চুপচাপ দেখে এবার সে সাহস করে সেখানে উঠল। উঠে দেখে ড্রাগনের কাটাছেঁড়া শরীর আর তার কিছুদূরে শিকারী আর রাজকন্যে আর সব জন্তুদের ঘুমিয়ে থাকতে। লোকটা ছিল পাজি আর শয়তান। তাই সে শিকারীর মুণ্ডু কেটে, রাজকন্যেকে কোলে তুলে পাহাড় থেকে নামতে লাগল। রাজ-কন্যের ঘুম তখন গেল ভেঙে। ভয়ে সে থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগল।

মার্‌শাল্‌ তাকে বলল, "তুমি এখন আমার কবলে। আমরা বাড়ি ফেরার পর বলবে—ড্রাগনটাকে মেরেছি আমি।"

রাজকন্যে বলল, "সে কথা বলতে আমি পারব না। কারণ ড্রাগনকে মেরেছে শিকারী আর তার জন্তুরা।"

মার্‌শাল্‌ তখন খাপ থেকে তার তরোয়াল বার করে শাসিয়ে বলল—তার কথামতো কাজ না করলে রাজকন্যেকে মেরে ফেলবে। রাজকন্যে তখন ভয় পেয়ে বাধ্য হল তার কথায় সায় দিতে।

তার পর রাজকন্যেকে সে নিয়ে গেল রাজার কাছে। রাজা ভেবে-ছিলেন তাঁর মেয়েকে ড্রাগন কেটে ছিঁড়ে মেরে ফেলেছে। তাই অক্ষত শরীরে মেয়েকে ফিরতে দেখে তাঁর আনন্দ আর ধরে না। মার্‌শাল্‌ বলল—ড্রাগনকে সে মেরে রাজ্যের সবাইকে সে উদ্ধার করেছে; তাই রাজকন্যের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে হবে।

রাজকন্যেকে রাজা প্রশ্ন করলেন, "মার্‌শাল্‌-এর কথাটা কি সত্যি?"

রাজকন্যে বলল, "মনে হয় কথাটা সত্যি। কিন্তু আমার একান্ত অনুরোধ—আজ থেকে এক বছর বিয়েটা মুলতুবি থাক।" সে আশা করেছিল এক বছরের মধ্যে সেই সাহসী শিকারীর খবর পাওয়া যাবে।

ড্রাগন-পাহাড়ের মৃত-প্রভুর পাশে তখনো ঘুমিয়েছিল জন্তুরা। একটা বড়োসড়ো ভোমরা উড়ে এসে বসল খরগোশের নাকে। থাবা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে খরগোশ ঘুমিয়ে চলল। দ্বিতীয়বার ভোমরা ফিরে এসে খরগোশের নাকে হুল ফোটাতে তার ঘুম ভাঙল। ঘুম ভাঙতেই খরগোশ জাগাল শেয়ালকে, শেয়াল নেকড়েকে, নেকড়ে ভালুককে আর ভালুক সিংহকে।

সিংহ জেগে উঠে যখন দেখল রাজকন্যে নেই আর তার প্রভু মরে পড়ে আছে তখন ভয়ংকর গর্জন করে সে চেঁচিয়ে উঠল, "কে এ-কাজ করল? ভালুক, আমাকে জাগাও নি, কেন?" ভালুক প্রশ্ন করল,

"নেকড়ে, আমাকে জাগাও নি কেন?" নেকড়ে প্রশ্ন করল, "শেয়াল, আমাকে জাগাও নি কেন?" আর শেয়াল প্রশ্ন করল, "খরগোশ, আমাকে জাগাও নি কেন?"

খরগোশ বেচারা কোনো অজুহাত খুঁজে পেল না। সব দোষ তাকে ঘাড় পেতে নিতে হল। অন্যরা তাকে সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে ফেলত। কিন্তু অনুনয় করে সে বলল, "আমাকে মেরো না। কারণ প্রভুকে আবার আমি বাঁচাতে পারি। আমি একটা পাহাড় জানি; সেখানে এমন লতা জন্মায় যেটা মুখে ঠেকালে সব অসুখ সারে, সব ক্ষত জোড়া লাগে। কিন্তু সেখানে যেতে আমার দুশো ঘণ্টা লাগবে।

সিংহ বলল, "চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেখান থেকে সেই লতা তোমায় আনতে হবে।"

প্রাণপণে ছুটল খরগোশ। আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই নিয়ে এল সেই আশ্চর্য লতা। শিকারীর কাটা মুণ্ডু সিংহ জোড়া দিল আর খরগোশ সেই লতা ঠেকাল তার মুখে। আর সঙ্গে সঙ্গে শিকারীর বুকের স্পন্দন ফিরে এল! আর সে বেঁচে উঠল।

জেগে উঠে রাজকন্যেকে দেখতে না পেয়ে শিকারী দারুণ ঘাবড়ে গেল। তার পর ভাবল, 'হয়তো আমাকে সে আর দেখতে চায় নি। তাই যখন ঘুমিয়ে ছিলাম সম্ভবত তখন সে চুপি চুপি চলে গেছে।'

তাড়াহুড়ো করে সিংহ তার প্রভুর মাথা উলটো করে জুড়েছিল। কিন্তু রাজকন্যের কথা ভাবতে ভাবতে শিকারী এমনই হয়ে পড়েছিল যে, দুপুরের আগে এই ভুলটা সে ধরতে পারে নি। দুপুরে খেতে শুরু করে ঘুমন্ত অবস্থায় কী-কী ঘটেছে প্রশ্ন করার সময় ভুলটা সে টের পায়। সিংহ তখন বলে যায়—কী ভাবে ক্লান্ত হয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল, জেগে উঠে কী ভাবে দেখে মুণ্ডু কাটা, কী ভাবে খরগোশ নিয়ে আসে সেই আশ্চর্য লতা আর কী ভাবে তাড়াহুড়োর মাথায় তার প্রভুর মুণ্ডু উলটো দিকে সে বসায়। সিংহ বলল—ভুলটা এক্ষুনি শুধরে নিচ্ছে। এই-না বলে এক থাবায় প্রভুর মুণ্ডু ছিঁড়ে নিয়ে সোজা করে সিংহ বসাল আর সঙ্গে সঙ্গে খরগোশ সেই আশ্চর্য লতা ছুঁইয়ে সেটা আবার জোড়া দিয়ে দিল।

শিকারী তার পর খুবই মনমরা হয়ে পড়ল। দেশে-দেশে এলো-মেলো সে ঘুরে বেড়ায়। পথে-পথে তার জন্তুদের নাচিয়ে পয়সাকড়ি

নেয়। এখন হল কি—যে শহরে রাজকন্যেকে সে ড্রাগনের কবল থেকে বাঁচিয়েছিল, তার ঠিক এক বছর পূর্ণ হবার দিন সে পৌঁছল সেই শহরে। শহরে তখন উড়ছে উৎসবের নানা রঙের পতাকা। সরাই-খানার মালিককে শিকারী প্রশ্ন করল, "মশাই, এই-সব লাল পতাকার মানে কী? গতবার এখানে যখন আসি তখন তো শহর মোড়া ছিল পাতলা কালো রেশমী কাপড়ে।

সরাইখানার মালিক বলল, "এক বছর আগে রাজকন্যেকে বলি দেবার কথা ছিল ড্রাগনের কাছে। কিন্তু রাজার মার্‌শাল্ যুদ্ধ করে ড্রাগনটাকে মেরেছে। মার্‌শাল্-এর সঙ্গে আজ তাই রাজকন্যের বিয়ে। আজ আর শহরটা তাই শোকের পাতলা কালো রেশমী কাপড়ে মোড়া নয় তার বদলে চারি দিকে ওড়ানো হয়েছে উৎসবের লাল পতাকা।"

পরের দিন বিয়ের দিন। শিকারী সরাইখানার মালিককে বলল, "কর্তা, আমার সঙ্গে একটা বাজি ধরবে? আমি বলছি, রাজার জন্যে তৈরি রুটি এই টেবিলে খাব। কী কত্তা, বাজি ধরবে?"

সরাইখানার মালিক বলল, "অসম্ভব। একশো মোহর বাজি ধরলাম।—তোমার কথা সত্যি হতেই পারে না।"

খরগোশকে শিকারী বলল, "খরগোশভায়া, তুমি তো সেরা দৌড়বাজ। রাজা যে-ধরনের রুটি খান ছুট্টে গিয়ে সেরকম রুটি নিয়ে এসো।"

সব চেয়ে ছোট্টো বলে খরগোশ জানত তাকেই যেতে হবে। কাজটা করার ফরমাশ অন্য কাউকে সে করতে পারবে না। সে ভাবল, 'পথ দিয়ে একা লাফাতে-লাফাতে গেলে কসাই-এর কুকুরগুলো নিশ্চয়ই আমাকে ধরবে।' আর সত্যি-সত্যি হলও ঠিক তাই। কসাই-এর কুকুরগুলো বেরিয়ে এসে তেড়ে গেল তাকে থাবা মারতে। খরগোশ কিন্তু এক লাফে প্রহরীর ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিল। প্রহরী টের পেল না। কুকুরগুলো ছুটে এসে চেষ্টা করল সেখান থেকে খরগোশকে বার করতে। কিন্তু প্রহরী তাদের এমন মুগুরপেটা করল যে, কেঁউ-কেঁউ করতে করতে কুকুরগুলো ছুটে পালাল। খরগোশ তখন লাফাতে লাফাতে রাজপ্রাসাদের মধ্যে সেঁধিয়ে সোজা রাজকন্যের কাছে গিয়ে তার চেয়ারের তলায় বসে সুড়সুড়ি দিতে শুরু করল রাজকন্যের পায়ে।

রাজকন্যে ভাবল তার পোষা কুকুরটা বুঝি পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। তাই চেঁচিয়ে উঠল, "যা যা, বিরক্ত করিস না।"

দ্বিতীয়বার খরগোশ তার পায়ে সুড়সুড়ি দিতে রাজকন্যে আবার ধমকে বলল, "তুই যাবি, না যাবি না ?" তখনো তার ধারণা কুকুরটা সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

তৃতীয়বার খরগোশ সুড়সুড়ি দিতে রাজকন্যে তাকাল চেয়ারের তলায় আর খরগোশের গলার হার দেখে চিনতে পারল তাকে।

তখন তাকে কোলে তুলে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে রাজকন্যে বলল, "কী চাস্ রে, খরগোশ ?"

খরগোশ বলল, "আমার প্রভু, ড্রাগনকে যিনি মেরেছিলেন, এখানে এসেছেন। বলেছেন, রাজা যে-রুটি খান তার একটা নিয়ে আসতে।"

খবর শুনে রাজকন্যে খুব খুশি হল। তার পর রুটিওয়ালাকে ডেকে বলল, রাজা যে রুটি খান তার একটা নিয়ে আসতে।

খরগোশ তখন বলল, "কসাই-এর কুকুরগুলো আমায় ধরতে পারে। তাই রুটিটা নিয়ে যেতে হবে রুটিওয়ালাকে।" রুটিটা নিয়ে রুটিওয়ালাকে তাই যেতে হল সরাইখানায়। সরাইখানার বসার ঘরের দোরগোড়ায় রুটিটা সে রাখল। সেখানে বসে ছিল খরগোশ। সামনেকার থাবা-দুটো দিয়ে রুটিটা ধরে সেটা সে নিয়ে গেল তার প্রভুর কাছে।

শিকারী তখন সরাইখানার মালিককে বলল, "এই দেখো, রাজার রুটি। এবার তোমাকে সেই একশো মোহর দিতে হয়।"

রুটি দেখে তো সরাইখানার মালিক তাজ্জব। শিকারী তখন বলে চলল, "শুধু এই রুটিই নয়। রাজার টেবিলের মাংসর রোস্টও আনাচ্ছি।"

সরাইখানার মালিক বলল, "না দেখলে বিশ্বাস হচ্ছে না।" কিন্তু বাজি ধরতে আর ভরসা পেল না।

শেয়ালকে ডেকে শিকারী বলল, "শেয়ালভায়া, রাজার জন্যে যে মাংস রান্না হয়েছে সেটা নিয়ে এসো।"

শেয়াল ছিল ভারি ধূর্ত। খরগোশের চেয়ে পথ তার অনেক ভালো চেনা। সদর রাস্তা দিয়ে না গিয়ে সে চুপি চুপি গেল অলিগলি দিয়ে। তাই কোনো কুকুর তার দেখা পেল না। নিরাপদে রাজকন্যের চেয়ারের তলায় বসে রাজকন্যের পা সে চুলকে দিল। চেয়ারের তলায় তাকিয়ে কলারটা দেখে শেয়ালকে সে চিনতে পারল।

নিজের ঘরে তাকে নিয়ে গিয়ে রাজকন্যে প্রশ্ন করল, "কী চাস্ রে শেয়াল ?"

শেয়াল বলল, "আমার প্রভু, ড্রাগনকে যিনি মেরেছিলেন, এখানে এসেছেন। তিনি অনুরোধ করেছেন, রাজার জন্যে রান্না মাংসর রোস্ট তাঁকে পাঠাতে।"

রাঁধুনিকে ডেকে রাজকন্যে আদেশ দিল, রাজার জন্য রান্না মাংসর খানিকটা সরাইখানায় পৌছে দিতে। মাংসর রোস্ট পৌছতে পাত্রের ঢাকনা খুলে লেজ দিয়ে মাছি তাড়িয়ে শেয়াল সেটা নিয়ে গেল তার প্রভুর কাছে।

শিকারী তখন সরাইখানার মালিককে বলল, "এই দেখো, রুটি আর মাংস। এবার রাজার জন্যে রান্না তরিতরকারিও আনাচ্ছি।" নেকড়েকে ডেকে সে আদেশ দিল তরিতরকারি নিয়ে আসতে।

নেকড়ে সোজা গেল রাজপ্রাসাদে। কারণ কাউকেই তার ভয় ডর নেই। তার পর রাজকন্যের কাছে গিয়ে পিছন থেকে টান দিল তার গাউনে। ফিরে তাকিয়ে তারও কলার দেখে চিনতে পেরে নিজের ঘরে তাকে নিয়ে গিয়ে রাজকন্যে প্রশ্ন করল, "কী চাস্ রে, নেকড়ে?"

নেকড়ে বলল, "আমার প্রভু, ড্রাগনকে যিনি মেরেছিলেন, এখানে এসেছেন। তিনি অনুরোধ করেছেন রাজার জন্যে রান্না তরিতরকারি তাঁকে পাঠাতে।"

রাঁধুনিকে ডেকে রাজকন্যে আদেশ দিল রাজার জন্য রান্না তরি-তরকারির খানিকটা সরাইখানায় পৌছে দিতে। তরিতরকারি পৌছতে পাত্রের ঢাকনা খুলে নেকড়ে সেটা নিয়ে গেল তার প্রভুর কাছে।

শিকারী তখন সরাইখানার মালিককে বলল, "এই দেখো—রুটি, মাংস আর তরিতরকারি। এবার রাজা যে মিষ্টি খান সেটা আনাচ্ছি।" ভালুককে ডেকে শিকারী বলল, "ভালুক ভায়া, রাজা যে পেস্ট্রি ভালোবাসেন আমার জন্যে তার খানকয়েক নিয়ে এসো।"

হেলে দুলে ভালুক পৌছল রাজপ্রাসাদে। তাকে আসতে দেখে সবাই ভয় পেয়ে পালাল ছুটে। কিন্তু প্রহরীর ঘরের কাছে পৌছতে সে ভালুকের মাথা টিপ করে বন্দুক তুলে চেষ্টা করল তার পথ আগলাতে। ভালুক তখন লাফিয়ে উঠে থাবা দিয়ে এমন জোরে প্রহরীর কান মলে দিল যে, সে হয়ে গেল দারুণ হতভম্ব। ফলে ভালুককে আর বাধা দিল না।

ভালুক তখন সোজা রাজকন্যের কাছে গিয়ে, তার পিছনে দাঁড়িয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগল। ঘাড় ফিরে তাকিয়ে, ভালুককে

চিনতে পেরে, নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে রাজকন্যে প্রশ্ন করল, "কী তোর চাই রে?"

ভালুক বলল, "আমার প্রভু, ড্রাগনকে যিনি মেরেছিলেন, এখানে এসেছেন। তিনি অনুরোধ করেছেন, রাজা যে পেস্ট্রি খান সেগুলো আনতে।"

পেস্ট্রি যে বানায় তাকে ডেকে রাজকন্যে আদেশ দিল এক প্লেট পেস্ট্রি সরাইখানায় নিয়ে যেতে। ভালুক তখন ঢেকে পেস্ট্রি নিয়ে গেল তার প্রভুর কাছে।

শিকারী তখন সরাইখানার মালিককে বলল, "এই দেখো—রুটি, মাংস, তরিতরকারি আর পেস্ট্রি। কিন্তু রাজা যে আঙুরের রস পান করেন, সেটা আমি চাখতে চাই।"

সিংহ তাই ভয়ংকর গর্জন করতে করতে ছুটল আঙুরের রস আনতে। সিংহের গর্জন শুনে পড়িমরি করে ছুটে পালাল প্রহরীর দল। রাজ-প্রাসাদের ঘরে গিয়ে সিংহ তার লেজ দিয়ে সজোরে টোকা দিল।

রাজকন্যে দরজাটা খুলল। সিংহকে দেখে প্রথমটায় হকচকিয়ে গেল। তার পর তার গলায় নিজের সেই সোনার বক্‌লস্ হার দেখে, চিনতে পেরে, নিয়ে গেল তাকে নিজের ঘরে।

রাজকন্যে প্রশ্ন করল, "কী তোর চাই রে, সিংহ?"

সিংহ, বলল, "আমার প্রভু, ড্রাগনকে যিনি মেরেছিলেন, এখানে এসেছেন। রাজা যে আঙুরের রস খান, সেটার খানিকটা তিনি চান।"

রাজকন্যে চাকরকে বলল, মাটির তলার ঘর থেকে আঙুর-রস সিংহকে দিতে।

সিংহ বলল, "লোকটার সঙ্গে গিয়ে দেখছি সত্যিকারের ভালো আঙুর-রস পাই কি না।" চাকরের সঙ্গে সেই মাটির তলার ঘরে গিয়ে হাজির হল সিংহ। চাকরটা চাকরদের জন্য রাখা বাজে পিপের কল খুলতে গেছে—সিংহমশাই তখন হুঙ্কার ছেড়ে বলল, "দাঁড়া, আগে আমি চেখে দেখি।"

চেখে সিংহ বলল, "এক্কেবারে বাজে।"

আড়চোখে তাকিয়ে চাকর গেল—যে-পিপে থেকে মারশাল্-এর জন্য আঙুর-রস থাকে, সেই পিপের কাছে।

হুংকার ছেড়ে আবার সিংহ বলল, "দাঁড়া, আগে চেখে দেখি।"

চেখে সিংহ বলল, "আগের চেয়ে ভালো। কিন্তু আসল জিনিস নয়।"

চাকর তখন ভীষণ চটে বলল, "তুই তো একটা জন্তু। আসল জিনিসের কী বুঝিস্ রে?"

তাই-না শুনে সিংহ লোকটার মাথায় এমন থাবা কষাল যে, অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে সে পড়ে গেল মেঝেয়। জ্ঞান ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সিংহকে সেই চাকর নিয়ে গেল মাটির তলার বিশেষ একটা ছোটো ঘরে। সেখানে ছিল এমন একটা পিপে আঙুর-রস, রাজা ছাড়া যেটা কেউই খেতে পেত না। সেই পিপে থেকে খানিকটা আঙুর-রস খেয়ে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে-চাটতে সিংহ বলল, "মনে হচ্ছে এটাই আসল আঙুর-রস।" তার পর চাকরকে বলল সেই আঙুর-রস ছটা বোতলে ভরতে।

সিঁড়ি দিয়ে সবাই উঠল উপরে। কিন্তু খোলা বাতাসে পৌঁছে সিংহর মাথা ঘুরতে আর পা টলতে লাগল। তাই সিংহের বদলে চাকরকেই সরাইখানায় নিয়ে যেতে হল আঙুর-রসের বোতলগুলো। তার পর সিংহ সেগুলো নিয়ে গেল তার প্রভুর কাছে।

শিকারী তখন সরাইখানার মালিককে বলল, "এই দেখো! রাজা যে রুটি, মাংস, তরিতরকারি, পেস্ট্রি আর আঙুর-রস খান—তার সবগুলোই আমার রয়েছে। এবার তাই আমার প্রিয় জন্তুদের সঙ্গে ডিনারে বসি।" এই-না বলে খাবার টেবিলের সামনে গিয়ে বসল। খরগোশ, শেয়াল, নেকড়ে, ভালুক আর সিংহর সঙ্গে। পেট ভরে খাওয়া-দাওয়া তারা করল। শিকারীর মন-মেজাজ তখন খুব ভালো। কারণ তার মনে হল—রাজকন্যে তাকেই তখনো ভালোবাসে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সরাইখানার মালিককে শিকারী বলল, "রাজা যা খান সেই-সব খাবার-দাবার খেলাম। এবার রাজসভায় গিয়ে রাজকন্যেকে বিয়ে করব।"

সরাইখানার মালিক বলল, "তা কী করে সম্ভব। রাজকন্যে নিজেই তো তার বর ঠিক করে রেখেছে।"

ড্রাগন-পাহাড়ে রাজকন্যে যে-রুমাল তাকে দিয়েছিল তাতে জড়ানো ছিল ড্রাগনের সাতটা জিভ। সেটা তখন বার করে শিকারী বলল, "এটাতেই কাজ হবে।"

রুমালটা দেখে সরাইখানার মালিক বলল, "আর যাই বিশ্বাস

করি-না-কেন, তোমার এ কথা বিশ্বাস করতে পারলাম না। উঠোন সমেত আমার বাড়ি বাজি ধরছি।"

শিকারী তখন হাজার মোহর-ভরা একটা থলি বার করে বলল, "যা বললাম তাই করব। এই মোহরগুলো বাজি ধরলাম।"

এদিকে খাবার টেবিলের সামনে খেতে বসে মেয়েকে রাজা প্রশ্ন করলেন, "যে-বুনো-জানোয়ারগুলো আমার প্রাসাদে আনাগোনা করেছিল, তোমার সঙ্গে তাদের কী দরকার ছিল?"

রাজকন্যে বলল, "সে কথা তোমাকে বলতে পারব না। কিন্তু জন্তুদের প্রভুকে তুমি ডেকে পাঠাও। তাকে দেখলে তুমি খুশিই হবে।"

সেই বিদেশী লোকটিকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাজা তাঁর ভৃত্যকে পাঠালেন সরাইখানায়।

সরাইখানার মালিককে শিকারী বলল, "দেখছ তো, ভোজসভায় নেমন্তন্ন করে রাজা তাঁর চাকরকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু বিনা জাঁকজমকে আমি যাচ্ছি না।" তার পর ভৃত্যের দিকে ফিরে সে বলল, "রাজাকে বোলো আমার জন্যে রাজপোশাক ছ-ঘোড়ায়-টানা একটা জুড়িগাড়ি আর সাজপোশাক পরাবার এক চাকরকে পাঠাতে।"

কথাটা শুনে মেয়েকে রাজা প্রশ্ন করলেন, "কী করব?"

রাজকন্যে বলল, "সে যা বলছে তাই কর। রাজমর্যাদায় সে আসুক। তাতে তুমি খুশিই হবে।"

রাজকন্যের কথামতো রাজা পাঠালেন রাজপোশাক, ছ-ঘোড়ায়-টানা একটা জুড়িগাড়ি আর সাজপোশাক পরাবার এক ভৃত্যকে।

তাদের আসতে দেখে সরাইখানার মালিককে শিকারী বলল, "এই দেখো—যেরকম চেয়েছিলাম সেইরকম জাঁকজমক করেই আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে।" এই-না বলে রাজপোশাক পরে, ড্রাগনের কাটা-জিভ-জড়ানো রুমালটা নিয়ে জুড়িগাড়ি চেপে শিকারী গেল রাজার সঙ্গে দেখা করতে।

তাকে আসতে দেখে রাজা তাঁর মেয়েকে প্রশ্ন করলেন, "ওকে কী ভাবে অভ্যর্থনা করব?"

রাজকন্যে বলল, "তুমি নিজে গিয়ে ওকে নিয়ে এসো। তাতে তুমি খুশিই হবে।"

রাজকন্যের কথামতো নিজে গিয়ে রাজা তাকে আদর-আপ্যায়ন

করে রাজপ্রাসাদের মধ্যে নিয়ে এলেন। শিকারীর পিছন-পিছন এল তার জন্তুরা।

খাবার টেবিলের সামনে রাজা আর রাজকন্যের মাঝখানে সে বসল। উলটো দিকে ভাবী বরের আসনে বসল মার্‌শাল্‌।

তার পর আনা হল ড্রাগনের সাতটা মুণ্ডু। সেগুলো দেখিয়ে রাজা বললেন, "আমার মার্‌শাল্‌ ড্রাগনের এই সাতটা মাথা কেটেছে। তাই আজ আমার মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিচ্ছি।"

শিকারী তখন দাঁড়িয়ে উঠে সেই সাতটা মুণ্ডুর মুখ খুলে প্রশ্ন করল, "ড্রাগনের সাতটা জিভ কোথায় গেল?"

কথাটা শুনে মার্‌শাল্‌-এর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ভেবে পেল না কী উত্তর দেবে? শেষটায় তোৎলাতে-তোৎলাতে সে বলল, "ড্রাগনের জিভ থাকে না।"

শিকারী বলল, "তাই নাকি! মিথ্যুকদের জিভ থাকা উচিত নয়। কিন্তু ড্রাগনের জিভ হচ্ছে বিজয়ীর প্রতীকচিহ্ন।" এই-না বলে রুমাল থেকে সেই সাতটা জিভ বার করে ড্রাগনের কাটা-মুণ্ডুগুলোর মুখের মধ্যে সে দিল বসিয়ে। তার পর রুমালে ছুঁচের কাজ-করা রাজকন্যের নাম দেখিয়ে সে প্রশ্ন করল, "রুমালটা কার?" রাজকন্যে বলল, "ড্রাগনকে যে মেরেছে তার।"

তার পর শিকারী তার জন্তুদের ডেকে তাদের কাছ থেকে নিল প্রবালের গুটিগুলো আর সিংহের গলা থেকে খুলল সোনার বক্‌লস্‌টা। রাজকন্যেকে সেগুলো দেখিয়ে সে প্রশ্ন করল, "এগুলো কার?"

রাজকন্যে বলল, "হার আর সোনার বক্‌লস্‌টা আমার। কিন্তু যে-সব জন্তু ড্রাগনটাকে মারতে সাহায্য করেছিল তাদের আমি এগুলো দিয়ে দিয়েছিলাম।"

শিকারী বলল, "লড়াই করার পর আমি যখন ঘুমিয়ে পড়ি মার্‌শাল্‌ তখন এসে আমার মুণ্ডু কেটে ফেলে। তার পর রাজকন্যেকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে বলে—ড্রাগনকে মেরেছে সে। সে যে মিথ্যে কথা বলেছিল সেটা আমি প্রমাণ করতে পারি এই রুমাল, হার আর জিভগুলো দিয়ে।" তার পর সে জানাল কেমন করে খরগোশ সেই আশ্চর্য লতা দিয়ে তাকে বাঁচায়, কেমন করে এক বছর ধরে সে ঘুরে বেড়ায় আর তার পর কেমন

করে শহরে ফিরে সরাইখানার মালিকের কাছে সে শোনে মার্‌শাল্‌-এর ছলনার কথা।

রাজা তাঁর মেয়েকে প্রশ্ন করলেন, "এ-সব কথা কি সত্যি? সত্যই কি এ ড্রাগনকে মেরেছিল?"

রাজকন্যে বলল, "হ্যাঁ, অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। এখন আমি মার্‌শাল্‌-এর বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলতে পারি। কারণ তার মুখোশ খোলার ব্যাপারে আমার কোনো হাত নেই। আর আমি যে কথা দিয়েছিলাম এক বছর চুপচাপ থাকব—সে-প্রতিজ্ঞা আমি ভঙ্গ করি নি। এ-কারণেই বলেছিলাম এক বছর আমার বিয়ে পিছিয়ে দিতে।"

সঙ্গে সঙ্গে রাজা তাঁর বারোজন মন্ত্রীকে ডেকে বললেন মার্‌শাল্‌-এর বিচার করতে। বিচার করে তারা শাস্তি দিল—বুনো ষাঁড় দিয়ে মার্‌শাল্‌কে টুকরো-টুকরো করে ফেলার। তার পর রাজা তাঁর মেয়ের বিয়ে দিলেন শিকারীর সঙ্গে আর তাকে করলেন গোটা রাজ্যের শাসক। খুব ধুমধাম করে তাদের বিয়ে হয়ে গেল। নতুন তরুণ রাজা তখন তার বাবা আর পালক-বাবাকে আমন্ত্রণ করে দিল অনেক ধনদৌলত। তার বন্ধু, সেই সরাইখানার মালিকের কথাও সে ভুলল না। তাকে সে বলল:

"দেখলে তো, বন্ধু, যা-যা বলেছিলাম সব ফলে গেছে। রাজ-কন্যেকে আমি বিয়ে করেছি আর রাজা তাঁর রাজত্ব দিয়ে দিয়েছেন আমাকে। তুমিও বাজি হেরেছ। উঠোনসমেত তোমার বাড়িটা এবার আমায় দিয়ে দিতে হয়।"

সরাইখানার মালিক বলল, "হ্যাঁ, ন্যায্যত সেগুলো তুমি দাবি করতে পারো।"

কিন্তু তরুণ রাজা বলল, "তোমার বাড়ি আর তোমার উঠোন তোমারই থাকুক। তার ওপর তোমায় উপহার দিলাম হাজার মোহর।"

তরুণ রাজা আর তরুণী রানী মহানন্দে দিন কাটাতে লাগল। তরুণ রাজা প্রায়ই শিকারে বেরুত তার বিশ্বস্ত জন্তুদের নিয়ে। কারণ শিকার করাই ছিল তার প্রধান আনন্দ। কাছেই ছিল একটা বন। একবার সেই বনে শিকারে যেতে তার ইচ্ছে হল। কারণ সেই বনের পথ গোলক ধাঁধার মতো বলে কেউ সেখানে শিকার করতে যেত না। অনেক অনুরোধ-উপরোধ করতে শেষটায় সেখানে শিকারে যাবার অনু-

মতি বুড়ো রাজা দিলেন। আর এক সকালে অনেক লোক-লশকর নিয়ে সে যাত্রা করল। বনে পৌঁছে সে দেখে দুধের মতো ধবধবে ভারি সুন্দর এক হরিণী। সেখানে তার অনুচরবর্গকে অপেক্ষা করতে বলে সেই হরিণীর পিছু সে নিল। সঙ্গে চলল শুধু তার জন্তুর দল। সন্ধে পর্যন্ত তার জন্য অপেক্ষা করল তার লোকজন। কিন্তু তখনো সে না ফেরায় তার লোকজন বাড়ি ফিরে তরুণী রানীকে জানাল—এক জাদুর বনে এক সাদা হরিণীর পিছু নিয়েছে তরুণ রাজা। তার পর আর ফেরে নি। খবর শুনে তার জন্য তরুণী রানীর ভীষণ ভাবনা হল।

এদিকে তরুণ রাজা তাড়া করে যাচ্ছিল সেই সুন্দর হরিণীকে। আর যেই সে নাগালের মধ্যে আসে আর গুলি ছোঁড়ার জন্য তরুণ রাজা বন্দুক তোলে অমনি হরিণী দূরে হয়ে যায় অদৃশ্য। এইভাবে যেতে-যেতে শেষটায় হরিণী একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তখন তরুণ রাজা দেখে সে চলে এসেছে গভীর বনে। তাই অনুচরবর্গকে ডাকার জন্য সে তার শিঙা বাজাল। কিন্তু তারা কেউ শুনতে পেল না। তখন রাত হয়ে গেছে। তাই সে এক গাছতলায় আগুন জ্বেলে স্থির করল সেখানেই রাত কাটাবে। আগুনের পাশে সে বসে আর চার পাশে তার জন্তুরা শুয়ে—এমন সময় তার মনে হল যেন মানুষের স্বর শুনতে পাচ্ছে। উপর দিকে তাকিয়ে সে দেখে গাছে এক বুড়ি বসে। বুড়ি ক্রমাগত কাতরাচ্ছিল :

"হি-হি-হি! কী ঠাণ্ডা! জমে গেলাম। জমে গেলাম।"

তরুণ রাজা বলল, "শীত করছে তো নেমে এসে আগুন-তাতে বোসো।"

বুড়ি বলল, "না-না। নামলে তোমার জন্তুরা আমায় কামড়াবে।"

"না বুড়িমা! ওরা কামড়াবে না। নেমে এসো।"

বুড়িটা আসলে শয়তান ডাইনি। সে বলল, "গাছের সরু একটা ডাল ফেলছি। সেটা দিয়ে জন্তুগুলোর পিঠে মারলে ওরা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।" এই-না বলে গাছের সরু একটা ডাল বুড়ি ফেলল আর সেটা জন্তুদের পিঠে তরুণ রাজা ঠেকাতেই তারা হয়ে গেল পাথর। বুড়ি যখন দেখল জন্তুরা তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তখন সে গাছ থেকে লাফিয়ে নেমে সেই ডাল দিয়ে তরুণ রাজাকে মেরে তাকেও পাথর করে দিল। আর তার পর খিলখিল করে হেসে উঠে তাকে

আর তার জন্তুদের টেনে নিয়ে গিয়ে সে ফেলল একটা গর্তে। সেই গর্তে ছিল আরো অনেক পাথর।

রাজা না ফেরায় রানীর দুর্ভাবনা আরো বেড়ে গেল। এখন হল কি, ছাড়াছাড়ি হবার সময় অন্য যে ভাই পশ্চিম দিকে গিয়েছিল—সে পৌঁছল সেই রাজ্যে। সে চাকরির খোঁজে ছিল। কিন্তু কোনো চাকরি পায় নি। পথে-পথে জন্তুদের নাচিয়ে নানা দেশে সে ঘুরে বেড়ায়। একদিন তার ইচ্ছে হল ছাড়াছাড়ি হবার সময় যে-ছুরিটা তারা গাছে গেঁথেছিল সে-ছুরিটা দেখে জানা—তার ভাই কেমন আছে। গাছটার কাছে গিয়ে সে দেখে ছুরিটায় তার ভাইয়ের দিকের আধখানায় মর্চে ধরেছে, আর আধখানা রয়েছে চকচকে। দেখে ভয় পেয়ে আপন মনে সে বলে উঠল, 'ভাই নিশ্চয়ই খুব বিপদে পড়েছে। এখনো হয়তো তাকে আমি সাহায্য করতে পারি—কারণ ছুরির অর্ধেকটা চকচকে রয়েছে।' জন্তুদের নিয়ে যেতে-যেতে সে পৌঁছল সেই শহরের সিংহদ্বারে। তাকে দেখে প্রহরী জানতে চাইল—তার আসার কথা রানীকে জানাবে কি না। কারণ এতদিন না ফেরায় রানী খুব উৎকণ্ঠায় রয়েছেন। ভেবেছেন জাদুর বনে তার মৃত্যু ঘটেছে। প্রহরী ভেবেছিল সে-ই তাদের তরুণ রাজা। কারণ তার চেহারা হুবহু তরুণ রাজার মতো। তার সঙ্গের জন্তুরাও হুবহু এক। সে বুঝল প্রহরী নিশ্চয়ই তার ভাইয়ের কথা বলছে। তাই ভাবল, 'এখন এদের ভুল না ভাঙাই ভালো। তাতে আমার ভাইকে বাঁচানো অনেক সহজ হবে' এই-না ভেবে প্রহরীর পিছন-পিছন সে গেল রাজপ্রাসাদে। তাকে দেখে সবাই খুশি। তরুণী রানী ভাবল, সে-ই তার বর। তাকে প্রশ্ন করল, "ফিরতে এত দেরি হবার কারণ কী।" সে বলল, "বনে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। মনে হয়েছিল বুঝি কোনোদিনই বেরুতে পারব না।" রাতে সে গেল শোবার ঘরে। কিন্তু তরুণী রানী আর তার নিজের মাঝখানে রাখল একটা তরোয়াল। সেটা দেখে রানী তো অবাক। কিন্তু কারণটা জিগ্‌গেস করতে তার ইচ্ছে হল না। এইভাবে দিন কয়েক কাটল আর সেই সময়ের মধ্যে জাদুর বন সম্বন্ধে সে নিল নানা খোঁজ-খবর। শেষটায় একদিন সে বলল, "ঐ বনে আবার আমি শিকার করতে যাব।" বুড়ো রাজা আর তরুণী রানী তাকে অনেক করে বারণ করল। কিন্তু কারুর কথাই সে শুনল না। লোক-লশকর নিয়ে সে পড়ল বেরিয়ে।

বনে পৌঁছতে তার বেলাতেও ঘটল একই ঘটনা। সে-ও দেখতে পেল সেই সাদা হরিণীকে। না ফেরা পর্যন্ত লোক-লশকরদের সেখানে থাকতে বলে হরিণীকে সে তাড়া করে চলল। জন্তুরা ছুটল তার পিছন-পিছন। কিন্তু কিছুতেই হরিণীর নাগাল সে পেল না। আর শেষটায় গভীর বনে পথ হারিয়ে বাধ্য হল সেখানে রাত কাটাতে। আবার সেই বুড়ি ডাইনি গাছে বসে কাতরাতে লাগল :

"হি-হি-হি! কী ঠাণ্ডা! জমে গেলাম! জমে গেলাম!"

সে বলল, "শীত করছে তো নেমে এসে আগুন-তাতে বোসো।"

বুড়ি বলল, "না-না। নামলে তোমার জন্তুরা আমায় কামড়াবে।"

সে বলল, "না বুড়িমা! ওরা কামড়াবে না। নেমে এসো।"

কিন্তু আগের বারের মতোই বুড়ি বলল, "গাছের সরু একটা ডাল ফেলছি। সেটা দিয়ে জন্তুদের পিঠে মারলে ওরা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।"

বুড়ি ডাইনির কথা শুনে শিকারীর সন্দেহ হল। সে বলল, "আমার জন্তুদের পিঠে মারব না। নেমে এসো, নইলে জোর করে তোমায় নামাব।"

বুড়ি বলল, "ইচ্ছে হলে আমাকে গুলি করতে পার। তোমার বুলেটে আমার কিছুই হবে না।"

টিপ করে সে বুড়িকে গুলি করল। কিন্তু সীসের বুলেটে ডাইনির গায়ে আঁচড়টি লাগল না।

কান ফাটিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠে সে বলল, "আমাকে মারতে পারবে না। আবার চেষ্টা করে দেখো!"

শিকারীর মাথায় তখন একটা ফন্দি এল। একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে কোটের রুপোর বোতামগুলো ছিঁড়ে সে ভরল তার বন্দুকে। তার পর গুলি চালাল বুড়ি ডাইনির উপর। রুপোর গুলি থেকে বাঁচবার তুকতাক ডাইনি জানত না। চেঁচাতে-চেঁচাতে গাছ থেকে সে পড়ল হুড়মুড়িয়ে। ডাইনিকে পা দিয়ে চেপে শিকারী বলল, "আমার ভাইয়ের কী করেছিস বল। না বললে দু হাতে তোকে ধরে আগুনে ছুঁড়ে ফেলব।"

ভীষণ ভয় পেয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে ডাইনি বলল, "একটা গর্তের মধ্যে জন্তুদের সঙ্গে পাথর হয়ে সে পড়ে আছে।"

বুড়িকে সে বাধ্য করল সেই গর্তটার কাছে তাকে নিয়ে যেতে। তার পর বলল, "শয়তানী! এক্ষুনি আমার ভাই, সব লোকজন আর জন্তুদের রক্ত-মাংসের শরীর ফিরিয়ে দে। নইলে তোকে আগুনে পুড়িয়ে মারব।"

একটা ডাল নিয়ে বুড়ি ডাইনি ছোঁয়াল পাথরগুলোয়। আর সঙ্গে সঙ্গে তার ভাই, জন্তুগুলো আর সব লোকেরা ফিরে পেল নিজেদের দেহ। অন্য সব লোকজনের মধ্যে ছিল বণিক, রাখাল আর নানা শিক্ষানবিশ। ত্রাণকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে খুশি মনে যে যার পথে চলে গেল।

যমজ ভাইরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে আনন্দে উঠল চেঁচিয়ে। তার পর বুড়ি ডাইনির হাত-পা বেঁধে তাকে তারা ফেলল আগুনে। ডাইনি যখন পুড়ে মরছে তখন সমস্ত বন আলোয় আলো হয়ে গেল আর মাইল কুড়ি দূরে তারা দেখতে পেল রাজপ্রাসাদ। সেই আলোয় পথ চিনে তারা ফিরে চলল বাড়ির দিকে। আর যেতে-যেতে তারা বলল নিজেদের এ্যাডভেঞ্চারের কথা। রাজা-ভাই জানাল, সে হয়েছে বুড়ো রাজার গোটা রাজ্যের শাসক। ভবঘুরে-ভাই বলল, "আমারও তাই মনে হয়েছিল। কারণ শহরে পৌঁছবার পর আমাকে তুমি বলে লোকে ভুল করে রাজার মতো খাতির করে। তরুণী রানী আমাকে মনে করে তার বর। আমি বাধ্য হই তার পাশে বসে খেতে আর তোমার বিছানায় শুতে।"

এই-না শুনে রাজা-ভাই হিংসেয় জ্বলে উঠে তরোয়াল খাপ থেকে বার করে কেটে ফেলল ভবঘুরে-ভাইয়ের মুণ্ডু। কিন্তু তাকে রক্তে ভেসে মরে পড়ে থাকতে দেখে দুঃখে-শোকে পাগলের মতো চীৎকার করে কাঁদতে-কাঁদতে সে বলতে লাগল, "হায় হায়! এ কি করলাম! ভাই আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছে, আর আমি কিনা তার প্রতিদান দিলাম তাকে খুন করে!" তখন খরগোশ এসে বলল, সেই আশ্চর্য লতা সে নিয়ে আসবে যেটা ছোঁয়ালে সব ক্ষত জোড়া লেগে লোকে বেঁচে ওঠে। এই-না বলে খরগোশ দৌড়ে গিয়ে ঠিক সময়ে নিয়ে এল সেই লতা আর বেঁচে উঠল ভবঘুরে-ভাই। ক্ষতের কোনো চিহ্ন তার শরীরে রইল না।

তার পর আবার তারা যেতে শুরু করল। যেতে-যেতে রাজা-ভাই বলল, "তোমাকে দেখতে ঠিক আমার মতো। তোমার গায়েও রয়েছে রাজপোশাক। জন্তুরা যেমন আমার পেছনে পেছনে আসে, তোমার

পেছন পেছনেও তেমনি যায়। রাজপ্রাসাদের দুই ফটক দিয়ে দুজনে যাওয়া যাক।"

এই-না বলে আলাদা হয়ে তারা যেতে শুরু করল। আর তার পর উত্তর আর দক্ষিণের সিংহদ্বারের দুই প্রহরী একই সঙ্গে বুড়ো রাজাকে গিয়ে জানাল তরুণ রাজা শিকার থেকে ফিরেছে তার জন্তুদের নিয়ে।

রাজা বললেন, "তা কী করে সম্ভব? ফটক দুটো তো অনেক মাইল দূরে-দূরে!"

আর সেই মুহূর্তে দুই ভাই রাজপ্রাসাদের আঙিনায় পৌঁছে একই সঙ্গে লাগল সিঁড়ি দিয়ে উঠতে।

মেয়েকে বুড়ো রাজা বললেন, "তোর কে বর চিনতে পারিস? দুজনকেই হুবহু একরকম দেখতে। আমি তো চিনতে পারছি না।"

তরুণী রানী তখন পড়ল, মহা ফ্যাসাদে। কারণ সে-ও তার বরকে চিনতে পারল না। শেষটায় তার মনে পড়ল প্রবালের যে-গুটিগুলো জন্তুদের দিয়েছিল সেগুলোর কথা। আর সিংহের কেশর হাতড়ে সে খুঁজে পেল সোনার সেই বক্লস্। সঙ্গে সঙ্গে সে চেঁচিয়ে উঠল, "এই সিংহ যার পেছনে পেছনে যাবে সে-ই আমার বর।"

রাজা-ভাই হেসে উঠে বলল, "রানী ঠিকই চিনেছে।" আর তার পর সবাই একসঙ্গে আবার টেবিলের সামনে বসে মনের আনন্দে করল খাওয়া-দাওয়া।

রাতে তরুণ রাজা বিছানায় শোবার পর তার বউ প্রশ্ন করল, "গতবার শোবার সময় আমাদের মাঝখানে একটা খোলা তরোয়াল রাখতে কেন? ভেবেছিলাম তুমি আমাকে খুন করতে চাও।"

তরুণী রানীর কথা শুনে তরুণ রাজা তখন বুঝল তার ভবঘুরে-ভাই কত বিশ্বস্ত আর কত ভালো।

নেকড়ে আর সাত ছাগলছানা

এক বুড়ি ছাগলের সাতটা ছানা ছিল। সব মা নিজের ছেলে-পুলেদের যেরকম ভালোবাসে সেরকমই সে ভালোবাসত তার ছানা-গুলোকে। একদিন খাবার জোগাড় করতে তাকে যেতে হল বনে। তাই সাতটা ছানাকে কাছে ডেকে সে বলল, "বাছারা, সাবধানে থাকিস। আমি বনে বেরুলে নেকড়েটাকে ঢুকতে দিস না। ঢুকতে পেলেই তোদের সবাইকে সে গব্‌গব্‌ করে খেয়ে ফেলবে। বুড়ো শয়তানটা প্রায়ই ভোল পালটে আসে। তার হেঁড়ে গলা শুনলে আর কালো পা দেখলেই তোরা চিনতে পারবি।"

ছানারা বলল, "মামণি, আমরা সাবধানে থাকব। নিশ্চিন্ত মনে তুমি যাও।"

হাঁফ ছেড়ে নিশ্চিন্ত মনে তাদের বুড়ি মা পথে বেরুল।

খানিক পরেই কে একজন বাইরের দরজায় টোকা দিয়ে বলল, "বাছারা, দরজা খোল। আমি তোদের মা। সবাইকার জন্যে একটা করে জিনিস এনেছি।" কিন্তু তার হেঁড়ে গলা শুনে ছানারা বুঝল নেকড়েটা এসেছে। তাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে তারা বলল, "তোমাকে আমরা দোর খুলে দিচ্ছি না। তুমি আমাদের মা নও। আমাদের মায়ের গলা খুব মিষ্টি। তোমার তো হেঁড়ে কুচ্ছিত গলা। তুমি তো নেকড়ে!"

তাই শুনে মুদির দোকানে গিয়ে নেকড়ে কিনল বড়ো এক তাল সাদা খড়ি। নিজের গলা মোলায়েম করার জন্য সেটা খেয়ে ফিরে

এসে আবার সদর দরজায় টোকা দিয়ে সে বলল, "বাছারা, দোর খোল। আমি তোদের মা। সবাইকার জন্যে একটা করে জিনিস এনেছি।" কিন্তু নেকড়ে তার সামনেকার কালো থাবা রেখেছিল জানালার শার্শিতে। তাই-না দেখে একসঙ্গে ছানারা চেঁচিয়ে বলল, "তোমাকে আমরা দোর খুলে দিচ্ছি না। তোমাদের মতো আমাদের মায়ের পা কালো নয়। তুমি তো নেকড়ে।"

নেকড়ে তখন এক দৌড়ে রুটিওয়ালার কাছে গিয়ে বলল, "আমার পা-টা জখম হয়েছে। ময়দার পুলটিস লাগিয়ে দে।" রুটিওয়ালা ময়দার পুলটিস লাগিয়ে দিলে, এক দৌড়ে জাঁতাওয়ালার কাছে গিয়ে সে বলল, "আমার পায়ে খানিকটা ময়দা-গুঁড়ো ছড়িয়ে দে।" জাঁতাওয়ালা ভাবল, 'নিশ্চয়ই কাউকে ও ঠকাতে চায়।' তাই সে খানিক দোনোমোনো করতে লাগল। চটে উঠে নেকড়ে বলল, "যা বলছি না করলে তোকে আমি খেয়ে ফেলব।" ভয় পেয়ে জাঁতাওয়ালা তার পায়ের থাবা সাদা করে দিল।

শয়তানটা তৃতীয়বার সদর দরজায় ফিরে এসে টোকা দিয়ে বলল, "বাছারা দোর খোল। আমি তোদের মা। বন থেকে সবাইকার জন্যে জিনিস এনেছি।

ছানারা বলল, "আগে তোমার পা-টা দেখাও, তবেই বুঝব তুমি আমাদের মামণি কি না।"

তাই শুনে জানালার শার্শিতে নেকড়ে তার পা রাখল। ছানারা দেখল সত্যিই সেটার রঙ সাদা। তাই ভাবল তার কথা সত্যি। তারা দরজা খুলে দিল। নেকড়ে ঢুকতে আঁতকে উঠে তারা চেষ্টা করল লুকিয়ে পড়তে। প্রথমজন দৌড় দিল টেবিলের তলায়, দ্বিতীয়জন লাফিয়ে উঠল বিছানায়, তৃতীয়জন সেঁধুল উনুনের মধ্যে, চতুর্থজন পালাল বাসনমাজার ঘরে, পঞ্চমজন ঢুকল পোশাকের আলমারিতে, ষষ্ঠজন ঝাঁপ দিল স্নানের টবে আর সপ্তমজন উঠে পড়ল বড়ো দেয়াল-ঘড়ির মধ্যে। কিন্তু নেকড়ে তাদের সবাইকে খুঁজে বার করে গব্‌গব্‌ করে গিলে ফেলল। পারল না শুধু দেয়াল-ঘড়ির মধ্যেকার সব চেয়ে ছোটো ছানাকে খুঁজে বার করতে। ভোজ শেষ করে হেলতে-দুলতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সবুজ মাঠের এক গাছ-তলায় গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে অঘোরে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

খানিক পরেই বন থেকে বাড়ি ফিরল সেই বুড়ি ছাগল। সব-কিছু দেখে চোখ তার কপালে। দরজা খোলা। টেবিল-চেয়ার-টুল ওলটানো। স্নানের টব টুকরো-টুকরো। বিছানার চাদর-বালিশ লণ্ডভণ্ড। ছানা-গুলোকে কোথাও সে খুঁজে পেল না। প্রত্যেকের নাম ধরে একে-একে সে ডাকতে শুরু করল। কিন্তু কেউই সাড়া দিল না। শুধু সব চেয়ে ছোটো ছানার নাম ধরে ডাকতে কচি গলায় উত্তর এল, "মামণি, দেয়াল-ঘড়ির মধ্যে আমি লুকিয়ে আছি!" ছানাটাকে নামাতে, তাকে সে বলল, নেকড়েটা কী ভাবে এসে অন্য সবাইকে খেয়ে ফেলেছে। ছানাদের শোকে অনেকক্ষণ সে হাপুস-নয়নে কাঁদল। শোকে-দুঃখে শেষটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। সব চেয়ে ছোটো ছানাটা চলল তার পিছন-পিছন। মাঠে এসে তারা দেখে নেকড়েটা ঘুমচ্ছে। তার নাক-ডাকার শব্দে গাছের ডালপালা উঠছে মড়্‌মড়্ করে। চার দিক থেকে ছাগল-মা তাকে ভালো করে দেখে লক্ষ্য করল তার ফোলা পেটের মধ্যে কী সব যেন ছট্‌ফট্ করে নড়ছে। সে ভাবল, 'কী কাণ্ড! মনে হচ্ছে আমার ছানাগুলো এখনো বেঁচে আছে!' তাই-না দেখে ছাগল-মা দৌড়ে বাড়ি গিয়ে নিয়ে এল কাঁচি, ছুঁচ আর সুতো। নেকড়ের পেট সামান্য কাটতে একটা ছানা মাথা বার করল। আরো খানিক কাটতে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল তার ছ-ছটা ছানাই। ছানাগুলো মরে নি! কারণ পেটুক শয়তানটা তাদের চিবিয়ে না খেয়ে আস্ত গিলেছিল। ছানারা সবাই দারুণ খুশি। তাদের মাকে তারা জড়িয়ে ধরল। তার পর মনের ফুর্তিতে তারা লাগল লাফাতে। কিন্তু ছাগল-মা তাদের বলল, "তোরা ছুটে গিয়ে যত পারিস নুড়ি কুড়িয়ে আন। শয়তানটা ঘুমিয়ে থাকতে-থাকতে তার রাক্ষুসে পেটটা আমরা নুড়ি-বোঝাই করে ফেলব।" ছানারা চট্‌পট্ নুড়ি এনে সবাই মিলে নেকড়েটার পেট ভরে ফেলল। তার পর ছাগল-মা তাড়াতাড়ি সেটা দিল সেলাই করে। নেকড়েটা একবারও নড়ল-চড়ল না। কোনো দিকেই তখন তার হুঁশ নেই।

শেষটায় ঘুম ভাঙতে নেকড়ে যখন পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল পেটের নুড়িগুলোর দরুন তার পেলো ভীষণ তেষ্টা। সে ভাবল, কুয়ো থেকে জল খাওয়া যাক। কিন্তু যেই-না সে হেলে-দুলে হাঁটতে শুরু করেছে

অমনি তার পেটের মধ্যেকার নুড়িগুলো উঠল খড়্‌মড়্‌ করে। দারুণ অবাক হয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল:

"পেটের মধ্যে ঘড়্‌ঘড়্‌ খড়্‌মড়্‌
করছে ও-সব কী ?
গিলে ছিলাম ছাগল-ছানা
কচি-কচি,
মনে হচ্ছে ওগুলো সব
পাথর-কুচি !"

কুয়ো-পাড়ে এসে জল খাবার জন্য যেই-না সে ঝুঁকেছে অমনি নুড়িগুলোর ভারে কুয়োর মধ্যে পড়ে ডুবে সে মরল।

মহা ফুর্তিতে সাতটা ছাগল-ছানা সেখানে ছুটে গেল। আর তার পর সেই কুয়োর চার পাশে ছাগল-মায়ের সঙ্গে আনন্দে নাচতে-নাচতে চেঁচিয়ে চলল, "নেকড়েটা মরেছে ! নেকড়েটা মরেছে !"

নাতি আর ঠাকুর্দা

এক সময় এক গরিব লোক ছিল। অনেক তার বয়স। চোখে সে ভালো দেখত না, কানে শুনত খুব কম আর সব সময় থর্‌থর্ করে কাঁপত তার হাঁটু। খাবার টেবিলের সামনে বসে খাবার সময় হাত থেকে তার খসে পড়ত চামচে। ফলে টেবিল-ঢাকার উপর সুপ্ উপছে পড়ত, তার কষ বেয়েও সুপ্ গড়াত। তার ছেলে আর ছেলের বউ বুড়োকে একেবারে বরদাস্ত করতে পারত না, ভারি ঘেন্না করত তাকে। শেষটায় ঘরের এক কোণে উনুনের পিছনে তাকে তারা সরিয়ে দিল। পুরনো একটা মাটির ভাঁড়ে তাকে তারা নামমাত্র খেতে দিত। প্রায়ই জল-ভরা চোখে বিষণ্ণ মুখে খাবার টেবিলের দিকে সে থাকত তাকিয়ে। একদিন তার হাত কেঁপে মাটির সেই ভাঁড়টা মেঝেয় পড়ে ভেঙে গেল। তাই দেখে তার ছেলের তরুণী বউ ভীষণ রেগে তাকে খুব গালি-গালাজ করল। বুড়ো লোকটি ভয় পেয়ে কোনো জবাব দিল না। মাথা হেঁট করে শুধু ফেলল দীর্ঘশ্বাস। বুড়োর জন্যে দু ফার্দিং দিয়ে তারা কিনে আনল কাঠের একটা বাটি আর সেই বাটি থেকেই বুড়ো লোকটিকে খেতে হত খাবার।

কিছুদিন পরে বুড়ো লোকটির ছেলে আর ছেলের বউ দেখল তাদের চার বছরের ছোট্টো ছেলেকে মেঝেয় কাঠের নানা টুকরো জড়ো করতে।

তার বাবা প্রশ্ন করল, "ওখানে কী করছিস ?"

ছেলেটি বলল, "একটা জাবনা বানাচ্ছি। তুমি আর মা যখন বুড়ো হবে তখন এতে করে খেতে দেব।"

শিশুর কথা শুনে বুড়ো লোকটির ছেলে আর ছেলের বউ চুপচাপ পরস্পরের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে কাঁদতে শুরু করে দিল। তার পর শিশুটির ঠাকুর্দাকে আবার নিয়ে এল তাদের খাবার টেবিলের সামনেকার চেয়ারে। সেইদিন থেকে বুড়ো লোকটির সঙ্গে তারা খেত। আর কোনোদিন তাকে কোনো কড়া কথা বলত না।

ডাক্তার সবজান্তা

এক সময় ক্র্যাব্ নামে ছিল গরিব এক চাষী। একদিন দুটো বলদে-টানা গাড়িতে শহরে কাঠ নিয়ে গিয়ে ছ শিলিং দিয়ে এক ডাক্তারকে সেটা সে বিক্রি করল। যখন তাকে দাম চুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে সে দেখল খুব ভালো-ভালো খাবার-দাবার নিয়ে ডাক্তার বসেছে খেতে। তাই তার খুব সাধ হল ডাক্তার হবার। সেখানে খানিক ঘুর্ঘুর্ করার পর ডাক্তারকে চাষী প্রশ্ন করল, সে-ও ডাক্তার হতে পারে কি না।

ডাক্তার বলল, "নিশ্চয়ই। এটা আর এমন শক্ত কাজ কী।"

চাষী প্রশ্ন করল, "কী-কী আমায় করতে হবে?"

"প্রথমে একটা অ আ ক খ'র বই কিনো। সেটায় যেন থাকে, 'অ-য়ে অজগর আসছে তেড়ে।' তার পর তোমার গাড়ি আর বলদ দুটো বিক্রি করে কিনো ভালো পোশাক-আশাক আর ডাক্তারি করার জন্যে যাবতীয় জিনিসপত্র। তার পর একটা সাইনবোর্ডে লিখিয়ে নিয়ো 'আমি ডাক্তার সবজান্তা' আর সেটা পেরেক দিয়ে সেঁটে দিয়ো তোমার বাড়ির দরজার ওপর।"

ফিরে গিয়ে ডাক্তারের কথামতো সব-কিছুই চাষী করল। কিছুদিন ডাক্তারি করার পর এক ধনী জমিদারের চুরি গেল কিছু টাকাকড়ি। ডাক্তার সবজান্তার কথা জমিদার শুনেছিলেন। শুনেছিলেন এই ডাক্তার সবজান্তা সঠিকভাবে বলে দিতে পারবে তাঁর টাকাকড়ির খবর। তাই

জমিদার গাড়ি হাঁকিয়ে চাষীর বাড়িতে হাজির হয়ে প্রশ্ন করলেন, সে ডাক্তার সবজান্তা কি না।

চাষী বলল, "হ্যাঁ।"

জমিদার বললেন, "তা হলে আমার সঙ্গে গিয়ে টাকাকড়ি উদ্ধার করে দাও।"

চাষী বলল, "আমার বউ মার্জারিও আমার সঙ্গে আসবে।"

তাতে জমিদারের আপত্তি ছিল না। তাদের দুজনকে জুড়িগাড়িতে তুলে তিনি এলেন নিজের প্রাসাদে। সেখানে তখন ডিনারের জন্য টেবিল সাজানো হয়েছিল। জমিদার তাকে খেতে আমন্ত্রণ করলেন। চাষী বলল, "আমার বউ মার্জারিও কিন্তু আমার সঙ্গে খেতে বসবে।" জমিদারের আপত্তি হল না। তারা দুজনেই খাবার টেবিলের সামনে গিয়ে বসল।

প্রথম ভৃত্য সুস্বাদু মাংসের ডিশ নিয়ে এলে চাষী তার স্ত্রীকে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে বলল, "মার্জারি, এ হল পয়লা নম্বর।" সে বোঝাতে চেয়েছিল সেই ভৃত্য টেবিলে প্রথম ডিশ এনেছে। কিন্তু ভৃত্য ভাবল, চাষী বলতে চাইছে যে, সে হচ্ছে চোরদের মধ্যে এক নম্বর। আর বাস্তবিকই চোরদের দলে ছিল বলে ভীষণ ভয় পেয়ে বাইরে গিয়ে তার সঙ্গীদের সে বলল, "আমাদের দফা রফা। ডাক্তার সব-কিছু জানে। সে বলেছে আমি হলাম পয়লা নম্বর।"

দ্বিতীয় ভৃত্যের ভিতরে যাবার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু যেতে সে বাধ্য হল।

খাবারের ডিশ নিয়ে সে আসতে চাষী তার স্ত্রীকে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে বলল, "মার্জারি, এই হল দ্বিতীয়।"

প্রথমজনের মতো সেই ভৃত্যও ভীষণ ভয় পেয়ে চট্‌পট্‌ ঘর থেকে সরে পড়ল।

তৃতীয় ভৃত্যের বেলাতেও ঘটল একই ঘটনা। কারণ চাষী আবার বলে উঠল, "এই হল তৃতীয়।"

চতুর্থ ভৃত্যের হাতে ছিল ঢাকা-দেওয়া একটা ডিশ। জমিদার বললেন সেই ডিশে কী আছে বলতে পারলে বঝবেন ডাক্তার বাস্তবিকই সবজান্তা। সেই ডিশে ছিল কাঁকড়ার তরকারি।

চাষী ভেবে পেল না কী করে সেই ফ্যাসাদ থেকে পার পাওয়া

যায়। তাই নিজের জন্য আক্ষেপ করে সে চেঁচিয়ে উঠল, "হায়, বেচারা ক্র্যাব্!" [ক্র্যাব্ মানে কাঁকড়া]

চাষীর কথা শুনে জমিদার চেঁচিয়ে উঠলেন, "ঠিক হয়েছে। ডাক্তার বাস্তবিকই সবজান্তা। নিশ্চয়ই সে জানে চোরাই টাকাকড়ি কার কাছে আছে।"

সেই ভৃত্য তখন ভীষণ ভয় পেয়ে ইশারায় ডাক্তারকে বার বার বলতে লাগল বাইরে আসতে। সে বাইরে যেতে চার ভৃত্যই কবুল করল টাকাকড়ি তারাই হাতিয়েছে। তারা বলল তাদের ধরিয়ে না দিলে সব টাকাকড়ি তারা ফিরিয়ে দেবে, উপরন্তু তাকেও দেবে অনেক টাকা। ধরা পড়লে চুরির অপরাধে তাদের ফাঁসিতে লটকানো হবে। টাকাকড়ি যেখানে তারা লুকিয়ে রেখেছিল সেখানেও তাকে তারা নিয়ে গেল।

ডাক্তার তখন খুশি হয়ে আবার খাবার ঘরে ফিরে এসে জমিদারকে বলল, "কর্তা, আমার বইটা খুলে দেখি টাকাকড়ি কোথায় লুকনো আছে।"

পঞ্চম ভৃত্য তখন চুপি চুপি লুকিয়ে পড়ল খাবারের আলমারির পিছনে। কারণ, ডাক্তার আরো কি কি জানে সে কথা সে জানতে চেয়েছিল। ডাক্তার চেয়ারে বসে অ আ ক খ'র বইটা খুলে খুঁজতে লাগল 'অ-য়ে অজগর' ছড়াটা। কিন্তু ছড়াটা কোথাও খুঁজে না পেয়ে সে বলে উঠল, "জানি এখানেই আছে, বেরিয়ে পড়তেই হবে।"

শুনে খাবারের আলমারির পিছনে যে-ভৃত্য লুকিয়েছিল তার মনে হল কথাগুলো তাকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে। ভীষণ ভয় পেয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে সে চেঁচিয়ে উঠল, "ইনি সব-কিছু জানেন। ইনি সবজান্তা।"

তার পর ডাক্তার সবজান্তা জমিদারকে নিয়ে গেল চোরাই টাকাকড়ি যেখানে লুকনো ছিল সেখানে। এইভাবে চোরদের কাছ থেকে সে পেল অনেক টাকা আর পুরস্কার হিসেবে জমিদারের কাছ থেকেও পেল অনেক টাকা। আর রাতারাতি সে হয়ে উঠল বিখ্যাত।

চাষীর চালাক মেয়ে

এক সময় এক গরিব চাষীর কোনো জমিজমা ছিল না। থাকার মধ্যে ছিল ছোট্টো একটি কুঁড়েঘর আর এক মেয়ে। মেয়েটি তাই একদিন তার বাবাকে বলল, "আমাদের কিছুটা জমি দিতে রাজাকে বলা দরকার।"

তাদের অভাবের কথা শুনে রাজা দিলেন বিঘেখানেক জমি। সেখানে বীজ বোনার জন্য চাষী আর তার মেয়ে জমিতে লাঙল দিতে শুরু করল। কাজ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তারা দেখে মাটির মধ্যে রয়েছে খাঁটি সোনার একটা খল।

চাষী তার মেয়েকে বলল, "রাজা দয়া করে জমিটা দিয়েছেন। তাই এই খলটা তাঁকে দিয়ে দেওয়া দরকার।"

তার মেয়ে কিন্তু চাষীর কথায় রাজি না হয়ে বলল, "বাবা, আমরা শুধু খলটাই পেয়েছি। নুড়িটা পাই নি। সেটা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের চুপচাপ থাকাই ভালো।"

কিন্তু মেয়ের কথায় কান না দিয়ে সোনার খল নিয়ে রাজার কাছে গিয়ে চাষী বলল, "মহারাজ, আপনি যে জমি দিয়েছিলেন এটা সেখানে পেয়েছি। তাই দিতে এলাম।"

সোনার খল নিয়ে রাজা প্রশ্ন করলেন, "আর কিছু পাও নি?"

চাষী বলল, "না, মহারাজ।"

রাজা বললেন, "এবার তোমাকে সোনার নুড়িটা এনে দিতে হবে।"

চাষী জানাল, সোনার নুড়ি সে পায় নি। কিন্তু রাজা তার কথা

বিশ্বাস করলেন না। তাকে হাজতে ভরে বললেন, "যত দিন না সোনার নুড়িটা বার করে দিচ্ছ ততদিন হাজতে বন্দী থাকবে।" হাজতের দৈনিক বরাদ্দ খাদ্য ছিল শুধু জল আর রুটি। যে-সব শান্ত্রী সেই জল-রুটি দিয়ে যেত তারা শুনত চাষীকে সব সময় বিড়বিড় করে বলতে, "হায় হায়, মেয়ের কথাগুলো যদি শুনতাম! হায় হায়, মেয়ের কথাগুলো যদি শুনতাম!"

শান্ত্রীরা একদিন রাজাকে গিয়ে বলল, "মহারাজ, চাষী ক্রমাগত বলে—হায় হায়, মেয়ের কথাগুলো যদি শুনতাম! সে না খায় রুটি, না খায় জল।"

রাজা তাদের বললেন চাষীকে তাঁর কাছে হাজির করতে। চাষীকে হাজির করা হলে তিনি জানতে চাইলেন, ক্রমাগত কেন সে বলে চলে—'হায় হায়, মেয়ের কথাগুলো যদি শুনতাম!'

"মেয়ে তোমাকে কী কথা বলেছিল?"

"মহারাজ, মেয়ে বলেছিল—খলটা নিয়ে যেয়ো না। নিয়ে গেলে রাজা বলবেন সোনার নুড়ি এনে দিতে।"

"তোমার মেয়ের যদি অতই বুদ্ধি, তা হলে তাকে এখানে ডেকে পাঠাই।"

চাষীর মেয়ে রাজসভায় হাজির হলে রাজা বললেন, "তোমার কত বুদ্ধি যাচাই করে দেখছি। একটা ধাঁধা বলি। সেটার উত্তর দিতে পারলে তোমায় আমি বিয়ে করব।"

চাষীর মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জানাল ধাঁধার উত্তর সে দেবে।

রাজা বললেন, "আমার কাছে তোমায় আসতে হবে পোশাক না পরে, উলঙ্গ না হয়ে, গাড়িতে না চড়ে, না পথ দিয়ে, না পথের বাইরে দিয়ে।—এটা পারলে তোমায় বিয়ে করব।"

চাষীর মেয়ে তখন বাড়ি ফিরে তার সমস্ত পোশাক খুলে ফেলল। অতএব তার পরনে কোনো সাজসজ্জা রইল না। তার পর একটা মাছ-ধরা জালে সর্বাঙ্গ নিল ঢেকে—তাই সে রইল না উলঙ্গ অবস্থায়। তার পর একটা গাধা ভাড়া করে মাছ ধরার জালটা তার লেজের সঙ্গে বেঁধে দিলে আর গাধা তাকে টেনে নিয়ে চলল গোরুর গাড়ির চাকার দাগের মধ্যে দিয়ে। তাই সে জন্তুর পিঠে বা গাড়িতে করে গেল না; আর গোরুর গাড়ির দাগকে তো আর পথ বলা যায় না। কিন্তু সেটা

আবার পথের বাইরেও না। তাই রাজার কাছে সে হাজির হল—না পথ দিয়ে, না পথের বাইরে দিয়ে।

রাজা তার বুদ্ধি দেখে মুগ্ধ হলেন। তার পর চাষীকে দিলেন মুক্তি আর চাষীর মেয়েকে বিয়ে করে রাজত্বের সমস্ত সম্পত্তির ভার তুলে দিলেন তার হাতে।

কয়েক বছর পরে রাজা একদিন চলেছেন কুচকাওয়াজ দেখতে। কয়েকজন চাষী তখন রাজপ্রাসাদের সামনে তাদের মাল গাড়ি থামিয়ে কাঠ বিক্রি করছিল। গাড়িগুলোর কয়েকটা টানছিল বলদ, কয়েকটা ঘোড়া। এক চাষীর ছিল তিনটে ঘোড়া আর একটা ঘোড়ার ছিল একটা বাচ্চা। ঘোড়ার বাচ্চাটা ছুটে গিয়ে একটা মালগাড়ির সামনেকার দুটো বলদের মাঝখানে শুয়ে পড়ল। বলদগুলোর যে মালিক সেই চাষী বলল ঘোড়ার বাচ্চাটা তার। ঘোড়াগুলোর যে মালিক সেই চাষী বলল—তার ঘোড়ার বাচ্চা, অতএব সেটা তার। এই নিয়ে তাদের মধ্যে তুমুল লাঠালাঠি বেধে গেল। শেষটায় বিচারের জন্য গেল তারা রাজার কাছে। রাজা বললেন, "ঘোড়ার বাচ্চা যেখানে শুয়ে সেখানেই সেটা থাকবে।" অতএব বলদগুলোর মালিক পেয়ে গেল ঘোড়ার বাচ্চাটা, যদিও আসলে সেটা তার নয়। অন্য চাষী তার ঘোড়ার বাচ্চার শোকে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

এই চাষী শুনেছিল রানী খুব দয়ালু। কারণ চাষীর বংশে তার জন্ম। তাই রানীর কাছে গিয়ে মিনতি করে বলল, ঘোড়ার বাচ্চাটাকে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে।

রানী বলল, "সাহায্য করব। কিন্তু কথা দাও মতলবটা যে আমি দিয়েছি সে কথা কাউকে বলবে না। কাল ভোরে রাজা যখন কুচকাওয়াজ দেখতে বেরুবেন যে রাস্তা দিয়ে তিনি যাবেন সেটার মাঝখানে বড়ো একটা মাছধরা জাল নিয়ে বসে এমনভাবে সেটা ছুঁড়তে থাকবে যেন নদীতে মাছ ধরছ।" তার পর তাকে শিখিয়ে দিল রাজা প্রশ্ন করলে কী উত্তর দিতে হবে।

রানীর কথামতো পরদিন ভোরে শুকনো জায়গায় বসে-বসে চাষী করতে লাগল মাছ ধরার ভান। সেখান দিয়ে যাবার সময় সেদিকে তাকিয়ে রাজা তাঁর দূতকে বললেন, "দেখে এসো তো বোকা লোকটা অমন করছে কেন?"

চাষী তাকে বলল, "আমি মাছ ধরছি।"

দূত প্রশ্ন করল, "যেখানে জল নেই সেখানে মাছ ধরবে কী করে?"

চাষী বলল, "দুটো বলদের একটা ঘোড়ার বাচ্চা হতে পারলে এই শুকনো ডাঙায় আমিও পারব মাছ ধরতে।"

দূত ফিরে গিয়ে রাজাকে জানাল চাষীর উত্তর। চাষীকে তখন ডেকে পাঠিয়ে রাজা বললেন, "এই মতলবটা তোমার মাথায় আসতেই পারে না। কেউ নিশ্চয়ই তোমায় শিখিয়ে দিয়েছে। কে সে—এক্ষুনি বল।" চাষী কিন্তু রাজাকে আসল কথাটা কিছুতেই জানাল না। বার বার বলতে লাগল উত্তরটা তার নিজের। কিন্তু তাকে খড়ের গাদায় ফেলে বেদম প্রহার দেবার পর শেষটায় চাষী কবুল করল, উত্তরটা রানী তাকে শিখিয়ে দিয়েছে।

রাজা বাড়ি ফিরে তাঁর বউকে বললেন, "তুমি আমাকে ভীষণ ঠকিয়েছ। তাই আর আমার বউ হয়ে এখানে তুমি থাকতে পারবে না। যে-কুঁড়েঘর থেকে এসেছিলে সেখানে ফিরে যাও। যাবার সময় তোমার যেটা সব চেয়ে প্রিয় জিনিস, নিয়ে যেতে পার।"

রানী বলল, "আদেশ দিলে নিশ্চয়ই আমি ফিরে যাব।"

তার পর কড়া ঘুমের ওষুধ দিয়ে সরবত বানিয়ে এনে রাজাকে বলল, শেষ বিদায় নেবার আগে একসঙ্গে সেটা তারা পান করবে। রাজা ঢক ঢক করে অনেকটা সরবত খেলেন। রানী কিন্তু সেটা শুধুই ঠোঁটে ঠেকাল। তার পর রাজা ঘুমে ঢলে পড়লে রানী তাঁকে সুন্দর সাদা একটা কাপড়ে জড়িয়ে, ভৃত্যদের সাহায্যে তাঁকে ধরাধরি করে ওঠাল জুড়িগাড়িতে। তার পর তাঁকে নিজেদের ছোট্টো কুঁড়েঘরে এনে শোয়াল নিজের ছোট্টো বিছানায়। সেখানে তিনি ঘুমোলেন পুরো এক দিন আর পুরো এক রাত। ঘুম ভাঙতে অবাক হয়ে তাকিয়ে রাজা বলে উঠলেন, "কী কাণ্ড! কোথায় আমি?" তার পর তিনি ডাকাডাকি করতে লাগলেন তাঁর খাস ভৃত্যদের নাম ধরে। কিন্তু কেউই সাড়া দিল না।

শেষটায় তাঁর বউ বিছানার পাশে এসে বলল, "আমার রাজা! তুমি বলেছিলে রাজপ্রাসাদ থেকে আমার সব চেয়ে প্রিয় জিনিস নিয়ে আসতে পারি। তোমার চেয়ে প্রিয় আমার কিছুই নেই। তাই তোমাকে নিয়ে এসেছি।"

তার কথা শুনে রাজার চোখ জলে ভরে উঠল। তিনি বললেন, "রানী, চিরকাল তুমি আমার আর চিরকাল আমি তোমার থাকব।" তার পর তাকে নিয়ে রাজা ফিরলেন তাঁর প্রাসাদে।

সম্ভবত আজও তাঁরা সেখানে সুখে শান্তিতে বেঁচে আছেন।

হিল্‌ডারব্র্যাণ্ড

এক সময় ছিল এক চাষী আর তার বউ। গ্রামের যাজক চাষীর বউকে খুব পছন্দ করত। খুব উপভোগ করত তার সঙ্গসুখ। যাজকের খুব ইচ্ছে ছিল গোটা একটা দিন চাষীর বউয়ের সঙ্গে কাটায়। চাষীর বউও তাই চেয়েছিল।

একদিন যাজক তাকে বলল, "শোনো সখী, আমার মাথায় দারুণ ভালো একটা প্ল্যান এসেছে। এইভাবে গোটা একটা দিন একসঙ্গে আমরা কাটাতে পারি—আগামী বুধবার খুব অসুখের ভান করে তুমি বিছানায় শুয়ে পড়বে। রবিবার পর্যন্ত তোমার বরকে বলে যেয়ো—তোমার মাথা ঘুরছে, গা বমি-বমি করছে আর মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে যাবে। তার পর রবিবার সকালে গির্জেয় উপদেশ দেবার সময় আমার বক্তৃতায় বলব: যারই বাড়িতে অসুস্থ কেউ থাকবে—শিশু, স্বামী, স্ত্রী, বাবা, মা, ভাই, বোন, যে কেউই হোক-না-কেন তাকে তীর্থে যেতে হবে, ওয়ালিশ্‌ল্যাণ্ডে গোকেল্‌স্‌বার্গে। সেখানে এক পয়সায় পাওয়া যায় এক্ আঁটি চির-সবুজ লরেল্‌গাছের পাতা। সেই পাতা আনলে—শিশু, স্বামী, স্ত্রী, বাবা, মা, ভাই, বোন যে-কেউই হোক-না-কেন সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে উঠবে।

চাষীর বউ আনন্দে প্রায় নেচে উঠে বলল, "এতে আর কথা কি? নিশ্চয়ই খুব অসুখের ভান করব।"

তাই বুধবার চাষীর বউ বিছানা নিল। বলল—ভীষণ তার অসুখ করেছে। বেচারা চাষী হরেকরকম মুখরোচক খাবার নিয়ে এল তার জন্য। চাষীর বউ কোনোটাই ছুঁল না।

রবিবার সকালে চাষীর বউ বলল, "জানি মরতে বসেছি তবু শেষবারের মতো আমাদের যাজকের ধর্ম-উপদেশগুলো গির্জেয় গিয়ে শুনতে চাই।"

চাষী বলল, "বউ, দোহাই তোমার! উঠো না। উঠলে হয়তো আরো শরীর খারাপ হবে। তোমার হয়ে আমি গির্জেয় গিয়ে শুনে আসছি আমাদের যাজকের প্রত্যেকটি কথা। ফিরে তোমায় বলব।"

চাষীর বউ বলল, "বেশ। কিন্তু তাঁর একটি কথাও ভুলো না যেন।"

চাষী গির্জেয় গেল আর ধর্ম-উপদেশের বক্তৃতায় যা-যা বলবে বলেছিল যাজক বলল ঠিক সেই কথাগুলোই।

সে বলল—এক সময় একটি লোকের বাড়িতে তার এক পরমাত্মীয় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। লোকটি গোকেল্‌স্‌বার্গে যায় তীর্থ করতে। সেখান থেকে এক পয়সায় এক আঁটি লরেল্‌-পাতা সে কিনে আনে আর সেই পাতার গুণে সেরে ওঠে তার আত্মীয়। বক্তৃতার শেষে যাজক জানাল তার উপদেশমতো কেউ তীর্থে যেতে চাইলে তাকে সে দেবে লরেল্‌-পাতা আনার ঝুলি আর একটা পয়সা।

যাজকের বক্তৃতা শুনে চাষীর খুব আনন্দ হল। তাই সে গেল যাজকের কাছে। যাজক তাকে দিল একটা ঝুলি আর একটা পয়সা। হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে দোরগোড়া থেকে চাষী চেঁচিয়ে উঠল, "বউ, খুব সুখবর—এবার নির্ঘাৎ তোমার অসুখ সারবে!" তার পর সে জানাল যাজকের বক্তৃতার কথা, যেটা তার বউ আগে থেকেই জানত। লরেল্‌-পাতার জন্য থলি আর পয়সাটা দেখিয়ে সে বলল, "আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। কারণ যত তাড়াতাড়ি যাব তত তাড়াতাড়ি তুমি সেরে উঠবে।"

সে চলে যেতেই তার বউ বিছানা থেকে উঠে পড়ল আর তাদের বাড়িতে এসে পৌঁছল যাজক।

এখন এদের দুজনের কথা থাক। চলো যাই আমরা চাষীর সঙ্গে।

তাড়াতাড়ি তীর্থে পৌঁছবার জন্য হন্‌হনিয়ে চাষী চলেছে। পথে নিজের গ্রামের এক লোকের সঙ্গে তার দেখা। লোকটির হাঁস-মুরগির ব্যবসা। হাটে ডিম বেচে সে ফিরছিল।

চাষীকে সে প্রশ্ন করল, "এমন হন্তদন্ত হয়ে চলেছ কোথায়?"

চাষী বলল, "দিন কয়েক হল আমার বউয়ের খুব অসুখ। যাজকমশাই বলেছেন বাড়িতে যারই অসুখ করুক-না-কেন—স্বামী, স্ত্রী, বাবা, মা, ভাই, বোন—গোকেল্‌স্‌বার্গের তীর্থ করতে গিয়ে এক পয়সা দিয়ে এক আঁটি লরেল্‌-পাতা কিনে আনলে সঙ্গে সঙ্গে সে সেরে যাবে। তাই আমি চলেছি তীর্থে।"

গ্রামের লোকটি বলল, "ভায়া, তোমার মতো হাঁদারাম দুটি নেই। যাজকমশাইয়ের কথা তুমি বিশ্বাস করলে? জানো না, বাড়ি থেকে তারা তোমায় ভাগাতে চায়।"

চাষী বলল, "তাই নাকি? তোমার কথাটা সত্যি কি না যাচাই করে দেখছি।"

গ্রামের লোকটি বলল, "তা হলে আমার ঝুড়ির মধ্যে বসে পড়ো। তোমাকে আমি মাথায় করে তোমার বাড়িতে নিয়ে যাব। স্বচক্ষে তখন দেখবে আমার কথাটা অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি।"

চাষী ঝুড়ির মধ্যে সেঁধুতে গ্রামের লোকটি মাথায় করে তাকে তার বাড়িতে নিয়ে চলল। বাড়ির কাছাকাছি পেঁছিতে তাদের কানে ভেসে এল হো-হো হি-হি হাসির শব্দ। চাষীর বউ তখন রাতের ভোজের আয়োজন করেছিল। আগেই সে মেরেছিল গোটা কয়েক মুরগি আর বানিয়েছিল একটা কেক। আর যাজক এনেছিল তার বেহালাটা।

গ্রামের লোকটি দরজা ধাক্কা দিতে চাষীর বউ প্রশ্ন করলে, "কে?"

"আমি তোমাদের গাঁয়ের লোক গো। হাটে গিয়েছিলাম। কিন্তু ডিমগুলো বিক্রি হয় নি। ঝুড়িটা বেজায় ভারী। এত রাতে আর বাড়ি বয়ে নিয়ে যেতে পারছি না। তোমার এখানে রাতটুকু কাটাতে দেবে?"

চাষীর বউ বিরক্ত হয়ে বলল, "ভারি অসময়ে এসেছ। আমি এখন বেজায় ব্যস্ত। কিন্তু তুমি বলেই বলছি—ভেতরে এসে উনুনটার পাশে বোসো গে।"

গ্রামের লোকটি উনুনের পাশে বসে মাথার ঝুড়িটা নামিয়ে রাখল। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই ফুর্তিতে মেতে উঠল যাজক আর চাষীর বউ।

যাজক বলল, "সখী, তোমার গলা ভারি মিষ্টি। একটা গান শোনাবে?"

চাষীর বউ বলল, "ছেলেবেলায় গান গাইতাম। এখন আর তেমন গানের গলা নেই।"

যাজক কিন্তু ঝুলোঝুলি করতে লাগল, "ছোট্টো একটা গান—প্লিজ!"

চাষীর বউ তখন গান ধরল :

"বরটা আমার ভেড়া
গেছে তীর্থ করতে,
দেখলে গা-টা জ্বলে
পারবে কবে মরতে?"

যাজক তখন জুড়ে দিল :

"না ফিরলেই ভালো
না ফিরলেই ভালো।
ঝোলা-বোঝাই লরেল্ দিয়ে
ঘর হবে না আলো।"

গ্রামের লোকটি আর সামলাতে পারল না। উনুনের পিছন থেকে সে-ও গেয়ে উঠল :

"হিল্‌ডারব্র্যাণ্ড হিল্‌ডারব্র্যাণ্ড
করছ তুমি কী?
ঝুড়ির মধ্যে গুঁড়ি মেরে
একাকী একাকী?"

(চাষীর নাম ছিল হিল্‌ডারব্র্যাণ্ড)

চাষী তখন হুংকার ছেড়ে বলে উঠল, "এ-সব গান আর বরদাস্ত হচ্ছে না।" তার পর এক লাফে ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে লাফিয়ে যাজককে তাড়াল তার বাড়ি থেকে।

মিস্টার বাসকার্ট

একবার এক মোরগ আর মোরগ-বউ স্থির করল বেড়াতে বেরুবে। চারটে লাল চাকা দিয়ে মোরগ-বউ একটা জুড়িগাড়ি তৈরি করাল। সেটায় জুতে দেওয়া হল চারটে ইঁদুর। গাড়িতে বরের পাশে গিয়ে বসল মোরগ-বউ। গাড়িটা খানিক যেতে-না-যেতে তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এক বেড়ালের। বেড়াল জিগ্‌গেস করল, "কোথায় তোমরা চলেছ?"

মোরগ-বউ বলল, "চলেছি মিস্টার বাসকার্টের সঙ্গে দেখা করতে।"

বেড়াল বলল, "আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো।"

মোরগ-বউ জবাব দিল, "সানন্দেই নিয়ে যাব। পেছনে গিয়ে বোসো, যাতে না পড়ে যাও।"

"সাবধান সাবধান অতিশয়—
লাল চাকা নোংরা না হয়।
ক্ষুদে চাকা ঘোর্ রে
ক্ষুদে ইঁদুর টান্ রে
জলদি চল্ জলদি চল্
বাস্‌কার্টের বাড়ি চল্।"

যেতে-যেতে তাদের সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গেল একটা জাঁতা-পাথর, একটা পাতিহাঁস, একটা ডিম, একটা আলপিন আর একটা ছুঁচের। তারা প্রত্যেকেই গাড়িটায় যেতে চাইল। তাই তাদের প্রত্যেককেই তুলে নেওয়া হল গাড়িতে। আর সবাই মিলে তারা চলল মিস্টার

বাস্‌কার্টের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু পৌঁছে তারা দেখে মিস্টার বাসকার্ট বাড়িতে নেই। ইঁদুররা গেল গোলাবাড়িতে থাকতে, মোরগ আর মোরগ-বউ উড়ে বসল একটা বাঁশের উপর, বেড়াল গিয়ে বসল উনুনের সামনেকার কম্বলে, পাতিহাঁস গিয়ে বসল কল-ঘরের কলে, ডিম গুটিশুটি মেরে উঠে পড়ল তোয়ালের মধ্যে, আলপিন গিয়ে নিজেকে আটকে ফেলল চেয়ারের কুশনে, ছুঁচ লাফিয়ে বিছানায় উঠে সেঁধুল বালিশের মধ্যে আর জাঁতা-পাথর গিয়ে উঠল দরজার উপর। তার পর মিস্টার বাসকার্ট বাড়ি ফিরে গেলেন আগুন জ্বালাতে। কিন্তু বেড়াল তাঁর মুখে দিল ছাই ছুঁড়ে। তিনি দৌড়ে কল-ঘরে গেলেন মুখ ধুতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাতিহাঁস তাঁর মুখে জল ফেলল কুলকুচো করে। তোয়ালে দিয়ে তিনি গেলেন মুখ মুছতে। ডিমটা অমনি ফেটে তাঁর চোখের পাতায় গেল আটকে। তার পর বিশ্রাম নেবার জন্য তিনি গেলেন চেয়ারে বসতে। কিন্তু আলপিনটা তাঁকে মারল খোঁচা। দারুণ রেগে তিনি পড়লেন বিছানায় ঝাঁপিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ছুঁচটা তাঁর গায়ে বিঁধে গেল। হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে লাফিয়ে উঠে তিনি গেলেন ছুটে বাড়ি থেকে বেরুতে। অমনি সামনের দরজার উপরকার জাঁতা-পাথর তাঁর মাথায় পড়ে তাঁকে পিষে মারল। অতএব মিস্টার বাসকার্ট যে ছিলেন অতিশয় বদ লোক তাতে সন্দেহ নেই।



হান্‌সেল আর গ্রেথেল

প্রকাণ্ড একটা বনের কাছে এক সময় থাকত গরিব এক কাঠুরে, তার বউ আর তার দুই ছেলেমেয়ে। ছেলেটির নাম হান্‌সেল আর ছোট্টো মেয়েটির নাম গ্রেথেল। খাবার-দাবার খুব কমই তাদের কপালে জুটত। সেবার, দেশে যখন দুর্ভিক্ষ, প্রতিদিন রুটিও তারা জোগাড় করতে পারত না। সে-রাতে বিছানায় শুয়ে কাঠুরের চোখে ঘুম নেই। নানা দুশ্চিন্তা তার মনে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে করুণ স্বরে বউকে সে বলল, "আমাদের বরাতে কী আছে বল দেখি? আমাদেরই

খাবার নেই, বাচ্ছা দুটোকে কী করে খাওয়াই ?" তার বউ বলল, "কী করতে হবে বলি—শোনো। কাল খুব ভোরে ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমরা বনে যাব। গহন বনের মধ্যে তাদের জন্যে আগুন জ্বালিয়ে, এক টুকরো করে রুটি দিয়ে, সেখানে তাদের রেখে আমরা যাব আমাদের কাজে। তারা কিছুতেই বাড়ি ফেরার পথ খুঁজে পাবে না। আমাদের ঘাড় থেকে বোঝা নামবে।

কাঠুরে বলল, "না বউ, ওটা আমি পারব না। লোকে প্রাণ ধরে কি নিজের ছেলেমেয়েকে একলা বনে ছেড়ে দিতে পারে ? সেখানে তো বুনো জন্তু-জানোয়ার তাদের খেয়ে ফেলবে।"

তার বউ বলল, "তুমি ভারি বোকা ! আমাদের চারজনকেই তা হলে উপোস করে মরতে হবে দেখছি। আমাদের কফিনের কাঠগুলো চাঁচতে-ছুলতে শুরু করে দাও।" ক্রমাগত সে ঘ্যানঘ্যান করে চলল। শেষটায় নিমরাজি হল কাঠুরে।

ক্ষিদেয় ছেলেমেয়েদের পেট চুঁইচুঁই করছিল। তাই তারাও ঘুমোতে পারে নি। সৎমার কথাগুলো তাদের কানে এল। আমুরি-ঝুমুরি হয়ে কাঁদতে-কাঁদতে হান্‌সেলকে গ্রেথেল বলল, "আমাদের আর কোনো আশা নেই।"

হান্‌সেল বলল, "কাঁদিস না গ্রেথেল। আমি দেখছি যাতে ওদের মতলবটা ভেস্তে যায়।" বুড়ো-বুড়ি ঘুমিয়ে পড়লে নিজের ছোট্টো কোটটা গায়ে চড়িয়ে পা টিপে টিপে খিড়কির দরজা দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। ঝকঝকে জ্যোৎস্নায় বাড়ির সামনের সাদা নুড়িগুলো নতুন টাকা-পয়সার মতো চকচক করছিল। নিচু হয়ে হান্‌সেল সেই নুড়ি তার কোটের পকেটগুলোয় ভরল। তার পর ফিরে এসে গ্রেথেলকে বলল, "দুর্ভাবনা করিস না, বোনটি। শান্ত হয়ে ঘুমো। ভগবান আমাদের সহায় হবেন।" কথাগুলো বলে সেও শুয়ে পড়ল তার ছোট্টো বিছানায়।

পরদিন ভোরের আলো ফুটতে-না-ফুটতেই ছেলেমেয়েদের ঘুম থেকে তুলে সৎমা তাদের বলল সূর্য ওঠার আগে পোশাক পরে নিতে। বলল, "কাঠকুটো কুড়ুতে আমাদের সঙ্গে বনে চলো।" তাদের এক টুকরো করে রুটি দিয়ে বলল, দুপুরের আগে সেটা যেন তারা না খায়, কারণ আর কোনো খাবার তারা পাবে না। রুটির টুকরো দুটো গ্রেথেল ভরল তার এপ্রনের মধ্যে। কারণ হান্‌সেলের পকেটগুলো ছিল নুড়িতে

বোঝাই। অল্পক্ষণের মধ্যে তারা যাত্রা করল বনের দিকে। খানিক যেতে-না-যেতে হান্‌সেল দাঁড়িয়ে পড়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল তাদের বাড়ির দিকে। এইভাবে কয়েক পা সে যায় আর থেমে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে বাড়িটার দিকে তাকায়। শেষটায় তার বাবা বিরক্ত হয়ে বলল, "হান্‌সেল! বার বার থেমে-থেমে দেখছিস্ কী? পা চালিয়ে চল।"

হান্‌সেল বলল, "বাবা, আমার সাদা বেড়ালছানাটাকে দেখছি। ছাতে বসে থাবা নাড়িয়ে সে আমাকে বিদায় জানাচ্ছে।"

সৎমা বলল. "দূর মুখ্যু! ওটা তোর বেড়ালছানা নয়—সকালের রোদ চিমনির ওপর চকচক করছে।" আসলে হান্‌সেল কিন্তু বেড়াল-ছানাটাকে দেখছিল না—পকেটের নুড়িগুলো ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

বনের মাঝখানে পৌঁছে তাদের বাবা বলল, "এখানে কাঠকুটো জড়ো কর। আমি আগুন জ্বালিয়ে দেব। তা হলে ঠাণ্ডায় জমে যাবি না।"

হান্‌সেল আর গ্রেথেল বেশ কিছু কাঠকুটো জোগাড় করে আনল। আগুনের শিখা লকলক করে জ্বলে ওঠার পর সৎমা তাদের বলল, "বাছারা, এখানে শুয়ে বিশ্রাম নে। আমরা আর খানিক গিয়ে কাঠ কেটে আনি। কাঠ কাটা শেষ হলে এখান থেকে তোদের নিয়ে যাব।"

হান্‌সেল আর গ্রেথেল আগুনের পাশে বসল। দুপুরের খাবার সময় হলে সেই দু টুকরো রুটি বার করে তারা খেল। গাছের উপর কুড়ুলের কোপ তারা শুনতে পাচ্ছিল। তাই ভাবল বাবা তাদের কাছাকাছি কোথাও রয়েছে। আসলে কিন্তু শব্দটা কুড়ুলের নয়। সেটা একটা গাছের ডালের শব্দ। কাঠুরে সেটা বেঁধে দিয়েছিল মরা একটা গাছের সঙ্গে। বাতাসের ধাক্কায় সেটা এদিক-ওদিক দুলে গাছটায় আছড়ে-আছড়ে পড়ছিল। তাই শোনাচ্ছিল যেন কাঠ কাটার শব্দ। বহুক্ষণ তারা বসে রইল। শেষটায় ক্লান্ত হয়ে পড়ল ঘুমিয়ে। যখন তাদের ঘুম ভাঙল তখন রাত হয়ে গেছে। চারি দিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। গ্রেথেল কাঁদতে শুরু করে বলল, "আমরা কখনোই আর বন থেকে বেরুবার পথ খুঁজে পাব না।"

হান্‌সেল তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "একটু সবুর কর। এক্ষুনি চাঁদ উঠবে। চাঁদ উঠলেই পথ চিনতে পারব।"

খানিক পরেই আকাশে উঠল মস্ত বড়ো গোল একটা চাঁদ। হান্‌সেল তার ছোট্টো বোনটির হাত ধরে নুড়ি ছড়ানো পথ দিয়ে ফিরে চলল।

নুড়িগুলোকে সেই চাঁদের আলোয় দেখাচ্ছিল যেন রুপোর নতুন টাকা। সারা রাত হেঁটে ভোরবেলায় তারা পৌঁছল তাদের বাড়িতে। তারা দরজায় টোকা দেবার পর দরজা খুলে সৎমা তাদের দেখে বলল, "বনের মধ্যে এতক্ষণ ঘুমিয়েছিলি কেন? আমরা ভাবছিলাম—তোরা বুঝি আর ফিরবিই না।"

ছেলেমেয়েদের ফিরতে দেখে তাদের কাঠুরে-বাবার আনন্দ আর ধরে না। বনের মধ্যে তাদের ছেড়ে আসায় বুক তার দুঃখে-শোকে ভেঙে পড়েছিল।

কিছুকাল পরে দুর্ভিক্ষের হাহাকার আবার ছড়িয়ে পড়ল। রাতের বেলা ছেলেমেয়েরা আবার তাদের সৎমাকে বলতে শুনল, "ওগো শুনছ? খাবার বলতে কিছুই তো আর নেই—মাত্র আধখানা রুটি। আর সেটা শেষ হলে আমরা তো কাঙালের চেয়েও কাঙাল!

"ছেলেমেয়ে-দুটোকে যেমন করেই হোক দূর করতে হবে। এবার তাদের নিয়ে যাব বনের এমন একটা গভীর জায়গায়, যেখান থেকে ফেরবার পথ তারা খুঁজে পাবে না। আমাদের প্রাণে বাঁচতে হলে এটা ছাড়া অন্য পথ নেই।"

দুঃখে শোকে কাঠুরের মন তখন ভেঙে যাচ্ছে। সে ভাবছিল নিজেদের শেষ খুদ-কুঁড়ো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভাগ করে খাবার কথা। কিন্তু তার কোনো কথাই সেই সৎমা কানে তুলল না। ক্রমাগত দাঁত খিঁচিয়ে গালি-গালাজ করে চলল সে। কাঠুরে প্রথমবার তার বউয়ের কথা শুনেছিল। তাই দ্বিতীয়বারও তার কথা না শুনে পারল না।

ছেলেমেয়েরা জেগেই ছিল। তাই তাদের সৎমার কথাগুলো সব শুনল। তাদের বাবা আর সৎমা ঘুমিয়ে পড়ার পর আগের বারের মতো বিছানা থেকে উঠে পা টিপেটিপে হান্‌সেল আবার গেল নুড়ি কুড়োতে। কিন্তু সৎমা দরজায় কুলুপ এঁটে দিয়েছিল। তাই সে বাড়ির বাইরে যেতে পারল না। তবু তার বোনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "কাঁদিস না গ্রেথেল। ঘুমিয়ে পড়। ভগবান আমাদের সহায় হবেন।"

খুব ভোরে সৎমা তাদের ঘুম ভাঙাল। প্রত্যেককে দিল এক-এক টুকরো রুটি। কিন্তু আগের চেয়ে এবারের রুটির টুকরোগুলো অনেক ছোটো।

বনে যাবার পথে হান্‌সেল তার রুটি পকেটের মধ্যে ভেঙে ফেলল আর মাঝে মাঝে থেমে রুটির টুকরোগুলো লাগল মাটিতে ছড়াতে।

তাদের বাবা বলল, "হান্‌সেল, পেছনে কেন ঘুরঘুর করছিস আর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিস?"

"বাবা, আমার পোষা ছোট্টো বন-পায়রাটাকে দেখছি। ছাতে বসে বক-বকম্ করে সে আমায় বিদায় জানাচ্ছে।"

সৎমা মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠল, "হাঁদা কোথাকার। বন-পায়রা হতে যাবে কেন? সকালের রোদে চিমনির ওপরটা চকচক করছে।"

তার কথায় কান না দিয়ে হান্‌সেল চুপি চুপি রুটির টুকরো পথে ছড়িয়ে চলল।

সৎমা তাদের বনের এমন গভীরে নিয়ে গেল যেখানে আগে কখন তারা যায় নি। আবার বেশ বড়ো গোছের আগুন জ্বালানো হলে পর সৎমা তাদের বলল, "তোরা বাছা এখানে থাক। ক্লান্ত হলে খানিক ঘুমিয়ে নিস। কাঠ কাটার জন্যে আমরা এগুচ্ছি। কাজ সারা হলে তোদের নিতে আসব।"

দুপুরের খাবার সময় গ্রেথেল তার রুটির অর্ধেকটা হান্‌সেলকে দিলে, কারণ আসার সময় হান্‌সেল তার রুটির সবটাই টুকরো-টুকরো করে সারা পথে ছড়িয়েছিল। খাওয়া সেরে তারা ঘুমিয়ে পড়ল। সন্ধে পার হয়ে গেল। কিন্তু কেউই তাদের নিতে এল না। যখন তাদের ঘুম ভাঙল তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। ছোট্টো বোনটিকে সান্ত্বনা দিয়ে হান্‌সেল বলল, "সবুর কর। একটু পরেই চাঁদ উঠবে। রুটির যে টুকরোগুলো ছড়িয়েছি সেগুলো তখন দেখে-দেখে পথ চিনে বাড়ি ফিরব।"

কিন্তু চাঁদ ওঠার পর রুটির টুকরোগুলো তারা দেখতে পেল না। কারণ মাঠ-ঘাট-বনের হাজার পাখি সেগুলো খেয়ে ফেলেছিল।

হান্‌সেল বলল, "ভাবিস না গ্রেথেল। পথ আমরা ঠিকই খুঁজে পাব।" সারা রাত আর পরের সারাটা দিন তারা হাঁটল। কিন্তু তারা না খুঁজে পেল পথ, না পারল বন থেকে বেরুতে। বেরি-ফল ছাড়া অন্য কোনো খাবার তাদের কপালে জুটল না। খিদেয় তাদের আধ-মরা অবস্থা। ক্লান্তিতে পা আর চলতে চায় না। তাই তারা একটা গাছতলায় শুয়ে পড়ল ঘুমিয়ে।

বাড়ি ছেড়ে বেরুবার পর তৃতীয় দিন সকাল। তখনো তারা গভীর বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা বুঝল, কেউ

সাহায্য করতে না এলে তাদের মরতে হবে। এমন সময় তারা দেখে ধবধবে সাদা সুন্দর একটা পাখি গাছের একটা ডালে বসে ভারি সুন্দর গান গেয়ে চলেছে। সেই গান শোনার জন্য তারা থামল। গান গাওয়া শেষ হলে ডানা মেলে পাখিটা উড়ল আর তারা চলল সেটার পিছন পিছন। উড়তে-উড়তে পাখিটা এসে বসল ছোট্টো একটা বাড়ির ছাতে। কাছে গিয়ে তারা দেখে রুটি দিয়ে সেই বাড়িটি বানানো, খড়ের বদলে কেক দিয়ে চালটা ছাওয়া আর জানালাগুলো তৈরি মিছরি দিয়ে। হান্‌সেল বলল, "আয় গ্রেথেল, অনেকদিন পর পেট ভরে খাই। বাড়ির চালটায় আমি কামড় বসাচ্ছি। জানলাগুলো দিয়ে তুই শুরু কর—খুব মিষ্টি লাগবে।"

উপরে উঠে কেমন স্বাদ দেখবার জন্য হান্‌সেল ছাতের একটা টুকরো ভেঙে মুখে দিল। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে গ্রেথেল লাগল কুট্-কুট্ করে সেটায় কামড় দিতে।

এমন সময় বাড়িটার ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল :

"কুটুর! কুটুর! কুটুর!
কে রে আমার বাড়ি ঠোকরায়?"

ছেলেমেয়েরা উত্তর দিল :

"স্বর্গ থেকে আসা—
বাতাস! বাতাস! বাতাস!"

তার পর কোনোরকম ভ্রূক্ষেপ না করে তারা খেয়ে চলল।

হান্‌সেল দেখল ছাতটার স্বাদ চমৎকার। সে আর-একটা বড়োসড়ো টুকরো ভেঙে নিল। জানালার একটা শার্শি নামিয়ে বসে-বসে তারিয়ে-তারিয়ে খেতে শুরু করল গ্রেথেল। এমন সময় হঠাৎ বাড়িটার দরজা খুলে লাঠিতে ভর দিয়ে নড়বড় করতে-করতে বেরিয়ে এল খুনখুনে এক বুড়ি। তাকে দেখে দারুণ ভয়ে হান্‌সেল আর গ্রেথেলের পা লাগল ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে। তাদের হাত থেকে খাবার-দাবার মাটিতে পড়ে গেল।

বুড়ি তার নড়বড়ে মাথা নাড়িয়ে বলল, "বাছারা কে তোদের এখানে আনল? আয়-আয়, ভেতরে আয়। আমার সঙ্গে থাকবি। কেউ তোদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।"

তাদের হাত ধরে বুড়ি নিয়ে গেল সেই বাড়িটার মধ্যে। তারা দেখে থরে-থরে তাদের জন্য নানা খাবার সাজানো : নানারকম পিঠে-পুলি,

চিনির দানা, আপেল আর বাদাম। তার পর তাদের জন্য বুড়ি পেতে দিল ধবধবে ছোট্টো দুটো বিছানা। তাতে শুয়ে পড়ে হান্‌সেল আর গ্রেথেলের মনে হল তারা যেন স্বর্গে এসে পৌঁচেছে। সেই বুড়ি কিন্তু ভালোমানুষটির ভান করেছিল। কারণ আসলে সে ছিল শয়তান এক ডাইনি। ভালো-ভালো খাবার দিয়ে সে বাড়িটা বানিয়েছিল লোক দেখিয়ে ভুলিয়ে কচি-কচি ছেলেমেয়েদের ধরার জন্য। নিজের আওতায় ভালো করে আনার পর তাদের বধ করে রান্না করে মহানন্দে নিজের ভোজ সে সারত। বুড়ির চোখ দুটো ছিল ক্ষুদে-ক্ষুদে, ফ্যাকাশে-লালচে রঙের। দূরের জিনিস সে দেখতে পেত না। কিন্তু জন্তু-জানোয়ারের মতো ঘ্রাণ-শক্তি ছিল তার খুব তীব্র। অনেক দূর থেকে মানুষের গন্ধ সে পেত। হান্‌সেল আর গ্রেথেল তার বাড়ির কাছে আসতেই শয়তানী চাপা হাসি হেসে আপন মনে সে বলে উঠেছিল, "কচি বাচ্চা দুটোকে আগুনে ঝলসে খাব—ওরা আমার খপ্পর থেকে পালাতে পারবে না।"

পরদিন ভোরে ছেলেমেয়েদের ঘুম ভাঙার আগে বুড়ি ডাইনি উঠে পড়ল তার পর তাদের গোলাপী গালের দিকে তাকিয়ে বিড়্‌বিড়্‌ করে বলে উঠল, "ভারি রসাল—খাসা খেতে হবে।" তার পর তার শুকনো, চামড়া-কোঁচকানো হাত দিয়ে হান্‌সেলকে ধরে ছোট্টো একটা আস্তাবলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে লোহার গরাদের কপাট বন্ধ করে দিল। পরিত্রাহি চীৎকার করতে লাগল হান্‌সেল। কিন্তু কোনো ফল হল না। তার পর সেই ডাইনি গ্রেথেলের কাছে গিয়ে তাকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে বলল, "এই কুঁড়ে মেয়ে—ওঠ্, ওঠ্। কুয়ো থেকে জল তুলে এনে ভাইয়ের জন্যে ভালো-ভালো রান্না কর। আস্তাবলের মধ্যে সে আছে। তাকে মোটাসোটা করা দরকার। নাদুস-নুদুসটা হলে তাকে আমি খাব।"

আমুরি-ঝুমুরি হয়ে কাঁদতে শুরু করল গ্রেথেল। কিন্তু কোনো ফল হল না। শয়তান ডাইনির আদেশমতো কাজ করতে সে বাধ্য হল।

হান্‌সেলকে দেওয়া হতে লাগল ভালো-ভালো পুষ্টিকর খাবার। কিন্তু গ্রেথেলের বরাতে জুটতে লাগল শুধুই এঁটোকাঁটা। প্রতিদিন বুড়ি ডাইনি খোঁড়াতে-খোঁড়াতে আস্তাবলের কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে বলে, "হান্‌সেল, তোর একটা আঙুল বাড়িয়ে দে। দেখি কী রকম মোটা হচ্ছিস।" কিন্তু আঙুলের বদলে হান্‌সেল বাড়িয়ে দেয় এক টুকরো হাড়। বুড়ি ডাইনির দৃষ্টি খুব ক্ষীণ। তাই হাড়টা ভালো করে দেখতে পায় না। সেটা

টিপে-টিপে পরখ করে, আর হান্‌সেল মোটা হচ্ছে না দেখে অবাক হয়।

এইভাবে চার সপ্তাহ কাটল। কিন্তু হান্‌সেল যে রোগা, সেই রোগা। বুড়ি ডাইনি আর ধৈর্য ধরতে পারল না। গ্রেথেলকে সে বলল, "শোন্, চট্‌পট্ কুয়ো থেকে জল তোল। হান্‌সেল রোগাই থাক কি মোটাই থাক—কাল তাকে কেটে রান্না করে খাব।"

কুয়ো থেকে জল আনতে-আনতে হাপুস্ নয়নে কেঁদে চলল গ্রেথেল। তার দু গাল বেয়ে ঝর্ ঝর্ করে ঝরতে লাগল চোখের জল। মনে মনে সে প্রার্থনা করে চলল, 'হে ভগবান! আমাদের সাহায্য কর! বনের জানোয়ারেরা আমাদের খেয়ে ফেললে অন্তত এক সঙ্গে আমরা মরতে পারতাম।'

বুড়ি ডাইনি বলল, "ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করিস না। কোনো ফল হবে না।"

পরদিন ভোরে গ্রেথেলকে আগুন জ্বালিয়ে কেটলিতে জল ভরতে হল।

বুড়ি ডাইনি বলল, "প্রথমে আমরা রুটি সেঁকব। চুল্লিতে আঁচ দিয়ে ময়দা মেখে আমি রেখেছি।" গ্রেথেলকে সে পাঠাল রুটি সেঁকবার জায়গায়। চুল্লির চার পাশে আগুনের শিখা তখন লকলক করছে। ডাইনি বলল, "গুঁড়ি মেরে ভেতরে ঢুকে দেখ্—রুটিটা ভেতরে পোরার মতো যথেষ্ট গরম হয়েছে কি না।" তার মতলব ছিল গুঁড়ি মেরে ভিতরে ঢুকলে চুল্লির দরজা বন্ধ করে আগুনে ঝলসে প্রথমে গ্রেথেলকে খাবার।

কিন্তু ডাইনির মতলব বুঝতে পেরে গ্রেথেল বলল, "কী করতে হবে ঠিক বুঝতে পারছি না। কী করে ভেতরে ঢুকব?"

বুড়ি ডাইনি খেঁকিয়ে বলল, "গাধা কোথাকার! ফোকরটা তো বেশ বড়ো। এই দেখ্—আমি ঢুকছি।"

চুল্লির দরজা খুলে নিজের মাথাটা ভিতরে ঢোকাল সে। সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে ঠেলা দিয়ে ডাইনিকে চুল্লিটার মধ্যে পাঠিয়ে লোহার দরজাটা বন্ধ করে গ্রেথেল ছিটকিনি বন্ধ করে দিল।

তারস্বরে চেঁচাতে লাগল সেই বুড়ি ডাইনি। কিন্তু তার চীৎকারে কান দিল না গ্রেথেল। সেখান থেকে ছুটে সে পালাল। আর শয়তান বুড়ি ডাইনি মরল দগ্ধে-দগ্ধে পুড়ে।

আস্তাবলের কাছে দৌড়ে এসে লোহার গরাদের ফটক খুলে গ্রেথেল চেঁচিয়ে উঠল, "হান্‌সেল! আমরা বেঁচে গেছি! বুড়ি ডাইনি মরেছে!"

খাঁচা থেকে পাখি যেরকম বেরোয় সেইরকম এক লাফে আস্তাবল থেকে বেরিয়ে হান্‌সেল তার বোনকে জড়িয়ে ধরল আর তার পর আনন্দে তারা দুজনেই লাগল লাফাতে।

তখন তাদের আর ভয়ের কোনো কারণ নেই। তাই তারা ডাইনির বাড়িটা তন্নতন্ন করে খুঁজতে শুরু করল আর দেখল বাড়ির মধ্যেকার প্রতিটি কোণে রয়েছে হীরে, মুক্তো, জহরত ভরা নানা সিন্ধুক।

সেই-সব জহরত পকেটে মুঠো-মুঠো ভরতে-ভরতে হান্‌সেল বলল, "নুড়ির চেয়ে এগুলো অনেক ভালো।" গ্রেথেলও তার কোঁচড়ে হীরে-জহরত ভরে বলল, "আমিও কিছুটা বাড়ি নিয়ে যাব।"

হান্‌সেল বলল, "এই জাদুর বাড়ি থেকে এবার পালানো যাক।"

ঘণ্টা দুয়েক হাঁটার পর তারা পৌঁছল বিরাট একটা নদীর তীরে।

হান্‌সেল বলল, "এটা পার হওয়া যায় কী করে? আমি তো কোনো সাঁকো-টাকো দেখছি না।"

গ্রেথেল বলল, "কোনো জাহাজও তো নেই। কিন্তু ঐ দেখো একটা সাদা হাঁস সাঁতার কাটছে। আমি বললে হাঁসটা তার পিঠে করে আমাদের পারকরে দেবে।" এই বলে সে চেঁচিয়ে উঠল:

"ও ভাই হাঁস! ও ভাই হাঁস!
হান্‌সেল আর গ্রেথেল এখানে দাঁড়িয়ে,
তাদের না আছে পোল না আছে সাঁকো
পার করো তাদের পিঠে নিয়ে।"

হাঁসটা সাঁতরে আসতে হান্‌সেল তার পিঠে চড়ে গ্রেথেলকে বলল তার পাশে বসতে। গ্রেথেল বলল, "আমাদের দুজনের ভার ও বইতে পারবে না। এক-এক করে আমাদের পার করে দেবে।" হাঁসটা তাই করল। নিরাপদ নদীর অন্য পারে পৌঁছে হাঁটতে-হাঁটতে তাদের মনে হল বনটা যেন চেনা-চেনা। খানিক পরে দূরে তারা দেখতে পেল তাদের বাবার বাড়ি। পরে বাড়িটা নজরে পড়তেই ছুটতে-ছুটতে গিয়ে বাইরের ঘরে হুড়্‌মুড়িয়ে ঢুকে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের বাবার দু হাতের মধ্যে। সৎমাটা আগেই মরেছিল। গ্রেথেল তার কোঁচড় উজাড় করে হীরে-জহরত ঢেলে দিল আর হান্‌সেল তার পকেটের হীরে-জহরত দিল মুঠো-মুঠো করে ছড়িয়ে। এইভাবে তাদের দৈন্যদশা শেষ হল আর তার পর থেকে আনন্দে কাটতে লাগল তাদের দিন।

তুষার-কণা আর সাত বামনের গল্প

শীতকালের মাঝামাঝি একবার পাখির পালকের মতো তুষারের পাপড়ি ঝরছিল আকাশ থেকে আর এক রানী জানলার পাশে বসে কালো আবলুস কাঠের ফ্রেমের মধ্যে ছুঁচের কারুকাজ করছিল। কাজ করতে করতে বাইরেকার তুষারপাপড়ির দিকে তাকাতে ছুঁচটা তার আঙুলে ফুটে গেল আর তিন ফোঁটা রক্ত পড়ল তুষারের উপর। তুষারের উপর লাল রক্ত ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল বলে রানী মনে মনে বলল, 'তুষারের মতো সাদা আর রক্তের মতো টুকটকে আর মাথায় এই আবলুস কাঠের মতো কালো চুল নিয়ে আমার একটি শিশু থাকলে খুব ভালো লাগত।'

তার অল্প কাল পরেই তার কোলে এল ছোট্টো একটি মেয়ে। মেয়েটির গায়ের রঙ তুষারের মতো ধবধবে আর রক্তের মতো টুকটুকে। মাথার চুল আবলুস কাঠের মতো কালো। আদর করে সবাই তাকে ডাকত 'তুষার-কণা' বলে। কিন্তু মেয়েটি জন্মাবার পরেই রানী মারা গেল।

বছর খানেকের মধ্যেই রাজা আবার বিয়ে করলেন। তাঁর দ্বিতীয় বউও খুব সুন্দরী। কিন্তু ভারি অহংকারী আর স্বভাবটাও অত্যন্ত উদ্ধত। তার চেয়ে বেশি সুন্দরী অন্য কাউকে সে বরদাস্ত করতে পারত না। তার ছিল একটা জাদুর আয়না। সেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে যখন সে প্রশ্ন করত :

"দেয়াল-আয়না দেয়াল-আয়না, না করে কোনো ছল,
সবার সেরা সুন্দরী কোথায় আছে বল ?"

আয়না উত্তর দিত, "রানী, তুমিই সব চেয়ে সুন্দরী।"

এটা শুনে সে তৃপ্তি পেত। কারণ জানত, আয়না সত্যি কথা বলে।

এদিকে তুষার-কণা বড়ো হয়ে উঠতে লাগল। আর যত দিন যেতে লাগল ততই রূপ যেন তার লাগল ফেটে পড়তে। যখন তার সাত বছর পূর্ণ হল তখন সে হয়ে উঠল সকালের মতো সুন্দর আর রানীর চেয়েও রূপসী।

একদিন রানী যখন যথারীতি আয়নাকে প্রশ্ন করেছে :

"দেয়াল-আয়না, দেয়াল-আয়না, না করে কোনো ছল,
সবার সেরা সুন্দরী কোথায় আছে বল ?"

আয়না উত্তর দিল :

"রানী তোমার রূপের কণা কেউ কখনো পায় নি,
তুষার-কণার রূপের জুড়ি দেখা কিন্তু যায় নি।"

উত্তর শুনে রানী রেগে ক্ষেপে উঠল। হিংসেয় একবার তার মুখ হল হলদে, একবার সবুজ। তার পর থেকে সেই ছোট্টো মেয়েটির দিকে তাকালেই মন তার নিষ্ঠুর হয়ে উঠত, ঘৃণায় ভরে যেত বুক। দিনে রাতে তার শান্তি রইল না। সব সময় হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরে। একদিন এক শিকারীকে ডেকে পাঠিয়ে সে বলল, "এই বাচ্চা মেয়েটাকে বনে নিয়ে যাও। এ আমার দু চক্ষের বিষ হয়ে উঠেছে। একে মেরে ফেলে প্রমাণ হিসেবে এর কলজে আর ফুসফুস আমাকে এনে দেখাবে।"

রানীর আদেশমতো তুষার-কণাকে নিয়ে গেল শিকারী। বর্শা তুলে তার নিষ্পাপ বুকে সেটা যখন সে বিঁধতে যাচ্ছে কেঁদে ফেলে অনুনয় করে মেয়েটি তাকে বলল :

"শিকারী-ভাই, আমাকে মেরো না। বনের মধ্যে অনেক দূরে আমি চলে যাব। কক্ষনো আর ফিরব না।" তার সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে শিকারীর মায়া হল। সে বলল, "বেশ, দৌড়ে পালাও।"

শিকারী ভাবল, 'বুনো জন্তু নিশ্চয়ই ওকে খেয়ে ফেলবে। তাই আমার মারা না-মারা—দুইই সমান।' কিন্তু নিজের হাতে তাকে না মারার জন্য শিকারীর মনে হল—বুক থেকে যেন পাথরের ভারী একটা বোঝা নেমে গেছে। ঠিক তখুনি পাশ দিয়ে একটা হরিণ-ছানা ছুটে যাচ্ছিল। সেটাকে মেরে তার কলজে আর ফুসফুস নিয়ে গিয়ে রানীকে সে দেখাল। রাঁধুনি সেগুলো নুনে জরিয়ে রাঁধল আর সেই

শয়তান রানী সেগুলো খেয়ে ভাবল তুষার-কণার কলজে আর ফুসফুস খেয়েছে।

এদিকে বেচারা মেয়েটি একলা ঘুরে বেড়াতে লাগল সেই বিরাট বনের মধ্যে। প্রতিটি পাতার আড়াল থেকে সে উঁকি মেরে দেখে কেউ সেখানে আছে কি না। শেষটায় সে ছুটতে শুরু করল তীক্ষ্ণ পাথরের উপর দিয়ে, কাঁটাঝোপের ভিতর দিয়ে। বুনো জন্তু-জানোয়ার তাকে দেখেও দেখল না। সমস্ত দিন ছুটে-ছুটে সন্ধেয় সে পৌঁছল ছোট্টো একটি বাড়ির কাছে। বিশ্রাম নেবার জন্য বাড়িটার মধ্যে সে গেল। ভিতরে গিয়ে সে দেখে সব-কিছু পরিষ্কার পরিপাটি করে সাজানো। সেখানে ছিল ছোট্টো একটা টেবিল। তার উপর ধবধবে সাদা টেবিল ঢাকা আর ছোট্টো-ছোট্টো সাতটা প্লেট। প্রত্যেকটি প্লেটের পাশে ছোট্টো-ছোট্টো ছুরি, কাঁটা আর চামচে। আর ছিল সাতটা ছোট্টো-ছোট্টো গেলাস। দেওয়ালের পাশে বিছানা পাতা ছোট্টো-ছোট্টো সাতটা খাট। তুষার-কণার খুব ক্ষিদে পেয়েছিল। তাই প্রত্যেকটা প্লেট থেকে একটু-একটু করে রুটি আর মাংস সে খেল। আর প্রত্যেকটি গেলাসে দিল একটু করে চুমুক। তার পর খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বলে সে গেল শুতে। প্রত্যেকটা বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সে দেখল—কোনোটা তার পক্ষে খুব ছোটো, কোনোটা তার পক্ষে খুব বড়ো। কিন্তু সপ্তম বিছানায় শুয়ে সে দেখল সেটা ঠিক তার মাপসই। সেটায় শুয়ে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে সে পড়ল ঘুমিয়ে।

অন্ধকার গভীর হবার পর সেই ছোট্টো বাড়ির কর্তারা ফিরল। তারা সাতটি বামন, পাহাড়ে গিয়েছিল সেখান থেকে খুঁড়ে ধাতু আনতে। তারা তাদের ছোট্টো-ছোট্টো সাতটা মোমবাতি জ্বালাল। বাড়িটার মধ্যে আলো হতে তারা দেখে—কেউ সেখানে এসেছিল, জিনিসপত্র যেভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখে তারা গিয়েছিল সেগুলো আর তেমনটি নেই। প্রথম বামন বলল, "কে আরাম কেদারায় বসেছিল?" দ্বিতীয় বলল, "কে আমার ছোট্টো প্লেট থেকে খেয়েছে?" তৃতীয় বলল, "কে আমার রুটি ভেঙেছে?" চতুর্থ বলল, "কে আমার তরকারি খেয়েছে?" পঞ্চম বলল, "কে আমার কাঁটা নোংরা করেছে?" ষষ্ঠ বলল, "কে আমার ছুরি দিয়ে খেয়েছে?" সপ্তম বলল, "কে আমার গেলাসে চুমুক দিয়েছে?"

তার পর প্রথম বামন পিছনে তাকিয়ে দেখে তার বিছানায় টোল পড়েছে। সে চেঁচিয়ে উঠল, "কেউ আমার বিছানায় শুয়েছিল।" তাই

শুনে আর সবাইও নিজের নিজের বিছানার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "আমার বিছানাতেও কেউ শুয়েছিল! আমার বিছানাতেও কেউ শুয়েছিল!" কিন্তু সপ্তম বামন নিজের বিছানার কাছে গিয়ে সেখানে দেখে পরম তৃপ্তির সঙ্গে ঘুমিয়ে রয়েছে তুষার-কণা। আর সবাইকে সে ডাকল। তারা এসে ঘুমন্ত মেয়েটিকে ভালো ক'রে দেখার জন্যে তুলে ধরল নিজের-নিজের মোমবাতি। মেয়েটির অদ্ভুত রূপ দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তারা চেঁচিয়ে উঠল, "কী আশ্চর্য! এরকম রূপ তো দেখা যায় না!" ভারি খুশি হয়ে উঠল তারা। সবাই স্থির করল—তাকে জাগাবে না, যেখানে শুয়ে সেখানেই সে ঘুমুক। সপ্তম বামন পালা করে তার বন্ধুদের বিছানায় শুলো। ঘণ্টায়-ঘণ্টায় সে করল বিছানা বদল। এইভাবে সকাল হল।

ভোরে তুষার-কণার ঘুম ভাঙল। বামনদের দেখে সে পেল খুব ভয়। কিন্তু বামনরা ছিল দয়ালু আর তাদের স্বভাবটা মিষ্টি। তারা প্রশ্ন করল, "তোমার নাম কী?"

মেয়েটি বলল, "আমার নাম তুষার-কণা।"

"এখানে এলে কী করে?" আবার তারা প্রশ্ন করল।

তুষার-কণা তাদের বলল সব কথা—কী ভাবে সৎমা তাকে মেরে ফেলার আদেশ দিয়েছিল, কীভাবে শিকারী তাকে পালাতে দেয় আর কী ভাবে সমস্ত দিন ছুটতে-ছুটতে সে পৌঁছয় তাদের ছোট্টো বাড়িতে।

তার কথা শুনে বামনরা বলল, "আমাদের হয়ে যদি তুমি ঘর-সংসার দেখ, রাঁধোবাড়ো, বিছানা পাত, কাপড় কাচ, সেলাই-ফোঁড়াই কর, আর সব কিছু যদি পরিষ্কার পরিপাটি করে রাখ—তা হলে আমাদের সঙ্গে থাকতে পাবে, কোনো-কিছুর অভাব হবে না।"

তুষার-কণা বলল, "তোমরা যা বলবে সব-কিছু খুব খুশি হয়েই করব!" এইভাবে মেয়েটি থেকে গেল তাদের সঙ্গে। তাদের হয়ে সে ঘর-সংসার দেখে আর তারা পাহাড়ে যায় সোনা আর তামার খোঁজে। প্রতি সন্ধেয় বাড়ি ফিরলে সে তাদের পরিবেশন করে রাতের খাবার। কিন্তু সারাদিন ছোট্টো মেয়েটি একা থাকে বলে বিজ্ঞ বামনরা তাকে বলল, "তোমার সৎমা সম্বন্ধে সাবধান। খুব সম্ভব শিগ্গিরই সে জানতে পারবে তুমি এখানে আছ। তাই কাউকে বাড়ির মধ্যে আসতে দিয়ো না।"

তুষার-কণার কলজে আর ফুসফুস খেয়েছে বলে মনে করে রানী ভাবল, এবার নিশ্চয়ই পৃথিবীর মধ্যে সে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। তাই তার আয়নার কাছে গিয়ে সে প্রশ্ন করল :

"দেয়াল-আয়না, দেয়াল-আয়না, না করে কোনো ছল,
সবার সেরা সুন্দরী কোথায় আছে বল ?"

আয়না উত্তর দিল :

"সবার সেরা সুন্দরী রানী তুমি এখানে,
পাহাড়ের অন্য পারে
সাত বামনের সংসারে
লক্ষগুণ রূপবতী তুষার-কণা সেখানে।"

আয়নার কথা শুনে রাগে রানী থর্‌থর করে কাঁপতে লাগল। কারণ সে জানত আয়না তাকে সত্যি কথাই বলেছে। সে বুঝল শিকারী তাকে ঠকিয়েছে আর তুষার-কণা আছে বেঁচে। রানীর মাথায় তখন শুধু একমাত্র চিন্তা—কী করে তুষার-কণাকে মেরে ফেলা যায়। কারণ পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দরী হতে না পারলে হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাবে। শেষটায় তার মাথায় একটা ফন্দি এল। হাতে-মুখে কালিঝুলি মেখে সে এমন ভাবে বুড়ি ফেরিওয়ালার পোশাক পরল যে, তাকে চেনা অসম্ভব। এই ছদ্মবেশে হেঁটে পাহাড় পেরিয়ে সে পোঁছল সাত বামনের আস্তানায়। তার পর দরজায় টোকা দিয়ে হাঁক দিল, "আমার সওদাগুলো খুব সস্তা—কেউ কিনবে ?"

জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে তুষার-কণা বলল, "শুভদিন, বুড়িমা। কী—কী জিনিস আছে ?"

রানী বলল, "হরেকরকম সুন্দর-সুন্দর ভালো-ভালো জিনিস, বাছা : লেস, রঙিন জামা, এই দেখ।" এই-না বলে সিল্কের লেসের চোখ-ধাঁধানো রঙের একটা জামা সে বার করল।

তুষার-কণা ভাবল, 'এই ভালোমানুষ বুড়ি বাড়ির মধ্যে এলে কোনো ক্ষতি নেই।' তাই দরজা খুলে সে কিনল সুন্দর দুটো লেসের জামা।

বুড়ি বলল, "বাছা, তোর মুখটা ভারি সরল। এখানে আয়, লেসের জামাটা তোকে ভালো করে পরিয়ে দি।"

তুষার-কণা কোনোরকম সন্দেহ করল না। লেসের জামাটা পরবার জন্য বুড়ির কাছে গিয়ে সে দাঁড়াল। বুড়ি চট্‌পট্ এমন আঁট করে লেস

জড়িয়ে দিল যে, মেয়েটি ভালো করে নিশ্বেস নিতে পারল না। শেষটায় পড়ে গেল, যেন মরে গেছে। "আর তুই সব চেয়ে সুন্দরী নোস," বলে চট্‌পট রানী চলে গেল।

সন্ধ্যেয় বামনরা ফিরে তুষার-কণাকে মেঝেয় পড়ে থাকতে দেখে খুব ভয় পেয়ে গেল। সে নড়েও না, কথাও বলে না। দেখে মনে হয় মরে গেছে। তাকে তুলে তারা দেখল তার গায়ে খুব আঁট করে লেস জড়ানো হয়েছে। চট্‌পট্‌ তারা লেসের জামাটা কেটে ফেলতে তুষার-কণা নিশ্বেস নিতে শুরু করল তার পর ধীরে-ধীরে ফিরে এল তার জ্ঞান। সব কথা শুনে বামনেরা বলল, "বুড়ি ফেরিওয়ালি আর কেউ নয়— শয়তান রানী এসেছিল ছদ্মবেশে। ভবিষ্যতে সাবধানে থেকো। আমরা বাইরে গেলে কাউকে বাড়ির মধ্যে আসতে দিয়ো না।"

বাড়ি ফিরেই শয়তান রানী তার আয়নার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল:

"দেয়াল-আয়না, দেয়াল-আয়না, না করে কোনো ছল,
সবার সেরা সুন্দরী কোথায় আছে বল ?"

আগের মতোই আয়না উত্তর দিল।

"সব সেরা সুন্দরী রানী তুমি এখানে
পাহাড়ের অন্য পারে
সাত বামনের সংসারে
লক্ষগুণ রূপবতী তুষার-কণা সেখানে।"

কথাটা শুনতেই দারুণ রাগে মুখ তার ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কারণ সে বুঝল তুষার-কণা বেঁচে আছে। তার পর আপন মনে বলে উঠল, 'যাক গে, এবার আরো ভালো করে ফন্দি আঁটব।' রানী জানত অনেক তুকতাক আর ডাইনিদের জাদুমন্ত্র। তাই সে বানাল একটা চিরুনি। তার পর আবার এক বুড়ির ছদ্মবেশ ধরে পাহাড় পেরিয়ে গিয়ে সেই বামনদের বাড়ির দরজায় টোকা দিল।

"কে আমার সওদা কিনবে ? খুব সস্তা," হাঁক দিল সে।

তুষার-কণা উঁকি দিয়ে মুখ বার করে বলল, "তুমি যাও। কাউকে আমি ভিতরে আসতে দেবো না।"

জানলার দিকে সেই বিষাক্ত চিরুনিটা তুলে ধরে বুড়ি বলল, "এই সুন্দর চিরুনিটা একবার দেখো।"

ছেলেমানুষ তুষার-কণার চিরুনিটা খুব পছন্দ হল। সেটা কেনার জন্য বুড়িকে সে আসতে দিল।

বুড়ি বলল, "আয় বাছা, তোর চুল ভালো করে আঁচড়ে দি।"

তুষার-কণার কোনোরকম সন্দেহ হল না। বুড়িকে তার চুল আঁচড়াতে দিল। আর চিরুনিটা তার চুলে ঠেকতে-না-ঠেকতে অজ্ঞান হয়ে সে ঢলে পড়ল মেঝের উপর।

বিড়্‌বিড়্ করে বুড়ি বলল, "এইবার তোর রূপের দফা শেষ।" এই-না বলে চট্‌পট্ সে সরে পড়ল।

মেয়েটির কপাল ভালো। কারণ তখন সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে। বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে বামনদের। মেঝেয় জ্ঞান হারিয়ে তুষার-কণাকে পড়ে থাকতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে তাদের সন্দেহ হল—সৎমা আবার এসে-ছিল। তার পর তাদের চোখে পড়ল বিষাক্ত চিরুনিটা। চুল থেকে সেটা তারা বার করে নিতেই তুষার-কণার জ্ঞান এল। আর তার পর সে জানাল সব কথা। তার বামন বন্ধুরা আবার তাকে সাবধান করে দিল—তারা না থাকলে কখনো সে যেন দরজা না খোলে।

বাড়ি পৌঁছে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রানী প্রশ্ন করল :

"দেয়াল-আয়না, দেয়াল-আয়না, না করে কোনো ছল,
সবার সেরা সুন্দরী কোথায় আছে বল ?"

আগের মতোই আয়না উত্তর দিল :

"সব সেরা সুন্দরী রানী তুমি এখানে
পাহাড়ের অন্য পারে
সাত বামনের সংসারে
লক্ষগুণ রূপবতী তুষার-কণা সেখানে।"

আয়নার কথাগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে রানী আবার রাগে থর্‌থর্ করে কাঁপতে লাগল। সে চেঁচিয়ে উঠল, "তুষার-কণাকে মরতেই হবে। তার জন্যে যদি আমার জীবন যায় তো যাক।" তার পর একটা চিলে-কোঠায় গিয়ে সে দরজা বন্ধ করে দিল, যেখানে কেউ যায় না। আর তার পর বানাল একটা আপেল, যেটা কালকূট বিষ। বাইরে থেকে সেটা দেখতে ভারি সুন্দর—লাল টুকটুকে। দেখলেই কামড় বসাতে লোভ হয়। কিন্তু সেটার ছোট্টো একটা টুকরো মুখে গেলেই নিশ্চিত মৃত্যু। আপেল বানিয়ে মুখে রঙ করে সে ধরল চাষী-বউয়ের

ছদ্মবেশ। আর তার পর পাহাড় পেরিয়ে পৌঁছল সেই সাত বামনের বাড়ি। দরজায় টোকা দিতে জানলা দিয়ে মাথা বার করে তুষার-কণা চেঁচিয়ে উঠল:

"কাউকে ভেতরে আসতে দেওয়া বারণ। সাত বামন আমাকে নিষেধ করে দিয়েছে।"

চাষী-বউ বলল, "দরজা খোলার দরকার নেই। আমি শুধু আমার আপেলগুলো বিলিয়ে দিতে চাই। এই নে, এই আপেলটা তোকে দিলাম।"

তুষার-কণা বলল, "না, ধন্যবাদ। কিছু নেওয়া আমার বারণ।"

চাষী-বউ বলল, "বিষের ভয় করছিস? এই দেখ—এটা আমি দু টুকরো করে কাটলাম। তুই ডান-দিকটা খা, আমি খাচ্ছি বাঁ-দিকটা।"

আপেলটা এমন নিপুণ ভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে, শুধু সেটার ডান দিকেই ছিল বিষ। টুকটুকে আপেলটা চোখে দেখার লোভ তুষার-কণা সামলাতে পারল না। চাষী বউকে সেটা খেতে দেখে হাত বাড়িয়ে সে নিল বিষাক্ত দিকটা। আর যেই-না তাতে কামড় দেওয়া—সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে মরে পড়ল লুটিয়ে। নিষ্ঠুর চোখে তার দিকে তাকিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল রানী। তার পর বলল:

"তুষারের মতো ধবধবে, রক্তের মতো টুকটুকে গায়ের রঙ আর আবলুস কাঠের মতো কালো চুল! হো-হো-হো! বামনেরা এবার আর তোকে জাগাতে পারবে না।" বাড়ি ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে প্রশ্ন করল:

"দেয়াল-আয়না, দেয়াল-আয়না, না করে কোনো ছল,
সবার সেরা সুন্দরী কোথায় আছে বল?"
শেষটায় আয়না উত্তর দিল:
"তুমিই রানী সব সেরা সুন্দরী।"

রানীর হিংসুটে হৃদয় তখন হল শান্ত—মানে হিংসুটে হৃদয় যতটা শান্ত হতে পারে, ততটা।

সেই সন্ধেয় বামনরা বাড়ি ফিরে দেখে তাদের তুষার-কণা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, নিশ্বেস পড়ছে না, একেবারে মরে গেছে। তাকে তুলে সর্বত্র তারা বিষের চিহ্ন খুঁজল—তার লেসের জামা ছাড়াল, চুল আঁচড়ে দিল, মুখে জল ছিটল, খানিকটা জল গলার মধ্যে ঢালল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তাদের আদরের শিশু মরে গিয়েছিল, সে আর

বেঁচে উঠল না। তাকে একটি শবাধারে শুইয়ে তার চার পাশে উবু হয়ে বসে সেই সাতটি বামন কাঁদল তিনদিন ধরে। তার পর তারা চাইল তাকে কবর দিতে। কিন্তু তখনো মেয়েটির চেহারা তাজা আর জীবন্ত, তখনো তার গাল দুটি টুকটুকে লাল। তাই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তারা বলাবলি করল, "এত সুন্দর মেয়েকে কালো মাটির নীচে আমরা কবর দিতে পারব না। স্বচ্ছ কাঁচের কফিন বানিয়ে তার মধ্যে একে আমরা শোয়াব, যাতে চার দিক থেকেই দেখা যায়। কফিনের ডালায় সোনার অক্ষরে আমরা লিখে দেব এর নাম আর মেয়েটি যে রাজকন্যে ছিল সেই কথা। তার পর কফিনটিকে রাখব আমরা পাহাড়ের ওপর আর পালা করে এই কফিন আমরা দেব পাহারা।" এই বলে কফিনটিকে তারা রাখল পাহাড়ের উপর আর পাখির দল এল তুষার-কণার জন্যে কাঁদতে—প্রথমে এক পেঁচা, তার পর এক দাঁড়কাক আর সবশেষে এক পায়রা।

অনেক অনেক দিন ধরে তুষার-কণা শুয়ে রইল সেই কফিনে। তার চেহারা এতটুকু বদলাল না। তাকে দেখে মনে হয় সে ঘুমিয়ে রয়েছে। তখনো সে তুষারের মতো ধবধবে, রক্তের মতো টুকটুকে আর তার মাথার চুল আবলুস কাঠের মতো কালো।

তার পর হল কি, একদিন এক রাজপুত্তুর সেই বনে এসে বামনদের বাড়িতে রাতের জন্য আশ্রয় নিল। পাহাড়ের উপর কফিনের মধ্যে রূপসী তুষার-কণাকে শুয়ে থাকতে সে দেখেছিল আর পড়েছিল সোনার অক্ষরের সেই লেখাগুলো। বামনদের সে বলল, "কফিনটা আমায় দাও। তার জন্যে যত মোহর তোমরা চাও আমি দেব।"

বামনরা কিন্তু উত্তর দিল, "পৃথিবীর সব সোনা দিলেও কফিনটি আমরা দেব না।"

রাজপুত্তুর বলল, "তা হলে বিনা-পয়সায় কফিনটি আমায় দাও। তুষার-কণাকে না দেখে আমি বাঁচতে পারব না। তোমাদের কথা দিচ্ছি তাকে আমি খুব যত্নে আর সাবধানে রাখব—পৃথিবীতে তার চেয়ে প্রিয় আমার আর কিছু নেই।" এই আন্তরিক কথাগুলো শুনে রাজপুত্তুরের উপর বামনদের খুব মায়া হল। তাই কাচের কফিনটা তারা তাকে দিল উপহার। ভৃত্যদের কাঁধে চাপিয়ে সেই কফিন রাজপুত্তুর নিয়ে গেল।

এখন হল কি, যেতে যেতে ভৃত্যরা এক মেঠো লতায় পড়ল হুমড়ি খেয়ে। আর সেই ঝাঁকানিতে বিষাক্ত আপেলের যে-টুকরোটা তুষার-কণা কামড়ে ছিল সেটা বেরিয়ে গেল তার গলা থেকে। তার এক মিনিট পরে সে চোখ মেলে তাকাল। আর তার পর কফিনের ডালা তুলে উঠে বসে চেঁচিয়ে উঠল, "আমি কোথায় ?"

তাই-না দেখে রাজপুত্তুরের আনন্দ আর ধরে না। সে বলল, "তুমি আছ আমার সঙ্গে" আর তার পর জানাল বামনদের কাছ থেকে কফিনটা কী ভাবে পেয়েছিল সে। রাজপুত্তুর বলে চলল, "পৃথিবীতে তোমার চেয়ে বেশি কাউকে আমি ভালোবাসি না। আমার সঙ্গে আমার বাবার প্রাসাদে চল—তোমাকে আমি বিয়ে করব।"

রাজপুত্তুরের সঙ্গে যেতে তুষার-কণা মোটেই আপত্তি করল না। আর তার পর তাদের বিয়ে হয়ে গেল খুব ধুমধাম করে।

সেই বিয়েতে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল তুষার-কণার শয়তান সৎমাকে। বিয়ে বাড়িতে যাবার নতুন পোশাক আর হীরে-জহরতের গয়নাগাটি পরে সে যখন তার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল :

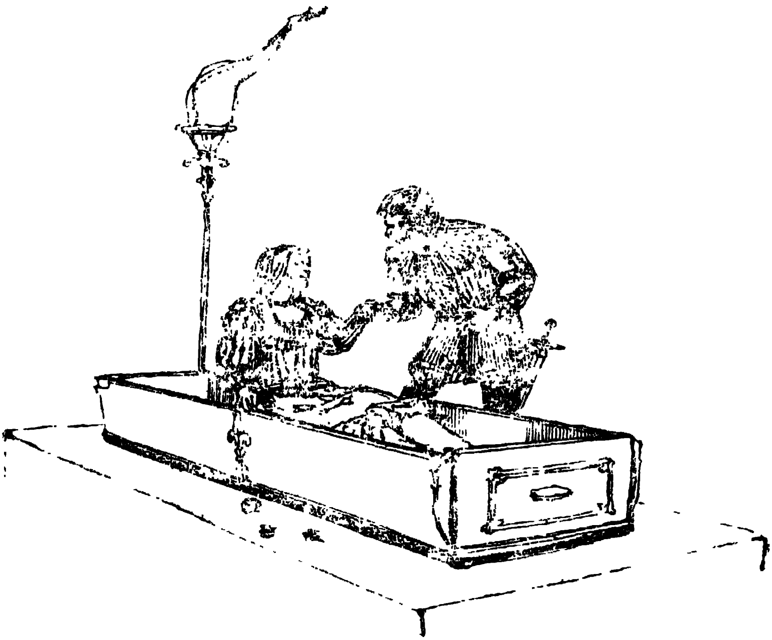
"দেয়াল-আয়না, দেয়াল-আয়না, না করে কোনো ছল,
সবার সেরা সুন্দরী কোথায় আছে বল ?"

আয়না তখন উত্তর দিল :

"সব সেরা সুন্দরী রানী তুমি এখানে,
লক্ষগুণ রূপবতী নতুন রানী সেখানে।"

কথাগুলো শুনে শয়তান রানী চীৎকার করে অভিশাপ দিয়ে উঠল। উত্তেজনায় উৎকণ্ঠায় কী যে করবে ভেবে পেল না।

প্রথমে সে বলল বিয়ে বাড়িতে সে যাবে না। কিন্তু যে তরুণী রানীর রূপ তার চেয়ে লক্ষগুণ বেশি তাকে দেখবার অসম্ভব কৌতূহল সে দমন করতে পারল না। তাই সে গেল, আর সেই রাজপ্রাসাদে পা দিয়েই সে চিনতে পারল তুষার-কণাকে। আতঙ্কে বিস্ময়ে স্থির হয়ে সেখানে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার জন্য লোহার একজোড়া চটি চুল্লিতে গন্‌গনে গরম করা হয়েছিল। সাঁড়াশি করে সেগুলো আনা হল। আর তার পর সেই গন্‌গনে লাল চটি জোড়া পরিয়ে যতক্ষণ না মরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ততক্ষণ তাকে বাধ্য করা হল নাচতে।



সাপের তিনটি পাতা

এক সময় ছিল গরিব একটি লোক। এমন গরিব যে নিজের একমাত্র ছেলেকে মানুষ করার সঙ্গতি তার ছিল না। তাই ছেলে তাকে বলল, "বাবা, তোমার অবস্থা এতই খারাপ যে আমি তোমার কাছে একটা বোঝার মতো। বেরিয়ে পড়ে দেখি, নিজের রুটি নিজে রোজগার করতে পারি কি পারি না।" বাবা তাকে আশীর্বাদ করে মনের দুঃখে বিদায় দিল।

সে-সময় এক শক্তিশালী এলাকার রাজা যুদ্ধ করছিল। সেই তরুণ তাঁর সৈন্যদলে যোগ দিয়ে চলে গেল যুদ্ধ করতে। শত্রুর সেনা দারুণ লড়তে লাগল। সেই তরুণ আর তার দলের সৈন্যদের উপর বৃষ্টির মতো নীল বুলেট লাগল ঝরতে। তার দলের অনেকেই গেল মারা। অন্যরা চাইল পালাতে। কিন্তু সেই তরুণ এগিয়ে গিয়ে বলল, "ভয় পেয়ে কাপুরুষের মতো পালিয়ো না। আমাদের পিতৃভূমিকে কিছুতেই

আমরা ছেড়ে যাব না।" তার কথা শুনে তারা আবার যুদ্ধ করতে ফিরে গেল আর ফিরে গিয়ে নিঃশেষ করে দিল শত্রু-সেনা। সেই তরুণের জন্য জয়ী হয়েছেন শুনে রাজা তাকে প্রধান অফিসার করলেন, দিলেন অনেক ধনসম্পত্তি আর করলেন তাকে নিজের প্রধান উপদেষ্টা।

রাজার ছিল একটি মেয়ে। যেমন রূপসী তেমনি খামখেয়ালী। সে পণ করেছিল এমন কাউকে বিয়ে করবে যাকে প্রথমে অঙ্গীকার করতে হবে সে মারা গেলে একই কবরে তার সঙ্গে সে যাবে জীবন্ত অবস্থায়। রাজকন্যে বলেছিল, "আমাকে সত্যিকারের ভালোবাসলে আমি মরবার পর আমার স্বামী আর বেঁচে থাকতে চাইবে না।" এ কথাও সে বলেছিল -স্বামী আগে মারা গেলে তার সঙ্গে সে-ও জীবন্ত অবস্থায় যাবে কবরে।

এই অদ্ভুত পণের জন্য কেউই তাকে বিয়ে করতে সাহস করে নি। কিন্তু তার রূপে সেই তরুণ এমনই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, রাজকন্যের পণ শুনে সে ভয় পেল না। তাই রাজাকে গিয়ে সে বলল, রাজকন্যেকে বিয়ে করতে সে রাজি।

রাজা প্রশ্ন করলেন, "তোমাকে কী প্রতিজ্ঞা করতে হবে জান তো?"

সে বলল, "জানি—রাজকন্যে আগে মারা গেলে তার সঙ্গে আমায় কবরে যেতে হবে। কিন্তু তাকে আমি এতই ভালোবেসে ফেলেছি যে, সেই সর্তেই রাজি।" রাজা তাই বিয়েতে মত দিলেন। আর খুব ধুমধাম করে তাদের বিয়ে হয়ে গেল। কিছুকাল তারা খুব আনন্দেই কাটাল। তার পর হঠাৎ একদিন রাজকন্যে পড়ল ভয়ংকর অসুখে। কোনো রাজবদ্যিই তার অসুখ সারাতে পারল না। রাজকন্যে মারা যেতে সেই তরুণের মনে পড়ল নিজের প্রতিজ্ঞার কথা। রাজকন্যের সঙ্গে জীবন্ত অবস্থায় কবরে যাবার কল্পনায় আতঙ্কে সে শিউরে উঠল। কিন্তু পালাবার কোনো পথ নেই। কারণ যাতে সে পালাতে না পারে তার জন্য বুড়ো রাজা শহর থেকে বেরুবার পথে পাহারা বসিয়ে দিয়েছিলেন। রাজকন্যের মৃতদেহের সঙ্গে সেই তরুণকেও রাজ-সমাধিকক্ষে নামিয়ে দরজায় কুলুপ এঁটে দেওয়া হল। কফিনের কাছে একটা টেবিলের উপর রাখা ছিল চারটে বড়ো-বড়ো মগে জল, চারটে পাউরুটি আর চার বোতল মদ। সেই খাদ্য আর পানীয় শেষ হলেই তাকে উপোস করে মরতে হবে। খুব মনমরা হয়ে সে বসে থাকে। প্রতিদিন খায় রুটির

ছোট্টো টুকরো আর সামান্য মদ। আর বুঝতে পারে মৃত্যু গুটিগুটি আসছে তার দিকে এগিয়ে।

মনমরা হয়ে একদিন মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে, এমন সময় দেখে সেই সমাধিঘরের এক কোণ থেকে নিঃশব্দে একটা সাপকে বেরিয়ে এসে রাজকন্যের মৃতদেহের দিকে এগিয়ে যেতে। সে ভাবল সাপটা সম্ভবত এসেছে রাজকন্যের মৃতদেহটা খেতে। তাই খাপ থেকে তরোয়াল বার করে সে বলে উঠল, "যতক্ষণ আমি বেঁচে ততক্ষণ রাজ-কন্যের দেহ কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।" এই-না বলে সঙ্গে সঙ্গে সাপটাকে সে তিন টুকরো করে দিল।

খানিক পরে সেই কোণ থেকে বেরিয়ে এল আর-একটা সাপ। কিন্তু অন্য সাপটাকে টুকরো-টুকরো হয়ে মরে পড়ে থাকতে দেখে দ্বিতীয় সাপটা পালিয়ে গেল! খানিক বাদেই ফিরল মুখে তিনটি সবুজ পাতা নিয়ে! তার পর মরা সাপের তিনটে টুকরো জুড়ে দ্বিতীয় সাপটা প্রত্যেকটা জোড়ের মুখে রাখল একটা করে সবুজ পাতা। আর সঙ্গে সঙ্গে কাটা সাপটা জোড়া লেগে বেঁচে উঠল আর তার পরেই সাপ দুটো গেল পালিয়ে। কিন্তু যাবার সময় মেঝেয় তারা ফেলে গেল সেই সবুজ তিনটে পাতা।

সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করে সেই তরুণের মনে হল—মরা সাপকে বাঁচাবার আশ্চর্য ক্ষমতা পাতা তিনটের থাকলে হয়তো মরা মানুষকেও এগুলো বাঁচাতে পারে। তাই সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে একটা রাখল রাজ-কন্যের মুখে আর অন্য দুটো তার দু চোখে। আর কী আশ্চর্য! প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যের শিরায় শিরায় বইতে শুরু করল রক্ত আর তার ফ্যাকাশে মুখটা হয়ে উঠল গোলাপী। তার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চোখ মেলে তাকিয়ে অবাক হয়ে রাজকন্যে চেঁচিয়ে উঠল :

"হা ভগবান! এ আমি কোথায়?"

তার স্বামী বলল, "বউ, তুমি আমার কাছে রয়েছ।" তার পর জানাল কী করে তাকে সে বাঁচিয়ে তুলেছে। রাজকন্যেকে সে খেতে দিল রুটি আর মদ। রাজকন্যে সুস্থ হয়ে উঠলে দুজনে তারা গিয়ে দরজায় দিতে লাগল ধাক্কা আর চেঁচিয়ে শুরু করে দিল ডাকাডাকি করতে। তাই-না শুনে প্রহরীর দল ছুটে গিয়ে রাজাকে খবরটা জানাল।

রাজা স্বয়ং নেমে এসে দরজা খুললেন আর তাদের দুজনকে সুস্থ দেখে আনন্দে হয়ে গেলেন আত্মহারা।

সেই তরুণ, সাপের সেই তিনটে পাতা সঙ্গে করে এনেছিল। নিজের ভৃত্যকে সে বলল, "এগুলো সাবধানে রেখে দাও সব সময় যেন তোমার সঙ্গে থাকে। দরকারের সময় এগুলো আমাদের কাজে লাগতে পারে।"

কিন্তু বেঁচে ওঠার পর রাজকন্যের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। মনে হল স্বামীর প্রতি সব ভালোবাসা তার হৃদয় থেকে যেন মুছে গেছে। কিছুকাল পরে সেই তরুণ জাহাজে করে বেরুল তার বুড়ো বাপকে দেখতে। রাজকন্যেও ছিল সেই জাহাজে। যেতে যেতে সেই জাহাজের এক নাবিককে রাজকন্যে খুব ভালোবেসে ফেলল। এক রাতে সেই তরুণ রাজা যখন ঘুমুচ্ছে—রাজকন্যে ধরল তার মাথা আর সেই নাবিক ধরল তার দুটো পা। আর তার পর দুজনে মিলে তাকে তারা ফেলে দিল সমুদ্রে।

এই দুষ্কর্ম করার পর সেই নাবিককে রাজকন্যে বলল, "এবার দেশে ফেরা যাক। ফিরে বলব, আমার স্বামী পথে মারা গেছে। রাজার কাছে তোমার এত প্রশংসা করব যে নিশ্চয়ই তিনি আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে তোমাকে তাঁর উত্তরাধিকারী করে যাবেন।"

কিন্তু সেই বিশ্বাসী ভৃত্য লক্ষ্য করেছিল সমস্ত ঘটনাটা। তাই জাহাজ থেকে চুপি চুপি একটা নৌকা নামিয়ে সে গেল যেখানে তার প্রভুকে ফেলে দেওয়া হয়। তার পর জল থেকে তার মৃতদেহ তুলে সেই পাতা তিনটের একটা সে রাখল তার মুখে আর অন্য দুটো তার দু-চোখে। এইভাবে সে বাঁচিয়ে তুলল তার প্রভুকে।

দিনরাত দাঁড় বেয়ে তারা চলল। ফলে তাদের ছোট্টো নৌকাটা অন্যদের আগেই পৌঁছল সেই বুড়ো রাজার রাজত্বে। তাদের একলা ফিরতে দেখে অবাক হয়ে রাজা কারণটা জানতে চাইলেন। তাঁর মেয়ের শয়তানীর কথা প্রথমটায় তাঁর বিশ্বাসই হল না। সত্য ঘটনা প্রকাশ করার জন্য জামাই আর ভৃত্যকে তিনি বললেন একটা গুপ্ত ঘরে লুকিয়ে থাকতে।

কিছুদিন পরেই জাহাজটা ফিরে এল। সেই শয়তান বউ শোকার্ত বিষণ্ণ মুখে হাজির হল তার বাবার সামনে।

রাজা তাকে প্রশ্ন করলেন স্বামীকে ফেলে একলা সে ফিরেছে কেন? উত্তরে রাজকন্যে বলল, "বাবা! আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। সমুদ্রে যেতে-যেতে হঠাৎ আমার স্বামী অসুস্থ হয়ে মারা যায়। এই দয়ালু নাবিক

সাহায্য না করলে আমার কী যে হত জানি না। আমার স্বামীর মৃত্যুর সময় এই নাবিক সেখানে উপস্থিত ছিল। সব কথা এ তোমাকে বলতে পারবে।"

শুনে রাজা বললেন, "তোমার মৃত স্বামীকে প্রাণ দিয়ে আমি ফিরিয়ে আনছি।" সেই গুপ্ত ঘরের দরজা খুলে যে দুজন সেখানে লুকিয়ে ছিল রাজা তাদের বললেন বেরিয়ে আসতে।

স্বামীকে জীবন্ত দেখে রাজকন্যে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল আর তার পর নতজানু হয়ে বসে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল।

কিন্তু রাজা তাকে ক্ষমা করলেন না। বললেন, "তোমার জন্যে এ মরতে প্রস্তুত ছিল, তোমাকে এ মৃত্যুর কাছ থেকে ফিরিয়ে এনেছিল। প্রতিদানে ঘুমন্ত অবস্থায় একে তুমি ডুবিয়ে দিয়েছিলে। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবার কর।"

রাজকন্যে আর সেই নাবিককে তলায় ফুটোওয়ালা একটা জাহাজে তুলে সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়া হল। দেখতে দেখতে সমুদ্রের ঢেউয়ের তলায় তারা গেল মিলিয়ে।

কুকুর আর চড়ুই

যে-কুকুরটি ভেড়ার পাল পাহারা দিত তার প্রভু ছিল নিষ্ঠুর। তাকে সে পেট ভরে খেতে দিত না। প্রভুর ব্যবহার অসহ্য হয়ে উঠলে বিষণ্ণ মনে তার বাড়ি ছেড়ে সে চলে গেল। পথে তার সঙ্গে এক চড়ুইয়ের দেখা। চড়ুই তাকে বলল, "কুকুর ভায়া, তোমাকে অমন মনমরা দেখাচ্ছে কেন?"

কুকুর বলল, "আমার খিদে পেয়েছে। কিছুই খেতে পাই নি।"

তার কথা শুনে চড়ুই বলল, "আমার সঙ্গে শহরে এসো। পেট ভরে খেতে দেব।"

একসঙ্গে শহরে আসার পর তারা পৌঁছল এক কসাইয়ের দোকানে। চড়ুই তখন কুকুরকে বলল, "ঐখানটায় দাঁড়াও। তোমার জন্যে এক টুকরো মাংস ঠোঁটে করে নিয়ে আসছি।"

দোকানের সামনে বসে ঘাড় ফিরিয়ে চড়ুই দেখে নিল কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কি না। তার পর এক টুকরো মাংস অনেকক্ষণ ধরে ঠুকরে ঠুকরে টেবিলের কিনারে এনে ফেলে দিল ফুটপাথের উপর। সেটা এক কোণে নিয়ে গিয়ে কুকুর খেয়ে ফেলল।

চড়ুই তখন বলল, "এবার আরেকটা দোকানে যাওয়া যাক। সেখান থেকে তোমাকে আরেক টুকরো মাংস দেব। তা হলেই তোমার পেট একেবারে ভরে যাবে।"

মাংসর দ্বিতীয় টুকরোটা কুকুর খাবার পর চড়ুই প্রশ্ন করল, "পেট ভরেছে তো, ভায়া?"

কুকুর বলল, "মাংস খেয়ে তৃপ্তি হয়েছে। কিন্তু এখনো রুটি খেতে পাই নি।"

চড়ুই বলল, "রুটিও পাবে। আমার সঙ্গে এসো।"

চড়ুই তাকে নিয়ে গেল এক রুটিওয়ালার দোকানে।

সেখানে গোটা দুই রুটি ঠুকরে-ঠুকরে সে পথে ফেলল। সেগুলো খাবার পর কুকুর চাইল আরো রুটি খেতে। তাই তারা গেল আর-এক রুটিওয়ালার দোকানে আর সেখানেও ঘটল একই ঘটনা।

চড়ুই তখন জিগগেস করল, "এবার পেট ভরেছে তো, ভায়া?"

কুকুর বলল, "হ্যাঁ, এবার শহরের বাইরে খানিক বেড়ানো যাক।"

তাই তারা গেল বড়ো রাস্তায়। দিনটা ছিল গরম। খানিক যাবার পর কুকুর বলল, সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, খানিক ঘুমতে চায়।

চড়ুই বলল, "বেশ কথা, ঘুমোও। আমি একটা গাছের ডালে বসে থাকব।"

কুকুর শুয়ে পড়ল আর অল্পক্ষণের মধ্যেই পড়ল গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে। সে যখন ঘুমচ্ছে তিন-ঘোড়ায়-টানা এক মালগাড়ি চালিয়ে পথে দেখা গেল এক গাড়োয়ানকে আসতে। মালগাড়িতে ছিল দু পিপে মদ। চড়ুই দেখল পথের চাকার দাগের মধ্যে কুকুর যেখানে ঘুমচ্ছে সেখান দিয়ে গাড়োয়ান গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে যাবে। তাই সে চেঁচিয়ে উঠল:

"গাড়োয়ান, কুকুরের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ো না। চালালে তোমাকে গরিব করে দেব।"

গাড়োয়ান খিঁচিয়ে উঠে বলল, "হ্যাঃ, চড়ুই আমাকে গরিব করে দেবে!" এই-না বলে ছপ্‌টি হাঁকিয়ে ঘুমন্ত কুকুরের গায়ের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেল। ফলে কুকুর গেল মরে।

তাই-না দেখে চড়ুই বলল, "আমার কুকুর-ভায়াকে তুমি মেরে ফেললে। তার জন্যে তোমায় দুটো ঘোড়া খেসারত দিতে হবে।"

গাড়োয়ান আবার খিঁচিয়ে উঠে বলল, "হ্যাঃ, আমাকে নাকি দুটো ঘোড়া খেসারত দিতে হবে! তুই আমার কী করতে পারিস, শুনি?" এই-না বলে সে গাড়ি হাঁকিয়ে চলতে লাগল।

চড়ুই তখন মাল-ঢাকা কাপড়ের নীচে চুপি চুপি সেঁধিয়ে ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে একটা পিপে ফুটো করে দিল। ফলে সব মদ গেল পড়ে। গাড়োয়ান টের পেল না। খানিক পরে পিছনে তাকিয়ে সে দেখে মদ

ঝরে যাচ্ছে। পিপে দুটো পরীক্ষা করে দেখে, একটা খালি। তাই-না দেখে সে চেঁচিয়ে উঠল, "হায় হায়! ভারি লোকসান হয়ে গেল।"

চড়ুই বলল, "পুরোপুরি গরিব হতে এখনো তোমার বাকি আছে।" এই-না বলে একটা ঘোড়ার মাথায় উড়ে গিয়ে বসে ঠুকরে তার চোখ-দুটো চড়ুই উপড়ে ফেলল।

তাই দেখে গাড়োয়ান একটা ইঁট তুলে ছুঁড়ল চড়ুইয়ের দিকে। চড়ুই উড়ে গিয়ে বসল একটা গাছে আর ইঁটটা লাগল আর-একটা ঘোড়ার মাথায়, আর সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটা মরে পড়ে গেল।

"হায় হায়, আমি গরিব হয়ে পড়লাম" বলে চেঁচিয়ে উঠল গাড়োয়ান।

দুটো ঘোড়া নিয়ে গাড়োয়ান যখন চলে যাচ্ছে চড়ুই তখন চেঁচিয়ে উঠল, পুরোপুরি গরিব হতে এখনো তোমার বাকি আছে।" এই-না বলে দ্বিতীয় ঘোড়াটার মাথায় বসে চড়ুই তার চোখদুটো উপড়ে দিল।

দারুণ রেগে চড়ুইয়ের দিকে অন্ধের মতো আবার সে ইঁট ছুঁড়ল। কিন্তু চড়ুইয়ের বদলে সেটা লাগল তার তৃতীয় ঘোড়ার মাথায় আর সেটাও মরে পড়ে গেল।

"হায় হায়, আমি গরিব হয়ে পড়লাম," বলে চেঁচিয়ে উঠল গাড়োয়ান।

চড়ুই বলল, "পুরোপুরি গরিব হতে এখনো তোমার বাকি আছে। এবার তোমায় বাড়িতে গরিব করব।" এই-না বলে চড়ুই উড়ে গেল।

ভীষণ চটে আর বিরক্ত হয়ে মালগাড়িটা ফেলে বাড়ি ফিরতে বাধ্য হল গাড়োয়ান। বউকে সে বলল, "হায় হায় বউ, আমার কপাল খুব খারাপ। পিপে থেকে সব মদ পড়ে গেছে আর ঘোড়া তিনটে মরেছে।"

তার বউ বলল, "এখানে এমন একটা পাজি পাখি এসেছে যে তুমি ধারণাই করতে পারবে না। সেটা সঙ্গে করে এনেছে আরো অনেক পাখি। আমাদের সব জই পাখিগুলো খেয়ে শেষ করল।

গাড়োয়ান গিয়ে দেখে হাজার-হাজার পাখি তাদের জই খাচ্ছে আর সেই চড়ুই বসে আছে তাদের মাঝখানে। "হায় হায়, আমি গরিব হয়ে পড়লাম," বলে চেঁচিয়ে উঠল গাড়োয়ান।

চড়ুই বলল, "পুরোপুরি গরিব হতে এখনো তোমার বাকি আছে। যা করেছ তার জন্যে এবার তোমার প্রাণ যাবে, গাড়োয়ান।"

গাড়োয়ানের তখন আর কিছুই নেই। তিতিবিরক্ত আর ভারি মনমরা হয়ে সে গিয়ে বসল উনুনের পাশে।

বাইরে জানালার কিনারে বসে চড়ুই বলল, "যা করেছ তার জন্যে এবার তোমার প্রাণ যাবে, গাড়োয়ান।"

রাগে পাগল হয়ে গাড়োয়ান তার ছোটো কুড়ুলটা ছুঁড়ল। কুড়ুলটা গিয়ে উনুন ভেঙে দু টুকরো করল। চড়ুই তখন লাফিয়ে-লাফিয়ে যেতে লাগল এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায়। আর কুড়ুলটা তার পিছু নিয়ে ভেঙে চলল আসবাব-পত্র, আয়না, ছবি, চেয়ার, টেবিল—সব-কিছু। শেষটায় সেটা গিয়ে ভাঙল বাড়ির দেওয়ালগুলো কিন্তু চড়ুইকে স্পর্শ করল না। শেষটায় গাড়োয়ান কিন্তু চড়ুইকে মুঠো করে ধরে ফেলল।

তার বউ বলল, "দাও, ওটাকে আছড়ে মারি।"

গাড়োয়ান বলল, "না-না, আছড়ে মারলে ওটার উচিত সাজা হবে না। আমি ওটাকে গিলে খাব।" এই-না বলে গাড়োয়ান গিলে ফেলল চড়ুইকে। চড়ুই কিন্তু তার পেটের মধ্যে গিয়ে ডানা ঝাপটাতে শুরু করে দিল। আর ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে লোকটার মুখের মধ্যে উঠে এসে নিজের ছোট্টো মাথাটা বার করে চড়ুই চেঁচিয়ে উঠল, "যা করেছ তার জন্যে এবার তোমার প্রাণ যাবে, গাড়োয়ান।"

গাড়োয়ান তখন বউয়ের হাতে কাটারিটা তুলে দিয়ে বলল, "বউ আমার মুখের মধ্যে ওটার ওপর একটা বাড়ি মার।"

তার বউ কাটারি তুলে বাড়ি বসাল। কিন্তু তার হাত ফসকে বাড়ি গিয়ে পড়ল গাড়োয়ানের মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে মরে সে মেঝেয় পড়ল। আর ফুড়ুৎ করে উড়ে পালাল চড়ুই।

ভালোবাসার জয়

এক সময় ছিল এক ডাইনি। তার দুই মেয়ে। একজন কুচ্ছিত আর পাজি। তাকেই সে ভালোবাসতো। কারণ সে হল তার নিজের মেয়ে। অন্য মেয়েটি সুন্দরী আর ভালো। তাকে সে দু চক্ষে দেখতে পারত না। কারণ সে হল তার সৎমেয়ে। সৎমেয়েটির ছিল সুন্দর একটা ওড়না। সেটা দেখে অন্য মেয়ের খুব হিংসে হল। তার মায়ের কাছে গিয়ে সে বায়না ধরল—সেটা তার চাই।

তার মা বলল "শান্ত হ, বাছা। ওটা তুই নিশ্চয় পাবি। তোর সৎবোনের অনেকদিন আগেই মরবার কথা। আজ রাতে সে ঘুমিয়ে পড়লে আমি গিয়ে তার মাথা কাটব। বিছানার পেছন দিকে শুয়ে তাকে সামনের দিকে ঠেলে দিস!"

এক কোণে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা না শুনলে বেচারি মেয়েটিকে নির্ঘাত মরতে হত। সারাদিন বাড়ি থেকে সে বেরুল না। শোবার সময় হলে তাকে সব শেষে শুতে পাঠানো হল, যাতে বিছানার সামনের দিকে সে থাকে। কিন্তু সৎবোন ঘুমিয়ে পড়ার পর তাকে টপ্‌কে গিয়ে মেয়েটি শুলো দেয়াল ঘেঁষে। আর বুড়ি সৎমা ডান হাতে কুড়ুল নিয়ে এসে বাঁ হাত দিয়ে হাতড়ে দেখে কেটে ফেলল নিজেরই মেয়ের মাথা।

সৎমা চলে যেতে মেয়েটি চুপি চুপি উঠে রোলাণ্ডের বাড়িতে গিয়ে দরজায় টোকা দিল। রোলাণ্ডকে সে ভালোবাসত। বাড়ি থেকে বেরিয়ে রোলাণ্ড তার কাছে এলে পর মেয়েটি বলল, "শোনো রোলাণ্ড,

বাইরে জানালার কিনারে বসে চড়ুই বলল, "যা করেছ তার জন্যে এবার তোমার প্রাণ যাবে, গাড়োয়ান।"

রাগে পাগল হয়ে গাড়োয়ান তার ছোটো কুড়ুলটা ছুঁড়ল। কুড়ুলটা গিয়ে উনুন ভেঙে দু টুকরো করল। চড়ুই তখন লাফিয়ে-লাফিয়ে যেতে লাগল এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায়। আর কুড়ুলটা তার পিছু নিয়ে ভেঙে চলল আসবাব-পত্র, আয়না, ছবি, চেয়ার, টেবিল—সব-কিছু। শেষটায় সেটা গিয়ে ভাঙল বাড়ির দেওয়ালগুলো কিন্তু চড়ুইকে স্পর্শ করল না। শেষটায় গাড়োয়ান কিন্তু চড়ুইকে মুঠো করে ধরে ফেলল।

তার বউ বলল, "দাও, ওটাকে আছড়ে মারি।"

গাড়োয়ান বলল, "না-না, আছড়ে মারলে ওটার উচিত সাজা হবে না। আমি ওটাকে গিলে খাব।" এই-না বলে গাড়োয়ান গিলে ফেলল চড়ুইকে। চড়ুই কিন্তু তার পেটের মধ্যে গিয়ে ডানা ঝাপটাতে শুরু করে দিল। আর ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে লোকটার মুখের মধ্যে উঠে এসে নিজের ছোট্টো মাথাটা বার করে চড়ুই চেঁচিয়ে উঠল, "যা করেছ তার জন্যে এবার তোমার প্রাণ যাবে, গাড়োয়ান।"

গাড়োয়ান তখন বউয়ের হাতে কাটারিটা তুলে দিয়ে বলল, "বউ-আমার মুখের মধ্যে ওটার ওপর একটা বাড়ি মার।"

তার বউ কাটারি তুলে বাড়ি বসাল। কিন্তু তার হাত ফসকে বাড়ি গিয়ে পড়ল গাড়োয়ানের মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে মরে সে মেঝেয় পড়ল। আর ফুড়ুৎ করে উড়ে পালাল চড়ুই।

ভালোবাসার জয়

এক সময় ছিল এক ডাইনি। তার দুই মেয়ে। একজন কুচ্ছিত আর পাজি। তাকেই সে ভালোবাসতো। কারণ সে হল তার নিজের মেয়ে। অন্য মেয়েটি সুন্দরী আর ভালো। তাকে সে দু চক্ষে দেখতে পারত না। কারণ সে হল তার সৎমেয়ে। সৎমেয়েটির ছিল সুন্দর একটা ওড়না। সেটা দেখে অন্য মেয়ের খুব হিংসে হল। তার মায়ের কাছে গিয়ে সে বায়না ধরল—সেটা তার চাই।

তার মা বলল "শান্ত হ, বাছা। ওটা তুই নিশ্চয় পাবি। তোর সৎবোনের অনেকদিন আগেই মরবার কথা। আজ রাতে সে ঘুমিয়ে পড়লে আমি গিয়ে তার মাথা কাটব। বিছানার পেছন দিকে শুয়ে তাকে সামনের দিকে ঠেলে দিস!"

এক কোণে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা না শুনলে বেচারি মেয়েটিকে নির্ঘাত মরতে হত। সারাদিন বাড়ি থেকে সে বেরুল না। শোবার সময় হলে তাকে সব শেষে শুতে পাঠানো হল, যাতে বিছানার সামনের দিকে সে থাকে। কিন্তু সৎবোন ঘুমিয়ে পড়ার পর তাকে টপ্‌কে গিয়ে মেয়েটি শুলো দেয়াল ঘেঁষে। আর বুড়ি সৎমা ডান হাতে কুড়ুল নিয়ে এসে বাঁ হাত দিয়ে হাতড়ে দেখে কেটে ফেলল নিজেরই মেয়ের মাথা।

সৎমা চলে যেতে মেয়েটি চুপি চুপি উঠে রোলাণ্ডের বাড়িতে গিয়ে দরজায় টোকা দিল। রোলাণ্ডকে সে ভালোবাসত। বাড়ি থেকে বেরিয়ে রোলাণ্ড তার কাছে এলে পর মেয়েটি বলল, "শোনো রোলাণ্ড,

আমাদের এক্ষুনি পালাতে হবে। সৎমা আমাকে মারতে চেয়েছিল। কিন্তু অন্ধকারে ভুল করে নিজের মেয়েকেই মেরেছে। ভোর হলেই সেটা সে জানতে পারবে। তখন আর আমাদের নিস্তার থাকবে না।"

রোলাণ্ড বলল, "আগে গিয়ে তার জাদুর লাঠিটা নিয়ে এসো। নইলে সে পিছু নিলে নিজেদের আমরা বাঁচাতে পারব না।"

মেয়েটি গিয়ে প্রথমে লাঠিটা নিল। তার পর সৎবোনের কাটা মুণ্ডু নিয়ে তিন ফোঁটা রক্ত ছড়াল—এক ফোঁটা বিছানার কাছে, এক ফোঁটা রান্নাঘরে আর এক ফোঁটা সিঁড়িতে। তার পর সে আর রোলাণ্ড গেল পালিয়ে।

পরদিন ভোরে উঠে ওড়নাটা দেবার জন্য ডাইনি তার মেয়ের নাম ধরে ডাকল। কিন্তু সে এল না। "কোথায় আছিস?" সে আবার হাঁক দিল।

এক ফোঁটা রক্ত জবাব দিল, "এইখানে, সিঁড়িতে।"

ডাইনি বেরিয়ে এল। কিন্তু সিঁড়িতে কাউকে দেখতে না পেয়ে সে আবার হাঁক দিল, "কোথায় আছিস?"

দ্বিতীয় ফোঁটা রক্ত জবাব দিল, "এইখানে, রান্নাঘরে!"

ডাইনি রান্নাঘরে গেল। কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে আবার হাঁক দিল, "কোথায় আছিস?"

তৃতীয় ফোঁটা রক্ত জবাব দিল, "এইখানে, বিছানায় ঘুমচ্ছি।"

তখন সে শোবার ঘরে গিয়ে দেখে তার নিজের মেয়ে নিজেরই রক্তে ভাসছে।"

ভয়ংকর রেগে ডাইনি গেল জানলার কাছে। সেখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত সে দেখতে পেত। সে দেখল তার সৎমেয়ে রোলাণ্ডের সঙ্গে তাড়াতাড়ি হেঁটে চলেছে।

ডাইনি বলল, "ওতে লাভ নেই। যত তাড়াতাড়িই হাঁটুক-না-কেন, আমি ওদের ধরে ফেলব।" সে তার মাইল-জুতো পরল। সেটা পরে এক-এক বার পা ফেলে সে ছ মাইল যেতে পারে। দেখতে-দেখতে সে তাদের নাগাল ধরে ফেলল।

মেয়েটি কিন্তু তাকে আসতে দেখে তার জাদুর লাঠি দিয়ে রোলাণ্ডকে একটা হ্রদ করে দিল আর নিজে হাঁস হয়ে তাতে লাগল সাঁতার কাটতে। ডাইনি তীরে দাঁড়িয়ে রুটির টুকরো ছুঁড়ে-ছুঁড়ে চেষ্টা

করল হাঁসকে লোভ দেখিয়ে তার কাছে আনতে। হাঁস কিন্তু এল না। তাই সন্ধের সময় হতাশ হয়ে বুড়ি ডাইনি বাড়ি ফিরতে বাধ্য হল। তখন মেয়েটি আর রোলাণ্ড আবার মানুষ হয়ে উঠে হেঁটে চলল সারা রাত। ভোরবেলায় মেয়েটি হয়ে গেল এক বৈঁচি-ঝোপের সুন্দর ফুল আর রোলাণ্ডকে করে দিল বেহালা-বাজিয়ে।

তার খানিক বাদেই লম্বা-লম্বা পা ফেলে এসে বেহালা-বাজিয়েকে ডাইনি বলল, "শোনো বাজনদার, ঐ সুন্দর ফুলটা তুলতে পারি ?"

সে বলল, "নিশ্চয়ই। ততক্ষণ বেহালায় আমি সুর বেঁধে নি।"

ফুলটা যে কে ডাইনি সে কথা ভালো করেই জানত। ফুল তোলার জন্য সে যখন ঝোপের কাছে এগুচ্ছে রোলাণ্ড তখন শুরু করল তার বেহালা বাজাতে। আর সেই সুরের তালে-তালে ডাইনি বাধ্য হল একটা জাদুর নাচ নাচতে। যত তাড়াতাড়ি সে বাজায় তত উঁচুতে ডাইনি বাধ্য হয় পা ছুঁড়তে। শেষটায় ঝোপের কাঁটায় তার পোশাক গেল ছিঁড়ে কুটিকুটি হয়ে আর তার সর্বাঙ্গ দিয়ে ঝরতে লাগল রক্ত। রোলাণ্ড কিন্তু বেহালা বাজানো থামাল না। শেষটায় নাচতে-নাচতে ডাইনি মরে পড়ে গেল।

ডাইনির ভয় যখন আর রইল না রোলাণ্ড তখন বলল, "এবার বাবার বাড়িতে ফিরে আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করি গে।"

মেয়েটি বলল, "তুমি না ফেরা পর্যন্ত আমি এখানে অপেক্ষা করব। কেউ যাতে আমায় দেখতে না পায় তার জন্যে আমি হয়ে যাব লাল একটা পাথর।"

রোলাণ্ড চলে গেল আর একটা মাঠের মধ্যে লাল পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটি করতে লাগল তার জন্য অপেক্ষা। কিন্তু বাড়ি ফিরে অন্য এক মেয়েকে রোলাণ্ড ভালোবেসে ফেলল। তার কথা একেবারে গেল ভুলে।

বেচারা মেয়েটি বহুদিন ধরে তার জন্য অপেক্ষা করে রইল। কিন্তু শেষপর্যন্ত রোলাণ্ড না ফেরায় মনের দুঃখে এই বলে সে একটি ফুল হয়ে গেল, 'এবার কেউ হয়তো আমাকে মাড়িয়ে চলে যাবে।'

কিন্তু হল কি—এক রাখাল মাঠে ভেড়া চরাতে এসে ফুলটিকে দেখে তুলে ঝোলায় ভরে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। আর তখন থেকে

রাখালের বাড়িতে ঘটতে লাগল নানা অবাক কাণ্ড। সকালে উঠে সে দেখে সংসারের সব কাজ সারা—ঘর ঝাঁট দেওয়া, টেবিল-চেয়ার পালিশ করা, উনুন জ্বালানো আর তাতে জল ফোটানো। দুপুরে ফিরে দেখে তার জন্য সুন্দর-সুন্দর খাবার তৈরি। সে ভেবে পেল না, কী করে এগুলো ঘটছে। কারণ তার বাড়িতে কাউকেই সে দেখতে পেত না! আর ওরকম ছোট্টো কুঁড়েঘরে কারুর পক্ষে লুকিয়ে থাকা একেবারে অসম্ভব।

তার সব কাজ হয়ে যেতে দেখে সে খুব খুশি হলেও এক বিজ্ঞ বুড়ির পরামর্শ সে চাইল। বুড়ি বলল, "নিশ্চয় এর পেছনে কোনো জাদু কাজ করছে। কাল সকালে লক্ষ্য কোরো কোনো-কিছু নড়ে কি না। কোনো জিনিস নড়লে সেটার ওপর একটা সাদা কাপড় চাপা দিয়ো। তা হলেই জাদু ধরা পড়বে।"

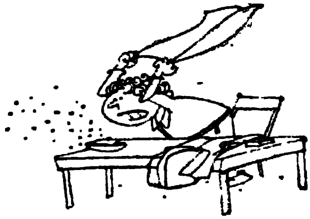
বুড়ির পরামর্শ মতো রাখাল কাজ করল। ভোরবেলায় সে দেখল তার থলি খুলে সেই ফুলটিকে বেরিয়ে আসতে। একলাফে সেখানে গিয়ে সেই ফুলের উপর একটা সাদা কাপড় সে চাপা দিল। সঙ্গে সঙ্গে ফুলটি হয়ে গেল এক সুন্দরী মেয়ে আর সে বলল, তার ঘর-সংসারের কাজ করছিল সেই ফুল। মেয়েটি নিজের সব কথা তার পর বলল রাখালকে। মেয়েটিকে খুব ভালো লেগেছিল বলে রাখাল তাকে প্রশ্ন করল—তাকে সে বিয়ে করবে কি না। মেয়েটি বলল, "না।" কারণ তাকে ছেড়ে গেলেও রোলাণ্ডকেই সে ভালোবাসত। কিন্তু রাখালকে সে কথা দিল— সে চলে যাবে না আর আগের মতোই করে যাবে তার ঘর-সংসারের কাজ।

এদিকে এগিয়ে এল রোলাণ্ডের বিয়ের দিন। সেই দেশের প্রথা অনুসারে সব কুমারী মেয়েদের ডাকা হল নতুন বর-বউয়ের জয়গান গাইবার জন্য। খবর শুনে মেয়েটির মন খুব খারাপ হয়ে গেল। বিয়েবাড়িতে যেতে তার ইচ্ছে হল না। কিন্তু অন্য মেয়েরা এসে জোর করে তাকে নিয়ে গেল।

তার গান গাইবার পালা আসতে মেয়েটি পিছিয়ে গেল। মনে হল তার বুক বুঝি ফেটে যাবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে বাধ্য হল গান গাইতে। আর সে গাইতে শুরু করতেই চমকে উঠে রোলাণ্ড চিনতে পারল তার স্বর। যে-সব কথা সে ভুলে গিয়েছিল একে একে

সে-সব কথা তার মনে পড়তে লাগল। সে চেঁচিয়ে উঠল, "এই স্বর আমার চেনা। এই আমার আসল বউ। একে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করব না।" মেয়েটির প্রতি ভালোবাসায় আবার তার হৃদয় কানায়-কানায় উঠল ভরে।

এইভাবে রোলাণ্ডের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল সেই মেয়েটির। আর তার পর থেকে দুঃখের হল শেষ আর আনন্দের শুরু।



সাহসী ক্ষুদে দর্জি

গ্রীষ্মকালের সুন্দর এক সকালে ক্ষুদে এক দর্জি জানলার পাশে তার টেবিলের সামনে বসে হাত চালিয়ে ছুঁচ দিয়ে সেলাই করছিল। এমন সময় পথ দিয়ে যেতে-যেতে এক চাষী-মেয়ে হেঁকে চলল, "চাই ভালো সস্তা মার্‌মালেড! ভালো সস্তা মার্‌মালেড!" (কমলালেবুর মোরব্বা)। সেই হাঁক শুনে দর্জির লোভ হল। জানলা দিয়ে কোঁকড়া-চুল-ভরা মাথা বার করে সে বলল, "এসো গো ভালোমানুষের বউ! তোমার সওদার খদ্দের এখানে রয়েছে।"

ভারী চুবড়িটা নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে সেই চাষী-মেয়ে দর্জির কাছে এসে তার কথামতো সব পাত্রগুলো সে বার করল। দর্জি একটা-একটা করে পাত্রগুলো নাকের সামনে ধরে শেষটায় বলল, "ভালো-মানুষের বউ, চার আউন্স আমাকে ওজন করে দাও। পৌনে এক পাউণ্ড হলেও আপত্তি নেই।"

চাষী-বউ ভেবেছিল ভালো খদ্দের পাবে। তাই এই সামান্য মার্‌মালেড দর্জিকে দিয়ে বিরক্ত হয়ে গজ্‌গজ্‌ করতে-করতে চলে গেল।

দর্জি বলল, "এই মার্‌মালেড নিয়ে আমি ভগবানের স্তব বলব। তা হলে নিশ্চয়ই চনচনে ক্ষিদে হবে।"

খাবারের আলমারি থেকে পাউরুটি বার করে, এক টুকরো কেটে সেটায় মার্‌মালেড সে মাখাল তার পর বলল, "জানি খেতে ভালোই লাগবে। কিন্তু খাবার আগে এই ওয়েস্টকোটটা শেষ করে ফেলি।"

এই-না বলে মার্‌মালেড-মাখানো রুটির টুকরোটা পাশে রেখে

মনের আনন্দে দিয়ে চলল ছুঁচে বড়ো-বড়ো ফোঁড়। ইতিমধ্যে মার্‌মালেডের মিষ্টি গন্ধ পেয়ে ভীড় করে মাছির দল এসে দেয়ালে বসল, তার পর সেটা চাখবার জন্য এল নীচে নেমে।

"কে তোদের নেমন্তন্ন করেছে রে?" বলে সেই ক্ষুদে দর্জি তাড়িয়ে দিল সেই-সব অনাহূত অতিথিদের। কিন্তু মাছিগুলো তার ভাষা বুঝল না। তাই না পালিয়ে ঝাঁকে-ঝাঁকে তারা আবার এল ফিরে। তখন সেই ক্ষুদে দর্জি দারুণ চটে একটা তোয়ালে নিয়ে আছড়াতে শুরু করল। ফলে অন্তত গোটা সাতেক মাছি আকাশের দিকে পা তুলে পড়ল মারা। নিজের সাহসের নিজেই তারিফ করে সে বলল, "দারুণ কাণ্ড! শহরময় হৈহৈ পড়ে যাবে।" এই-না বলে সেই ক্ষুদে দর্জি চট্‌পট্‌ একটা বেল্ট বানিয়ে তাতে লিখল, "এক ঘায়ে সাতটা কাবু!" তার পর আপন মনে বলে উঠল, 'শুধু শহর নয়, সারা পৃথিবীতে রটে যাবে খবরটা!' উত্তেজনায় ভেড়ার বাচ্ছার লেজের মতো তার বুকটা উঠল ধড়ফড় করে।

সেই বেল্টটা কোমরে জড়িয়ে দর্জি বেরিয়ে পড়ল পৃথিবী ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। কারণ তার বিরাট সাহস দেখাবার পক্ষে তার কাজের ঘরটা ছিল নেহাতই ছোটো। আরো কিছু সঙ্গে নিয়ে যাবার মতো আছে কি না দেখার জন্য যাত্রা করার আগে সে তাকাল চার দিকে। দেখল, খানিকটা পুরনো পনীর ছাড়া আর কিছু নেই। সেটাকে সে পকেটে ভরল। দরজার সামনে সে দেখে ঝোপে একটা পাখি আটকা পড়েছে। সেটাকেও সে পকেটে ভরল পনীরটাকে সঙ্গ দেবার জন্য। তার পর হাসিখুশি মুখে পড়ল বেরিয়ে। মানুষটা সে ছিল নেহাত ক্ষুদে। ওজনটাও খুব হালকা। তাই ক্লান্ত হয়ে পড়ল না। যেতে-যেতে সে পৌঁছল একটা পাহাড়ে। সেটার সব চেয়ে উঁচু চুড়োয় পৌঁছে সে দেখে একটা বিশাল চেহারার দৈত্য সেখানে বসে। দৈত্যটা চার দিকে শান্ত চোখে তাকাচ্ছিল। দর্জি তার কাছে গিয়ে বেপারোয়া স্বরে বলল:

"শুভদিন, দোস্ত। এখানে বসে-বসে তুমি কি সামনেকার বিরাট পৃথিবীটা দেখছ? আমিও ওখানে চলেছি। আমার সঙ্গে আসার ইচ্ছে আছে?"

নিদারুণ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দৈত্য বলল, "দূর ছোঁড়া—পুঁচকে ফাজিল কোথাকার!"

ক্ষুদে দর্জি বলল, "আমাকে তাই ভেবেছ বুঝি। কিন্তু এই দেখো।" কোটের বোতাম খুলে দৈত্যকে সে দেখাল তার বেল্ট। তার পর বলল, "পড়ে দেখো কী ধরনের লোক আমি।"

দৈত্য দেখল লেখা রয়েছে "এক ঘায়ে সাতটা কাবু।" সে ভাবল এক ঘায়ে সাতটা লোককে দর্জি মেরেছে। তখন তার প্রতি দৈত্যর কিছুটা শ্রদ্ধা হল। তবু ভাবল তাকে যাচাই করে দেখা দরকার। তাই একটা পাথর তুলে হাতের মধ্যে গুঁড়িয়ে সে জল বার করে ফেলল।

তার পর বলল, "তোমার যদি সত্যিই শক্তি থাকে তা হলে আমার মতো পাথর গুঁড়িয়ে জল বার করো।"

দর্জি বলল, "এই কথা? এটা তো নেহাত ছেলেখেলা।" এই-না বলে পকেট থেকে নরম পনীর বার করে চটকে জল বার করে ফেলল সে।

দৈত্য অবাক হল। কিন্তু এই ক্ষুদে মানুষটার শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ তার ঘুচল না। তাই সে একটা পাথর তুলে এমন উঁচুতে ছুঁড়ল যে প্রায় দেখাই গেল না।

তার পর বলল, "আমার মতো ছোঁড়ো দেখি—বেঁটে-বাঁটকুল কোথাকার।"

দর্জি বলল, "খাসা ছুঁড়েছ। কিন্তু তোমার পাথরটা তো মাটিতে এসে পড়ল। আমি এমন পাথর ছুঁড়ব যেটা মাটিতেই পড়বে না।"

এই-না বলে পকেট থেকে পাখিটাকে বার করে সে দিল শূন্যে ছুঁড়ে। মুক্তি পেয়ে মনের আনন্দে পাখিটা উড়ে গেল, আর ফিরে এল না। "এবার বল দোস্ত, কেমন লাগল?" প্রশ্ন করল দর্জি।

দৈত্য উত্তর দিল, "মানছি তুমি ভালোই ছুঁড়তে পার। কিন্তু এবার দেখা যাক ভারি বোঝা তুমি বইতে পার কি না।"

এই-না বলে ক্ষুদে দর্জিকে সে নিয়ে গেল প্রকাণ্ড একটা ওক্‌গাছের কাছে। কাটা-অবস্থায় সেটা মাটিতে পড়েছিল। দৈত্য বলল, "ক্ষমতা থাকলে এটাকে বনের বাইরে নিয়ে যেতে আমাকে সাহায্য কর।"

ক্ষুদে দর্জি বলল, "এটা আর শক্ত কি? গুঁড়িটা তুমি কাঁধে নাও। ডালপালাগুলো আমি বইছি—সেটাই সব চেয়ে কঠিন।"

দৈত্য গাছের গুঁড়িটা কাঁধে তুলল আর দর্জি গিয়ে বসল একটা

ডালে। ঘাড় ফিরিয়ে দৈত্য দেখতে পারল না। তাই শুধু যে পুরো গাছটা তাকে বইতে হল তাই নয়, সেই সঙ্গে বইতে হল ক্ষুদে দর্জিকেও।

পিছনকার ডালে বসে যেতে-যেতে মনের আনন্দে দর্জি কখনো দেয় শিস্, কখনো গেয়ে ওঠে টুকরো-টুকরো গান। ভাবখানা—ভারি গাছ বয়ে নিয়ে যাওয়া নেহাতই ছেলে খেলা।

ভারি গাছটা খানিক দূর বয়ে নিয়ে যাবার পর হাঁপাতে-হাঁপাতে দৈত্য চেঁচিয়ে বলল—আর সে বইতে পারছে না, কাঁধ থেকে গাছটা ফেলছে।

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে নেমে পিছনকার ডালপালা দু হাত দিয়ে দর্জি ধরল। ভাবখানা—এতক্ষণ সে-ও বয়ে আনছিল গাছটা। তার পর টিটকিরি দিয়ে বলল, "কী কাণ্ড! তোমার মতো জোয়ান লোক একটা গাছ বইতে পারে না!"

খানিক যেতে-যেতে তারা পৌঁছল একটা চেরিগাছের কাছে। সেটার মাথায় ফলেছিল পাকা-পাকা ফল। গাছটার ঝুঁটি ধরে টেনে নামিয়ে ডালটা দর্জির হাতে দিয়ে দৈত্য তাকে বলল যত খুশি ফল খেতে। কিন্তু ডালটা টেনে ধরার শক্তি সেই ক্ষুদে দর্জির ছিল না। দৈত্য ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে গাছটা আবার খাড়া হয়ে উঠল, দর্জিও সেই সঙ্গে সোঁ করে উঠে গেল উপরে।

অক্ষত শরীরে দর্জি মাটিতে পড়ার পর দৈত্য বলল, "আরে! ঐ কচি ডালটা দাবিয়ে রাখার ক্ষমতাও তোমার নেই?"

দর্জি উত্তর দিল, এর সঙ্গে ক্ষমতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। একঘায়ে সাতটাকে মারার পর তুমি কি ভাব ডালটা দাবিয়ে রাখতে পারতাম না? গাছটা টপ্‌কে এলাম, কারণ দেখি ঝোপের মধ্যে বসে এক শিকারী আমার দিকে তাক করছে। গাছটা টপ্‌কাতে তুমি পার?"

দৈত্য টপ্‌কাবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। মগডালে গেল আটকে। তাই-না দেখে দর্জি তো হেসেই কুটোপাটি!

দৈত্য বলল, "তুমি ক্ষুদে মানুষ হলেও খুব সাহসী দেখছি। চলো, আমাদের গুহায় রাত কাটাতে।"

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে ক্ষুদে দর্জি চলল দৈত্যর সঙ্গে। গুহায় পৌঁছে তারা দেখে অন্য দৈত্যরা আগুনের চার পাশে বসে। প্রত্যেকের হাতে

একটা করে আগুনে ঝলসানো ভেড়া। এমনভাবে কামড় দিয়ে চলেছে যেন সেগুলো রুটির হালকা টুকরো। দৈত্য তাকে একটা বিছানা দেখিয়ে বলল সেখানে শুয়ে বিশ্রাম নিতে। কিন্তু বিছানাটা ছিল দর্জির পক্ষে বেজায় বড়ো। তাই তাতে না শুয়ে গুটিগুটি এক কোণে গিয়ে বসল দর্জি। মাঝরাত হলে দৈত্য ভাবল ক্ষুদে দর্জি নিশ্চয়ই অঘোরে ঘুমচ্ছে। তাই একটা লোহার গজাল এনে এক ঘায়ে বিছানায় সেটা গেঁথে ভাবল ক্ষুদে ফড়িঙের মতো দর্জির দফা সে নিকেশ করে দিয়েছে।

পরদিন ভোরে দর্জির কথা ভুলে দৈত্যরা গেল বনে। এমন সময় সুস্থ শরীরে আগের মতোই বেপরোয়া চালে দর্জি হাজির হল তাদের কাছে। তাকে দেখে দারুণ ঘাবড়ে গেল দৈত্যের দল। ভাবল তাদের সে এবার মেরে ফেলবে। তাই পড়িমরি করে তারা ছুটে পালাল। ক্ষুদে দর্জি নাক-বরাবর সোজা চলল হেঁটে। অনেক দূর যাবার পর সে পৌঁছল এক রাজপ্রাসাদের অঙ্গনে। বেজায় তখন সে ক্লান্ত। তাই সেখানে শুয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল। সে যখন ঘুমচ্ছে, নানা লোক এসে তার বেল্টের উপরকার সেই লেখাটাই পড়ল—"এক ঘায়ে সাতটা!"

লোকেরা ভাবল, 'নিশ্চয়ই এ মস্ত বড়ো বীরপুরুষ। কিন্তু এখন তো যুদ্ধ নেই—এখানে এসেছে কেন?" তারা গিয়ে রাজাকে খবরটা দিয়ে বলল—যুদ্ধ বাধলে লোকটা খুব কাজে লাগবে, তাই কিছুতেই তাকে যেন যেতে দেওয়া না হয়।

রাজি হয়ে দর্জির কাছে রাজা পাঠালেন তাঁর এক অমাত্যকে। বলে দিলেন দর্জির ঘুম ভাঙলে যেন জানানো হয় তাকে সৈন্যদলে ভর্তি করতে রাজা চান। ঘুম ভাঙার পর চোখ মেলে দর্জি যখন আড়মোড়া ভাঙছে, সেই অমাত্য তাকে জানাল রাজার প্রস্তাব।

দর্জি বলল, "সেইজন্যই তো এখানে আসা। রাজার সৈন্যদলে যোগ দিতেই তো চাই।"

তাকে সসম্মানে সৈন্যদলে ভর্তি করে নেওয়া হল। থাকার জন্য দেওয়া হল খুব ভালো একটা বাড়ি। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সেই দর্জির উপর হিংসেয় অন্যান্য অফিসাররা জ্বলেপুড়ে মরতে লাগল। ফন্দি আঁটতে লাগল সেখান থেকে তাকে তাড়াবার। নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করল, "ওর সঙ্গে যদি আমাদের ঝগড়া বাধে আর ও যদি এক-এক ঘায়ে আমাদের সাতজনকে খতম করতে থাকে—তা হলে

আমাদের কী দশা হবে ? তাই রাজার কাছে দল বেঁধে গিয়ে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তারা বলল, "এক-এক ঘায়ে সাতটা লোককে যে সাবাড় করতে পারে তার সঙ্গে পাল্লা দেবার উপযুক্ত আমরা নই।"

একজন লোকের জন্য নিজের সমস্ত বিশ্বস্ত কর্মচারীদের হারিয়ে রাজা খুব ক্ষুণ্ণ হলেন। তাঁর মনে হল লোকটার দেখা না পেলেই ভালো হত। তাই ভাবতে লাগলেন—কী করে তাকে তাড়ানো যায়। কিন্তু তাকে বরখাস্ত করার সাহস রাজার হল না। ভাবলেন, জবাব দিলে দর্জি হয়তো তাঁকে আর তাঁর প্রজাদের মেরে ফেলে নিজেই সিংহাসন অধিকার করে বসবে। অনেক ভাবনা চিন্তার পর তাঁর মাথায় একটা ফন্দি এল। লোক মারফত ক্ষুদে দর্জিকে তিনি জানালেন—সে দারুণ সাহসী বীরপুরুষ, তাই তার কাছে একটা প্রস্তাব আছে। প্রস্তাবটা এই : তাঁর রাজত্বের মধ্যে এক বনে দুটো দৈত্য থাকে ; খুন-খারাপি লুটপাট করে তারা ভয়ংকর ক্ষতি করে চলেছে ; তাদের সামনে যাবার সাহস কারুর নেই। এই দুই দৈত্যকে দর্জি মেরে ফেলতে পারলে তার সঙ্গে নিজের একমাত্র মেয়ের বিয়ে তিনি দেবেন আর সেই সঙ্গে দেবেন অর্ধেক রাজত্ব। দৈত্যদের মারার জন্য দর্জিকে তাঁর একশোজন বীর সৈন্য সাহায্য করবে।

দর্জি ভাবল, 'সুন্দরী রাজকন্যে আর অর্ধেক রাজত্ব—কী কাণ্ড !' তাই সে উত্তরে জানাল, "নিশ্চয়ই যাব আর গিয়ে দৈত্যদের খতম করে আসব। আপনার একশোজন বীর সৈন্যের দরকার নেই। এক ঘায়ে সাতজনকে যে মারতে পারে, অনায়াসে দুজনকে সে নিকেশ করতে পারবে।"

ক্ষুদে দর্জি যাত্রা করল। তার পিছনে চলল সেই একশোজন বীর সৈন্য। বনের কিনারে পেঁৗছে সঙ্গীদের সে বলল, "তোমরা এখানে থাকো। দৈত্যদের আমি খতম করে আসছি।" একাই সে ছুটে গেল বনের মধ্যে। যেতে-যেতে তাকাতে লাগল ডাইনে আর বাঁয়ে। খানিক পরে সেই দুটো দৈত্যের দেখা পেল সে। একটা গাছের তলায় তারা দুজন ঘুমচ্ছিল। তাদের নাকডাকার শব্দে উপরকার ডালপালার উড়ে যাবার অবস্থা। দু পকেট পাথর ভরে দর্জি সেই গাছটায় চড়ল। ঘুমন্ত দৈত্যদের উপরকার একটা ডালে বসে একটা দৈত্যের বুকের উপর ফেলতে লাগল সে পাথরগুলো। অনেকক্ষণ দৈত্যটা নড়ল না। শেষটায়

জেগে উঠে তার সঙ্গীকে ঠেলা দিয়ে সে বলল, "আমাকে মারছিস কেন ?"

অন্যজন উত্তর দিল, "আমি তো মারি নি। নিশ্চয়ই তুই স্বপ্ন দেখছিস।"

আবার শুয়ে তারা ঘুমিয়ে পড়ল। দর্জি তখন আর-একটা পাথর ফেলল দ্বিতীয় দৈত্যের বুকে।

সে চেঁচিয়ে উঠল, "কী ব্যাপার ? আমাকে পাথর ছুঁড়ে মারছিস কেন ?"

প্রথমজন রেগে গর্‌গর্‌ করে উঠল, "মোটেই পাথর ছুঁড়ে তোকে মারি নি।"

নিজেদের মধ্যে খানিক ঝগড়া করার পর আবার ঘুমে তাদের চোখ বুজে এল। কারণ দুজনেই ছিল খুব ক্লান্ত। ক্ষুদে দর্জি তখন তার সব চেয়ে বড়ো পাথরটা নিয়ে সজোরে ছুঁড়ে মারল প্রথম দৈত্যটার বুকে।

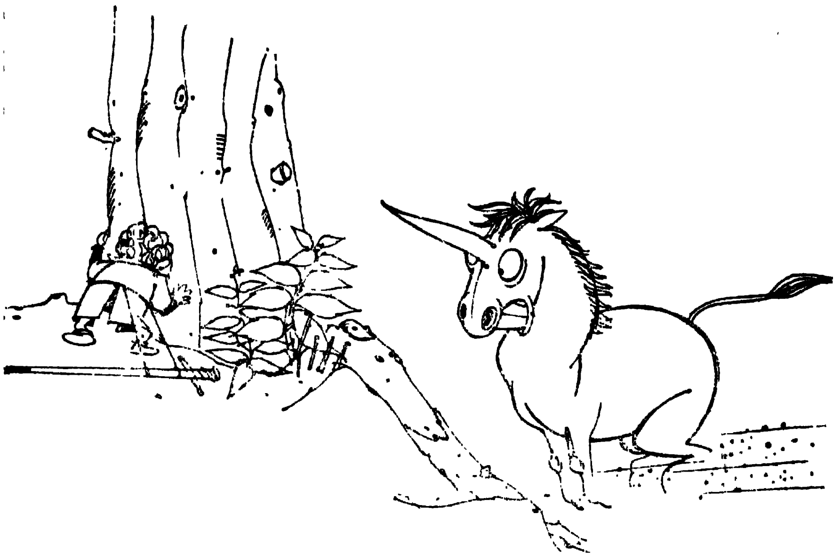
"এ তো ভয়ানক জ্বালা হল দেখছি" বলে চেঁচিয়ে উঠে পাগলের মতো তার সঙ্গীকে এমন জোরে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে সে চেপে ধরল যে, থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগল গোটা গাছটা। অন্যজনও সমান ক্ষেপে উঠে শুরু করে দিল এলোপাথাড়ি কিল-চড়-লাথি মারতে। তার পর দারুণ রেগে শেকড়সুদ্ধ গাছ উপড়ে মারামারি করতে করতে দুজনেই তারা মরে মাটিতে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে লাফিয়ে গাছ থেকে নেমে দর্জি বলল, "কী ভাগ্যি—যে-গাছটায় বসেছিলাম সেটা ওরা ওপড়ায় নি। ওপড়ালে কাঠ-বিল্লীর মতো অন্য গাছে লাফিয়ে আমায় যেতে হত।" তার পর নিজের খাপ থেকে তরোয়াল বার করে তাদের বুকে কোপ বসিয়ে সেই বীর সৈন্যদের কাছে গিয়ে সে বলল, "কাজটা হাসিল হয়েছে। দৈত্য দুটোকে খতম করেছি। সাংঘাতিক লড়তে হয়েছে। নিজেদের বাঁচাবার জন্যে গোড়াসুদ্ধ গাছ ওরা উপড়েছিল। কিন্তু এক ঘায়ে যে সাতজনকে কাবু করতে পারে তার সঙ্গে এঁটে উঠবে কী করে ?"

তারা প্রশ্ন করল, "তুমি আহত হও নি ?"

দর্জি বলল, "না। আমাকে মারবার ওরা খুব চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমার মাথার একগাছা চুলও ছুঁতে পারে নি।"

তার কথা সেই সৈন্যদের বিশ্বাস হল না। তাই তারা ঘোড়ায়



চড়ে বনের মধ্যে গেল। আর গিয়ে দেখে নিজেদের রক্তেই দৈত্য দুটো ভাসছে আর চারি দিকে ছড়িয়ে রয়েছে ওপড়ানো অনেক গাছ।

ক্ষুদে দর্জি তার পর রাজার কাছে গিয়ে তার দাবি জানাল। নিজের অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করে রাজা মনে-মনে হায় হায় করতে লাগলেন আর মতলব ভাঁজতে লাগলেন—কী করে এই ক্ষুদে মানুষটাকে দূর করা যায়।

শেষটায় তিনি বললেন, "আমার মেয়েকে বিয়ে করা আর আমার অর্ধেক রাজত্ব পাবার আগে তোমাকে আর-একটা দুঃসাহসী কাজ করতে হবে। বনের মধ্যে একটা ইউনিকর্ন[1] ভারি ক্ষতি করে চলেছে। সেটাকে তোমায় ধরতে হবে।"

দর্জি বুক ফুলিয়ে বলল, "দুটো দৈত্যের চেয়েও একটা ইউনিকর্নকে আমি কম ভয় করি। আমার লড়াই করার কায়দা—এক ঘায়ে সাতটা সাবাড় করা।"

[1]প্রাচীন গ্রীক ও রোমান লেখকদের রচনায় এই জন্তুর বর্ণনা আছে। ঘোড়ার মতো তার দেহ আর মাথায় একটা শিঙ।

একগাছা দড়ি আর একটা কুড়ুল নিয়ে বনে পেঁাছে দলের লোক-জনদের সে বলল বাইরে অপেক্ষা করতে। বেশিক্ষণ তাকে খোঁজাখুঁজি করতে হল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল সেই ইউনিকর্নকে। দর্জির দিকে এমনভাবে সেটা তেড়ে এল যেন চক্ষের নিমেষে শিঙ দিয়ে গুঁতিয়ে তাকে শেষ করে ফেলবে।

দর্জি চেঁচিয়ে উঠল, "ধীরে—ধীরে—অত তাড়াহুড়োর দরকার নেই!"

স্থির হয়ে সে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। জন্তুটা একেবারে গায়ের ওপর এসে পড়তে তড়াক করে এক লাফে সে সরে গেল একটা গাছের পিছনে। পাগলের মতো সেই গাছটার দিকে ছুটে গিয়ে শিঙ দিয়ে জন্তুটা এমন জোরে গাছটার গুঁড়ি গুঁতলো যে, সেখানে শক্ত হয়ে গেঁথে গেল তার শিঙ। কিছুতেই টেনে সেটা সে ছাড়াতে পারল না।

গাছের পিছনে থেকে বেরিয়ে এসে দর্জি বলল, "এবার তোমায় কায়দায় পেয়েছি, জাদু!" তার পর দড়িটা তার গলায় বেঁধে, গাছের গুঁড়িতে গাঁথা শিঙটা কুড়ুল দিয়ে কেটে সেটাকে সে নিয়ে গেল রাজার কাছে।

রাজা কিন্তু সেই প্রতিশ্রুত পুরস্কার তাকে দিলেন না। তিনি জানালেন তৃতীয় কড়ারের কথা। বললেন—বিয়ের দিনক্ষণ স্থির হবার আগে দর্জিকে ধরতে হবে একটা বুনো শুয়োর। সেখানে সেটা দারুণ উৎপাত করে চলেছে। সেটাকে ধরতে নানা শিকারী সাহায্য করবে।

দর্জি বলল, "সানন্দেই যাচ্ছি। একটা বুনো শুয়োর ধরা তো নেহাতই ছেলেখেলা!" শিকারীদের সঙ্গে সে নিল না। তাতে শিকারীর দল হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কারণ আগে বুনো শুয়োরটাকে ধরতে গিয়ে তারা দারুণ নাজেহাল হয়েছিল।

দর্জিকে দেখামাত্র দাঁত কিস্‌কিস্‌ করতে-করতে শুয়োরটা তেড়ে এল। মুখ দিয়ে তখন তার গাঁজলা বেরুচ্ছে! কিন্তু সেই চট্‌পটে দর্জি সঙ্গে সঙ্গে সেঁধিয়ে পড়ল কাছের একটা কুঁড়ে ঘরের মধ্যে আর চক্ষের নিমেষে বেরিয়ে গেল জানলা দিয়ে। শুয়োরটা তার পিছন পিছন কুঁড়ে ঘরে ঢুকতে পিছন থেকে ছুটে এসে দর্জি দিল দরজাটা বন্ধ করে। কুঁড়েঘরের মধ্যে বন্ধ হওয়ার দরুন গজরাতে লাগল জন্তুটা। বেজায় সেটা মোটাসোটা। তাই জানলা গলে বেরুতে পারল না।

দর্জি তখন শিকারীদের ডেকে বলল কী ঘটেছে নিজের চোখে দেখে আসতে। তার পর দর্জি গেল রাজার কাছে আর তাকে বলল—এবার

তিনি তাঁর অঙ্গীকার পালন করতে বাধ্য; অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যেকে তাকে দিতে হবে। রাজা যদি জানতেন সে বীর সৈনিক নয়, আসলে ছোট্টো এক দর্জি তা হলে নিশ্চয়ই নিজের কথা রাখতেন না।

যাই হোক—ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল। সেই দর্জি হল এক রাজা। একদিন সেই তরুণী রানী শোনে ঘুমের মধ্যে তার স্বামী বিড়্ বিড়্ করে বলছে, "এই ছোকরা—এক্ষুনি আমার ওয়েস্টকোট শেষ করে ট্রাউজারটা টেঁকে দে, নইলে তোর গজকাঠি দিয়ে তোর মাথায় বাড়ি দেবো।" তখন সে বুঝতে পারল তার স্বামীর জন্ম কোন পরিবারে। পরদিন সকালে তার বাবার কাছে গিয়ে সে অভিযোগ করল—যার সঙ্গে রাজা তার বিয়ে দিয়েছেন, আসলে সে নগণ্য একটা দর্জি।

রাজা মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "কাল রাতে ঘরের দরজাটা খুলে রাখিস। আমার চাকর বাইরে অপেক্ষা করবে। ও ঘুমিয়ে পড়লে চুপি চুপি ভেতরে গিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে তাকে তুলে দেবে একটা জাহাজে। জাহাজটা তাকে নিয়ে চলে যাবে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে।"

কথাটা শুনে রাজকন্যে খুশি হল। কিন্তু দর্জি-রাজার ভৃত্য অন্য রাজার কথাগুলো শুনেছিল। তাই প্রভুর কাছে গিয়ে এই ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিল।

সব শুনে দর্জি-রাজা বলল, "ঠিক আছে। এই সামান্য ব্যাপারটার নিষ্পত্তি আমি করছি।"

রাতে যথাসময়ে সে গিয়ে শুলো তার বউয়ের পাশে। রাজকন্যের যখন মনে হল দর্জি-রাজা ঘুমিয়ে পড়েছে তখন চুপি চুপি উঠে দরজাটা খুলে দিয়ে ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়ল। ছোট্টো দর্জি ঘুমের শুধুই ভান করছিল। হঠাৎ সে তীব্র গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "এই ছোকরা—এক্ষুনি আমার ওয়েস্টকোট শেষ করে ট্রাউজারটা টেঁকে দে, নইলে তোর গজকাঠি দিয়ে তোর মাথায় বাড়ি দেব। এক ঘায়ে সাতজনকে আমি খতম করেছি, মেরেছি দুটো দৈত্য, ধরেছি একটা ইউনিকর্ন আর বুনো শুয়োর। দরজার বাইরে যে দাঁড়িয়ে তাকে আমি পরোয়া করি নাকি? ছোট্টো দর্জির চীৎকার শুনে সবাই ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। যারা তাকে বাঁধতে এসেছিল তারা পড়িমড়ি করে ছুটে পালাল। আর তার পর কেউই তাকে কোনোদিন স্পর্শ করতে সাহস করে নি। এইভাবে সেই ছোট্টো দর্জি সারা জীবন কাটালো রাজা হয়ে।

মৌমাছিদের রানী

এক সময় এক রাজার দুই ছেলে অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু বদ-সঙ্গে পড়ে বাজে আমোদ-প্রমোদে মশগুল হয়ে বাড়ি ফিরল না। ছোটো ভাইকে তারা বলত গোবুচন্দ্র! সে বেরুল তার বড়ো ভাইদের খোঁজে। ভাইদের সঙ্গে তার দেখা হতে ভাইরা তাকে নিয়ে অনেক ঠাট্টা-তামাশা করল। বলল, তার মতো হাঁদাগঙ্গারামকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। বলল, তাদের মতো চালাক-চতুর লোক যে পৃথিবীতে কিছুই করতে পারে নি সেখানে তার মতো লোক কোনো পাত্তাই পাবে না।

যাই হোক, একসঙ্গে যেতে-যেতে তারা পৌঁছল এক পিঁপড়ের ঢিবিতে। বড়ো ভাইরা বলল ঢিবিটা ভেঙে পিঁপড়েদের ডিম মুখে নিয়ে চার দিকে ছুটোছুটি করতে দেখলে তারা খুব মজা পাবে। কিন্তু তাদের বোকা ছোটো ভাই বলল, "আহা, বেচারা পিঁপড়েদের কেন মিছিমিছি সর্বনাশ করবে? ঢিবিটা আমি ভাঙতে দেবো না।"

আরো খানিক গিয়ে তারা পৌঁছল এক হ্রদে। অনেক হাঁস সেখানে সাঁতার কাটছিল। বড়ো ভাইরা বলল সেখান থেকে দুটো হাঁস নিয়ে ঝলসে খাবে। কিন্তু তাদের বোকা ছোটো ভাই বলল, "আহা বেচারাদের মেরো না। ওদের আমি মারতে দেবো না।"

আরো খানিক গিয়ে একটা গাছে তারা দেখে মধুতে টুস্‌টুসে একটা মৌচাক। গাছটার গুঁড়ি দিয়ে মধু গড়িয়ে পড়ছিল। বড়ো ভাইরা বলল গাছের তলায় আগুন জ্বেলে ধোঁয়া দিয়ে মৌমাছিদের তাড়িয়ে মধু

নেবে। কিন্তু তাদের বোকা ছোটো ভাই বলল, "আহা, বেচারা মৌমাছিদের কেন সর্বনাশ করবে? ওদের আমি পোড়াতে দেবো না।"

শেষটায় তিন ভাই পৌঁছল এক দুর্গে। সেখানকার আস্তাবলের ঘোড়াগুলো পাথর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু লোকজন কাউকে দেখা গেল না। সব ঘরগুলো ঘোরার পর তারা পৌঁছল একটা দরজায়। সেটায় ছিল তিনটে হুড়কো। দরজাটার মাঝখানের ছোট্টো ফোকর দিয়ে তাকিয়ে তারা দেখে ঘরের মধ্যে একটা টেবিলের সামনে বসে রয়েছে ছোটোখাটো একটি লোক। চুলগুলো তার পাকা। তাকে বার দুয়েক তারা ডাকল। কিন্তু মনে হল না তাদের কথা সে শুনতে পেয়েছে। তৃতীয়বার ডাকার পর লোকটা উঠে দরজা খুলে তাদের কাছে এল। কোনো কথা না বলে তাদের সে নিয়ে গেল নানা খাবার-ভরা একটা টেবিলের কাছে। খাওয়া-দাওয়ার পর তাদের সে নিয়ে গেল তিনটে আলাদা আলাদা শোবার ঘরে।

পরদিন সকালে সেই ছোট্টোখাট্টো বুড়ো মানুষটি এসে হাতছানি দিয়ে বড়ো ভাইকে ডেকে নিয়ে গেল এক পাথরের টেবিলের কাছে। দুর্গকে জাদুমুক্ত করার তিনটে কাজের কথা সেখানে ছিল লেখা। প্রথম কাজটা হল: বনের মাঝখানে জলা-জমিতে রাজকন্যের যে হাজারটা মুক্তো পোঁতা হয়েছিল সেগুলো খুঁজে বার করা। যে খুঁজতে যাবে সন্ধের আগে সে যদি সব মুক্তোগুলো খুঁজে না পায় তা হলে সে হয়ে যাবে পাথর। সারাদিন ধরে বড়ো ভাই মুক্তোগুলো খুঁজল—কিন্তু সন্ধের মধ্যে একশোটার বেশি খুঁজে পেল না। তাই টেবিলের লেখা অনুযায়ী সে হয়ে গেল পাথর। পরদিন মেজোভাই গেল মুক্তোর খোঁজে। কিন্তু বড়ো ভাইয়ের মতোই সব মুক্তো সে খুঁজে পেল না। সে পেল মাত্র দুশোটা। তাই সে-ও হয়ে গেল পাথর।

শেষটায় মুক্তো খোঁজার পালা এল সেই বোকা ছোটো ভাইয়ের। জলা-জমিতে মুক্তোগুলো খুঁজতে সে শুরু করল। কিন্তু কাজটা করা অসম্ভব দেখে একটা পাথরে বসে সে লাগল কাঁদতে। এমন সময় পাঁচহাজার প্রজা নিয়ে হাজির হল পিঁপড়েদের রাজা, যার জীবন সে বাঁচিয়েছিল। মুহূর্তের মধ্যে ক্ষুদে-ক্ষুদে পিঁপড়েগুলো সব মুক্তো খুঁজে এনে এক জায়গায় জড় করে রাখল।

দ্বিতীয় কাজটা হল: হ্রদের তলা থেকে রাজকন্যের শোবার

ঘরের চাবি তুলে আনা। ছোটো ভাই জলের কাছে আসতে, যে-হাঁসদের প্রাণ সে বাঁচিয়েছিল তারা এল সাঁতরে। আর তার পর জলে ডুব দিয়ে তারা তুলে আনল চাবিটা।

কিন্তু তৃতীয় কাজটাই ছিল সব চেয়ে কঠিন। সেটা এই : যে তিন রাজ কন্যে ঘুমিয়ে রয়েছে তাদের মধ্যে সব চেয়ে ছোটো আর সব চেয়ে সুন্দরীকে হাত দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। তিন রাজকন্যেকেই দেখতে হুবহু একরকম। তাদের মধ্যে একমাত্র যেটা তফাত সেটা এই : ঘুমবার আগে বড়ো রাজকন্যে খেয়েছিল এক টুকরো মিছরি, মেজো খেয়েছিল এক ঢোক সিরাপ আর ছোটো খেয়েছিল এক চামচে মধু।

কিন্তু ছোটো ভাইকে সাহায্য করতে এল মৌমাছিদের রানী, যাকে সে বাঁচিয়েছিল আগুন থেকে। তিন রাজকন্যের মুখের উপর উড়তে লাগল মৌমাছির রানী। তার পর যে-রাজকন্যে মধু খেয়েছিল তার ঠোঁটের উপর নামল সে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে দেখিয়ে দিল ছোটো ভাই।

দুর্গ হয়ে গেল জাদুমুক্ত। সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার সবাইকার জাদুর ঘুম ভাঙল। যারা পাথর হয়ে গিয়েছিল তারা আবার ফিরে পেল মানুষের দেহ। যে ছোটো ভাইকে সবাই বলত বোকা তার সঙ্গেই বিয়ে হল সব চেয়ে সুন্দরী ছোটো রাজকন্যের আর তার বাবার মৃত্যুর পর সে-ই হল রাজা। তার বড়ো দুভাই বিয়ে করল অন্য দুই রাজকন্যেকে।

তিনটি পালক

এক সময় ছিলেন এক রাজা। তাঁর তিন ছেলে। বড়ো দুজন চালাক-চতুর। কিন্তু ছোটোটি নিরীহ আর শান্ত। তাই লোকে তাকে বলত হাঁদাগঙ্গারাম। রাজা বুড়ো হবার পর ভাবতে শুরু করলেন—তাঁর পর কোন ছেলে সিংহাসনে বসবে। একদিন ছেলেদের ডেকে তিনি বললেন, "তোমরা বেরিয়ে পড়ো। আমার জন্যে যে সব চেয়ে সুন্দর গালচে নিয়ে আসতে পারবে, আমার মৃত্যুর পর সেই হবে রাজা।" এই-না বলে তাদের নিয়ে রাজা দুর্গের সামনে গিয়ে ফুঁ দিয়ে তিনটি পালক উড়িয়ে দিলেন। তার পর বললেন, "এই তিনটে পালক যেদিকে যাবে তোমরা তিনজন সেদিকে যেয়ো।" একটা পালক উড়ে গেল পুবে, একটা পশ্চিমে আর তৃতীয়টা সামনের দিকে খানিক গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তাই এক ভাই গেল পুবে, এক ভাই পশ্চিমে। সামনে খানিক গিয়ে যে পালকটা পড়েছিল বোকা ছোটো ভাইটাকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারা টিটকিরি দিয়ে হাসল।

বেচারা বোকা ছোটো ভাই সেখানে বসে মনের দুঃখে কাঁদতে লাগল। কিন্তু কয়েক মিনিট পরে সে দেখে পালকটা যেখানে পড়ে তার কাছেই একটা গুপ্ত দরজা। সেটা খুলে দেখে একটা সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে সে লাগল নীচে নামতে। খানিক নামার পর সে পৌঁছল আর-একটা দরজার সামনে। সেই দরজায় টোকা দিয়ে সে শুনতে পেল ভিতরে কে যেন গান গাইছে। দরজা খুলতে সে দেখে একটা মস্ত মোটা কোলা ব্যাঙ বসে। আর সেটাকে ঘিরে রয়েছে ছোটো-ছোটো আরো অনেক ব্যাঙ।

মোটা কোলা ব্যাঙ প্রশ্ন করল—কী তার চাই। সে বলল, "সব চেয়ে সুন্দর একটা গালচে আমার দরকার।"

ছোটো একটা ব্যাঙকে কোলা ব্যাঙ বলল বড়ো একটা বাক্স আনতে। ছোটো ব্যাঙ বাক্সটা আনতে মোটা কোলা ব্যাঙ সেটার ডালা খুলে বোকা ছোটো ভাইকে এমন সুন্দর একটা গালচে দিল, পৃথিবীতে যার জুড়ি নেই।

কোলা ব্যাঙকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বোকা ছোটো ভাই আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল।

অন্য দু ভাই ভেবেছিল তাদের ছোটো ভাই এমনই বোকা যে, কিছুই আনতে পারবে না। তাই তারা বিশেষ খোঁজাখুঁজি করল না। প্রথম যে রাখাল-বউয়ের সঙ্গে দেখা তার কাছ থেকে খুব বাজে ধরনের আলোয়ান নিয়ে তারা ফিরল রাজার কাছে। একই সময় সেই নিখুঁত সুন্দর গালচে নিয়ে রাজার কাছে পৌঁছল তাদের বোকা ছোটো ভাই।

গালচেটা দেখে অবাক হয়ে রাজা বললেন, "ন্যায়ত আর ধর্মত এরই রাজা হবার কথা।" কিন্তু অন্য দুই ছেলে কিছুতেই রাজার কথা মানতে রাজি হল না। তারা বলল, বোকা লোকের পক্ষে রাজত্ব চালানো অসম্ভব। রাজাকে তারা বলল, আরো শক্ত একটা কাজ দিতে।

রাজা বললেন, "আমার জন্যে যে সব চেয়ে সুন্দর আংটি আনতে পারবে সে-ই পাবে রাজত্ব।" এই-না বলে তিন ছেলেকে দুর্গের বাইরে নিয়ে গিয়ে ফুঁ দিয়ে আবার তিনি তিনটে পালক উড়িয়ে দিয়ে বললেন, পালকগুলোর পেছন পেছন যেতে।

আবার বড়ো ছেলেদের একজন গেল পুবে, একজন পশ্চিমে। আর বোকা ছেলেটির পালক সামনে উড়ে গিয়ে পড়ল সেই গুপ্ত দরজাটার পাশে।

আবার সিঁড়িটা দিয়ে নামতে তার সঙ্গে দেখা হল সেই মোটা কোলা ব্যাঙের। বোকা রাজপুত্তুর বলল, "পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর আংটির দরকার।"

সঙ্গে সঙ্গে মোটা কোলা ব্যাঙ বলল সেই বাক্সটা আনতে আর সেটা থেকে ঝলমলে হীরে-পান্না বসানো সুন্দর একটা আংটি বার করল যার জুড়ি পৃথিবীর কোনো স্যাকরা বানাতে পারে না।

বোকা ভাইটি সুন্দর আংটির খোঁজে গেছে বলে বড়ো দুভাই খুব হাসাহাসি করল। সুন্দর আংটি জোগাড় করার কোনো চেষ্টাই নিজেরা

করল না। একটা ঠেলা গাড়ির পুরনো ছোটো চাকা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে সেটার পেরেকগুলো ঠুকে বের করে তারা নিয়ে গেল রাজার কাছে।

বোকা ভাই তার হীরে-পান্না বসানো সোনার আংটিটা দেখাতে রাজা বললেন, "আমার ছোটো ছেলেই পাবে রাজত্ব।"

কিন্তু অন্য দুই ছেলে কিছুতেই রাজার কথা মানতে রাজি হল না। তাই শেষটায় রাজা আর-একটা শর্ত করে বললেন—সব চেয়ে সুন্দরী মেয়েকে যে নিয়ে আসতে পারবে সে-ই পাবে রাজত্ব। আবার বাতাসে ওড়ানো হল সেই তিনটে পালক আর আগের মতোই সেগুলো গেল তিন দিকে।

বোকা ছেলে সোজা সেই মোটা কোলা ব্যাঙের কাছে গিয়ে বলল— পরমা-সুন্দরী একটি মেয়ে দিতে।

কোলা ব্যাঙ বলল, "পরমাসুন্দরী মেয়েকে পাওয়া অত সহজ নয়। কিন্তু তোমাকে দিচ্ছি।" এই-না বলে সে তাকে দিল পুরনো হলদে একটা গাজর। সেটার মাঝখানে ফাঁপা। গাজরটার সঙ্গে সে জুতে দিল ছটা ইঁদুর।

বোকা রাজপুত্তুর করুণ গলায় প্রশ্ন করল, "এদের নিয়ে কি করব?"

কোলা ব্যাঙ বলল, "এটার মধ্যে আমার যে কোনো একটা বাচ্চাকে বসিয়ে দাও।"

এই-না বলে হাতের কাছে যে বাচ্চাকে পেল তাকে ধরে সে বসিয়ে দিল সেই হলদে গাড়িতে। আর চক্ষের নিমেষে সেই বাচ্চা ব্যাঙ হয়ে গেল পরমা সুন্দরী তরুণী মেয়ে, গাজরটা জুড়িগাড়ি আর ছটা ইঁদুর ছটা ঘোড়া। ছোটো রাজপুত্তুর মেয়েটিকে চুমু খেলো। তার পর গাড়ি হাঁকিয়ে তাকে নিয়ে গেল রাজার কাছে।

তার অন্য দু ভাই ফিরল পরে। আগের মতোই এবারও তারা কষ্ট করে খোঁজাখুঁজি করে নি। যে চাষী-মেয়েদের সঙ্গে প্রথম দেখা তাদেরই তারা হাজির করল 'পরমাসুন্দরী' হিসেবে।

তাই-না দেখে রাজা ঘোষণা করে দিলেন, "আমার মৃত্যুর পর রাজত্ব পাবে আমার ছোটো ছেলে।"

কিন্তু বড়ো দু ভাই আপত্তি করে রাজার কান ঝালাপালা করে দিল। তারা বলল, "তোমার রাজত্ব এক হাঁদাগঙ্গারাম শাসন করবে—এটা আমরা বরদাস্ত করব না।" তারা প্রস্তাব করল: যে-ছেলের বউ

হলঘরের মধ্যে টাঙানো লোহার চাকার মধ্যে দিয়ে লাফিয়ে যেতে পারবে তাকেই দিতে হবে রাজত্ব। তারা ভেবেছিল, 'চাষীদের মেয়েরা শক্তসমর্থ আর ডানপিটে গোছের, লাফঝাঁপের কাজ অনায়াসে তারা করতে পারবে। কিন্তু ভদ্র পরিবারের কোমল দুর্বল মেয়ে লাফঝাঁপ করতে গেলে পড়বে মারা।'

বুড়ো রাজা এই প্রস্তাবে রাজি হলেন। চাষী-মেয়েরা কিন্তু সেই লোহার চাকার মধ্যে দিয়ে এমন আনাড়ির মতো লাফ দিল যে, পড়ে গিয়ে ভাঙল তাদের হাত-পা। কিন্তু বোকা রাজপুত্তুরের সুন্দরী বউ হরিণীর মতো সুন্দর ভঙ্গিতে লাফিয়ে গলে গেল সেই লোহার চাকার মধ্যে দিয়ে। আর তখন কোনো ওজর-আপত্তি খাটল না। বোকা রাজপুত্তুরই পেল রাজমুকুট আর অনেক বছর ধরে বিজ্ঞ আর বিচক্ষণের মতো রাজ-কাজ করল পরিচালনা।

গরিব ক্ষুদে চাষী

এক সময় এক গ্রামে আর সবাই ছিল ধনী, একজন মাত্র গরিব। লোকে তাকে বলত 'ক্ষুদে চাষী'। তার না ছিল কোনো গোরু, না ছিল গোরু কেনবার টাকা। কিন্তু তার আর তার বউয়ের একটা গোরুর খুবই দরকার ছিল। ক্ষুদে চাষী একদিন তার বউকে বলল, "আমার মাথায় খুব ভালো একটা ফন্দি এসেছে। তুমি তো জানো গাফ্‌ফের শ্রেইনার নামে এক ছুতোর আছে। সে কাঠ থেকে এমন একটা বাছুর বানিয়ে বাদামী রঙ করে দিতে পারে যেটাকে দেখতে হবে অবিকল বাছুরের মতো। কালে সেটা বড়ো হয়ে আমাদের জন্যে একটা গোরুর বাচ্ছা পাড়বে।"

কথাটা বউয়ের মনে ধরল। আর গাফ্‌ফের শ্রেইনার কাঠ কেটে রঙ করে তাদের জন্য এমন একটা বাছুর বানিয়ে দিল যেটার মাথা নাড়ানো যায়। মাথাটা নীচের দিকে নামিয়ে দিলে মনে হয় সেটা ঘাস খাচ্ছে।

পরদিন সকালে রাখাল যখন গোরু চরাতে নিয়ে যাচ্ছে, চাষী তাকে ডেকে বলল, "এই শোন! আমার একটা বাছুর আছে। কিন্তু এতই সেটা ছোট্টো যে, কোলে করে নিয়ে যেতে হবে।"

রাখাল বলল, "ঠিক আছে।" এই-না বলে বাছুরটাকে কোলে করে মাঠে নিয়ে গিয়ে ঘাসের মধ্যে সে নামিয়ে দিল।

বাছুরটা এমনভাবে দাঁড়িয়ে রইল যে দেখে মনে হয় ঘাস খাচ্ছে। তাই দেখে রাখাল বলল, "এটা ঘাস খেতে পারলে হাঁটতেও পারবে।"

সন্ধ্যেয় গোরুর পাল নিয়ে ফেরার সময় বাছুরটাকে সে বলল, "তুই তো সারাদিন ঠায় দাঁড়িয়ে ঘাস খেয়েছিস। এবার নিজের চার-পায়ে বাড়ি ফিরে যা। তোকে কোলে করে নিয়ে যাবার দরকার নেই।"

বাছুরের অপেক্ষায় দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়েছিল চাষী। গ্রামের মধ্যে দিয়ে গোরুর পাল নিয়ে ফিরতে দেখে রাখালকে সে প্রশ্ন করল, বাছুরটা কোথায়।

রাখাল বলল, "তোমার বাছুর বাড়ি না ফিরে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খেতে ব্যস্ত।"

চাষী বলল, "কিন্তু বাছুরটা যে আমার চাই। যেখানে সেটা রয়েছে সেখানে আমাকে নিয়ে চল্।"

তারা দুজন মাঠে গেল। কিন্তু গিয়ে দেখে বাছুরটা চুরি গেছে।

রাখাল বলল, "নিশ্চয়ই সেটা পালিয়ে গেছে।"

চাষী বলল, "তোর কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।" এই-না বলে পাহারাওয়ালার কাছে রাখালকে সে ধরে নিয়ে গেল। পাহারাওয়ালা রাখালকে আদেশ দিল বাছুরের বদলে চাষীকে একটা গোরু খেসারতি দিতে।

গোরু পেয়ে চাষী আর তার বউয়ের আনন্দ ধরে না। কিন্তু ভালো করে খাওয়াতে না পারার দরুন কিছুদিনের মধ্যেই গোরুটাকে কাটতে হল। গোরুর মাংস নুনে জরিয়ে সেটার চামড়া বিক্রি করে একটা বাছুর কেনার জন্য চাষী চলল শহরে। যেতে-যেতে সে দেখে একটা বাতাস-কলে ডানা-ভাঙা একটা দাঁড়কাক বসে। তাকে দেখে চাষীর দয়া হল। সেটাকে তুলে গোরুর চামড়ার মধ্যে নিল জড়িয়ে। কিন্তু তার পর শুরু হয়ে গেল এমন ঝড় জল যে, শহরের দিকে না এগিয়ে মিল-এর মধ্যে গিয়ে চাষী আশ্রয় চাইল।

জাঁতাওয়ালার বউ বাড়িতে ছিল একা। চাষীকে সে বলল, "ঐ খড়ের উপর শুয়ে পড়ো।" তার পর চাষীর জন্য নিয়ে এল রুটি আর পনীর।

খাওয়া-দাওয়া সেরে চামড়াটা পাশে রেখে চাষী শুয়ে পড়ল। জাঁতাওয়ালার বউ ভাবল, 'লোকটা বেজায় ক্লান্ত। এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়বে।'

এমন সময় পুরুতমশাই এল দেখা করতে। তাঁকে দেখে জাঁতা-

ওয়ালার বউ বলল, "আমার স্বামী বাড়ি নেই। আসুন আমরা ভোজে বসি।"

'ভোজ' কথাটা শুনে চাষী কান খাড়া করে রইল। মনে-মনে ভাবল, তাকে শুধু রুটি আর পনীর খেতে দেওয়া অন্যায় হয়েছে।

মাংসের রোস্ট, স্যালাড্, কেক আর আঙুর-রস দিয়ে টেবিল সাজালো জাঁতাওয়ালার বউ। আর তার পর যেই-না তারা দুজন খেতে বসতে যাবে অমনি দরজায় পড়ল টোকা। টোকা শুনে জাঁতাওয়ালার বউ আঁতকে চেঁচিয়ে উঠল, "কী সর্বনাশ! আমার বর ফিরেছে!" এই-না বলে তাড়াহুড়ো করে কয়লা রাখার জায়গায় মাংসের রোস্ট, বালিসের তলায় আঙুর-রস, বিছানার মধ্যে স্যাল্যাড্, খাটের নীচে কেক আর বারান্দায় কাপড়ের আলমারির মধ্যে পুরুতমশাইকে সে লুকিয়ে ফেলল। তার বর বাড়ির ভিতর এসে বলল—বাইরে খুব দুর্যোগ, আবার বন্যা আসছে। তার বউ বলল, "ভগবানের খুব দয়া—নিরাপদে বাড়ি ফিরেছ।"

জাঁতাওয়ালা তখন খড়ের গাদায় চাষীকে শুয়ে থাকতে দেখে প্রশ্ন করল, "ও-লোকটা কে?"

তার বউ বলল, "ও একটা গরিব ভবঘুরে। জল-ঝড়ের জন্যে আশ্রয় চেয়েছিল। তাই ওকে আমি রুটি আর পনীর খেতে দিয়ে বলেছি ঐখানে শুতে।"

তার বর বলল, "আমার আপত্তি নেই। আমাকে চট্‌পট্ কিছু খেতে দাও।"

তার বউ বলল, "রুটি আর পনীর ছাড়া আর কোনো খাবার নেই।"

জাঁতাওয়ালা বলল, "যা হোক কিছু হলেই চলবে। কিন্তু চট্‌পট্ দাও।" তার পর চাষীর দিকে তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, "ওহে, আমাদের সঙ্গে খেতে এসো।"

চাষীকে দুবার বলতে হল না। দাঁড়িয়ে উঠে সে গেল খাবার টেবিলের সামনে।

যে-চামড়ায় দাঁড়কাক জড়ানো ছিল সেটা দেখিয়ে সেই জাঁতাওয়ালা প্রশ্ন করল, "ওটায় কী আছে?"

চাষী বলল, "ওর মধ্যে একজন ভবিষ্যদ্বক্তা আছে।"

জাঁতাওয়ালা প্রশ্ন করল, "আমার ভবিষ্যৎ সে কি বলতে পারবে?"

চাষী বলল, "নিশ্চয়ই, কেন পারবে না? কিন্তু সে চারটে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। পঞ্চমটা বলে না।"

জাঁতাওয়ালার কৌতূহল বেড়ে উঠল। সে বলল, "ওকে ভবিষ্যদ্বাণী করতে বল।"

চাষী তখন দাঁড়কাকের মাথায় টোকা দিতে সেটা ডেকে উঠল, "কা-কা।"

জাঁতাওয়ালা প্রশ্ন করল, "কী বলছে?"

"প্রথমত, ও বলছে বালিশের তলায় আঙুর-রস আছে।"

"তার মানে, উঁকি মেরে দেখো," জাঁতাওয়ালা বলল। তার পর গিয়ে বার করল আঙুর-রস।

"আবার ওকে বলতে বল," অনুরোধ করল জাঁতাওয়ালা।

চাষী দাঁড়কাকের মাথায় টোকা দিতে আবার সেটা ডেকে উঠল। চাষী বলল, "দ্বিতীয়ত, ও বলছে কয়লা রাখার জায়গায় আছে মাংসর রোস্ট।"

"তার মানে, উঁকি মেরে দেখো," চেঁচিয়ে উঠল জাঁতাওয়ালা। তার পর গিয়ে বার করল মাংসর রোস্ট।

দাঁড়কাকের মাথায় তৃতীয়বার টোকা দিতে সেটা ডেকে উঠল। চাষী বলল, "তৃতীয়ত, ও বলছে বিছানার মধ্যে আছে স্যালাড্।"

"তার মানে, উঁকি মেরে দেখো।" এই-না বলে সে গিয়ে বার করল স্যালাড্।

দাঁড়কাকের মাথায় চতুর্থবার টোকা দিতে সেটা ডেকে উঠল। চাষী বলল. "চতুর্থত, ও বলছে খাটের নীচে আছে কেক।"

"তার মানে উঁকি মেরে দেখো।" এই-না বলে খাটের তলায় তাকিয়ে জাঁতাওয়ালা বার করল কেক।

তার পর তারা দুজন গিয়ে বসল খাবার ভর্তি টেবিলের সামনে। কিন্তু জাঁতাওয়ালার বউ ভীষণ ভয় পেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল আর শুয়ে-শুয়েই লাগল খেতে। তার পর দাঁড়কাকের পঞ্চম ভবিষ্যদ্বাণী জাঁতাওয়ালা শুনতে চাইলে চাষী বলল, "যে-চারটে জিনিস পাওয়া গেছে আগে সেগুলো খেয়ে নেওয়া যাক। পঞ্চমটা এগুলোর মতো ভালো নয়।"

পেট ভরে তারা খাওয়া-দাওয়া করল। তার পর স্থির হল ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য চাষীকে জাঁতাওয়ালা দেবে তিনশো মোহর।

দাঁড়কাকের মাথায় পঞ্চমবার টোকা দিতে সেটা ডেকে উঠল। চাষী বলল, "ও এখন বলছে বারান্দায় শয়তান লুকিয়ে আছে কাপড়ের আলমারিতে।"

জাঁতাওয়ালা বলল, "তা হলে শয়তানকে তাড়ানো দরকার।"

আলমারির চাবি দিতে বাধ্য হল জাঁতাওয়ালার বউ আর চাষী গিয়ে সেটা খুলতে পড়ি-মরি করে দৌড় দিলেন পুরুতমশাই।

জাঁতাওয়ালা বলল, "কালো শয়তানটাকে স্পষ্ট আমি দেখেছি।"

পরদিন ভোরের আলো ফুটতে-না-ফুটতেই সেই তিনশো মোহর নিয়ে চলে গেল চাষী।

কিছুদিন বাদে সেই চাষী, এক সময় যে ছিল খুব গরিব—সে বানালো সুন্দর একটা বাড়ি। সেটা দেখে গ্রামের লোকেরা ঠাট্টা করে বলাবলি করতে লাগল, "এমন দেশে ও নিশ্চয় গিয়েছিল যেখানে তুষারের বদলে ঝরে মোহর। আর লোকে বস্তা বোঝাই করে সেই মোহর নিয়ে যায়।" তাই চাষীকে হাজির করা হল পাহারাওয়ালার কাছে। পাহারাওয়ালা জানতে চাইল কোথা থেকে অত মোহর সে পেয়েছে।

চাষী বলল, "তিনশো মোহরে আমার গোরুর চামড়াটা বিক্রি করেছি।"

তার কথা শুনে গ্রামের লোকেরা ছুটে নিজেদের বাড়ি গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলল তাদের গোরুগুলো আর গোরুর চামড়া নিয়ে শহরে ছুটল মোটারকম দাঁও মারতে। সবাইকার আগে পাহারাওয়ালা পাঠাল তার ঝিকে, যাতে শহরে সে প্রথম পৌঁছয়।

চামড়ার ব্যবসাদার একটা গোরুর চামড়ার জন্য পাহারাওয়ালার ঝিকে দিল তিনটে মোহর। তার পর অন্যরা যখন চামড়া নিয়ে হাজির তাদের দিল আরো কম দাম। বলল, "গোরুর এত চামড়া নিয়ে কী করব?"

গ্রামের লোকেরা এবার ক্ষুদে চাষীর উপর ভীষণ চটে গেল। সে যে তাদের ধাপ্পা দিয়েছে তাতে কারুর সন্দেহ রইল না। তারা স্থির করল উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবে আর তাকে পাহারাওয়ালার সামনে

হাজির করে এই ধাপ্পার জবাবদিহি চাইবে। বিচারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল সেই নির্দোষ চাষীকে এমন একটা পিপেয় ভরে নদীতে গড়িয়ে ফেলা হবে যেটার তলা নেই। তাই তাকে ভগবানের নাম শোনাবার জন্য ডেকে পাঠানো হল এক যাজককে। সেই যাজক আর চাষীকে একসঙ্গে রেখে সবাই দূরে সরে গেল। যাজক কাছে আসতে চাষী চিনল—ইনিই সেই পুরুতমশাই, জাঁতাওয়ালার বউয়ের যিনি অতিথি হয়েছিলেন।

চাষী তাঁকে বলল, "কাপড়ের আলমারি থেকে আপনাকে পালাতে আমি সাহায্য করেছিলাম। আপনি এখন পিপে থেকে পালাতে আমায় সাহায্য করুন।"

ঠিক তখনি ভেড়ার পাল নিয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক রাখাল। পাহারাওয়ালা হবার তার বহুকালের ইচ্ছে।

"না-না, কখনো আমি রাজি হব না! কক্ষনো না, কক্ষনো না," বলে সেই ক্ষুদে চাষী প্রাণপণ জোরে চেঁচিয়ে উঠল।

তার চীৎকার শুনে কাছে গিয়ে রাখাল প্রশ্ন করল, "কিসে তুমি কক্ষনো রাজি হবে না?"

চাষী বলল, "ওরা বলছে এই পিপেয় বসলে আমাকে পাহারাওয়ালা করে দেবে। আমি বলছি এতে বসতে কক্ষনো রাজি হব না।"

রাখাল চেঁচিয়ে উঠল, "তাই নাকি! পাহারাওয়ালা হতে হলে শুধু এটাই দরকার? খুশি হয়েই পিপের মধ্যে বসছি।"

চাষী বলল, "বোসো, বসলেই পাহারাওয়ালা হয়ে যাবে।"

খুশি হয়ে পিপের মধ্যে বসল রাখাল আর সঙ্গে সঙ্গে সেটার ঢাকনা বন্ধ করে দিল ক্ষুদে চাষী। তার পর রাখালের ভেড়ার পাল নিয়ে গেল চলে।

পুরুতমশাই তখন গ্রামের লোকদের কাছে গিয়ে বললেন—ভগবানের নাম চাষীকে তিনি শুনিয়েছেন। তাঁর কথা শুনে গ্রামের লোকেরা ছুটে এল পিপেটাকে গড়িয়ে জলের মধ্যে ফেলতে।

পিপেটা গড়াতে শুরু করলে রাখাল চেঁচিয়ে উঠল, "আমি খুব খুশি; পাহারাওয়ালা হচ্ছি।"

তারা ভাবল ক্ষুদে চাষী বুঝি চেঁচাচ্ছে। তাই তারা বলল, "কিন্তু তার আগে নদীর তলাটা তালিয়ে দেখো গে।" এই-না বলে পিপেটা তারা গড়িয়ে ফেলল জলের মধ্যে।

তার পর গ্রামের লোকেরা ফিরে চলল যে যার বাড়িতে। আর যেতে-যেতে তারা দেখে সেই গরিব ক্ষুদে চাষী এমন শান্তভাবে এক পাল ভেড়া চরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—যেন কিছুই ঘটে নি।

ভীষণ অবাক হয়ে তারা চেঁচিয়ে উঠল, "ক্ষুদে চাষী, কোথা থেকে আসছ? জল থেকে বেরিয়ে এলে?"

চাষী বলল, "ঠিক ধরেছ! ডুবতে-ডুবতে নদীর একেবারে তলায় পৌঁছই। তার পর পিপে থেকে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে দেখি জলের নীচে সুন্দর-সুন্দর মাঠ আর সেখানে চরে বেড়াচ্ছে পাল-পাল ভেড়া। সেখান থেকে এক পাল ভেড়া নিয়ে তাই ফিরে এলাম।"

সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের লোকেরা প্রশ্ন করল, "সেখানে আরো ভেড়া আছে?"

ক্ষুদে চাষী বলল, "আছে বৈকি! যত চাও তত—গোণা-গুনতি নেই।"

তাই-না শুনে গ্রামের লোকেরা দল বেঁধে ছুটল ভেড়া আনতে। কিন্তু পাহারাওয়ালা বলল, "আমি যাব প্রথম।"

নদীর তীরে তারা যখন পৌঁছল তখন নীল আকাশ জুড়ে ভেড়ার পালের মতো ছেঁড়া-ছেঁড়া হালকা-হালকা সাদা-সাদা মেঘ। সেই মেঘগুলোর ছায়া পড়েছিল জলে।

সেই ছায়া দেখে গ্রামের লোকেরা চেঁচিয়ে উঠল, "ঐ যে! ভেড়াগুলোকে এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে!"

পাহারাওয়ালা তাদের ঠেলে এগিয়ে গিয়ে বলল, "নদীর তলায় আগে যাব আমি। সেখানে সব-কিছু ঠিকঠাক আছে দেখলে তোমাদের ডাকব।"

এই-না বলে ঝপাং করে নদীতে দিল ঝাঁপ। সেই শব্দটা শুনে গ্রামের লোকদের মনে হল পাহারাওয়ালা বলছে, "চলে এসো।"

সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সবাই নদীতে দিল ঝাঁপ।

সেই গ্রামে এখন আর কেউ নেই।

এইভাবে গরিব ক্ষুদে চাষী হয়ে উঠল ধনী।

সোনার হাঁস

এক সময় এক লোকের ছিল তিন ছেলে। ছোটোটিকে লোকে বলত ভ্যাবলা। অন্য দুই ভাই সব সময় তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত, দুচক্ষে দেখতে পারত না। একবার বড়ো ভাই বলল, বনে যাবে কাঠ কাটতে। তার মা তার সঙ্গে দিল এক বোতল আঙুর-রস আর একটা কেক।

বনে পৌঁছে তার সঙ্গে দেখা এক পাকা চুল ছোট্টোখাট্টো বুড়োর। বুড়ো বলল, "তোমার ঝুলি থেকে এক টুকরো কেক আর একটু আঙুর-রস খেতে দাও। আমার খুব ক্ষিদে আর তেষ্টা পেয়েছে।"

চালাক বড়ো ছেলে বলল, "আমি না খেয়ে তোমায় দিতে যাব কেন? ভাগো এখান থেকে।" এই-না বলে বুড়ো লোকটিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে সে চলে গেল। কিন্তু গাছ কাটতে গিয়ে ভুল করে গাছের ডালে না পড়ে, কুড়লের কোপ গিয়ে পড়ল তার হাতে। তাই বাড়ি ফিরে হাতটা তাকে বাঁধতে হল।

তার পর মেজো ছেলে গেল বনে। তাকেও তার মা দিল একটা কেক আর এক বোতল আঙুর-রস। তার সঙ্গেও দেখা সেই পাকা-চুল ছোট্টোখাট্টো বুড়ো মানুষটির। তার কাছেও সে চাইল এক টুকরো কেক আর এক চুমুক আঙুর-রস। মেজো ছেলেও তাকে হাঁকিয়ে দিয়ে বলল, "তোমার জন্যে কেন আমি উপোস করে থাকতে যাব?" বুড়ো লোকটি হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তার পাশ দিয়ে সে চলে গেল। ফলে সেও পেল সাজা। গাছের ডালে না

পড়ে, কুড়ুলের কোপ গিয়ে পড়ল তার পায়ে। ফলে ধরাধরি করে তাকে নিয়ে যেতে হল বাড়িতে।

তখন সেই ভ্যাবলা ছোটো ছেলে বলল, "বাবা, আমি বনে গিয়ে কাঠ কেটে আনব।"

তার বাবা বলল, "কাঠ কাটতে গিয়ে তোর ভাইরা কী রকম জখম হয়ে ফিরেছে, দেখছিস তো? কাঠ কাটার তুই কিছুই জানিস না। তাই তোর গিয়ে কাজ নেই।"

কিন্তু নাছোড়বান্দার মতো ভ্যাবলা ধরে পড়ায় শেষটায় তার বাবা রাজি হয়ে বলল, "আচ্ছা, যা তা হলে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে চালাক হতে শেখ।"

তার মা তাকে দিল খুব বাজে একটা কেক আর আঙুর-রসের বদলে হাকুচ-তেতো বিয়ার্।

বনে যেতে তার সঙ্গে দেখা হল সেই পাকা-চুল ছোট্টোখাট্টো বুড়ো লোকটির সঙ্গে। সে বলল, "তোমার এক টুকরো কেক আর এক চুমুক আঙুর-রস আমায় দাও।"

ভ্যাবলা ছেলেটি বলল, "আমার পাশে বোসো। আমার কেকটা নেহাতই বাজে। ছাইয়ের আঁচে বানানো। আর আঙুর-রসের বদলে আছে হাকুচ-তেতো বিয়ার্। এসো, সেগুলোই আমরা ভাগাভাগি করে খাই।"

তারা বসল। আর ভ্যাবলা ছেলে যেই-না তার ছাইয়ের আঁচে তৈরি কেক বার করেছে অমনি সেটা হয়ে গেল ডিমের তৈরি সুন্দর কেক আর হাকুচ তেতো বিয়ার্ হয়ে গেল মিষ্টি আঙুর-রস।

খাওয়া-দাওয়ার পর ছোট্টো মানুষটি বলল, "তোমার অন্তঃকরণ খুব ভালো। আমার সঙ্গে তুমি খাবার ভাগাভাগি করে খেয়েছ। তাই তোমার একটা উপকার করব। কাছেই একটা বুড়ো গাছ আছে। সেটাকে কাটো। সেটার গুঁড়ির মধ্যে একটা খুব ভালো জিনিস পাবে।"

ভ্যাবলা ছেলেটি গিয়ে গাছটা কাটল। আর সেটা পড়তেই একটা হাঁস উড়ে বেরিয়ে এল। তার পালকগুলো খাঁটি সোনার। হাঁসটা নিয়ে রাত কাটাবার জন্যে সে গেল এক সরাইখানায়। সরাইখানার মালিকের ছিল তিন মেয়ে। সেই আশ্চর্য হাঁসকে দেখে তারা খুব অবাক হল। তাদের খুব লোভ হল হাঁসের একটা সোনার পালক

নেবার। বড়ো মেয়ে ভাবল, 'একটা পালক ছিঁড়ে নেবার সুযোগ নিশ্চয়ই আসবে। আর ভ্যাবলা ছেলে যেই-না পিছন ফিরেছে অমনি সে হাঁসের ডানা চেপে ধরল। কিন্তু ডানা থেকে হাত সরাতে পারল না। কারণ পালকের মধ্যে আটকে গিয়েছিল তার আঙুলগুলো। এক মুহূর্ত পরে একটা পালক নিতে এল মেজো বোন। কিন্তু যেই-না বড়ো বোনকে সে ছুঁয়েছে সঙ্গে সঙ্গে সে-ও গেল আটকে। তার পর এল ছোটো বোন। তাকে দেখে অন্য দু বোন চেঁচিয়ে উঠল, "খবরদার, কাছে আসিস না।" কিন্তু বোনেরা তার কী করছে দেখার জন্য ছুটে এসে তাদের ছুঁতেই সে-ও গেল আটকে। তাই সেই হাঁসের সঙ্গে তিন বোনকেই রাত কাটাতে হল।

পরদিন সকালে হাঁসকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সেই ভ্যাবলা ছেলে। সেই তিন মেয়ে চলল তার পিছন পিছন। তাদের দিকে সে ফিরেও তাকাল না।

ক্ষেতের মাঝখানে দেখা পাদরিমশাইয়ের সঙ্গে। মেয়েদের ঐভাবে যেতে দেখে চটে উঠে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "বেহায়া মেয়ের দল! এই ভাবে ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে এক ছোকরার পেছন পেছন ছুটতে তোদের লজ্জা করছে না?" এই-না বলে ছোটো মেয়ের হাত ধরে তিনি গেলেন টান দিতে। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও গেলেন তাদের সঙ্গে আটকে।

মিনিট কয়েক পরে তাদের সঙ্গে দেখা সেক্সটনের[১]। তিনটি মেয়ের পেছন পেছন পাদরিকে ছুটতে দেখে সে তো হতভম্ব। সে হেঁকে উঠল, "পাদরিমশাই, পাদরিমশাই! এরকম হন্তদন্ত হয়ে চলেছেন কোথায়? ভুলে যাবেন না আজকে একটা নামকরণের অনুষ্ঠান আছে।" তার পর ছুটে গিয়ে পাদরিমশাইয়ের জামার আস্তিন সে চেপে ধরল আর সঙ্গে সঙ্গে গেল তাদের সঙ্গে আটকে।

এইভাবে পাঁচজন যখন চলেছে তখন তাদের সঙ্গে দেখা দুই চাষীর। আঁকশি কাঁধে নিয়ে খড়ের মাঠ থেকে তারা ফিরছিল। পাদরিমশাই চেঁচিয়ে তাদের বললেন, তাঁকে আর সেক্সটনকে ছাড়িয়ে দিতে। কিন্তু সেক্সটনকে ছুঁতে-না-ছুঁতেই তারাও গেল আটকে। এইভাবে ভ্যাবলা ছেলে আর তার হাঁসের পিছন পিছন চলল সাতজনে।

[১] ঘণ্টা বাজানো, কবর খোঁড়া ইত্যাদি কাজের জন্য গির্জার কর্মচারি।

যেতে যেতে তারা পৌঁছল এক শহরে। সেখানে এক রাজা থাকতেন। তাঁর মেয়ে এমনই গম্ভীর প্রকৃতির যে, কেউ কখনো তাকে হাসাতে পারে নি। রাজা তাই ঘোষণা করেছিলেন, যে তাঁর মেয়েকে হাসাতে পারবে তার সঙ্গেই দেবেন মেয়ের বিয়ে।

রাজার ঘোষণার কথা শুনে তার হাঁস আর হাঁসের পেছনে আটকানো সাতজনকে নিয়ে ভ্যাবলা ছেলে গেল রাজকন্যের কাছে। আর সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে রাজকন্যে এমনই হাসতে শুরু করল যে তাকে থামানোই দায়।

ভ্যাবলা ছেলে তখন রাজাকে গিয়ে বলল, রাজকন্যের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে। রাজা কিন্তু নানা ওজর আপত্তি করতে লাগলেন। শেষটায় বললেন, মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবার আগে তাকে এমন একজন লোক নিয়ে আসতে হবে যে একলা তাঁর মাটির তলার ঘরের মদের পিপেগুলো সাবাড় করতে পারে।

সেই পাকা চুল ছোট্টোখাট্টো বুড়ো মানুষটির কথা ভ্যাবলা ছেলের তখন মনে পড়ল। ভাবল সেই বুড়ো হয়তো তাকে সাহায্য করতে পারবে। তাই বনের যেখানে সে গাছটা কেটেছিল সেখানে গেল ফিরে। গিয়ে দেখে ছোট্টো মানুষটি ভারি বিষণ্ণ মুখে সেখানে বসে আছে। ভ্যাবলা ছেলে প্রশ্ন করল তার মন খারাপের কারণ কী?

সে বলল, "আমার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। কিছুতেই তেষ্টা মিটছে না। ঠাণ্ডা জল আমার বরদাস্ত হয় না। এক পিপে মদ শেষ করেছি। কিন্তু আমার যে তেষ্টা তার কাছে এক পিপে মদ তো একটা ফোঁটারও মতো নয়।"

ভ্যাবলা ছেলে বলল, "আমার সঙ্গে এসো। তোমার তেষ্টা মেটাচ্ছি।"

বুড়োকে সে নিয়ে গেল রাজবাড়ির মাটির তলার ঘরে। আর প্রকাণ্ড পিপেগুলোর সামনে নিচু হয়ে বসে ছোট্টোখাট্টো মানুষটি শুরু করল চোঁ-চোঁ করে খেতে। খেতে খেতে মনে হল তার পেট বুঝি ফেটে যাবে। যাই হোক, সন্ধের মধ্যে সব পিপেগুলো শেষ করে ফেলল সেই পাকা-চুল বুড়ো।

আবার ভ্যাবলা ছেলে চাইল রাজকন্যেকে বিয়ে করতে। কিন্তু বোকামির জন্য লোকে তাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করত বলে রাজা তার উপর ছিলেন চটে। তাই তাকে দিলেন আরো কঠিন একটা কাজ।

বললেন, এমন একটা লোককে আনতে, যে রুটির পাহাড় খেয়ে ফেলতে পারে।

খানিক ভেবে ভ্যাবলা ছেলে আবার বনে ফিরে গেল যেখানে গাছটা সে কেটেছিল।

সেখানে গিয়ে দেখে বিষণ্ণ মুখে সেই বুড়ো বসে নিজের পেটে কষে দড়ি জড়াচ্ছে। বুড়ো বলল, "একটা রুটি কারখানার সব রুটি খেয়ে শেষ করেছি। কিন্তু আমার প্রচণ্ড ক্ষিদের কাছে সেটা তো নস্যি। আমার পেট এখন খালি। তাই ক্ষিদের জ্বালায় যাতে মরতে না হয়, তার জন্যে পেটে কষে দড়ি বাঁধছি।"

খুব খুশি হয়ে ভ্যাবলা ছেলে বলল, "উঠে পড়ো। তোমার ক্ষিদে আমি মেটাচ্ছি।" এই-না বলে রাজপ্রাসাদের আঙিনায় তাকে সে নিয়ে গেল। সেখানে রাজত্বের সমস্ত ময়দা জড় করে বানানো হয়েছিল প্রকাণ্ড একটা রুটির পাহাড়।

বনের সেই লোকটি সঙ্গে সঙ্গে খেতে শুরু করে দিল আর সন্ধের মধ্যে অদৃশ্য হল সেই রুটির পাহাড়।

ভ্যাবলা ছেলে তৃতীয়বার চাইল রাজকন্যেকে বিয়ে করতে। কিন্তু সেবারেও রাজা রাজি না হয়ে তাকে দিলেন আরো একটা শক্ত কাজ।

রাজা বললেন, "এমন একটা জাহাজ আনতে, যেটা সমুদ্রে আর ডাঙায় চলতে পারে। বললেন, "সেই জাহাজে চড়ে এসো। তা হলেই আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব।"

সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাবলা ছেলে আবার গেল বনে। আবার তার সঙ্গে দেখা হল সেই পাকা-চুল ছোট্টোখাট্টো মানুষটির। সে বলল, "তোমার জন্যে আমি পিপে-পিপে মদ গিলেছি আর রুটির পাহাড় শেষ করেছি। এবার তোমাকে সানন্দেই দেবো সেই আশ্চর্য জাহাজটা। তোমার জন্যে এ-সব যে করছি তার কারণ আমার সঙ্গে তুমি সদয় ব্যবহার করেছিলে।"

এই-না বলে সেই বুড়ো তাকে এমন একটা জাহাজ দিল যেটা জলে আর স্থলে চলতে পারে। সেটা দেখে রাজা আর কোনো ওজর-আপত্তি করতে পারলেন না।

খুব ধুমধাম করে তাদের বিয়ে হয়ে গেল আর রাজার মৃত্যুর পর সেই ভ্যাবলা ছেলেই হল রাজা।



সিন্‌ডারেলা

এক বড়োলোকের বউ একদিন হঠাৎ অসুখে পড়ল। সে বুঝল তার দিন ঘনিয়ে এসেছে। তাই তার একমাত্র ছোট্রো মেয়েটিকে নিজের বিছানার পাশে ডেকে বলল, "বাছা। সর্বদা ভালো হয়ে থাকিস, ধর্মে মতি রাখিস। তা হলে ভগবান তোর মঙ্গল করবেন। স্বর্গ থেকে তোর ওপর নজর রাখব।" এই বলে চিরকালের মতো সে চোখ বুজল।

মেয়েটি তার মায়ের কবরের কাছে প্রতিদিন যায় আর কাঁদে আর ধর্মে মতি রেখে ভালো হয়ে থাকে। শীত এল। তুষারে ঢেকে গেল তার মায়ের কবর। কিন্তু বসন্তের রোদে তুষার গলবার আগেই সেই বড়োলোক আবার বিয়ে করল।

এই নতুন বউয়ের ছিল দুই মেয়ে। তারাও এল তাদের মায়ের সঙ্গে থাকতে। চেহারা তাদের সুন্দর কিন্তু হৃদয় জঘন্য শয়তানীতে ভরা। বেচারা সৎমেয়েটির সময় খুব খারাপ কাটতে লাগল। তারা বলল, "এই বোকাটা আমাদের সঙ্গে বৈঠকখানায় বসতে পাবে না। রুটি যে খাবে তাকে সেটা রোজগার করতে হবে। মেয়েটা রান্নাঘরের দাসীর কাজ করুক। তার ভালো-ভালো পোশাক কেড়ে নিয়ে তাকে দিল একটা

পুরনো ছাই-রঙা সায়া আর কাঠের জুতো। তারা বলল, "দেমাকী রাজকন্যেকে একবার দেখো—কী সুন্দর তাকে দেখাচ্ছে!" মুখ ভেংচে নানারকম ঠাট্টা-তামাশা করে তারা তাকে পাঠিয়ে দিল রান্নাঘরের কাজে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সেখানে তাকে খাটতে হয় হাড়ভাঙা খাটুনি। কুয়ো থেকে জল সে তোলে, উনুন ধরায়, রাঁধে আর বাসন মাজে। তা ছাড়া সেই দুই বোনের অকথ্য আরো নানা অপমান তো আছেই। মটর-মসুরদানা ছাইগাদায় তারা ছড়ায় যাতে সেগুলো বেছে-বেছে তাকে তুলতে হয় আর রাতে যখন সে বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তাকে তারা শোবার কোনো বিছানা দেয় না। তাকে শুতে হয় উনুনের পাশের ছাইগাদায়। সব সময় তার গায়ে ছাই লেগে থাকে। সব সময় তাকে দেখায় খুব নোংরা। তাই তাকে তারা ডাকে সিন্‌ডারেলা[১] বলে।

একদিন ঘোড়ায় চেপে তাদের বাবা শহরে গেল গির্জায় উপাসনা করতে। যাবার আগে তার দুই সৎমেয়েকে জিগ্‌গেস করল কী তাদের জন্য সে নিয়ে আসবে।

একজন বলল, "খুব সুন্দর একটা পোশাক।" অন্যজন বলল, "মুক্তো আর চুনি।"

তার বাবা প্রশ্ন করল, "সিন্‌ডারেলা, তোর কী চাই?"

"বাড়ি ফেরার সময় প্রথম যে হেজেলগাছের ডালে ফুল ফুটেছে দেখবে সেই ডালটা আমার জন্যে এনো।

সেই বড়োলোক বাবা তার সৎমেয়েদের জন্যে কিনল ভালো-ভালো পোশাক আর মুক্তো-চুনি-পান্না। আর ফেরার সময় একটা ফুলে ভরা হেজেল-ডাল তার টুপিতে লাগতে সেটা ভেঙে সে নিয়ে এল। বাড়িতে সৎমেয়েদের উপহারগুলো দিয়ে সিন্‌ডারেলাকে সে দিল হেজেলগাছের সেই ডালটা।

বাবাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেই ডালটা নিয়ে সিন্‌ডারেলা গেল তার মার কবরের কাছে। ডালটা সেখানে পুঁতে অঝোরে সে কাঁদতে লাগল। টপ্ টপ্ করে তার চোখের জল পড়ল সেই ডালে। কিছুদিনের মধ্যেই সেই ডালটা হয়ে উঠল চমৎকার একটা গাছ। প্রতিদিন তিন-বার

[১] ইংরাজিতে cinder মানে আঁঙার বা পোড়া কাঠ।

করে সিন্ডারেলা যায় তার মার কবরের কাছে আর গাছটার তলায় থাকে বসে। সে বসে থাকে আর কাঁদে আর প্রার্থনা করে। সেই গাছের ডালে বসে থাকে সাদা ছোট্টো একটা পাখি আর সিন্ডারেলা কোনো জিনিসের জন্য প্রার্থনা করলে সেটা সে মনে করে রাখে।

সেবার হল কি—রাজা আয়োজন করলেন, বিরাট এক ভোজ-সভার। দেশের সব চেয়ে সুন্দরী মেয়েদের সেখানে নিমন্ত্রণ করা হল যাতে তাদের মধ্যে থেকে রাজপুত্তুর তার বউ পছন্দ করতে পারে। সেই ভোজসভায় উপস্থিত থাকতে হবে শুনে দুই সৎবোন আবেগ-উত্তেজনায় ফেটে পড়ল। সিন্ডারেলাকে তারা আদেশ দিল তাদের চুল বাঁধতে, জুতো পরাতে আর বগলস্‌গুলো চকচকে করে পালিশ করতে। বলল, "এগুলো ভালো করে কর—কারণ আমরা চলেছি রাজপ্রাসাদে বল্‌-নাচের সভায়।"

সিন্ডারেলা তাদের হুকুম মতো কাজগুলো করে দিল। তার পর লাগল কাঁদতে। কারণ তারও খুব ইচ্ছে করছিল রাজপ্রাসাদের সেই বল্‌-নাচের সভায় যাবার। শেষটায় সৎমার কাছে গিয়ে সে বলল তাকে নিয়ে যেতে।

সবাই হৈহৈ করে বলে উঠল, "বলছিস কি সিন্ডারেলা! তুই যাবি রাজবাড়ির বল্‌-নাচের আসরে—তোর মতো ময়লা নোংরা ছেঁড়া পোশাক পরা মেয়ে? নাচের আসরে, ভাব একবার ওর কথা! তোর না আছে বল্‌-নাচের পোশাক, না আছে নাচবার জুতো।"

কিন্তু তাকে নিয়ে যাবার জন্য সে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। শেষটায় তাদের একজন বলল, "ছাইগাদায় এক বাটি মসুরদানা আমি ফেলেছি। দু ঘণ্টার মধ্যে সেগুলো বেছে তুলতে পারলে তোকে নিয়ে যাওয়া হবে।"

মেয়েটি খিড়কি-দরজা দিয়ে বাগানে বেরিয়ে বলল:

"পোষা পায়রা, ঘুঘু আর ছোট্টো পাখির দল, আমাকে মসুরদানাগুলো বাছতে সাহায্য কর:

ভালোটা যাবে বিস্কুট-টিনে
মন্দগুলো ডাস্টবিনে।"

তার ডাক শুনে রান্নাঘরের জানলায় নামল দুটো সাদা পায়রা, তার পর দুটো ঘুঘু আর তার পর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির দল। ছাইগাদায়

নেমে তারা ডানা ঝাপটাতে লাগল। প্রথমে মাথা নাড়িয়ে কুট্-কুট্-কুট্ করে পায়রাগুলো মসুরদানা বাছতে শুরু করল আর তার পর অন্য সব পাখিগুলোও শুরু করে দিল কুট্-কুট্-কুট্ করে বাছতে। এক ঘণ্টার মধ্যে সব ভালো মসুরদানাগুলো বেছে-বেছে টিনে ফেলে তারা উড়ে গেল।

সিন্ডারেলা তখন মসুরদানার বাটিটা মনের আনন্দে নিয়ে গেল তার সৎমার কাছে। কারণ সে ভেবেছিল এবার নিশ্চয়ই নাচের আসরে তাকে তারা নিয়ে যাবে।

কিন্তু তার সৎমা বলল, "না সিন্ডারেলা। তোর পোশাক নেই আর তা ছাড়া তুই নাচতেও পারিস না। তোকে দেখে সবাই হাসবে।"

কিন্তু সিন্ডারেলা আবার কাঁদতে শুরু করলে তার সৎমা বলল, ছাইগাদা থেকে দু বাটি মসুরদানা বাছতে পারলে তোকে নিয়ে যাব।" মনে-মনে সৎমা ভাবল, 'এটা করা ওর পক্ষে একেবারে অসম্ভব।'

ছাইগাদায় দু বাটি মসুরদানা ফেলার পর মেয়েটি আবার বাগানে গিয়ে বলল, "পোষা পায়রা, ঘুঘু আর ছোট্টো পাখির দল, আমাকে মসুর-দানাগুলো বাছতে সাহায্য কর :

ভালোটা যাবে বিস্কুট-টিনে
মন্দগুলো ডাস্টবিনে।"

তার ডাক শুনে রান্নাঘরের জানলায় নামল দুটো সাদা পায়রা, তার পর দুটো ঘুঘু আর তার পর ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখির দল। ছাইগাদায় নেমে তারা ডানা ঝাপটাতে লাগল। প্রথমে মাথা নাড়িয়ে কুট্-কুট্-কুট্ করে পায়রাগুলো মসুরদানা বাছতে শুরু করল আর তার পর অন্য সব পাখিগুলোও শুরু করে দিল কুট্-কুট্-কুট্ করে বাছতে। আধ ঘণ্টার মধ্যে সেই দুটো বাটি ভরে গেল। এক মুখ হেসে বাটি দুটো সৎমার কাছে নিয়ে গেল সিন্ডারেলা। কারণ তার ধারণা এবার নিশ্চয়ই তাকে নিয়ে যাওয়া হবে।

কিন্তু সৎমা বলল, "না না—আমাদের সঙ্গে কী করে যাবি? তোর পোশাক নেই, তা ছাড়া তুই তো নাচতেও পারিস না। তোকে নিয়ে গেলে লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হবে।" এই-না বলে তার দুই দাম্ভিক মেয়েকে নিয়ে সে চলে গেল।

বাড়ি খালি হয়ে যেতে সিন্ডারেলা গেল তার মায়ের কবরের কাছে। তার পর সেই হেজেলগাছের নীচে বসে বলল :



"ছোট্টো গাছ, ঝরাও-ঝরাও,
সোনালী-রুপোলী পোশাক পরাও।"

তাই শুনে সেই সাদা পাখিটা উপর থেকে ফেলে দিল সোনা আর রুপোর কাজ-করা পোশাক আর সিল্কের উপর রুপোলী নক্‌শার এক জোড়া চটি জুতো।

চট্‌পট্‌ সেগুলো পরে নিয়ে সিন্‌ডারেলা হাজির হল রাজপ্রাসাদের নাচের আসরে। তার সৎমা আর বোনেরা তাকে চিনতেই পারল না। ভাবল বিদেশের বুঝি কোনো রাজকন্যে—সোনালী পোশাকে এমনই তাকে চোখ-ধাঁধানো সুন্দর দেখাচ্ছিল। সে যে সিন্‌ডারেলা—সে কথা এরা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। তাদের ধারণা সিন্‌ডারেলা তখন বাড়িতে কালিঝুলি মেখে মসুরদানা বাছছে।

রাজপুত্তুর তার কাছে গিয়ে তার হাত ধরল। তার পর শুরু করল তার সঙ্গে নাচতে। অন্য কারুর সঙ্গেই সে নাচতে চাইল না। সিন্‌ডারেলার সঙ্গে যে-ই নাচতে আসে তাকেই সে বলে দেয়, "এ আমার নাচের সঙ্গিনী।"

রাজপুত্তুরের সঙ্গে মাঝরাত পর্যন্ত সিন্‌ডারেলা নাচল তার পর বলল বাড়ি ফিরবে।

রাজপুত্তুর বলল, "তোমার সঙ্গে তোমার বাড়ির দোরগোড়া পর্যন্ত যাব।" তার পর জানতে চাইল কোথায় এই সুন্দরী মেয়েটি থাকে। সিন্‌ডারেলা কিন্তু পায়রা-ঘরের মধ্যে লাফিয়ে ঢুকে রাজপুত্তুরকে এড়িয়ে গেল। বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে চলল রাজপুত্তুর। সিন্‌ডারেলার বাবা ফিরতে তাকে সে বলল সেই অচেনা মেয়েটি পায়রা-ঘরের মধ্যে লাফিয়ে ঢুকেছে।

বুড়ো বাপ ভাবল, 'সেই অচেনা সুন্দরী সিন্‌ডারেলা নাকি?' তার পর কুড়ুল এনে পায়রা-ঘরটা টুকরো-টুকরো করে ফেলা হল। কিন্তু দেখা গেল ভিতরে কেউ নেই। বাড়ির ভিতরে গিয়ে তারা দেখে নোংরা পোশাক পরে সিন্‌ডারেলা বসে আছে ছাইগাদার মধ্যে আর চিমনির এক কোণে টিম্‌টিম্‌ করছে মাত্র একটি তেল-বাতি। কারণ পায়রা-ঘরের পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে তার মায়ের কবরের পাশে সেই হেজেলগাছের কাছে সিন্‌ডারেলা ছুটে গিয়ে তার সুন্দর পোশাক বদলে পুরনো ছাই-রঙা সায়াটা আর কাঠের জুতো-জোড়া

পরে রান্নাঘরে ফিরে আসে। পাখিটা নিয়ে যায় তার সেই সুন্দর পোশাকটা।

পরদিন সেই নাচ-গান-ভোজের উৎসবে তার বাবা, সৎমা আর সৎবোনেরা চলে গেলে সিন্‌ডারেলা আবার তার মায়ের কবরের পাশে সেই হেজেলগাছের কাছে গিয়ে বলল :

"ছোট্টো গাছ, ঝরাও-ঝরাও,
সোনালী-রুপোলী পোশাক পরাও।"

এবার পাখিটা ঝুপ্ করে ফেলে দিল আগের চেয়েও জমকালো পোশাক। উৎসব-সভায় সিন্‌ডারেলা পৌঁছলে তার রূপ দেখে সবাই দারুণ অবাক হয়ে ভাবতে লাগল—মেয়েটি কে ?

রাজপুত্তুর তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। সে আসতে সঙ্গে সঙ্গে কাছে গিয়ে রাজপুত্তুর তার হাত ধরল। অন্য কারুর সঙ্গে সে নাচল না। সিন্‌ডারেলার সঙ্গে যে-ই নাচতে আসে তাকেই বলে দেয়, "এ আমার নাচের সঙ্গিনী।"

মাঝরাতে সিন্‌ডারেলা বলল, বাড়ি ফিরবে। রাজপুত্তুর গেল তার পিছন পিছন। কারণ সে দেখতে চেয়েছিল কোন বাড়িতে সিন্‌ডারেলা থাকে। কিন্তু বাড়ির পিছনকার বাগানে সিন্‌ডারেলা দৌড়ে পালিয়ে গেল। সেখানে ছিল ভারি সুন্দর লম্বা একটা গাছ। তাতে ঝুলছিল অনেক রসালো নাশপাতি। কাঠবিল্লির মতো তরতর করে সেটায় উঠে, ডালপালার মধ্যে সিন্‌ডারেলা লুকিয়ে পড়ল। রাজপুত্তুর বুঝতে পারল না কোথায় গেল।

সিন্‌ডারেলার বাবা ফিরতে তাকে সে বলল, "অচেনা মেয়েটি আমার কাছ থেকে দৌড়ে পালিয়েছে। মনে হয় সে লুকিয়ে রয়েছে নাশপাতি গাছটার মধ্যে।"

বুড়ো বাপ ভাবল, 'সেই অচেনা সুন্দরী সিন্‌ডারেলা নাকি ?' তার-পর কুড়ুল এনে গাছটা কাটা হল। কিন্তু দেখা গেল সেখানে কেউ নেই। রান্নাঘরে গিয়ে তারা দেখে নোংরা ছেঁড়া পোশাক পরে সিন্‌ডারেলা বসে আছে ছাইগাদার মধ্যে। কারণ নাশপাতি গাছটার পিছন থেকে লাফিয়ে নেমে তার মায়ের কবরের পাশে ছুটে গিয়ে পাখিটাকে সিন্‌ডারেলা তার সুন্দর পোশাকটা দিয়ে দেয় তার পর সেই ছাই-রঙা সায়া পরে ফিরে আসে।

তৃতীয় দিন সেই নাচ-গান-ভোজের উৎসবে তার বাবা, সৎমা আর সৎবোনেরা চলে গেলে সিন্ডারেলা আবার তার মায়ের কবরের পাশে সেই হেজেলগাছের কাছে গিয়ে বলল :

"ছোট্টো গাছ, ঝরাও-ঝরাও,
সোনালী-রুপোলী পোশাক পরাও।"

সঙ্গে সঙ্গে পাখিটা ঝুপ্ করে ফেলে দিল এমন সুন্দর জমকালো পোশাক যেটার তুলনা নেই। এবারকার চটি-জোড়াটাও খাঁটি সোনার। বল্-নাচের আসরের অতিথিরা দেখে দেখে একেবারে মুগ্ধ।

সারা সন্ধে রাজপুত্তুর শুধু তার সঙ্গে নাচল। সিন্ডারেলার সঙ্গে যে-ই নাচতে আসে তাকেই সে বলে দেয়, "এ আমার নাচের সঙ্গিনী।"

রাত বাড়লে সিন্ডারেলা বলল সে বাড়ি ফিরবে। রাজপুত্তুর বলল সঙ্গে গিয়ে পেঁছি দিয়ে আসবে। কিন্তু এমন চট্পট্ সে পালাল যে রাজপুত্তুর তার পিছু নিতে পারল না।

এবার কিন্তু রাজপুত্তুর একটা ফন্দি এঁটেছিল—গোটা সিঁড়িতে মাখিয়ে রেখেছিল আটা। তাই সিন্ডারেলা দৌড়ে পালাবার সময় তার একপাটি চটি সেখানে গেল আটকে। রাজপুত্তুর কুড়িয়ে নিয়ে দেখে—সেটা সুন্দর. ছোট্টো, সোনার চটি।

পরদিন সকালে সিন্ডারেলার বাবার কাছে গিয়ে রাজপুত্তুর বলল, "এই চটিটা যার পায়ে হবে তাকেই আমি বিয়ে করব।"

রাজপুত্তুরের কথা শুনে সৎবোনেদের খুশি আর ধরে না। কারণ তাদের দুজনেরই পা ছোট্টো আর সুন্দর। চটিটা নিয়ে বড়ো বোন গেল তার ঘরে। কিন্তু তার মোটা বুড়ো আঙুল কিছুতেই সেটার মধ্যে ঢুকল না। তার মা পাশে দাঁড়িয়েছিল। মেয়েকে একটা ছুরি দিয়ে বলল, "বুড়ো আঙুলটা কেটে ফেল। রানী হলে তোকে কখনো হাঁটতে হবে না।" বড়ো বোন বুড়ো আঙুলটা কেটে, চটির মধ্যে জোর করে পা ঢুকিয়ে, কোনোরকমে যন্ত্রণা চেপে হেঁটে গেল রাজপুত্তুরের কাছে। রাজপুত্তুর তাকে নিজের ঘোড়ায় চড়িয়ে যেতে শুরু করল। যেতে-যেতে তারা পেঁছিল সেই কবরের পাশে। সেখানকার হেজেলগাছটায় বসেছিল ছোট্টো দুটো পায়রা। তারা চেঁচিয়ে উঠল :

"অবাক কাণ্ড ! আরে একি !
রক্ত ঝরে জুতোয় দেখি !
ছোট্টো জুতো—দে—খে—ছ ?
ভুল কনেকে—এ—নে—ছ !"

কনের পায়ের দিকে তাকিয়ে রাজপুত্তুর দেখে ঝর্ ঝর্ করে রক্ত পড়ছে। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ভুল কনেকে নিয়ে সে ফিরে গেল। তার বাবাকে সে বলল অন্য মেয়েকে চটিটা পরতে। সেই মেয়ে চটি নিয়ে নিজের ঘরে গেল, তার বুড়ো আঙুলটা ঢুকল। কিন্তু গোড়ালিটা কিছুতেই ভিতরে সেঁধুল না।

মেয়ের মা পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। মেয়ের হাতে একটা ছুরি দিয়ে সে বলল গোড়ালিটা কেটে ফেলতে। বলল, "রানী হলে তোর কখনো আর হাঁটতে হবে না।" মেয়েটা তার গোড়ালির খানিকটা কেটে চেপেচুপে জুতোটা পরল। তার পর কোনোরকমে যন্ত্রণা চেপে গেল রাজপুত্তুরের কাছে। আর রাজপুত্তুর তাকে নিজের ঘোড়ায় চড়িয়ে যেতে শুরু করল।

যেতে-যেতে তারা পৌঁছল সেই হেজেলগাছটার কাছে। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই দুটো ছোট্টো পায়রা উড়ে এসে গাছটায় বসে চেঁচিয়ে উঠল :

"অবাক কাণ্ড ! আরে একি !
রক্ত ঝরে জুতোয় দেখি !
ছোট্টো জুতো– দেখেছ ?
ভুল কনেকে এনেছ !"

কনের পায়ের দিকে তাকিয়ে রাজপুত্তুর দেখে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। সাদা মোজা-দুটো লাল হয়ে গেছে। তাই ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ভুল কনেকে নিয়ে আবার সে ফিরে গেল তাদের বাড়িতে।

রাজপুত্তুর বলল, "এ-মেয়েটাও আসল কনে নয়। তোমার আর মেয়ে নেই ?"

সিন্ডারেলার বাবা উত্তর দিল, "না—। তবে আর-একজন আছে। সে আমার আগের বউয়ের মেয়ে। কালিঝুলি-মাখা, আধ-পেট-খাওয়া হতকুচ্ছিত একটা। আসল কনে কখনোই সে হতে পারে না।"

রাজপুত্তুর বলল তাকে নিয়ে আসতে। কিন্তু সৎমা বাধা দিয়ে বলল, "না-না—মেয়েটা কালিঝুলি-মাখা বদখদ। তাকে দেখাতে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে।"

রাজপুত্তুর কিন্তু আদেশ দিল সিন্ডারেলাকে নিয়ে আসতে। মেয়েটি প্রথমে ভালো করে ধুলো তার মুখ আর হাত, তার পর এসে নতজানু হয়ে রাজপুত্তুরকে অভিবাদন করল। রাজপুত্তুর তার হাতে দিল সোনার চটিটা। একটা টুলে বসে পা থেকে কাঠের ভারী জুতোটা খুলে সোনার চটির মধ্যে পা সে ঢোকাল। আর খুব সহজেই তার পা গেল সোনার চটির মধ্যে সেঁধিয়ে।

মেয়েটি দাঁড়িয়ে উঠে মুখ ফেরাবার সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্তুর চিনতে পারল— এই সেই মেয়ে, যার সঙ্গে সে নেচেছে! রাজপুত্তুর চেঁচিয়ে উঠল, "এই তো আমার আসল বউ।"

সেই সৎমা আর সৎবোনেরা, রাগে ফুঁস্‌তে-ফুঁস্‌তে সরে গেল। আর রাজপুত্তুর নিজের ঘোড়ায় সিন্ডারেলাকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করল।

যেতে-যেতে পৌঁছল সেই হেজেলগাছটার কাছে। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই দুটো ছোট্টো পায়রা উড়ে এসে গাছটায় বসে চেঁচিয়ে উঠল :

"অবাক কাণ্ড! দ্যাখো, দ্যাখো!
জুতোয় রক্ত ঝরছে নাকো!
জুতো নয় ছোট্টো
দেখেছ?
আসল কনে এনেছ।"

এই-না বলে পায়রা দুটো উড়ে এসে বসল সিন্ডারেলার কাঁধে— একটা ডান দিকে, অন্যটা বাঁ দিকে।

শয়তান বোনেরা এল রাজপুত্তুরের বিয়েতে আর সিন্ডারেলাকে খোশামোদ করে চেষ্টা করল তার সঙ্গে নিজেদের আত্মীয়তার কথা জাহির করতে।

বর-বউ যখন গির্জের দিকে যেতে শুরু করল সিন্ডারেলার ডান পাশে তখন বড়ো বোন, বাঁ পাশে ছোটো। সেই দুটো পায়রা এসে উপড়ে নিল তাদের একটা করে চোখ। বর-বউ যখন গির্জে থেকে ফিরছে সিন্ডারেলার ডান পাশে তখন ছোটো বোন, বাঁ পাশে বড়ো। সেই দুটো পায়রা আবার উড়ে এসে উপড়ে নিল তাদের আর-একটা করে চোখ। নিজেদের নিষ্ঠুরতার জন্য আজীবন অন্ধ হয়ে থেকে এই ভাবে তারা পেল শাস্তি।



হোল্‌লে ঠাকরুন

এক বিধবার ছিল দুই মেয়ে। একজন সুন্দরী আর পরিশ্রমী। অন্যজন কুচ্ছিত আর কুঁড়ে। বিধবা কিন্তু বেশি ভালোবাসত কুচ্ছিত আর কুঁড়ে মেয়েকে, কারণ সে ছিল তার নিজের মেয়ে। অন্যজনকে করতে হত সব কাজকর্ম— সংসারের সে ছিল সিন্‌ডারেলা[1]। মেয়েটাকে রোজ বেরুতে হত বড়ো রাস্তায় আর তার পর একটা কুয়োপাড়ে বসে তকলি দিয়ে কাটতে হত সুতো। সুতো কাটতে-কাটতে তার আঙুল দিয়ে রক্ত ঝরত। একদিন তার তকলিতে রক্ত মাখামাখি হয়ে গেলে কুয়োয় সেটা ধুতে সে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে তার হাত ফস্‌কে সেটা পড়ে গেল কুয়োর মধ্যে। কাঁদতে-কাঁদতে সৎমার কাছে গিয়ে সব কথা সে জানাল। সৎমা তো রেগে আগুন। খুব তাকে সে গালাগালি করল।

[1] যে রূপবতী গুণবতী মেয়ে সংসারে তার রূপগুণের আদর পায় না।

তার পর বলে দিল কুয়ো থেকে তকলিটা তুলে না আনলে কিছুতেই তাকে ক্ষমা করবে না। কুয়োর কাছে ফিরে গেল মেয়েটি। কিন্তু কী করবে ভেবে পেল না। শেষটায় আরো বকুনি খাবার ভয়ে কুয়োর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে সে অজ্ঞান হয়ে গেল। জ্ঞান হতে দেখে ঝলমলে রোদে সে শুয়ে আছে সবুজ এক মাঠে। চার দিকে হাজার-হাজার সুন্দর ফুল। উঠে পড়ে সেই মাঠ দিয়ে যেতে সে পৌঁছল রুটি সেঁকার এক চুল্লির কাছে। সেটায় ভরা পাউরুটি।

পাউরুটিগুলো বলল, "আমাদের বার করে নাও। নইলে পুড়ে যাব। অনেকক্ষণ ধরে আমরা সেঁকা হচ্ছি।"

মেয়েটি এগিয়ে গিয়ে পাউরুটি সরাবার বেলচা দিয়ে এক-এক করে রুটিগুলো নামাল। তার পর আরো এগিয়ে গিয়ে পৌঁছল একটা গাছের কাছে। সেটায় ফলেছিল অজস্র আপেল। আপেলগুলো চেঁচিয়ে উঠল, "গাছটা ঝাঁকাও, ঝাঁকাও। আমরা পেকে টুস্‌টুসে হয়ে গেছি।"

মেয়েটি গাছটা ঝাঁকাতে ঝর্‌ঝর্‌ করে হাজার-হাজার আপেল ঝরে পড়ল। গাছে একটা আপেলও রইল না। সেগুলো এক জায়গায় জড় করে মেয়েটি আবার এগিয়ে চলল।

যেতে-যেতে যেতে-যেতে শেষটায় সে পৌঁছল ছোট্টো একটা বাড়ির কাছে। বাড়িটার জানলা দিয়ে এক বুড়ি তাঁর দিকে উঁকি মেরে তাকাল। বুড়ির দাঁতগুলো মস্ত বড়ো-বড়ো। তাই দেখে দারুণ ভয় পেয়ে মেয়েটি গেল দৌড়ে পালাতে। বুড়ি চেঁচিয়ে উঠল, "ভয় পাচ্ছিস কেন, বাছা? আমার সঙ্গে থাকবি আয়। আমার ঘর-দোরের কাজ ভালো করে করলে এখানে খুব ভালোই থাকবি। ভালো করে আমার বিছানা পাতিস আর তোশকটা এমন করে ঝাড়িস যতক্ষণ-না পালকগুলো সেখান থেকে উড়তে শুরু করে। পালকগুলো উড়লেই পৃথিবীতে তুষার পড়বে। আমিই হচ্ছি হোল্‌লে ঠাকরুন[১]।

বুড়ির মিষ্টি কথা শুনে মেয়েটির ভয় কেটে গেল। তাই তার কাছে কাজ করতে রাজি হয়ে গেল সে। তার কাজে বুড়ি খুব খুশি। ভালো করে তোশক ঝেড়ে তুষারের পাপড়ির মতো পালক সে ওড়াল। বুড়ির সংসারে সে রইল সুখে-স্বচ্ছন্দে। প্রতিদিন ডিনারে সে খেতে

[১]হেস্ শহরে প্রবাদ আছে যে, হোল্‌লে ঠাকরুন বিছানা পাতলেই তুষার ঝরে।

গেল হয় সেদ্ধ নয় ঝলসানো মাংস। কিন্তু কিছুদিন পরে মেয়েটির মন খুব খারাপ হয়ে গেল। প্রথমে সে বুঝতে পারল না এর কারণ কী। কিন্তু শেষে বুঝল বাড়ির জন্য তার মন-কেমন করছে। বাড়ির চেয়ে হোল্‌লে ঠাকরুনের কাছে সে হাজার গুণ আরামে ছিল। তবু তার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হল। শেষটায় বুড়িকে সে বলল, "এখানে আমি খুব ভালো আছি, তবু কিন্তু বাড়ির জন্যে আমার খুব মন-কেমন করছে; তাই আমি আর থাকতে পারব না। বাড়ির লোকদের কাছে আমার ফিরে যেতেই হবে।"

তার কথা শুনে হোল্‌লে ঠাকরুন বলল, "তুই বাড়ি ফিরতে চাস শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি। খুব ভালো করে আমার সেবা-যত্ন করেছিস বলে তোকে আমি নিজেই নিয়ে যাব।" এই-না বলে বুড়ি তার হাত ধরে নিয়ে গেল বিরাট একটা ফটকের কাছে। আর ফটকটা খোলার পর তার নীচে দাঁড়াতেই মেয়েটির উপর ঝর্ ঝর্ করে ঝরে পড়ল অনেক অনেক মোহর। আর মোহরগুলো আটকে গেল তার পোশাকে। ফলে মেয়েটির মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে গেল সোনায়।

হোল্‌লে ঠাকরুন বলল, "তুই খুব পরিশ্রমী বলে এগুলো তোকে দিলাম।" কুয়োয় যে-তকলিটা পড়ে গিয়েছিল সেটাও বুড়ি তাকে ফিরিয়ে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল ফটকটা। মেয়েটি দেখল আবার সে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে আর কাছেই রয়েছে তার সৎমার বাড়ি। মেয়েটি বাড়ির উঠনে পৌঁছলে পাম্পের উপরকার মোরগটা চেঁচিয়ে উঠল:

"কোঁকর-কোঁ, কোঁকর-কোঁ
সোনার মেয়ে ফির্‌-লো।"

তার পর মেয়েটি গেল তার সৎমার কাছে। আর তার গা ভর্তি সোনা দেখে সেই সৎমা আর সৎবোন একমুখ হেসে তাকে অনেক আদর করল। কী কী ঘটেছে সব কথা মেয়েই বলল তাদের। সব শুনে সেই সৎমা স্থির করল তার কুচ্ছিত কুঁড়ে মেয়েকেও পাঠাবে মোহর আনতে। তাই তাকে সে পাঠাল সেই কুয়োপাড়ে সুতো কাটতে। তকলিতে রক্ত মাখাবার জন্য মেয়েটা কাঁটা ঝোপে হাত ঢুকিয়ে আঙুল-গুলোয় কাঁটা ফোটাল আর তার পর তকলিটা কুয়োয় ফেলে, দিল ঝাঁপ! ভালো মেয়েটির মতোই সেই সুন্দর মাঠে পৌঁছে একই পথ ধরে সে শুরু

করল যেতে। কিন্তু সেই রুটি-সেঁকার চুল্লির কাছে পৌঁছবার পর পাঁউরুটিগুলো যখন বলল, "আমাদের বার করে নাও, নইলে আমরা পুড়ে যাব, কুঁড়ে মেয়েটা উত্তর দিল, "তোদের জন্যে কালিঝুলি মাখতে আমার বয়ে গেছে।" এই-না বলে সেখান থেকে সে চলে গেল।

যেতে-যেতে যেতে-যেতে সে পৌঁছল সেই আপেল গাছটার কাছে আর আগের মতোই আপেলগুলো চেঁচিয়ে উঠল, "গাছটা ঝাঁকাও, ঝাঁকাও, আমরা পেকে টুস্‌টুসে হয়ে গেছি।"

মেয়েটা বলল, "তাই তো দেখছি। কিন্তু কে জানে, হয়তো অনেকগুলো আমার মাথায় পড়বে।" এই-না বলে সেখান থেকে সে চলে গেল।

হোল্‌লে ঠাকরুনের ছোট্টো বাড়িটার কাছে গিয়ে সে কিন্তু ঘাবড়াল না। কারণ আগেই সে শুনেছিল তার বড়ো-বড়ো দাঁতের কথা। বুড়ির কাজে সে বহাল হয়ে গেল আর প্রথম দিন চেষ্টা করল খুব খেটেখুটে বুড়ির কথামতো কাজ করতে। কারণ বার বার তার মনে পড়েছিল সেই মোহরগুলোর কথা, যেগুলো পরিশ্রমের পুরস্কার হিসেবে সে পাবে। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে শুরু হয়ে গেল তার কুঁড়েমি। আর তৃতীয় দিনে ভোরে সে প্রায় উঠতেই চাইল না। ভুলে গেল হোল্‌লে ঠাকরুনের বিছানা ভালো করে পাততে আর তোশক ঝেড়ে পালক ওড়াতে। তার কাজে বিরক্ত হয়ে হোল্‌লে ঠাকরুন তাকে জবাব দিল। কুঁড়ে মেয়েটা তাই শুনে বেজায় খুশি হয়ে ভাবল, 'এবার মোহর বৃষ্টির সময় হয়েছে।'

হোল্‌লে ঠাকরুন তাকে নিয়ে গেল সেই ফটকটার কাছে। কিন্তু সেটার নীচে দাঁড়াতে মোহরের বদলে তার মাথায় ঝরে পড়ল মস্ত বড়ো এক কেতলি আলকাতরা। "তোর কাজের এই পুরস্কার," বলে হোল্‌লে ঠাকরুন বন্ধ করে দিল ফটকটা।

আলকাতরা মেখে কুঁড়ে মেয়েটা বাড়ি ফিরতে পাম্পের উপরকার মোরগটা চেঁচিয়ে উঠল :

"কোঁকর-কোঁ, কোঁকর-কোঁ,
নোংরা মেয়ে ফির-লো।"

সেই আলকাতরা ধোয়া গেল না। যতদিন মেয়েটা বেঁচে ছিল ততদিন তার গায়ে লেপটে ছিল সেই আলকাতরা।

সোনার পাখি

সে আজ অনেকদিন আগেকার কথা। এক রাজার দুর্গের পিছনে ছিল এক বাগান। সেখানে একটা গাছে ফলত সোনার আপেল। আপেল-গুলো পাকবার পর তাদের গায়ে নম্বর লেখা হল। কিন্তু পরদিন সকালেই দেখা গেল একটা আপেল কম। রাজাকে খবরটা জানাতে তিনি আদেশ দিলেন—প্রত্যেক রাতে গাছতলায় দাঁড়িয়ে কাউকে-না-কাউকে পাহারা দিতে হবে। রাজার ছিল তিন ছেলে। রাত হলে বড়ো ছেলেকে তিনি পাঠালেন বাগানে। কিন্তু মাঝরাতের পর সে আর জেগে থাকতে পারল না। আর সকাল হতে দেখা গেল আর-একটা আপেল চুরি গেছে।

পরের রাতে পাহারা দিতে পাঠানো হল মেজো ছেলেকে। কিন্তু রাত বারোটার ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেও পড়ল ঘুমিয়ে। আর পরদিন সকালে দেখা গেল আরো একটা আপেল চুরি গেছে।

এবার পাহারা দেবার পালা এল ছোটো ছেলের। পাহারা দিতে যাবার তার খুব আগ্রহ ছিল। কিন্তু তার উপর রাজার বিশেষ ভরসা ছিল না। ভাবলেন অন্য দু ভাইয়ের মতো সেও বিফল হবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাকে তিনি অনুমতি দিলেন। ছেলেটি গাছতলায় শুয়ে জেগে রইল। আর মাঝরাতের ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে সে শুনল ডানা ঝাপটাবার শব্দ আর দেখল একটি পাখিকে উড়ে আসতে। জোৎস্নায় তার পালক-গুলো সোনার মতো ঝকঝক করছিল। গাছে বসে পাখিটা যখন একটা আপেল ঠোকরাতে যাচ্ছে, ছোটো রাজপুত্তুর তখন তাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ল একটা তীর। পাখিটা উড়ে পালাল। কিন্তু তীর লেগে মাটিতে

খসে পড়ল একটা পালক। সেটা কুড়িয়ে পরদিন সে নিয়ে গেল রাজার কাছে আর তার পর রাতে যা-যা দেখেছে সব কথা বলল তাঁকে। রাজা তাঁর সভাসদ্‌বর্গকে ডেকে পাঠালেন। পালকটা দেখে প্রত্যেকেই বলল, এরকম একটা পালকের দাম গোটা রাজত্বের সমান। রাজা বললেন, "তাই যদি হয়—একটা পালকে আমার তৃপ্তি নেই। আমি চাই পুরো পাখিটাকে।"

সোনার পাখির খোঁজে বেরুল রাজার বড়ো ছেলে। সে নিঃসন্দেহ ছিল—পাখিটাকে খুঁজে বার করতে পারবে। খানিক দূর গিয়ে সে দেখল, বনের কিনারে একটা শেয়াল বসে। বন্দুক তুলে সেটার দিকে টিপ্‌ করতেই শেয়ালটা বলে উঠল :

"আমাকে মেরো না। আমি তোমায় ভালোবুদ্ধি দেবো। তুমি তো সোনার পাখির খোঁজে বেরিয়েছ। আজ সন্ধেয় তুমি একটা গ্রামে পেঁছবে। সেখানে মুখোমুখি দুটো সরাইখানা আছে। একটায় দেখবে আলো ঝলমল করছে আর তার ভেতরে শোনা যাচ্ছে লোকজনের হৈ-হল্লা; অন্যটা অন্ধকার আর নিরানন্দ। তবু প্রথমটায় যেয়ো না, যেয়ো দ্বিতীয়টায়।"

'বোকা জন্তুর উপদেশের কোনো দাম নেই,' এই-না ভেবে বড়ো রাজপুত্তুর গুলি ছুঁড়ল। কিন্তু গুলিটা শেয়ালের গায়ে লাগল না। লেজ গুটিয়ে চক্ষের নিমিষে সে বনের মধ্যে অদৃশ্য হল। যেতে-যেতে সন্ধেয় বড়ো রাজপুত্তুর পেঁছল সেই গ্রামে যেখানে ছিল মুখোমুখি দুটো সরাইখানা। একটার মধ্যে চলছিল নাচগান। অন্যটা নিস্তব্ধ আর অন্ধকার।

"এই ফুর্তির জায়গা ছেড়ে অন্যটায় যাওয়া তো নিছক বোকামি।" এই-না ভেবে যারা নাচগান করছিল তাদের দলে সে যোগ দিল। আর সেখানে বিলাস আর আলসেমির মধ্যে মশগুল হয়ে থেকে সে বেমালুম ভুলে গেল সেই পাখি আর তার বাবার কথা।

বহুদিন কেটে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বড়ো ছেলে বাড়ি না ফেরায় সোনার পাখির খোঁজে বেরুল মেজো ছেলে। তার সঙ্গেও দেখা হল সেই শেয়াল আর তাকেও শিয়াল দিল একই উপদেশ। সেও তার বড়ো ভাইয়ের মতোই শেয়ালের কথায় কান দিল না। সেই দুটো সরাইখানার কাছে সে পেঁছল আর আলো-ঝলমল সরাইখানার একটা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বড়ো ভাই ওকে ডাকল হাতছানি দিয়ে। নাচগান হৈ-

হুল্লোড়ের লোভ সেও সামলাতে পারল না। সেখানে গিয়ে বিলাস আর আলসেমির মধ্যে মশগুল হয়ে সেও ভুলে গেল সোনার পাখি আর তার-বাবার কথা।

বেশ কিছুদিন পরে ছোটো রাজপুত্তুর চাইল নিজের ভাগ্য পরীক্ষার জন্য বেরিয়ে পড়তে। রাজা কিন্তু আপত্তি জানিয়ে বললেন, "তোর গিয়ে কোনো লাভ নেই। অন্য দুই ভাইয়ের মতো সোনার পাখির খোঁজ তুইও পাবি না। তোর কোনো বিপদ-আপদ ঘটলে আমার এক ছেলেও থাকবে না।" কিন্তু ছোটো ছেলে অনেক কাকুতি-মিনতি করতে শেষটায় রাজা অনুমতি দিলেন।

বনের বাইরে এবারেও বসেছিল সেই শেয়াল। অনুনয় করে সে বলল ছোটো রাজপুত্তর তাকে যেন না মারে। আর তার পর শেয়াল দিল তাকে সেই ভালো উপদেশ।

ছোটো রাজপুত্তুর বলল, "ভয় পেয়ো না, শেয়াল! তোমায় মারব না।"

শেয়াল বলল, "এই দয়া দেখাবার জন্যে কখনো তোমায় অনুশোচনা করতে হবে না। আমার লেজের ওপর উঠে পড়ো। তা হলে অনেক তাড়াতাড়ি যেতে পারবে।"

লেজের উপর ছোটো রাজপুত্তুর উঠে বসতে-না-বসতেই ছুটতে শুরু করল শেয়াল। আর পাহাড় আর উপত্যকার উপর দিয়ে এমন জোরে সে ছুটে চলল যে, বাতাসের মধ্যে শিস্ দিয়ে উঠল তাদের চুল। তার পর সেই গ্রামে পৌঁছে শেয়ালের উপদেশমতো ছোটো রাজপুত্তুর গেল ছোট্টো, নিরানন্দ সরাইখানায়। সেখানে চুপচাপ সে রাত কাটাল।

পরদিন সকালে মাঠে বেরুতে তার সঙ্গে আবার দেখা হল শেয়ালের। শেয়াল বলল, "এবার তোমায় কী করতে হবে বলি। সোজা গেলে তুমি একটা দুর্গে পৌঁছবে। সেটার সামনে দেখবে এক দল সৈন্য ছাউনি গেড়েছে। তাদের দেখে ভয় পেয়ো না। তারা ঘুমিয়ে থাকবে। তাদের মাঝখান দিয়ে দুর্গে গিয়ে সব ঘরগুলো দেখো। শেষটায় যে-ঘরে পৌঁছবে সেখানে কাঠের খাঁচায় দেখবে সোনার এক পাখি। কাছেই দেখবে একটা সোনার খাঁচা। কাঠের খাঁচা থেকে বার করে সোনার খাঁচায় পাখিটাকে কিন্তু রাখতে যেয়ো না। রাখতে গেলে ফ্যাসাদে পড়বে।"

কথাগুলো বলে শেয়াল তার লেজ লম্বা করে দিল আর ছোটো রাজপুত্তুর সেটায় চড়ে বসল। তার পর নানা পাহাড়-পর্বত মাঠ-ঘাট আর উপত্যকার উপর দিয়ে তারা ছুটে চলল হু-হু করে। দুর্গে পৌঁছে ছোটো রাজপুত্তুর দেখল শেয়াল যা-যা বলেছিল সে-সবই অক্ষরে-অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। যে-ঘরে সোনার পাখি কাঠের খাঁচায় ছিল সে-ঘরে রাজপুত্তুর গেল। দেখল পাখিটার কাছেই রয়েছে সোনার একটা খাঁচা আর মেঝেয় তিনটে সোনার আপেল। তার পর তার মনে হল এই সুন্দর পাখিটাকে সাধারণ একটা কাঠের খাঁচায় নিয়ে যাবার কোনো মানেই হয় না। তাই কাঠের খাঁচার দরজা খুলে সোনার পাখি নিয়ে রাখল সে সোনার খাঁচায়। সঙ্গে সঙ্গে পাখিটা উঠল তীক্ষ্ণ স্বরে ডেকে। তার ডাক শুনে সৈন্যরা জেগে উঠে ছুটে এসে ছোটো রাজপুত্তুরকে নিয়ে গেল কয়েদ ঘরে। পরদিন সকালে তাকে হাজির করা হল হাকিমের সামনে আর সব কথা কবুল করায় হাকিম দিলেন তার প্রাণদণ্ডের আদেশ। রাজার কিন্তু দয়া হল। তিনি বললেন—যে সোনার ঘোড়া বাতাসের আগে ছোটে সেটা তাঁকে এনে দিলে প্রাণদণ্ডের আদেশ তিনি মকুব করে দেবেন, আর সেই সঙ্গে উপহার দেবেন সোনার পাখিকে। বিষণ্ণ মনে ছোটো রাজপুত্তুর বেরুল সোনার ঘোড়ার খোঁজে। সে জানত সোনার ঘোড়ার খোঁজ পাওয়া একেবারে অসম্ভব। তাই তার দীর্ঘনিশ্বেস পড়ল। তার পর হঠাৎ দেখল তার বন্ধু শেয়ালকে পথের পাশে বসে থাকতে।

শেয়াল বলল, "আমার কথা শোনো নি বলেই তুমি এই ফ্যাসাদে পড়েছ। কিন্তু মন খারাপ কোরো না। সোনার ঘোড়ার হদিস তোমায় দিচ্ছি। তুমি সোজা গেলে একটা দুর্গে পৌঁছবে। সেখানকার আস্তাবলে আছে সোনার ঘোড়া। আস্তাবলের সামনে সহিস্‌রা নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছে। তাই ঘোড়াটা বার করে আনতে তোমার অসুবিধে হবে না। কিন্তু এক বিষয়ে সাবধান। সেখানে দেখবে একটা খুব জমকালো সোনার জিন্‌ পড়ে আছে। ঘোড়ার পিঠে সেটা চড়িয়ো না। কাঠ আর চামড়ায় সাধারণ যে-জিন্‌ দেখবে সেইটা চড়িয়ো।"

কথাগুলো বলে শেয়াল তার লেজ লম্বা করে দিল আর ছোটো রাজপুত্তুর সেটায় চড়ে বসল। তার পর নানা পাহাড়-পর্বত মাঠ-ঘাট আর উপত্যকার উপর দিয়ে তারা ছুটে চলল হু-হু করে।

শেয়াল যা-যা বলেছিল সে-সবই অক্ষরে-অক্ষরে মিলে গেল। যে-

আস্তাবলে সোনার ঘোড়া ছিল সেখানে সে পৌঁছল। কিন্তু সাধারণ জিন্‌টা পরাতে গিয়ে সে ভাবল, 'এই সুন্দর ঘোড়ার পিঠে সোনার জিন্‌ না চড়ালে তাকে অপমান করা হবে।' আর সোনার জিন্‌ ঘোড়াটার পিঠে ঠেকাতেই সেটা উঠল চিঁ-হিঁ-হিঁ করে ডেকে। সঙ্গে সঙ্গে সহিস্‌রা জেগে উঠে ছোটো রাজপুত্তুরকে নিয়ে গেল কয়েদ-ঘরে। পরদিন সকালে তাকে হাজির করা হল হাকিমের সামনে আর হাকিম দিলেন প্রাণদণ্ডের আদেশ। কিন্তু রাজা বললেন—যে-সোনার কেল্লায় রূপসী রাজকন্যে থাকে সেখান থেকে তাকে এনে দিলে প্রাণদণ্ডের আদেশ তিনি মকুব করে দেবেন।

বিষণ্ণ মনে ছোটো রাজপুত্তুর বেরুল রাজকন্যের খোঁজে আর বেরিয়েই শেয়ালকে তার জন্য অপেক্ষা করতে দেখে ভারি খুশি হল।

শেয়াল বলল, "তোমাকে আর সাহায্য করা উচিত নয়। কিন্তু তোমার জন্যে আমার দুঃখু হচ্ছে। তাই আর-একবার তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করব। সোজা চলে গেলে আজ সন্ধেয় পৌঁছবে সোনার কেল্লায়। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সুন্দরী রাজকন্যে চানের ঘরে যায় চান করতে। সে যখন যাবে, ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ো। তা হলেই সে বশ মেনে তোমার পেছনে পেছনে আসতে বাধ্য হবে। কিন্তু কিছুতেই তাকে তার মা-বাবার কাছে বিদায় নিতে দিয়ো না। তাকে যেতে দিলেই তুমি বিপদে পড়বে।"

কথাগুলো বলে শেয়াল তার লেজ লম্বা করে দিল আর ছোটো রাজপুত্তুর সেটায় চড়ে বসলে শেয়াল ছুটল বাতাসের বেগে।

সোনার কেল্লায় সে পৌঁছলে শেয়াল যা-যা বলেছিল সে-সবই অক্ষরে-অক্ষরে মিলে গেল। মাঝরাত পর্যন্ত সে অপেক্ষা করল। তার পর সুন্দরী রাজকন্যে যখন স্নানের ঘরে চলেছে, ছুটে গিয়ে ছোটো রাজপুত্তুর তাকে চুমু খেল। রাজকন্যে তখন বলল খুশি হয়েই সে তার সঙ্গে যাবে। কিন্তু কাঁদতে-কাঁদতে মিনতি করে বলল তাকে তার মা-বাবার কাছ থেকে বিদায় নিতে যেতে দিতে। প্রথমে ছোটো রাজপুত্তুর আপত্তি করল। কিন্তু তার কান্না দেখে শেষপর্যন্ত হল রাজি। আর যেই-না রাজকন্যে তার বাবার বিছানার কাছে গেছে, অমনি সবাই জেগে উঠে তাকে ধরে নিয়ে গেল কয়েদ-ঘরে।

পরদিন সকালে রাজা তাকে বললেন, "আট দিনের মধ্যে আমার

জানলার সামনের পাহাড়টাকে সরাতে পারলে তোমার জীবন ভিক্ষে দিতে পারি। পাহাড়টার জন্যে বাইরেটা আমি দেখতে পাই না। পাহাড়টা সরাতে পারলে আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবো।"

ছোটো রাজপুত্তুর পাহাড় সরাবার কাজে লেগে গেল। কোথাও শাবল দিয়ে পাথর খোঁড়ে, কোথাও কোদাল দিয়ে মাটি সরায়। এইভাবে সাতটা দিন কেটে গেল। কিন্তু পাহাড়টা যে কে সেই! একেবারে মনমরা হয়ে ছোটো রাজপুত্তুর হাল ছেড়ে দিল। সাত দিনের দিন সন্ধেয় আবার সেই শেয়াল এসে বলল, "তোমাকে আর সাহায্য করা আমার উচিত নয়। যাক গে—তুমি গিয়ে ঘুমোও। তোমার কাজটা আমি সেরে দিচ্ছি।"

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ছোটো রাজপুত্তুর দেখে-পাহাড়টা নেই। দৌড়ে গিয়ে রাজাকে জানাল ওঁর কড়ার সে পূর্ণ করেছে। নিজের কথা রাখার জন্য রাজা তখন বাধ্য হলেন মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে।

সেই রূপসী রাজকন্যেকে নিয়ে ছোটো রাজপুত্তুর বেরুল তার নিজের দেশে ফিরতে। কিন্তু খানিক যাবার পরেই সেই শেয়াল-বন্ধু হাজির হয়ে বলল, "তুমি তো সব-কিছুই পেলে। কিন্তু মনে রেখো—সোনার ঘোড়াটা সোনার কেল্লার রাজকন্যের।"

ছোটো রাজপুত্তুর জিগ্‌গেস করল, "কিন্তু ঘোড়াটা পাই কী করে?"

শেয়াল বলল "পাবার উপায়টা বলছি। যে-রাজা তোমায় সোনার কেল্লায় পাঠিয়েছিল প্রথমে তাঁর কাছে মেয়েটিকে নিয়ে যাও। সেখানে তোমায় দেখে সবাই খুব আমোদ-আহ্লাদ করবে। তোমায় তারা সোনার ঘোড়াটা দেবে। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায় চাপবে, প্রত্যেকের হাত ছুঁয়ে বিদায় জানাবে, আর সবশেষে রাজকন্যে এলে তাকে তোমার ঘোড়ার জিন্‌-এর পাশে তুলে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাবে। কেউই তোমার নাগাল পাবে না। কারণ ঘোড়াটা ছোটে বাতাসের আগে।

এই পরামর্শমতো সব-কিছুই হল। সোনার ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছোটো রাজপুত্তুর রাজকন্যেকে পাশে বসিয়ে, নিয়ে গেল।

তার পর আবার সেই শেয়াল এসে বলল, "সোনার পাখি এবার তোমায় দেবো। যে-দুর্গের কাছে সোনার পাখি থাকে, সেখানে পৌঁছে এই রাজকন্যেকে আমার জিম্মায় রেখে দিয়ো। তার পর সোনার

ঘোড়ায় চড়ে চলে যেয়ো সেই রাজপ্রাসাদের আঙিনায়। তোমাকে দেখে সবাই খুব খুশি হয়ে সোনার পাখিটা দেবে। খাঁচাটা নিয়েই রাজকন্যের কাছে ঘোড়া ছুটিয়ে তুমি এসো।"

শেয়ালের কথামতো সব-কিছুই করল ছোটো রাজপুত্তুর।

ধনদৌলত নিয়ে যখন সে বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত—এমন সময় শেয়াল এসে বলল :

"প্রথম কথা—আমি যা-যা করলাম তার জন্যে পুরস্কার দাও।"

ছোটো রাজপুত্তুর বলল, "তোমার জন্যে কী-কী করতে হবে—বলো।"

"আমরা বনে পৌঁছবার পর আমাকে গুলি করে মেরে আমার মাথা আর থাবাগুলো কেটে ফেলো।"

ছোটো রাজপুত্তুর বলল, "তোমার কথা রাখতে পারব না।"

শেয়াল বলল, "তা হলে চললাম। যাবার আগে তোমাকে শুধু আর-একটা উপদেশ দিয়ে যাই। দুটো জিনিস থেকে সাবধানে থেকো : ফাঁসির আসামীকে কখনো বাঁচিয়ো না আর কুয়ো-পাড়ে কখনো বোসো না।" এই-না বলে শেয়াল বনে চলে গেল।

ছোটো রাজপুত্তুর ভাবল, 'অদ্ভুত শেয়ালটার অদ্ভুত-অদ্ভুত যত সব কথা! কে কবে ফাঁসির আসামীকে বাঁচাতে যায়? কে কবে সখ করে বসতে যায় কুয়ো-পাড়ে?'

রাজকন্যেকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যেতে-যেতে সে পৌঁছল সেই গ্রামে, যেখানে তার বড়ো ভাইরা বিলাসের মধ্যে কুঁড়েমি করে সময় কাটাচ্ছিল। সেখানে গিয়ে সে দেখে—দারুণ হৈ-হৈ কাণ্ড। কারণটা জিগ্‌গেস করতে সে শুনল, দুজন লোকের সেখানে সেদিন ফাঁসি হবে। কাছে গিয়ে সে দেখে—সেই লোক দুটো তাঁর দুই বড়ো ভাই। তারা ফুর্তি-টুর্তি করে নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তি সব ঘুচিয়েছে আর করেছে নানা অপরাধ। তাই তাদের ফাঁসি হবে।

ছোটো রাজপুত্তুর জানতে চাইল—কোনো উপায়ে তাদের প্রাণ বাঁচানো যায় কি না।

লোকে তাকে বলল, "ওদের জন্যে টাকা খরচ করলে বাঁচাতে পার। কিন্তু ওদের মতো নচ্ছারদের জন্যে কেন মিছিমিছি টাকা খরচ করবে?"

ছোটো রাজপুত্তুর কিন্তু কারুর কথাতেই কান দিল না। টাকা-

পয়সা দিয়ে তাদের সে খালাস করল। তার পর সবাই মিলে একসঙ্গে চলল বাড়ি ফিরে। যেতে-যেতে সেই বনের কাছে তারা পৌঁছল, যেখানে শেয়ালের সঙ্গে তাদের প্রথম দেখা। তখন চড়চড়ে রোদ। আর সেই বনকে দেখাচ্ছিল ভারি মিষ্টি আর ঠাণ্ডা। তার বড়ো দু ভাই বলল, "কুয়ো-পাড়ে গিয়ে বিশ্রাম নিয়ে খাওয়া-দাওয়া করা যাক।" ছোটো রাজপুত্তুর ভাইদের কথায় রাজি হয়ে, শেয়ালের উপদেশ ভুলে গিয়ে বসল কুয়ো-পাড়ে। আর যেই-না সেখানে বসা, অমনি তার দু ভাই তাকে ঠেলে ফেলে দিল কুয়োর মধ্যে। তার পর সেই সোনার পাখি, সেই সোনার ঘোড়া আর সোনার কেল্লার সেই রূপসী রাজকন্যেকে নিয়ে ফিরে গেল তাদের বাবার প্রাসাদে।

রাজাকে তারা বলল, "বাবা, এই দেখো—তোমার জন্যে শুধু সোনার পাখি আনি নি। এনেছি সোনার ঘোড়া আর সোনার কেল্লার সুন্দরী রাজকন্যেকে।"

তারা ফেরায় রাজত্ব-জুড়ে মস্ত উৎসব শুরু হয়ে গেল। কিন্তু সোনার ঘোড়া কিছু খেলো না, সোনার পাখি গান গাইল না আর সোনার কেল্লার রাজকন্যে শুধুই লাগল কাঁদতে। এদিকে সেই ছোটো রাজপুত্তুর কিন্তু মরে নি। কারণ কুয়োটা ছিল শুক্‌নো আর সে গিয়ে পড়েছিল নরম-নরম শ্যাওলার উপর। না লাগলেও সে ভেবে পেল না—কী করে সেখান থেকে বেরুনো যায়। এমন সময় আবার হাজির হল সেই বন্ধু শেয়াল তাকে উদ্ধার করতে।

তার উপদেশ না শোনার জন্য ছোটো রাজপুত্তুরকে খুব বকে সে বলল, "তোমাকে বিপদের মধ্যে রেখে আমি তো যেতে পারি না। তোমাকে তাই কুয়ো থেকে তুলে আনছি।" নিজের লেজটা বাড়িয়ে দিয়ে ছোটো রাজপুত্তুরকে সে বলল শক্ত করে ধরতে। তার পর তাকে কুয়ো থেকে তুলে বলল, "এখনো তোমার কিন্তু বিপদ কাটে নি। তুমি মরেছ বলে তোমার ভাইরা এখনো নিঃসন্দেহ নয়। তাই বেঁচে থাকলে যাতে তুমি পালাতে না পার তার জন্যে বনের চার পাশে তারা প্রহরী মোতায়েন করেছে।"

পথের পাশে এক ভিখিরি বসেছিল। ছোটো রাজপুত্তুর তার সঙ্গে পোশাক বদলে পেঁৗছল রাজ-দরবারে।

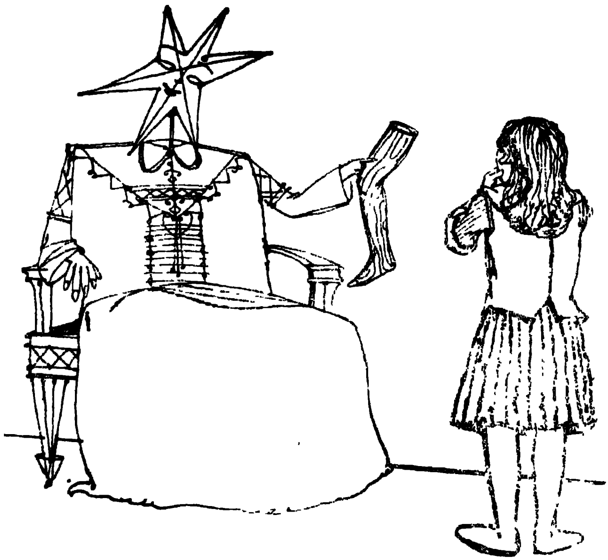
কেউ তাকে চিনতে পারল না। কিন্তু সোনার পাখি উঠল গান

গেয়ে, সোনার ঘোড়া লাগল খেতে আর সোনার কেল্লার রূপসী রাজকন্যের কান্না গেল থেমে। অবাক হয়ে রাজকন্যেকে রাজা জিগ্গেস করলেন, "এ-সবের কারণ কী?" রাজকন্যে বলল, "সে কথা জানি না। আমার মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এখন কিন্তু হঠাৎ খুব ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে—আমার আসল বর যেন এসেছে!" রাজার বড়ো দু ভাই তাকে শাসিয়েছিল আসল কথা ফাঁস করলে তাকে মেরে ফেলবে বলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সোনার কেল্লার রাজকন্যে আসল কথা রাজার কাছে ফাঁস করে দিল।

দুর্গের সবাইকে তাঁর সামনে হাজির করার জন্য রাজা আদেশ দিলেন। সবাইকার সঙ্গে এল ছোটো রাজপুত্তুর, পরনে যার ভিখিরির পোশাক। সোনার কেল্লার রাজকন্যে সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিনতে পেরে ছুটে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল।

আর বিচারে বড়ো দুই ভাইয়ের হল প্রাণদণ্ডের আদেশ। ছোটো রাজপুত্তুরের সঙ্গে বিয়ে হল সোনার কেল্লার সুন্দরী রাজকন্যের আর রাজা ঘোষণা করলেন তাঁর পর সিংহাসন পাবে তাঁর ছোটো ছেলে।

কিন্তু সেই শেয়ালের কী হল? অনেকদিন পর সেই বনে গিয়ে শেয়ালের সঙ্গে দেখা হল ছোটো রাজপুত্তুরের। শেয়াল বলল, "রাজপুত্তুর! সব-কিছুই তুমি পেয়েছ। কিন্তু আমার দুর্দশা যে কে সে-ই। একমাত্র তুমিই পার আমার দুর্দশা ঘোচাতে।" তার পর রাজপুত্তুরকে সে বলল—তাকে গুলি করে মেরে তার মাথা আর থাবাগুলো কেটে ফেলতে। তার অনুরোধ মতো ছোটো রাজপুত্তুর গুলি করতেই শেয়াল হয়ে গেল মানুষ। আসলে সে ছিল সোনার কেল্লার রাজকন্যের ভাই। বহুকাল ধরে এক জাদুর প্রভাবে সে হয়েছিল শেয়াল। তাকে আবার মানুষ হতে দেখে সোনার কেল্লার রাজকন্যে আর ছোটো রাজপুত্তুরের আনন্দ আর ধরে না। আর তার পর আজীবন তারা রইল সুখে-শান্তিতে বেঁচে।



সাতটা দাঁড়কাক

একটি লোকের ছিল সাত ছেলে। কিন্তু কোনো মেয়ে ছিল না। মেয়ের সখ তার অনেকদিনের। শেষটায় তার বউয়ের কোলে এল একটি মেয়ে। লোকটির আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু মেয়েটি ভারি ছোট্টোখাট্টো আর ক্ষীণজীবী। তার দুর্বলতার দরুন তাকে নিরিবিলিতে খৃস্টধর্মে দীক্ষা দেওয়া দরকার হয়ে পড়ল। সেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য ঝর্নার জল আনতে মেয়েটির বাবা তাড়াহুড়ো করে পাঠাল এক ছেলেকে। অন্য ছজন বলল তার সঙ্গে তারাও যাবে। কে আগে জল তুলতে পারে তাই নিয়ে তাদের মধ্যে পড়ে গেল হুড়োহুড়ি। ফলে ঝর্নায় পড়ে গেল মগটা। কী করবে ভেবে না পেয়ে সেখানে তারা দাঁড়িয়ে রইল। ভয় পেল বাড়ি ফিরতে। তারা না ফেরায় বাবা অধৈর্য হয়ে বলে উঠল, "হতভাগাগুলো নিশ্চয়ই আবার বজ্জাতি জুড়েছে।" তার ভয় হল ছোট্টো মেয়েটি হয়তো খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হবার আগেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে। তাই সে চেঁচিয়ে উঠল, "ছেলেগুলো যেন দাঁড়কাক হয়ে যায়।" কথাগুলো তার মুখ থেকে খসতে-না-খসতেই তার মাথার উপর আকাশে

সে শুনতে পেল ডানার ঝট্‌পট্‌। তাকিয়ে দেখে সাতটা কুচ্‌কুচে কালো দাঁড়কাক উড়ছে।

এই জাদুর মায়া মা-বাবা কেউই কাটাতে পারল না। সাত ছেলেকে হারিয়ে তাদের খুব দুঃখ হল। কিন্তু তাদের সেই ছোট্টো মেয়েটিকে দিন-কের দিন সুস্থ সবল আর সুন্দর হয়ে উঠতে দেখে পেল খানিক সান্ত্বনা। মেয়েটি বহুকাল জানত না যে, এক সময় তার সাতটি ভাই ছিল। বাবা-মা সযত্নে কথাটা তার কাছে এড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একদিন সে শোনে লোকে কানাকানি করছে—সে সুন্দরী হতে পারে কিন্তু তারই দোষে তার সাত ভাই দুর্দশায় পড়েছে। শুনে তার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। মা-বাবার কাছে গিয়ে সে প্রশ্ন করল—সত্যিই তার সাত ভাই ছিল কি না; আর থাকলে কী তাদের হয়েছে। কথাটা তখন তার মা-বাবা আর চেপে রাখতে পারল না। কিন্তু তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল—সবটাই ভগবানের ইচ্ছে, সে শুধু নিমিত্তমাত্র। ছোট্টো মেয়েটির বিবেক কিন্তু প্রবোধ মানল না। তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল—ভাইদের মুক্ত করা তার পবিত্র কর্তব্য। দিনে রাতে তার মনে আর শান্তি রইল না। তাই চুপি চুপি একদিন সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল তার ভাইদের খোঁজে। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করল বরাতে যাই থাকুক, ভাইদের সে শাপমুক্ত করবে।

সঙ্গে সে নিল ছোট্টো একটা আংটি তার বাবা-মার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। আর নিল খিদের জন্য একটা পাউরুটি, তেষ্টার জন্য এক মগ জল, আর ক্লান্ত হলে ভর দেবার জন্য একটা লাঠি।

ঘুরতে-ঘুরতে ঘুরতে-ঘুরতে সে পৌঁছল পৃথিবীর শেষ প্রান্তে। তার পর সে গেল সূর্যের কাছে। কিন্তু সূর্য ভয়ংকর আর অসম্ভব গরম। কচি-কচি ছেলেমেয়েদের সে খেয়ে ফেলে। চট্‌পট্‌ সেখান থেকে পালিয়ে সে গেল চাঁদের কাছে। কিন্তু চাঁদ ভীষণ ঠাণ্ডা, তার উপর নিষ্ঠুর আর শয়তান। ছোট্টো মেয়েটিকে দেখে সে বলল, "হাঁউ-মাউ-খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ।" তাই মেয়েটি প্রাণপণে ছুট্টে গেল নক্ষত্রদের কাছে। তারা বন্ধুর মতো। স্বভাবটাও দয়ালু। এক-একজন বসেছিল একেকটি ছোটো চেয়ারে।

শুকতারা উঠে তাকে কাঠের ছোট্টো একটি পা দিয়ে বলল, "এই পা না থাকলে কাচের পাহাড়ের মধ্যে তুমি যেতে পারবে না। সেই কাচের পাহাড়েই তোমার ভাইরা আছে।"

সেই কাঠের পা আলোয়ানে জড়িয়ে মেয়েটি গেল কাচের পাহাড়ে। সেখানে পৌঁছে আলোয়ান খুলে কাঠের পা'টা বার করতে গিয়ে মেয়েটি দেখে সেটা নেই—দয়ালু তারার উপহারটা গেছে হারিয়ে। কী তখন সে করে? আন্তরিকভাবে সে চেয়েছিল ভাইদের বাঁচাতে। কিন্তু কাচের পাহাড়ে যাবার চাবিকাঠি সে ফেলেছে হারিয়ে। দয়ালু ছোট্টো বোনটি তখন একটা ছুরি দিয়ে তার কড়ে আঙুলটা কেটে দরজার মধ্যে ঢোকাল আর ভারি খুশি হয়ে দেখল দরজাটা খুলে যেতে।

ভিতরে যেতে একটি বামন তার কাছে গিয়ে বলল, "বাছা কী খুঁজছ?"

মেয়েটি বলল, "খুঁজছি আমার সাত ভাইকে, সেই সাতটি দাঁড়কাককে।"

বামন বলল, "দাঁড়কাক প্রভুরা এখন বাড়ি নেই। তাঁদের না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাও তো ভেতরে এসো।"

তার পর সেই বামন দাঁড়কাকদের খাবার নিয়ে এল সাতটা ছোটো প্লেটে। সাতটা ছোটো গেলাসে আনল জল। ছোটো বোনটি প্রত্যেক প্লেট থেকে খেল এক টুকরো করে রুটি, প্রত্যেক গেলাসে দিল একবার করে চুমুক। শেষ গেলাসে সে ফেলে দিল সেই ছোট্টো আংটিটা, বাড়ি থেকে যেটা এনেছিল। হঠাৎ সে শুনতে পেল ডানার ঝট্‌পট্‌ শব্দ। বামন বলল, "দাঁড়কাক প্রভুরা উড়তে-উড়তে বাড়ি ফিরছেন।"

ফিরে এসেই তারা বসল তাদের ছোটো-ছোটো প্লেট আর গেলাসের সামনে। তার পর তাদের একজন বলে উঠল, "কে আমার প্লেট থেকে খেয়েছে? কে আমার গেলাসে চুমুক দিয়েছে?—নিশ্চয়ই কোনো মানুষ!" সাতজনের জন চুমক দিয়ে গেলাসে শেষ করতে তলা থেকে গড়িয়ে বেরিয়ে এল আংটিটা।

আংটিটা দেখেই সে চিনল—সেটা অর মা-বাবার। তাই সে চেঁচিয়ে উঠল, "ভগবান আমাদের ছোট্টো বোনটিকে পাঠালে এই জাদুর মায়া থেকে আমরা মুক্তি পেতাম!"

দরজার আড়াল থেকে মেয়েটি এতক্ষণ তাদের কথা শুনছিল। দাঁড়কাকের কামনার কথা শুনে সে বেরিয়ে এল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই সাতটা দাঁড়কাক ফিরে পেল তাদের মানুষের দেহ। তার পর সবাই সবাইকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল আর মনের আনন্দে ফিরে গেল নিজেদের বাড়িতে।

খরগোশের বউ

এক সময় এক মা আর তার মেয়ে একটা বিরাট বাড়িতে থাকত। বাড়িটার চার দিকে ছিল বাঁধাকপির বাগান। শীতকালে প্রকাণ্ড একটা খরগোশ এসে বাঁধাকপিগুলো খেয়ে ফেলত। মা তার মেয়েকে বলল, "মার্থা, বাগানে গিয়ে খরগোশটাকে তাড়িয়ে দে।"

মার্থা বাগানে গিয়ে চেঁচাতে লাগল, "হ্যাট্, হ্যাট্—চোর খরগোশ কোথাকার! এখান থেকে পালা। বাঁধাকপিগুলো খাস না।"

খরগোশ বলল, "মার্থা, আমার লেজে এসে বসো। তোমাকে আমার গর্তে নিয়ে যাব।"

মার্থা বলল, "না, ধন্যবাদ।"

পরদিন খরগোশটা আবার এসে বাঁধাকপিগুলো খেয়ে ফেলল। মা তার মেয়েকে বলল, "বাগানে গিয়ে খরগোশটাকে তাড়িয়ে দে।"

বাগানে গিয়ে মার্থা দু হাতে তালি বাজিয়ে বলল, "হ্যাট্, হ্যাট্! এখান থেকে পালা! আমাদের বাঁধাকপি খাস না।"

মুখে মুখে খরগোশ জবাব দিল, "মার্থা, আমার লেজে এসে বসো। তোমাকে আমার সুন্দর গর্তে নিয়ে যাব।"

মার্থা বলল, "না, ধন্যবাদ।"

তৃতীয় দিনে আবার এল খরগোশটা। মা তার মেয়েকে বলল, "মার্থা, বাগানে গিয়ে খরগোশটাকে তাড়িয়ে দে।"

মার্থা বাগানে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "হ্যাট্, হ্যাট্! এখান থেকে পালা। আমাদের বাঁধাকপি খাস না।"

আর তৃতীয়বার খরগোশ তাকে বলল, "মার্থা, আমার লেজে এসে বসো। তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাব।"

এবার মার্থা গিয়ে বসল তার লেজে আর খরগোশ তাকে নিয়ে গেল অনেক অনেক দূরে।

তার পর তারা খরগোশের ছোট্টো বাড়িতে পৌঁছলে খরগোশ বলল, "লতা-পাতা দিয়ে স্যুপ বানাও। আমি চললাম বিয়ের নেমন্তন্ন সারতে।"

খানিক বাদে দলে-দলে আসতে লাগল অতিথি-অভ্যাগতের দল। (জানো, তারা কারা? আমি বলে দিতে পারি কে, কারণ একজন আমাকে কথাটা বলেছিল। তারা সবাই খরগোশ, শুধু পাদরি আর সেক্সটন ছাড়া। পাদরি হল কাক আর সেক্সটন শেয়াল। বিয়ের বেদী ছিল একটা রামধনু)।

মার্থার মন খারাপ হয়ে গেল। কারণ বাড়িতে সে ছাড়া আর কোনো মেয়ে ছিল না।

খরগোশ তার কাছে গিয়ে বলল, "মন খারাপ কোরো না, মন খারাপ কোরো না! অতিথিরা সবাই খুব আমুদে।" কিন্তু বিয়ের কনে কোনো জবাব দিল না। শুধু কাঁদতে লাগল।

খরগোশ চলে গেল। কিন্তু খানিক পরে আবার ফিরে এসে বলল, "মন খারাপ কোরো না, মন খারাপ কোরো না! অতিথিদের খিদে পেয়েছে।"

বিয়ের কনে কোনো কথা বলল না। আরো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

আবার খরগোশ ফিরে এসে বলল, "কান্না থামাও, কান্না থামাও! অতিথিরা অপেক্ষা করছে।"

বিয়ের কনে তবু কোনো কথা বলল না। খরগোশ চলে যেতে খড়ের একটা পুতুলকে নিজের পোশাক পরিয়ে, তার হাতে একটা চামচ ধরিয়ে, সস্‌প্যানে লতাপাতাগুলো ভরে উনুনে চড়িয়ে সে বাড়ি ফিরে গেল তার মার কাছে।

মিস্টার খরগোশ আবার এসে বলল, "ওঠো গিন্নী, ওঠো।" তার পর রেগে পুতুলটার মাথার একপাশে যেই-না চড় কষিয়েছে, সেটার টুপি পড়ল খসে। মিস্টার খরগোশ তখন টের পেল তার কনে পালিয়েছে। তাই সে ভারি মুষড়ে পড়ল।

বারোজন শিকারী

এক সময় এক রাজপুত্তুর একটি মেয়েকে খুব ভালোবাসত। একদিন মেয়েটির পাশে মনের আনন্দে সে যখন বসে। এমন সময় খবর এল তার বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাকে দেখতে চান। মেয়েটিকে তাই সে বলল, "আমি চললাম। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এই আংটিটা রাখো। আমি রাজা হলে পর তোমাকে নিতে আসব।" এই-না বলে ঘোড়ায় চড়ে সে চলে গেল আর যখন সে রাজার কাছে পৌঁছল তখন রাজার শেষ অবস্থা। রাজা তাকে বললেন, "মরবার আগে তোকে একবার দেখতে চেয়েছিলাম। আমাকে কথা দে আমার ইচ্ছেমতো বিয়ে করবি বলে।" এই-না বলে এক রাজকন্যের তিনি নাম করলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল তাকেই রাজপুত্তুর বিয়ে করে। রাজপুত্তুর তখন শোকে এমন মুষড়ে পড়েছিল যে সে কী বলছে সেটা তার খেয়াল ছিল না, তাই রাজাকে সে কথা দিল—তাঁর ইচ্ছেমতোই সেই রাজকন্যেকে সে বিয়ে করবে বলে। ছেলের কথা শোনার পর রাজা চিরদিনের মতো চোখ বুজলেন।

রাজপুত্তুর তার পর রাজা হল আর শোকের সময় কাটার পর তার মনে হল রাজার কাছে যে-প্রতিজ্ঞা সে করেছিল সেটা তাকে মানতেই হবে। তাই রাজা যে-রাজকন্যেকে পছন্দ করেছিলেন তাকে আনবার জন্য দূত পাঠানো হল।

যে-মেয়েটিকে আগে সে বলেছিল বিয়ে করবে, এই খবর শুনে কেঁদে-কেঁদে তার মরার দশা।

মেয়ের বাবা তাই দেখে বলল, "বাছা, এমন মনমরা হয়ে পড়েছিস কেন? তোর মন ভালো করার জন্যে যা বলবি তাই করব।"

খানিক ভেবে মেয়েটি বলল, "বাবা, ঠিক আমার মতো দেখতে আর আমার মাথায়-মাথায় এগারোজন কুমারী মেয়ে আমার চাই।"

রাজা বললেন, "সেরকম মেয়ে পাওয়া গেলে নিশ্চয়ই এনে দেবো।" এই-না বলে তাঁর রাজ্যের সব জায়গায় তিনি দূত পাঠালেন। খুঁজে-খুঁজে তারা এগারোজন মেয়েকে বার করল যারা দেখতে হুবহু তাঁর মেয়ের মতো আর তার মাথায়-মাথায়।

তারা এলে দর্জিকে মেয়েটি বলল, বারোটা শিকারীর পোশাক বানাতে। আর পোশাকগুলো তৈরি হলে পর এগারোজন মেয়েকে সে পরাল এগারোটা পোশাক আর নিজে পরল একটা। তার পর বাবার কাছে বিদায় নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে সে গেল বাগ্‌দত্ত সেই রাজপুত্তুরের রাজসভায় যাকে সে মনে-প্রাণে ভালোবাসত। গিয়ে সে তাকে জিগ্‌গেস করল তার শিকারীর দরকার কি না আর থাকলে তাদের বারোজনকেই চাকরিতে সে বহাল করবে কি না।

রাজা তার দিকে তাকাল, একেবারেই চিনতে পারল না। কিন্তু সবাইকে দেখতে সুন্দর বলে রাজা বলল তাদের চাকরি দেবে। তাই তারা হয়ে গেল রাজার শিকারী।

রাজার একটা আশ্চর্য সিংহ ছিল। লোকের মনের কথা সে পারত বলে দিতে আর জানত সব গোপনীয় খবরাখবর। একদিন রাজাকে সে বলল, "মহারাজ আপনি কি মনে করেন ঐ তরুণরা বারোজন শিকারী?"

রাজা বলল, "হ্যাঁ, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।"

সিংহ বলল, "মহারাজ, আপনার ধারণা ভুল। ওরা হল বারোটি মেয়ে।"

রাজা বলল, "হতেই পারে না। তোমার কথা যে সত্যি তার প্রমাণ কী?"

সিংহ বলল, "মহারাজ, আপনার পাশের ঘরে মটরদানা ছড়িয়ে দিন; তা হলেই দেখবেন আমার কথা সত্যি। পুরুষরা দৃঢ় পায়ে হাঁটে। মটরদানা না ঘেঁটে তারা ডিঙিয়ে যাবে। কিন্তু মেয়েরা হাঁটে এলোমেলো পায়ে। মটরদানা তারা ছড়িয়ে ফেলবে।"

সিংহের কথামতো রাজা মেঝেয় ছড়াল মটরদানা।

কিন্তু রাজার এক চাকর কথাটা আড়ি পেতে শুনেছিল। শিকারীদের সে ভালোবাসত। তাই তাদের কাছে গিয়ে সব কথা সে দিল ফাঁস করে।

রাজকন্যে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে মেয়েদের বলল, "দৃঢ় পায়ে মটর-দানার ওপর দিয়ে হেঁটো।"

পরদিন সকালে বারোজন শিকারীকে রাজা ডেকে পাঠালেন তাঁর পাশের ঘরে আর মেয়েরা এমন দৃঢ় পায়ে হেঁটে গেল যে একটি মটর-দানাও নড়ল না।

ঘর থেকে তারা বেরিয়ে যেতে সিংহকে রাজা বললেন, "দেখলে তো, তোমার কথাটা ভুল। ওরা হেঁটেছে পুরুষের মতো দৃঢ় পায়ে।"

কিন্তু সিংহ বলল, "ওরা জানত ওদের পরখ করা হবে। তাই হেঁটেছে পরুষালি ঢঙে। আপনার পাশের ঘরে বারোটা চরকা রাখুন। তা হলেই দেখবেন ওরা কী রকম খুশি হয়ে চরকাগুলোর দিকে ছুটে যাবে। পুরুষ হলে চরকাগুলো লক্ষ্যই করবে না।"

সিংহের পরামর্শমতো চরকাগুলো রাজা রাখলেন পাশের ঘরে।

কিন্তু সেই চাকর আবার তাদের কাছে গিয়ে কথাটা ফাঁস করে দিল।

রাজকন্যে তার এগারোজন মেয়েদের বলল, "চরকাগুলোর দিকে এক্কেবারে তাকাবে না।"

পরদিন সকালে রাজা তার শিকারীদের ডেকে পাঠাল। কিন্তু চরকাগুলোর দিকে তারা ফিরেও তাকাল না।

সিংহকে রাজা আবার বললেন, "দেখলে তো, তোমার কথাটা ভুল। চরকাগুলোর দিকে ওরা ফিরেও তাকায় নি। ওরা নিশ্চয়ই পুরুষ।"

সিংহ বলল, "ওরা জানত ওদের পরখ করা হবে। তাই প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল চরকাগুলোর দিকে না তাকাতে।"

কিন্তু সিংহের কথায় রাজার আর বিশ্বাস রইল না।

বারোজন শিকারী রাজার সঙ্গে সব সময়ের যেতে থাকে শিকারে আর রাজা যত তাদের দেখেন ততই পছন্দ করেন তাদের।

একদিন হল কি, তারা যখন শিকারে বেরিয়েছে রাজার কাছে

খবর এল তার বাবার পছন্দের সেই রাজকন্যে আসছে। কথাটা শুনে শোকে দুঃখে আসল কন্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

রাজা ভাবলেন নিশ্চয়ই তাঁর প্রিয় শিকারীর ভীষণ অসুখ করেছে। তাই নিজে গিয়ে তার পাশে নতজানু হয়ে বসে তার হাতের দস্তানা ফেললেন খুলে আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল সেই আংটি, প্রথম রাজকন্যেকে যেটা তিনি দিয়েছিলেন। তার মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে রাজা তখন তাকে চিনতে পারলেন।

আবেগে অভিভূত হয়ে রাজা তাকে চুমু খেতে রাজকন্যে চোখ মেলে তাকাল। আর রাজা বলে উঠল, "তুমি আমার, আমি তোমার। পৃথিবীর কেউ আমাদের আর আলাদা করে দিতে পারবে না।"

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় রাজকন্যের কাছে ঘোড়া ছুটিয়ে দূত পাঠানো হল। দূত তাকে গিয়ে বলল, তাকে তার রাজত্বে ফিরে যেতে, কারণ রাজা খুঁজে পেয়েছেন তাঁর আসল রানীকে। কিছুদিনের মধ্যেই খুব ধুমধাম করে তাদের বিয়ে হয়ে গেল আর সিংহ রইল আগের মতোই বহাল হয়ে—কারণ বরাবর সে সত্যি কথাই বলেছিল।



ঘুণপোকা আর নীলমাছি

ছোট্টো একটা ঘুণপোকা আর নীলমাছি এক বাড়িতে থাকত। ডিমের খোলায় রান্না করত তারা ঝোল। একদিন ঘুণপোকা সেই ডিমের খোলার মধ্যে পড়ে ঝলসে গেল। তাই-না দেখে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগল নীলমাছি। তার কান্না শুনে বৈঠকখানার ছোট্টো দরজাটা ক্যাচ্‌ক্যাচ্‌ করে প্রশ্ন করল, "নীলমাছি কাঁদছিস কেন?"

নীলমাছি বলল, "আমার ঘুণপোকা ঝলসে গেছে।"

দরজাটা ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্‌ করে চলল।

ঘরের কোণের ছোট্টো ঝাঁটা প্রশ্ন করল, "দরজাবাবু, ক্যাচ্‌ক্যাচ্‌ কর কেন?"

"কেন করব না?

ঘুণপোকা যে ঝলসেছে,
নীলমাছি যে কাঁদছে।"

তাই-না শুনে ঘ্যাস্‌ঘ্যাঁস্‌ ঝাঁটা ঝেঁটিয়ে চলল। তাই দেখে দাঁড়ি-পাল্লা প্রশ্ন করল, "ঝাঁটা, ঘ্যাঁস্‌ঘ্যাঁস্‌ করে ঝেঁটাস কেন?"

ঝাঁটা উত্তর দিল, "ঝেঁটাব না কেন?

ঘুণপোকা যে ঝলসেছে,
নীলমাছি যে কাঁদছে,
দরজা যে ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্‌ করছে।"

তাই-না শুনে দাঁড়িপাল্লা বলল, "আমি ছুটব।"

গোবর গাদার পাশ দিয়ে সে ছুটে যেতে গোবর গাদা প্রশ্ন করল, "দাঁড়িপাল্লা, ছুটিস কেন?"

দাঁড়িপাল্লা বলল, "ছুটব না কেন ?

ঘুণপোকা যে ঝলসেছে,
নীলমাছি যে কাঁদছে,
দরজা যে ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্‌ করছে,
ঝাঁটা যে ঝেঁটাচ্ছে।"

তাই-না শুনে গোবর গাদা বলল, "আমার গায়ে আগুন দিয়ে পাগলের মতো পুড়ব।" বলে সে লাগল জ্বলতে।

গোবর গাদার পাশের ছোট্টো গাছ প্রশ্ন করল, "গোবর গাদা, অমন করে পুড়িস কেন ?"

গোবর গাদা বলল, "পুড়ব না কেন ?

ঘুণপোকা যে ঝলসেছে,
নীলমাছি যে কাঁদছে,
দরজা যে ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্‌ করছে,
ঝাঁটা যে ঝেঁটাচ্ছে,
দাঁড়িপাল্লা যে ছুটছে।"

তাই-না শুনে গাছ বলল, "আমিও তা হলে কাঁপব।" বলে এমন সে কাঁপতে লাগল যে, ঝরে গেল তার সব পাতা।

ছোট্টো একটি মেয়ে কলসি-কাঁখে জল আনছিল। গাছকে কাঁপতে দেখে সে প্রশ্ন করল, "গাছ, অমন করে কাঁপিস কেন ?"

গাছ বলল, "কাঁপব না কেন ?

ঘুণপোকা যে ঝলসেছে,
নীলমাছি যে কাঁদছে,
দরজা যে ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্‌ করছে,
ঝাঁটা যে ঝেঁটাচ্ছে,
দাঁড়িপাল্লা যে ছুটছে,
গোবর গাদা যে জ্বলছে।"

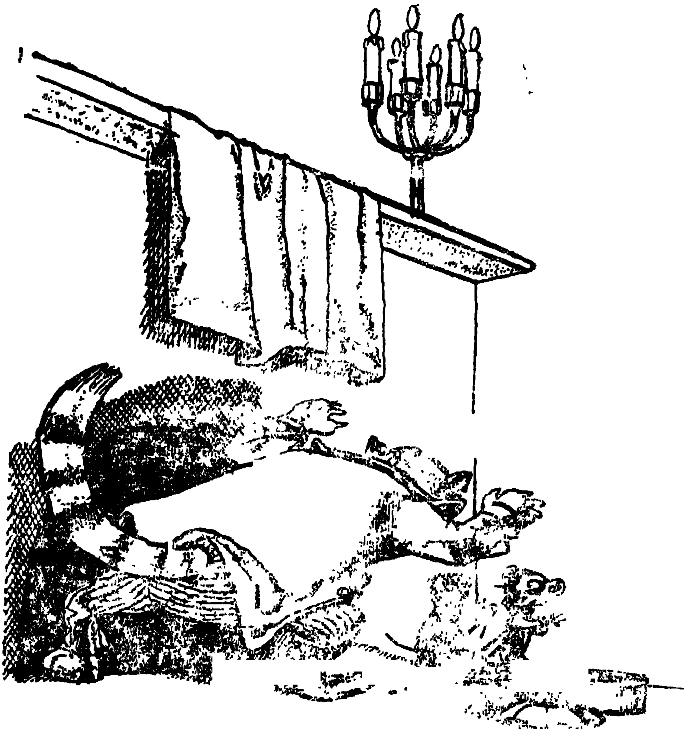
তাই-না শুনে মেয়েটি বলল, "আমি তা হলে কলসিটা ভাঙব।" বলে কলসিটা মাটিতে আছড়ে সে টুকরো-টুকরো করে ফেলল।

ছোট্টো নদী প্রশ্ন করল, "কলসিটা ভাঙিস কেন ?"

মেয়েটি বলল, "ভাঙব না কেন ?

ঘুণপোকা যে ঝলসেছে,
নীলমাছি যে কাঁদছে,
দরজা যে ক্যাচ্‌ক্যাচ্‌ করছে,
ঝাঁটা যে ঝেঁটাচ্ছে,
দাঁড়িপাল্লা যে ছুটছে,
গোবর গাদা যে জ্বলছে,
গাছটা যে কাঁপছে।"

তাই-না শুনে ছোট্টো নদী বলল, "আমি তা হলে উপছে পড়ব।" বলে ছোট্টো নদী এমন বাণ ডাকালে যে, তাতে সব-কিছু গেল ভেসে— মেয়ে, গাছ, গোবর গাদা, দাঁড়িপাল্লা, ঝাঁটা, দরজা, নীলমাছি, আর ঘুণপোকা।



বেড়াল আর ইঁদুরের সংসার

এক বেড়ালের সঙ্গে এক ইঁদুরের একবার আলাপ হয়। বেড়ালটা এমন আদর আদিখ্যেতা দেখায় যে, শেষপর্যন্ত ইঁদুরটা তার সঙ্গে একই ঘরে সংসার পাততে হয় রাজি।

বেড়াল বলল, "শীতকালের জন্যে আমাদের খাবার জমিয়ে রাখতেই হবে। নইলে খিদের জ্বালায় মরব। তুই ইঁদুর, তাই যেখানে খুশি যেতে পারিস না। বেশি ঘোরাঘুরি করলে শেষপর্যন্ত জাঁতিকলে মারা পড়বি।"

বেড়ালের উপদেশমতো ছোটো এক ডিবে চর্বি কেনা হল। কিন্তু

কোথায় সেটা তুলে রাখা যায় তারা ভেবে পেল না। শেষটায় অনেক ভেবেচিন্তে বেড়াল বলল, "মনে হচ্ছে গির্জের চেয়ে নিরাপদ আর কোনো জায়গা নেই। গির্জেয় কারুর নেই চুরি করার সাহস। বেদীর নীচে এটা আমরা রেখে দেবো। সত্যিকারের দরকার না পড়লে ছোঁব না।"

সেই নিরাপদ জায়গায় ডিবেটা রাখা হল। কিন্তু কয়েকদিন যেতে-না-যেতেই বেড়ালের খুব লোভ হল চর্বিটা চেখে দেখার। তাই ইঁদুরকে সে বলল, "শোন ভাই ইঁদুর, আমার বোনপোর ধর্মমা হবার জন্যে ওরা আমায় ধরেছে। হালে আমার বোনের ছেলে হয়েছে। ধবধবে রঙ, তার ওপর বাদামী ছোপ। তার নামকরণের দিন আমায় গিয়ে পবিত্র জলের গামলা ধরতে হবে। আমি গেলে বাড়ি থেকে তুই বেরুস নি। ঘর-সংসার আগলাবি।"

ইঁদুর বলল, "ঠিক আছে। যাবে বৈকি। শুধু ভালো ভালো জিনিস খাবার সময় আমার কথাটা ভেবো। নামকরণের মিষ্টি মদের কয়েক ফোঁটা চাখবার আমারও খুব ইচ্ছে।"

আসলে বেড়ালের কথাগুলোর পুরোটাই মিথ্যে। তার কোনো বোন-টোন ছিল না। কেউই তাকে ধর্মমা হতে বলে নি। বেড়ালটা সোজা গির্জেয় হাজির হয়ে চোরের মতো চুপি চুপি সেই চর্বির ডিবের কাছে গেল। তার পর সেটার গা-দিয়ে গড়ানো সব চর্বি চেটেপুটে করল শেষ। তার পর সে শহরের বাড়ির ছাদে-ছাদে ঘুরে, কোথায় কী চুরি-টুরি করা যায় উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে রোদে টান-টান হয়ে শুয়ে চর্বির ডিবেটার কথা ভাবতে-ভাবতে নিজের গোঁফ চাটতে লাগল। সন্ধেয় ফিরল বাড়ি।

ইঁদুর বলল, "কেমন আমোদ-আহ্লাদ হল?"

বেড়াল বলল, "মন্দ নয়।"

"ছেলের নাম কি হল?"

"ছাল-ওঠা," রসকষহীন স্বরে বলল বেড়াল।

ইঁদুর বলল, "ছাল-ওঠা? কী বেখাপ্পা নাম! এটা কি ওদের পদবি?"

বেড়াল বলল, "বেখাপ্পা কেন? তোর ঠাকুর্দার নাম ছিল তো রুটি-চোর। আশাকরি তার চেয়ে এটা খারাপ নাম নয়।"

কিছুদিন যেতে-না-যেতেই আবার বেড়াল লোভে উস্‌খুস্ করে উঠল। বলল, "ইঁদুর ভাই! আজ আবার তোকে একলা বাড়ি

আগলাতে হবে। দ্বিতীয়বার ধর্মমা হবার ডাক পড়েছে। বাচ্ছাটার গলার চার দিকে সাদা দাগ। আমাকে যেতেই হবে।"

ভালোমানুষ ইঁদুর সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। শহরের দেয়ালের উপর দিয়ে চোরের মতো চুপি চুপি গির্জেতে পেঁ ৗছে চেটে ডিবের অর্ধেকটা শেষ করে ফেলল বেড়াল।

তার পর বলল, "একলা-একলা খাবার মতো সুখ আর নেই।" মনে হল সেদিনকার মতো কাজ হাসিল করে সে বেজায় তৃপ্তি পেয়েছে।

সে ফিরলে ইঁদুর জিগ্‌গেস করল, "বাচ্চার নাম কী হল?"

বেড়াল বলল, "আধ-খালি।"

ইঁদুর বলল, "আধ-খালি? জীবনে তো এরকম নাম শুনি নি। হলফ করে বলতে পারি পাঁজিতে এরকম নাম নেই।"

অল্প কদিন পরে বেদীর নীচেকার সেই ডিবের কথা মনে পড়তেই বেড়ালের জিভে আবার জল এল। ইঁদুরকে বলল, "ভালো সব-কিছুই তিন-তিনটে করে হয়। তাই তৃতীয়বার আমাকে ধর্মমা হতে হবে। বাচ্ছাটা কুচকুচে কালো, শুধু কয়েক জায়গায় সাদা সাদা ছোপ। আর কোথাও একগাছা সাদা লোম নেই। এরকমটা কালেভদ্রে ঘটে। তাই আর-এক বার আমাকে বেরুতে হচ্ছে।"

চিন্তিতভাবে ইঁদুর বলল, "ছাল-ওঠা। আধ-খালি! এই অদ্ভুত নামগুলোর মাথামুণ্ডু বুঝছি না।"

"সারাদিন বাড়িতে ছাই রঙের কোট পরে আর লম্বা ল্যাজ নিয়ে বসে থাকতে থাকতে যত সব উদ্ভট ভাবনা তোর মাথায় আসে। কখনো বাইরে না বেরুলে এরকমটাই হয়।"

বেড়াল বেরিয়ে যেতে সব-কিছু ঝেড়ে-মুছে বাড়িটা ঝকঝকে তক-তকে করে তুলল ইঁদুর। পেটুক বেড়াল এদিকে চেটেপুটে সাফ করে দিল ডিবেটা। মনে মনে বলল, 'আঃ! শেষ হলে পরেই শান্তি।' সন্ধেয় নাদুস্-নুদুস্ চেহারা নিয়ে সে বাড়ি ফিরল। সঙ্গে সঙ্গে ইঁদুর জিগ্‌গেস করল তৃতীয় বাচ্ছাটার কী নামকরণ হল।

বেড়াল বলল, "নামটা নিশ্চয়ই তোর পছন্দসই হবে না। নাম দেওয়া হয়েছে সব-খালি।"

ইঁদুর বলে উঠল, "সব-খালি! ছাপার অক্ষরে এরকম নাম তো

কখনো দেখি নি। সব-খালি—কথাটার মানে কী?" মাথা নাড়িয়ে শরীরটা গোল করে পাকিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

এর পর থেকে কেউ আর বেড়ালকে নামকরণের নেমন্তন্ন করে না। কিন্তু শীত পড়ার পর খাবার-দাবার টান পড়তে গির্জেয় তাদের সেই জমানো চর্বির ডিবেটার কথা ইঁদুরের মনে পড়ল। বলল, "চল ভাই বেড়াল, আমাদের সেই জমিয়ে রাখা চর্বির ডিবেটা চেকে আসা যাক।"

বেড়াল বলল, "বেশ কথা। কিন্তু গিয়ে দেখবি চাখবার কিছু নেই। জানলা দিয়ে তোর ছোটো জিভ বার করার মতোই পণ্ডশ্রম হবে।"

গির্জেয় গিয়ে যথাস্থানেই তারা দেখল ডিবেটা, কিন্তু একদম সেটা ফাঁকা।

ইঁদুর বলল, "এবার পরিষ্কার বুঝলাম কী হয়েছে। বাস্তবিকই তুমি দেখছি আসল বন্ধু। ধর্মমা হবার নাম করে এসে সবটাই তুমি গোগ্রাসে গিলেছ। প্রথমে চেটেছিলে বাইরেটা। তার পর চেটেপুটে করেছিলে আধ-খালি। আর তার পর—"

বেড়াল চেঁচিয়ে বলল "বকবকানি থামাবি? আর একটা কথা খসালেই তোকেও সাবাড় করব।"

বেচারা ইঁদুরের জিভের ডগায় ততক্ষণে কিন্তু এসে গেছে—"সব-খালি।" সঙ্গে সঙ্গে বেড়াল তার উপর ঝাঁপিয়ে কুড়্‌মুড়্‌ করে চিবিয়ে তাকে গিলে ফেলল।

দেখলে তো—একেই বলে সংসার।

বাজিকর আর তার ওস্তাদ

জান চেয়েছিল তার ছেলে যে-কোনো একটা পেশা শিখুক। তাই সে গির্জেয় গেল প্রার্থনা করতে আর ভগবানকে জিগ্‌গেস করতে—কোন পেশা তার ছেলের পক্ষে হবে সব চেয়ে উপযুক্ত।

স্যাক্রিস্টান[১] পূজাবেদী সাজাচ্ছিল। বিড়্‌বিড়্‌ করে সে বলে উঠল, "ভোজবাজি ঃ ভোজবাজির পেশা।"

জান সোজা তার ছেলের কাছে গিয়ে বলল তাকে ভোজবাজি শিখতে হবে। কারণ সেটাই ভগবানের আদেশ। এই-না বলে ছেলের সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়ল ভোজবাজি শেখাবার গুরুর খোঁজে।

সারাদিন হাঁটার পর তারা পৌঁছল এক বনে। সেখানে এক কুঁড়ে-ঘরে এক বুড়ি থাকত। বুড়িকে জান জিগ্‌গেস করল ভোজবাজি শেখাবার মতো কেউ সেখানে থাকে কি না।

বুড়ি বলল, "হ্যাঁ, এখানে তোমার ছেলে শিখতে পারে। কারণ ভোজবাজির ব্যাপারে আমার ছেলের জুড়ি নেই।"

বুড়ির ছেলেকে জান দেখতে চাইলে কুঁড়েঘরে থেকে সে বেরিয়ে এসে বলল, "তোমার ছেলেকে আমি শেখাব। একবছর পরে ফিরে এসে যদি তুমি তাকে চিনতে পার তা হলে কোনো টাকাকড়ি নেব না। কিন্তু চিনতে না পারলে আমাকে দুশো মোহর দিতে হবে।"

[১]গির্জের যে-লোক ঐকতান-সংগীতের কথাগুলো নকল আর পুঁথিপত্রের দেখাশোনা করে।

ভোজবাজি আর ডাকিনীবিদ্যা শেখার জন্য ছেলেকে সেখানে রেখে জান বাড়ি ফিরে গেল।

একবছর পূর্ণ হবার পর জান ভাবল, ছেলেকে সে চিনতে পারবে কি না, আর না পারলে কী তার হবে।

বনে যাবার পথ ধরে যেতে-যেতে তার সঙ্গে ছোট্টোখাট্টো একটি মানুষের দেখা। সে তার কাছে এসে বলল, "বন্ধু, কী হয়েছে? তোমাকে এমন মনমরা দেখাচ্ছে কেন?"

জান বলল, "একবছর আগে ভোজবাজি শেখার জন্যে এক বাজি-করের কাছে আমার ছেলেকে রেখে গিয়েছিলাম। সে আমাকে বলেছিল এক বছর পরে ফিরে গিয়ে যদি তাকে চিনতে পারি তা হলে টাকাকড়ি নেবে না। কিন্তু চিনতে না পারলে আমাকে দিতে হবে দুশো মোহর। এখন আমার ভয় হচ্ছে—হয়তো চিনতে পারব না। না পারলে ভেবে পাচ্ছি না অতগুলো মোহর কোথা থেকে পাব।"

বুড়ো বলল, "তোমাকে কী করতে হবে বলি, শোনো। উনুন থেকে এক ঝুড়ি রুটি নিয়ে গিয়ে ছড়িয়ে দিয়ো। আপেলগাছ থেকে দেখবে একটা খাঁচা ঝুলছে। একটা ছোট্টো পাখি সেই খাঁচা থেকে বেরিয়ে রুটির টুকরো ঠুকরে খাবে। সেই পাখিটাই তোমার ছেলে।"

বাড়ি গিয়ে জান এক ঝুড়ি কালো রুটি এনে ছোট্টো মানুষটির কথামতো ছড়িয়ে দিল। আর তার পর সেই পাখিটা লাফিয়ে নামতে সে বলে উঠল, "আরে, তুই-ই আমার ছেলে—তাই-না?"

বাবাকে তার সঙ্গে কথা বলতে শুনে ছেলে খুব খুশি হল আর সেই ওস্তাদ জাদুকর রেগে চেঁচিয়ে উঠল, "নিশ্চয়ই শয়তান নিজে তোমাকে বলে দিয়েছিল। নইলে ছেলেকে চেনার সাধ্যি তোমার ছিল না।"

ছেলে তখন বলল, "বাবা, এবার একসঙ্গে বাড়ি ফেরা যাক।"

বাড়ি যাবার পথে একটা জুড়ি-গাড়ি আসতে তারা দেখল। ছেলে তার বাবাকে বলল সে একটা গ্রে-হাউণ্ড কুকুর হয়ে যাবে। তা হলে তাকে বিক্রি করে তার বাবা পারবে মোটা টাকা রোজগার করতে।

জুড়ি-গাড়িটা থেকে এক ভদ্রলোক লাফিয়ে নেমে প্রশ্ন করলেন, "ওহে কত্তা, কতয় কুকুরটা বিক্রি করবে?"

জান বলল, "ত্রিশ মোহর।"

ভদ্রলোক বললেন, "দামটা খুব চড়া। কিন্তু কুকুরটা খুব তাগড়াই; তাই ঐ দামেই কিনব।"

ভদ্রলোক দাম চুকিয়ে কুকুর নিয়ে জুড়ি-গাড়িতে উঠলেন। কিন্তু খানিক দূর যেতে-না-যেতেই এক লাফে কুকুরটা জানালার কাচ ভেঙে বেরিয়ে পড়ল। আর বেরিয়ে এসেই সে আর গ্রে-হাউণ্ড রইল না। দেখা গেল এক তরুণ তার বাবার সঙ্গে চলেছে হেঁটে।

একসঙ্গে তারা বাড়ি ফিরল। পরদিন ছিল পাশের গ্রামে হাটবার। ছেলে তার বাবাকে বলল, "আমি একটা সুন্দর ঘোড়া হয়ে যাচ্ছি। তা হলে হাটে তুমি আমায় বেচতে পারবে। কিন্তু আমার লাগামটা খুলতে যেন ভুলো না। নইলে আর মানুষ হতে পারব না।"

ঘোড়টা নিয়ে বাবা গেল হাটে আর ওস্তাদ বাজিকর এসে ঘোড়াটা কিনে নিল একশো মোহর দিয়ে। বাবা কিন্তু ভুলে গেল লাগামটা খুলে নিতে আর ওস্তাদ বাজিকর ঘোড়াটাকে নিয়ে গিয়ে রাখল একটা আস্তাবলে।

গয়লানি যখন তার পাশ দিয়ে গোরু দুইতে যাচ্ছিল ঘোড়াটা চেঁচিয়ে উঠল, "আমার লাগামটা খোলো! আমার লাগামটা খোলো!"

গয়লানি বলল, "আরে, তুই যে দেখছি কথা বলতে পারিস!" এই-না বলে ঘোড়ার কাছে গিয়ে লাগামটা সে খুলে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া একটা চড়ুই হয়ে উড়ে গেল। ওস্তাদ বাজিকর আর-একটা চড়ুই হয়ে ধাওয়া করল তাকে। তার কাছে পৌঁছে ওস্তাদ বাজিকর জলে ঝাঁপ দিয়ে হয়ে গেল একটা মাছ। ছেলেটিও তার দেখা-দেখি হয়ে গেল মাছ। শেষটায় ওস্তাদ বাজিকর হল একটা মোরগ। আর ছেলেটি একটা শেয়াল হয়ে ওস্তাদ বাজিকরের মুণ্ডু দিল কামড়ে ছিঁড়ে। এইভাবে মরল ওস্তাদ বাজিকর। আজ পর্যন্ত সে মরে পড়ে আছে।



গান গাওয়া হাড়

এক সময় এক দেশে একটা বুনো শুয়োরের দারুণ আতংক ছড়িয়ে পড়ে। চাষীদের ক্ষেতের ফসল সেটা ছারখার করে দিত, ছাগল-ভেড়া গোরু-মোষ মারত আর শিঙ দিয়ে ফালা-ফালা করে দিত লোকজনের শরীর। জন্তুটাকে যে মারতে পারবে তাকে অনেক পুরস্কার দেওয়া হবে বলে রাজা ঘোষণা করলেন। কিন্তু যে বনে শুয়োরটা থাকত কেউ সেখানে সাহস করে গেল না। শেষটায় রাজা ঘোষণা করলেন জন্তুটাকে যে ধরতে কিংবা মারতে পারবে তার সঙ্গে রাজকন্যের বিয়ে দেবেন। সেই দেশে এক গরিব লোকের দুই ছেলে ছিল। দুজনেই তারা জানাল সেই অসমসাহসিক কাজটা করতে তারা প্রস্তুত। বড়ো ছেলেটি খুব ধূর্ত। নেহাত বড়াই করেই কথাটা সে জানাল। ছোটোটি ছিল হাবাগোবা গোছের। কথাটা সে জানাল তাতে লোকের উপকার হবে বলে। রাজা আদেশ দিলেন বনের দু পাশ থেকে তাদের দুজনকে এগুতে। তা হলে

জন্তুটা তাদের নজর এড়িয়ে যেতে পারবে না। বড়ো ভাই গেল সকালে, ছোটো গেল সন্ধেয়। বনে যেতে-যেতে ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হল ছোট্টোখাট্টো একটি লোকের সঙ্গে। তার হাতে ছিল একটা বর্শা।

লোকটি বলল, "এই বর্শাটা নাও। তোমার মন খুব ভালো। তাই এটা দিলাম। এই বর্শা দিয়ে বুনো শুয়োরটাকে আক্রমণ করলে তুমি বিপদে পড়বে না। তোমার কোনো ক্ষতি জন্তুটা করতে পারবে না।"

সেই ছোট্টোখাট্টো মানুষটিকে ধন্যবাদ দিয়ে বর্শা নিয়ে নির্ভীক মনে ছোটো ভাই এগিলে চলল। আর খানিক পরেই দেখল শুয়োরটা তার দিকে তেড়ে আসছে। রাগে গর্ গর্ করতে-করতে এমন জোরে জন্তুটা সেই বর্শার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল যে সঙ্গে সঙ্গে তার বুকটা গেল দু টুকরো হয়ে। রাজার কাছে নিয়ে যাবার জন্য জন্তুটাকে কাঁধে নিয়ে সে ফিরল।

বনের অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় তার নজরে পড়ল একটা বাড়ি। বাড়ির বাইরে বহু লোক মদ-টদ খেয়ে হৈ-হল্লা ফুর্তি-টুর্তি করেছে। তার বড়ো ভাই ছিল সেখানে। ভেবেছিল শুয়োরটার সঙ্গে লড়াই করার আগে মদ খেয়ে সাহস সঞ্চয় করে নেবে। ভেবেছিল কিছুতেই জন্তুটা তাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না। কিন্তু বুনো শুয়োরের মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে ছোটো ভাইকে আসতে দেখে হিংসেয় সে জ্বলে উঠল। তাকে ডেকে বলল, "ওরে, এখানে আয়। বিশ্রাম কর। মদ-টদ খা।"

ছোটো ভাইটির মন খুব সরল। তাই তার সন্দেহ হল না দাদার মনে একটা কুমতলব আছে। সেখানে গিয়ে সব কথা সে জানাল: সেই ছোট্টোখাট্টো লোকটির বর্শা দেবার আর সেটা দিয়ে বুনো শুয়োরকে মারার কথা।

সেই সরাইখানায় বড়ো ভাই তাকে আটকে রাখল রাত পর্যন্ত। তার পর দুজনেই পড়ল বেরিয়ে। যেতে-যেতে গভীর অন্ধকারে তারা পৌঁছল একটা নদীর উপরকার সেতুতে। বড়ো ভাইবলল ছোটোভাইকে আগে-আগে যেতে। আর যেই-না ছোটো ভাই সেতুর মাঝখানে পৌঁছেছে সঙ্গে সঙ্গে বড়ো ভাই তাকে পিছন থেকে ছোরা মেরে দিল নদীর মধ্যে ফেলে। তার পর তাকে সেতুর নীচে কবর দিয়ে, বুনো শুয়োরের মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে রাজাকে বলল সেটাকে মেরেছে সে। তাই তার সঙ্গে রাজা তার

মেয়ের বিয়ে দিলেন। ছোটো ভাই না ফেরায় বড়ো ভাই বলল বুনো শুয়োরটা আগে নিশ্চয়ই তাকে টুকরো-টুকরো করে ফেলেছিল। সবাই তার কথা বিশ্বাস করল।

কিন্তু কিছুই ভগবানের চোখে এড়িয়ে যায় না। তাই এই জঘন্য অপরাধের কথা জানাজানি হয়ে গেল। অনেক বছর পরে এক রাখাল সেই সেতুর উপর দিয়ে যাচ্ছিল তার ভেড়ার পাল নিয়ে। যেতে-যেতে সে দেখে নীচেকার বালিতে পড়ে রয়েছে তুষার-ধবল একটা হাড়। সে ভাবল হাড়টা দিয়ে তার বাঁশির মুখটা ভালো করে বাঁধানো যাবে। নীচে নেমে হাড়টা কুড়িয়ে সেটা দিয়ে সে বাঁধলো তার বাঁশির মুখ। বাঁশিতে ফুঁ দিতেই রাখালকে দারুণ অবাক করে হাড়টা আপনা থেকেই গেয়ে উঠল :

"রাখালভাই শুনবে শোনো
আমার হাড় বাঁশিতে জানো ?
এখানে দাদা মেরেছিল
সেতুর তলে পুঁতেছিল।
বুনো শুয়োর দিয়ে পায়
রাজার মেয়ে রাজ্যসভায়।"

রাখাল বলে উঠল, "বাঁশিটা তো ভারি সুন্দর, আপনা থেকেই গাইতে পারে! রাজার কাছে এটাকে নিয়ে যাই তো।"

রাজার কাছে রাখাল পৌঁছতে বাঁশিতে আবার ঐ গানটা গেয়ে উঠল। গানের প্রতিটি কথা বুঝতে পেরে রাজা আদেশ দিলেন সেতুর তলার মাটি খুঁড়তে। আর মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে পড়ল নিহত ছোটো ভাইয়ের কঙ্কাল।

বড়ো ভাই তার অপরাধ অস্বীকার করতে পারল না। একটা থলিতে ভরে সেটার মুখ সেলাই করে তাকে ডুবিয়ে মারা হল। আর ছোটো ভাইয়ের হাড় গির্জের অঙ্গনে নিয়ে গিয়ে রাখা হল খুব সুন্দর একটি কবরে।



জাঁতাওয়ালার মেয়ে

এক সময় এক জাঁতাওয়ালা ছিল। সে গরিব হলেও তার মেয়েটি ছিল সুন্দরী। একদিন রাজার সঙ্গে সে কথা বলছিল। রাজাকে অবাক করে দেবার জন্য হঠাৎ সে বলে উঠল, "আমার মেয়ে খড় থেকে সোনার সুতো কাটতে পারে।"

রাজা বললেন, "তোমার কথামতো তোমার মেয়ে যদি সত্যি সত্যিই অমন চালাক হয়, তা হলে কাল তাকে আমার দুর্গে নিয়ে এসো। তার এই আশ্চর্য ক্ষমতা আমি পরখ করে দেখতে চাই।"

পরদিন জাঁতাওয়ালা মেয়েটিকে দুর্গে নিয়ে এল। রাজা তাকে নিয়ে গেলেন খড়-ভর্তি এক ঘরে। তার পর তাকে একটা চরকা দিয়ে বললেন, "কাজ শুরু করে দাও। সারা রাত চরকা কেটে কাল সকালের মধ্যে এই খড়গুলো থেকে সোনার সুতো বার করতে না পারলে তোমার প্রাণদণ্ড হবে।" কথাগুলো বলে রাজা নিজেই দরজা বন্ধ করে দিলেন। সেই ঘরে মেয়েটি রইল একা।

সেখানে বসে থাকতে-থাকতে মেয়েটি ভেবে পেল না কী করবে। কারণ সত্যিই সে জানত না খড় থেকে কী করে সোনার সুতো বানাতে হয়। শেষটায় দারুণ ভয় পেয়ে সে কাঁদতে শুরু করে দিল। এমন

সময় হঠাৎ দরজা খুলে ঘরে এল ছোটো একটি মানুষ। সে বলল, "শুভ সন্ধ্যা। তুমি কাঁদছ কেন?"

মেয়েটি বলল, "এই খড় থেকে আমায় সোনার সুতো বার করতে হবে। কিন্তু জানি না কী করে সেটা করতে হয়।"

ছোট্টো মানুষটি বলল, "তোমার হয়ে আমি যদি সোনার সুতো কেটে দি তা হলে আমাকে কী দেবে?"

মেয়েটি বলল, "আমার এই ওড়নাটা।"

ছোট্টো মানুষটি সেই ওড়না নিয়ে চরকার সামনে বসল। আর সঙ্গে সঙ্গে গুন্-গুন্ শব্দ করে চরকা ঘুরতে লাগল পুরোদমে। সারা রাত ধরে খড় থেকে সে সোনার সুতো কাটল। সকালে সব খড় হল শেষ আর সব মাকু ভরে গেল সোনার সুতোয়।

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজা এলেন। সোনার সুতো দেখে তাঁর আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু সোনা দেখে সোনার লোভ তাঁর আরো বেড়ে গেল। তাই মেয়েটিকে তিনি নিয়ে গেলেন আরো বড়ো একটা খড়-ভর্তি ঘরে। তার পর বললেন রাতের মধ্যে সেই খড় থেকে সোনার সুতো বানাতে না পারলে তার হবে প্রাণদণ্ড।

মেয়েটি হতাশ হয়ে কাঁদতে শুরু করল। কিন্তু আবার দরজা খুলে গেল আর এল সেই ছোট্টো মানুষটি। সে বলল, "তোমার হয়ে এই খড় থেকে আমি যদি সোনার সুতো কেটে দি তা হলে আমায় কী দেবে?"

মেয়েটি বলল, "আমার আঙুলের এই আংটি।"

ছোট্টো মানুষটি আংটিটা নিয়ে চরকার সামনে বসল। আর সঙ্গে সঙ্গে গুন্-গুন্ করে উঠল চরকা। সকালে সব খড় হল শেষ আর-সব মাকু ভরে গেল ঝকঝকে সোনার সুতোয়।

সোনার সুতো দেখে রাজার আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু সোনার লোভ তাঁর মিটল না। তাই মেয়েটিকে তিনি নিয়ে গেলেন আরো বড়ো একটা খড়-ভর্তি ঘরে। তার পর বললেন, "আজ রাতের মধ্যে এই সমস্ত খড় থেকে সোনার সুতো কাটতে পারলে তোমাকে আমি বিয়ে করব।" মনে-মনে তিনি ভাবলেন, 'তুচ্ছ জাঁতাওয়ালার মেয়ে হলে হবে কি, এর চেয়ে ধনী বউ কোথায় পাব?'

মেয়েটি ঘরে যখন একলা বসে, তৃতীয়বার এল সেই ছোট্টো

মানুষটি। সে বলল, "তোমার হয়ে এই খড় থেকে আমি যদি সোনার সুতো কেটে দি তা হলে আমায় কী দেবে?"

মেয়েটি বলল, "দেবার মতো আমার তো আর কিছু নেই।"

ছোট্টো মানুষটি বলল, "রানী হবার পর তোমার যে প্রথম সন্তান হবে—কথা দাও, তাকে আমায় দেবে।"

বিপদ থেকে উদ্ধারের আর কোনো আশা না দেখে মেয়েটি কথা দিল আর ছোট্টো মানুষটি আবার খড় থেকে বানিয়ে দিল সোনার সুতো। পরদিন সকালে সোনার সুতো দেখার সঙ্গে সঙ্গে রাজা আদেশ দিলেন বিয়ের ভোজের আয়োজন করতে। আর তার পর জাঁতাওয়ালার সুন্দরী মেয়ে হয়ে গেল রানী।

এক বছর পরে তার কোলে এল ফুটফুটে একটি শিশু। সেই ছোট্টো মানুষটির কাছে তার সেই প্রতিজ্ঞার কথা তখন আর তার মনে ছিল না। হঠাৎ একদিন ঘরে এসে সে বলল, "তুমি যাকে দেবে বলে কথা দিয়েছিলে এবার তাকে দাও।"

রানী তখন ভীষণ ভয় পেয়ে তাকে বলল তার সন্তানের বদলে নিজের সমস্ত হীরে-জহরত নিতে। কিন্তু ছোট্টো মানুষটি বলল, "তোমার সব হীরে-জহরতের চেয়ে আমার কাছে জীবন্ত শিশুর দাম অনেক বেশি।" তার কথা শুনে রানী হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। রানীর কান্না দেখে সেই ছোট্টো মানুষটির দয়া হল। সে বলল, "আমি তোমাকে তিনদিন সময় দিলাম। তার মধ্যে আমার নাম অনুমান করতে পারলে শিশুকে তুমি রাখতে পারবে।"

সারা রাত জেগে রানী ভাবতে লাগল নানা নাম। রাজ্যের সর্বত্র সে দূত পাঠাল নতুন-নতুন নাম জোগাড় করতে। পরদিন ছোট্টো মানুষটি এলে রানী বললেন, "ক্যাস্‌পার, মেল্‌চোর, বাল্‌জোর।" ছোট্টো মানুষটি মাথা নেড়ে বলল, "না, না, না।"

দ্বিতীয় দিন রানী আবার দূত পাঠাল নতুন-নতুন মজার মজার অদ্ভুত-অদ্ভুত সব নাম জোগাড় করতে। আর ছোট্টো মানুষটি এলে সে বলল, "কাগতাড়ুয়া, উটকপালে, ন্যাতা-গোবরা।" ছোট্টো মানুষটি মাথা নেড়ে বলল, "না, না, না।"

তৃতীয় দিন একজন দূত ফিরে এসে বলল কোনো নতুন নাম সে জোগাড় করতে পারে নি। কিন্তু সে যখন বনের পাশে পাহাড়ের কাছে

দাঁড়িয়েছিল, শেয়াল যেখানে খরগোশকে বলেছিল 'গুডনাইট', সেখানে সে দেখে ছোট্টো একটা বাড়ি। বাড়িটার সামনে আগুন জ্বলছিল। আর সেই আগুনের চার পাশে একপায়ে লাফাতে-লাফাতে একটা অদ্ভুত চেহারার বামন তারস্বরে চেঁচাছিল—

"আজ পাকাব ডাল-রুটি, কালকে সম্বার,
পরশু যাব রানীর কাছে, আনব ছেলে তার।
কেউ না জানে আমার নাম—হাঃ-হাঃ-হাঃ হিং
আমি রামখেলতিলকসিং।"

নামটা শুনে, বুঝতেই পারছ, রানীর আনন্দ আর ধরে না। কয়েক মিনিট পরে বামন এসে যখন প্রশ্ন করল, "রানী, আমার নাম কি?" রানী প্রথমে বললেন, "কুঁজো।"

"হল না।"

"বেঁটে-বাঁটকুল।"

"হল না।"

"তা হলে কি তোমার নাম রামখেলতিলকসিং?"

"কে বললে? কে বললে? নিশ্চয়ই শয়তান এসে বলে গেছে।" এই-না বলে তারস্বরে চেঁচাতে লাগল সেই ছোট্টো মানুষটি। তার পর দারুণ রেগে এমন জোরে তার ডান পা ঠুকল যে, সে গেল পড়ে। তার পর বাঁ পা ধরে নিজেকে সামলাতে গিয়ে সে হয়ে গেল দু টুকরো।

জেলে আর তার বউ

এক সময় এক জেলে ছিল। সমুদ্রের কাছে ছোট্টো এক নোংরা গোয়াল-ঘরে বউকে নিয়ে সে থাকত। প্রতিদিন সে যেত মাছ ধরতে।

একদিন স্বচ্ছ জলের নীচে তাকিয়ে ছিপ ধরে বসে আছে।

এমন সময় তার ছিপের সুতোয় টান পড়ল আর দেখতে-দেখতে সেটা চলে গেল সমুদ্রের একেবারে তলায়। তার পর সুতো টেনে তুলে সে দেখে সেটার শেষ মাথায় রয়েছে প্রকাণ্ড একটা পোনামাছ। পোনা-মাছটা তাকে বলল, "জেলে, শোনো! দোহাই আমাকে মেরো না। আমি পোনামাছ নই। আমি রাজপুত্তুর, জাদুর মায়ায় এই দশা। আমাকে মেরে তোমার লাভ কী? দেখবে আমার মাংস খাবার মতো নয়। আমাকে জলে ছেড়ে দাও, সাঁতরে চলে যাই।"

জেলে বলল, "অতশত কথায় আমার কাজ নেই। যে-পোনামাছ কথা বলতে পারে তাকে রাখার কল্পনাও করতে পারি না।" এই-না বলে জেলে তাকে স্বচ্ছ জলে ছেড়ে দিল। সাঁতরে চলে গেল পোনামাছটা আর তার পিছনে ফুটে উঠল রক্তের একটা রেখা। জেলে ফিরে গেল তার গোয়াল-ঘরে বউয়ের কাছে।

তার বউ বলল, "হ্যাঁগো, আজ তুমি কিছুই ধর নি?"

জেলে বলল, "না—মানে ইয়ে—একটা পোনামাছ ধরেছিলাম। কিন্তু সেটা বলল সে পোনামাছ নয়, সে রাজপুত্তুর—জাদুর মায়ায় তার ঐ দশা। তাই তাকে ছেড়ে দিয়েছি।"

জেলের বউ প্রশ্ন করল, "তার কাছে কোনো বর চাও নি?"

জেলে বলল, "না। কী বর চাইব?"

জেলের বউ বলল, "এই নোংরা গোয়াল-ঘরটায় থাকতে ভারি অসুবিধে। তার কাছে ছোট্টো সুন্দর একটা কুঁড়েঘর চাওয়া উচিত ছিল। ফিরে গিয়ে তাকে ডাকো। আমাদের একটা ছোট্টো কুঁড়েঘর চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিশ্চয়ই সে-ব্যবস্থা সে করবে।"

জেলে বলল, "কিন্তু এটা সে করতে যাবে কেন?"

তার বউ বলল, "তুমি তাকে ধরেছিলে তার পর দিয়েছিলে ছেড়ে। নিশ্চয়ই এটা সে করবে। এক্ষুনি যাও।

জেলের যাবার বিশেষ ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বউকে সে চটাতে চাইল না। তাই সে আবার ফিরে গেল সমুদ্রের তীরে।

সেখানে ফিরে এসে সে দেখে সমুদ্রের রঙ হয়ে উঠেছে সবুজ আর হলদে। আগের মতো শান্ত চেহারা আর তার নেই। সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে সে বলল:

"সমুদ্রের মাছ, আছ তুমি কোথায়,
বউটি যে কান দেয় না আমার কোনো কথায়।"

সেই পোনামাছটা সাঁতরে এসে বলল, "তোমার বউ কি চায়?"

জেলে বলল, "একটু আগে তোমায় ধরেছিলাম। তাই আমার বউ বলেছে তোমার কাছে একটা বর চাওয়া আমার উচিত ছিল। আমাদের গোয়াল-ঘরটায় সে আর থাকতে চায় না। সে চায় একটা কুঁড়েঘর।"

পোনামাছ বলল, "ফিরে যাও। গিয়ে দেখবে সেটা তোমার বউ পেয়ে গেছে।"

জেলে ফিরে গিয়ে দেখে গোয়াল-ঘরে তার বউ নেই। সেটার জায়গায় রয়েছে একটা কুঁড়েঘর আর কুঁড়েঘরের দরজার সামনে একটা বেঞ্চিতে তার বউ বসে। বউ তার হাত ধরে বলল, "ভেতরে এসে দেখ। এটা আগের চেয়ে অনেক ভালো নয় কি?"

তারা ভিতরে গেল। গিয়ে দেখে সেই কুঁড়েঘরটার মধ্যে রয়েছে একফালি বারান্দা, ছোট্টো সুন্দর একটা বসার ঘর, একটা শোবার ঘর—সেখানে তাদের বিছানা পাতা—একটা রান্নাঘর আর একটা ভাঁড়ার ঘর। সব ঘরগুলোই একেবারে নিখুঁত। আর রয়েছে টিন আর পেতলের প্রচুর বাসনপত্র। আর যাবতীয় সব দরকারি জিনিস। দেখে, ছোট্টো একটা উঠোনও রয়েছে। সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেক হাঁস আর মুরগি।

আর দেখে ছোট্টো একটা বাগান। সেখানে ফলে রয়েছে হরেকরকম তরিতরকারি আর ফল।

তার বউ বলল, "কেমন—খুব সুন্দর আর পরিপাটি নয়?"

জেলে বলল, "হ্যাঁ, এখানে আমরা খুব সুখেই থাকব।"

তার বউ বলল, "সেটা দেখা যাবে।"

এই-না বলে রাতের খাবার খেয়ে তারা শুতে গেল।

হপ্তাখানেক, হপ্তাদুয়েক তাদের খুব ভালোই কাটল। তার পর এক দিন জেলের বউ বলল, "ওগো শোনো—এই কুঁড়েঘরটা বেজায় ছোটো, উঠোন আর বাগানটাও বড়োসড়ো নয়। পোনামাছটা এর চেয়েও বড়ো একটা বাড়ি দিতে পারে। আমি একটা পাথরের মস্ত বড়ো প্রাসাদে থাকতে চাই। পোনামাছটার কাছে গিয়ে বল আমাদের একটা প্রাসাদ দিতে।"

জেলে বলল, "বউ, এই কুঁড়েঘরটা তো খুবই ভালো। প্রাসাদে থাকার কি দরকার আমাদের?"

তার বউ বলল, "বাজে বকবক কোরো না। পোনামাছটার কাছে যাও। নিশ্চয়ই এটার ব্যবস্থা সে করে দিতে পারবে।"

জেলে বলল, "না বউ। এই তো সেদিন পোনামাছ আমাদের কুঁড়েঘরটা দিয়েছে। তার কাছে আবার যেতে আমার ইচ্ছে করছে না। আমার কথা শুনে সে চটে যেতে পারে।"

তার বউ রেগে চেঁচিয়ে উঠল, "গিয়েই দেখ না! এটা সে পারে আর খুশি হয়েই এটা সে করবে। গিয়েই দেখ না।"

জেলের মন খারাপ হয়ে গেল। কিছুতেই যেতে তার ইচ্ছে করল না। আপন মনে বিড়্‌বিড়্‌ করে সে বলতে লাগল, 'এটা ঠিক নয়; এটা ঠিক নয়।' কিন্তু শেষপর্যন্ত যেতে তাকে হলই।

সমুদ্রের তীরে পৌঁছে সে দেখে জলের রঙ গাঢ় নীল আর বেগুনি—আগের মতো সবুজ আর হলদে নয়। কিন্তু জল তখনো শান্ত। সমুদ্রের তীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সে বলল :

"সমুদ্রের মাছ আছ তুমি কোথায়,
বউটি যে কান দেয় না আমার কোনো কথায়।"

পোনামাছ বলল, "কী সে চায়?"

বেশ ঘাবড়ে গিয়ে জেলে বলল, "সে একটা পাথরের প্রাসাদে থাকতে চায়।"

পোনামাছ বলল, "ফিরে যাও। গিয়ে দেখবে পাথরের প্রাসাদের দোরগোড়ায় সে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

জেলে বাড়ি ফিরে চলল। সেখানে পৌঁছে সে দেখে পাথরের প্রকাণ্ড একটা প্রাসাদ আর সিঁড়িতে তার বউ দাঁড়িয়ে। জেলের হাত ধরে তার বউ বলল, "আমার সঙ্গে ভেতরে চলো।" জেলে চলল তার বউয়ের সঙ্গে। প্রাসাদের ভিতরে গিয়ে দেখে মার্বেল পাথরের বাঁধানো মস্ত বড়ো একটা বারান্দা। অসংখ্য চাকর বিরাট দরজাগুলো খুলে দিচ্ছে। সুন্দর-সুন্দর রঙের দেয়ালগুলো ঝকঝক করছে। ঘরগুলোর মধ্যে সোনালী গিল্টি করা অসংখ্য চেয়ার আর টেবিল। ছাত থেকে ঝুলছে স্ফটিকের ঝাড়-লণ্ঠন। সব হলঘর আর শোবার ঘরে গালচে বিছানো। টেবিলগুলোর উপর থরে থরে রয়েছে দামী-দামী খাবার—দেখলে মনে হয় তাদের ভারে বুঝি টেবিলগুলো ভেঙে পড়বে। আর প্রাসাদের পিছনে রয়েছে প্রকাণ্ড একটা উঠোন। সেই উঠোনের মধ্যে অনেক আস্তাবল আর ঘোড়া আর গোরু আর নানা চমৎকার গাড়ি। আর রয়েছে সুন্দর একটা বাগান। সেখানে ফুটে রয়েছে আশ্চর্য-আশ্চর্য ফুল আর খুব ভালো-ভালো ফল। আর রয়েছে দু মাইলেরও বেশি লম্বা একটা পার্ক। সেখানে রয়েছে নানা জাতের হরিণ আর হরিণী আর খরগোশ—আর মানুষ যা চাইতে পারে তার সব-কিছু।

জেলের বউ বলল, "কেমন—চমৎকার নয়?"

জেলে বলল, "নিশ্চয়ই। এই সুন্দর প্রাসাদে আমরা সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকব।"

তার বউ বলল, "সেটা দেখা যাবে। এখন চল ঘুমুতে যাওয়া যাক।" তারা দুজনেই গেল ঘুমতে।

পরদিন সকালে প্রথমে ঘুম ভাঙল জেলের বউয়ের। আকাশে সবে তখন দিনের আলো ফুটেছে। বিছানা থেকে সে দেখতে পেল তার দেশের আকাশ-ছোঁয়া সুন্দর মাঠ-ঘাট, অরণ্য-পাহাড়। খানিক পরে তার স্বামীরও ঘুম ভাঙল। কনুই দিয়ে তার পাঁজরে খোঁচা দিয়ে জেলের বউ বলল, "ওগো! উঠে পড়ে আমার সঙ্গে জানলার কাছে এসো। এই-সব মাঠ-ঘাট বন-পাহড়ের কর্ত্রী হতে আমি চাই। পোনামাছটাকে গিয়ে বল আমরা চাই রাজা-রানী হতে।"

জেলে বলল, "বউ! আমাদের রাজা-রানী হবার কী দরকার? রাজা হতে আমি চাই না।"

তার বউ বলল, "তুমি রাজা হতে না চাইলে হয়ো না। আমি চাই রানী হতে। পোনামাছটাকে গিয়ে বল আমাকে রানী হতেই হবে।"

জেলে বলল, বউ! রানী হতে তুমি চাইছ কেন? সে কথা তাকে আমি বলতে পারব না।"

খেঁকিয়ে উঠে তার বউ বলল, "বলতে পারবে না কেন শুনি? এক্ষুনি যাও। রানী আমাকে হতেই হবে।"

জেলে চলে গেল। কিন্তু তার বউ রানী হতে চায় জেনে মনে-মনে তার খুব অস্বস্তি। মনে-মনে সে বলল, 'এটা ঠিক নয়, নিশ্চয়ই এটা ঠিক নয়। একবার ভাবল যাবে না। কিন্তু শেষটায় গেল সে।

তীরে যখন পৌঁছল সমুদ্রের জল তখন ঘোলাটে আর কালচে ছাই-ছাই রঙের হয়ে উঠেছে—তলা থেকে যেন উঠেছে গেঁজিয়ে। সেখান থেকে বেরুচ্ছে বিশ্রী একটা পচা গন্ধ। তীরে দাঁড়িয়ে জেলে বলল:

"সমুদ্রের মাছ, আছ তুমি কোথায়,
বউটি যে কান দেয় না আমার কোনো কথায়।"

পোনামাছ প্রশ্ন করল, "কী সে চায়?"

জেলে বলল, "সে চায় রানী হতে।"

পোনামাছ বলল, "বাড়ি ফিরে যাও। গিয়ে দেখবে তার ইচ্ছে পূর্ণ হয়েছে।"

জেলে বাড়ি ফিরল। ফিরে দেখে প্রাসাদটা আরো প্রকাণ্ড হয়ে গেছে। সেটার উপর মস্ত বড়ো একটা গম্বুজ, তাতে চমৎকার ভাস্কর্য। ফটকের সামনে প্রহরী দাঁড়িয়ে। বহু সৈন্য-সামন্ত গিজ্‌গিজ্‌ করছে। বাজছে ব্যাণ্ড আর ঢাক-ঢোল ভেরী-তূরী। প্রাসাদের মধ্যে গিয়ে সে দেখে সব-কিছুই নিখুঁত মর্মর আর সোনা দিয়ে তৈরি। চেয়ার-টেবিলে সোনার ঝুরকো-দেওয়া মখমলের ঢাকা। হল্‌ঘরের দরজাগুলো খুলে যেতে দেখা গেল জমজমাট রাজসভা। সেখানে হীরে-বসানো সোনার উঁচু একটা সিংহাসনে তার বউ বসে। মাথায় তার মস্ত বড়ো সোনার মুকুট। হাতে জহরত-বসানো রাজদণ্ড। সিংহাসনের দু পাশে সারি-সারি দাঁড়িয়ে ছজন রানীর সহচরী। প্রত্যেকে পাশের জনের চেয়ে

এক-মাথা করে ছোটো। তার কাছে গিয়ে জেলে বলল, "বউ! এখন তা হলে রানী হলে?"

সে বলল, "হ্যাঁ, এখন আমি রানী।",

খানিক দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে জেলে বলল, "তুমি রানী হয়েছ —খুবই সেটা ভালো কথা। আর কিছু আমরা চাইব না।"

"আর কিছু চাইব না মানে?" বলতে-বলতে তার বউ খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠল। "এ-সব আর বরদাস্ত করতে পারছি না। ভারি একঘেয়ে লাগছে। পোনামাছটাকে গিয়ে বল আমি মহারানী হতে চাই।"

জেলে বলল, "বউ! মহারানী হতে চাইছ কেন?"

সে বলল, তুমি পোনামাছটার কাছে যাও তো! আমি মহারানী হব।"

জেলে বলল, "বউ! পোনামাছ তোমাকে মহারানী করতে পারবে না। তাকে সে কথা বলতেও আমার ইচ্ছে করছে না। এ-রাজত্বে মাত্র একজনই মহারানী আছেন। পোনামাছ কিছুতেই তোমাকে মহারাণী করতে পারবে না।"

মুখ ঝামটা দিয়ে জেলের বউ চেঁচিয়ে উঠল, "কী বললে! আমি এখন রানী—তুমি তো নগণ্য আমার স্বামী। এক্ষুনি যাবে কি না বল? এই মুহূর্তে যাও। আমায় সে রানী করতে পারলে মহারানীও করতে পারবে। মহারানী আমাকে হতেই হবে। এক্ষুনি যাও।"

জেলে কী আর করে। যেতে সে বাধ্য হল। কিন্তু যেতে-যেতে বেজায় ভয় পেয়ে সে ভাবতে লাগল, 'এর পরিণাম ভালো হতেই পারে না। মহারানী হতে চাওয়া! এটা তো দারুণ ধৃষ্টতার আবদার! পোনামাছের ধৈর্যের বাঁধ এবার নিশ্চয়ই ভেঙে যাবে।'

এই-সব ভাবতে-ভাবতে সে পৌঁছল সমুদ্রের তীরে। সমুদ্র তখন কুচকুচে কালো হয়ে উঠেছে। যেন তলা থেকে শুরু করেছে ফুটতে। বড়ো-বড়ো বুদ্বুদ ভেসে উঠে ফেটে হয়ে যাচ্ছে চৌচির। ঝোড়ো বাতাসে উঠছে বড়ো-বড়ো ঢেউ। দেখে শুনে জেলে খুব ভয় পেয়ে গেল। তবু তীরে দাঁড়িয়ে সে বলল :

"সমুদ্রের মাছ, আছ তুমি কোথায়,
বউটি যে কান দেয় না আমার কোনো কথায়।"

পোনামাছ প্রশ্ন করল, "কী সে চায় ?"

জেলে উত্তর দিল, "হায় রে ! আমার বউ হতে চায় মহারানী ।"

পোনামাছ বলল, "বাড়ি ফিরে যাও । গিয়ে দেখবে সে মহারানী হয়ে গেছে ।"

তাই শুনে জেলে ফিরে গেল । বাড়ি ফিরে দেখে গোটা প্রাসাদটা হয়ে গেছে ঝকঝকে শ্বেতপাথরের । তাতে বসানো স্ফটিকের নানা মূর্তি আর সোনার কারুকাজ । ঢাক-ঢোল তূরী-ভেরী ঝাঁপ-করতাল বাজছে আর সেই বাজনার তালে-তালে ফটকের সামনে মার্চ করে চলছে সৈন্যদল । প্রাসাদের মধ্যে চাকর-বাকরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে নানা ব্যারন আর কাউণ্ট । জেলের জন্য সোনার দরজাগুলো তারা খুলে দিল । ভিতরে গিয়ে জেলে দেখে হাজার-হাজার ফুট উঁচু সোনার একটা সিংহাসনে তার বউ বসে । মাথায় তার হীরে-পান্না-জহরত-বসানো তিন গজ উঁচু বিরাট একটা সোনার মুকুট । এক হাতে তার রাজদণ্ড, অন্য হাতে রাজদণ্ডের মাথা । তার দুপাশে দুসারিতে তার প্রহরীর দল দাঁড়িয়ে । তাদের মধ্যে সব চেয়ে যে লম্বা তার চেহারা বহু ফুট দীর্ঘ দৈত্যের মতো আর সব চেয়ে যে ছোটো তার চেহারা কড়ে আঙুলের মতো । মহারানীর সামনে দাঁড়িয়ে বহু রাজপুত্তুর আর ছোটো-ছোটো রাজ্যের রাজা ।

তাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে জেলে বলল, "বউ ! তুমি তা হলে এখন মহারানী ?"

সে বলল, "হ্যাঁ, আমি মহারানী ।"

তাকে খুঁটিয়ে ভালো করে দেখে জেলে বলল, "বউ ! তুমি মহারানী হয়েছ—এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না ।"

তার বউ বলল, "এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন ? আমি এখন মহারানী, কিন্তু সেই সঙ্গে আমি পোপ্[১] হতেও চাই । গিয়ে পোনামাছটাকে সে কথা বল ।"

জেলে বলল, "বউ তুমি চাইছ কী ? তুমি কিছুতেই পোপ্ হতে পার না । খৃস্টীয় জগতে কেবল একজনমাত্রই পোপ্ আছেন । পোনামাছ তোমাকে পোপ্ করতে পারবে না ।"

[১]রোমান ক্যাথলিক ধর্মসম্প্রদায়ের প্রধান গুরু ।

জেলের বউ বলল, "পোপ্ আমি হবই। শিগ্‌গির যাও, কারণ আজকের মধ্যেই আমাকে পোপ্ হতে হবে।"

জেলে বলল, "না বউ। ও কথা তাকে বলতে চাই না—বলা উচিত হবে না—এটা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। পোনামাছ তোমায় পোপ্ করতে পারবে না।"

জেলের বউ বলল, "বাজে বকবক করো না। আমাকে সে মহা-রানী করতে পারলে পোপ্ করতেও পারবে। এক্ষুনি যাও। আমি মহারানী, আর তুমি তো সামান্য আমার স্বামী। এক্ষুনি যাবে কি না বল।"

তার কথা শুনে ভয় পেয়ে জেলে চলে গেল। কিন্তু মাথা তার ঘুরে উঠল, কাঁপতে লাগল সর্বাঙ্গ, হাঁটুদুটো লাগল ধকধক করতে। তার পর বাতাস শুরু করল আর্তনাদ করতে, উপর দিয়ে উড়তে শুরু করল ঝোড়ো মেঘ আর দেখতে দেখতে পশ্চিম দিগন্ত হয়ে গেল অন্ধকার। গাছের পাতাগুলো উঠল খস্‌খস্ করে। সমুদ্রের জল যেন ফুটে উঠে হিস্‌হিস্ করে তার জুতোর উপর লাগল আছড়ে পড়তে। আর দূর থেকে সে দেখল ঢেউয়ের উপর টলমল করতে-করতে জাহাজগুলোকে বিপদসূচক তোপ দাগতে। কিন্তু তখনো আকাশের মাঝখানটা ছিল সামান্য নীল, যদিও সেটার চার পাশ হয়ে উঠেছিল ভয়ংকর তামাটে রঙের—যেন মারাত্মক একটা ঝড় ছুটে আসছে। ভয়ে-ভয়ে সমুদ্রতীরে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে জেলে বলল :

"সমুদ্রের মাছ, আছ তুমি কোথায়,
বউটি যে কান দেয় না আমার কোনো কথায়।"

পোনামাছ প্রশ্ন করল, "কী সে চায় ?"

জেলে উত্তর দিল, "হায় রে। সে চায় পোপ্ হতে।"

পোনামাছ বলল, "বাড়ি ফিরে যাও। গিয়ে দেখবে সে পোপ্ হয়ে গেছে।"

তাই শুনে জেলে ফিরে গেল। বাড়ি ফিরে দেখে সেটা হয়ে গেছে প্রকাণ্ড একটা গির্জে আর তার চার পাশে রয়েছে নানা প্রাসাদ। ভীড় করে লোকে চলেছে ভিতরে। আর ভিতরে জ্বলছে হাজার-হাজার মোমবাতি। আর তার বউ বসে আছে আগের চেয়েও উঁচু একটা সিংহাসনে। সর্বাঙ্গে তার সোনার গয়না আর মাথায় সোনার তিনটে

মুকুট। গির্জের নানা হোমরা-চোমরা লোক তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। দু পাশে তার সারি সারি নানা বাতি। সবচেয়ে বড়ো বাতিটা সব চেয়ে উঁচু গম্বুজের মতো দীর্ঘ আর মোটা আর সব চেয়ে ছোট্টোটি নেহাতই ক্ষুদে —একেবারে টিমটিম করছে। আর তার সামনে নতজানু হয়ে বসে রাজা আর মহারাজায় চুমু খাচ্ছে তার চটিতে।

তার দিকে তাকিয়ে জেলে বলল, "বউ। তুমি তা হলে এখন পোপ্?"

সে বলল, "হ্যাঁ, আমি এখন পোপ্।"

জেলে তার বউয়ের দিকে ভালো করে তাকাল। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে জ্যোতি বেরুচ্ছিল। জেলের মনে হল সে যেন উজ্জ্বল সূর্যের দিকে তাকিয়েছে। তার দিকে খানিক তাকিয়ে থাকার পর জেলে বলল :

"বউ। তুমি পোপ্ হয়েছ—এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না।" কিন্তু তার বউ একেবারে কাঠ হয়ে বসে রইল। একটু নড়ল-চড়ল না।

জেলে তখন বলল, "বউ। তুমি এখন পোপ্ হয়েছ—এবার তৃপ্ত হও। কারণ এর চেয়ে বড়ো আর কিছু তুমি হতে পারবে না।"

তার বউ বলল, "সেটা আমি ভেবে দেখব।" তার পর তারা গেল শুতে। কিন্তু জেলের বউ তখনো পরিতৃপ্ত হয় নি। উচ্চাকাংক্ষায় তার ঘুম এল না। ক্রমাগত সে ভাবতে লাগল—আরো বড়ো কী করে হওয়া যায়।

জেলে খুব ভালো করে ঘুমাল। কারণ আগের দিন তাকে অনেক দৌড়ঝাঁপ করতে হয়েছিল। কিন্তু তার বউয়ের দু চোখে ঘুমের ছিটেফোঁটাও নেই। সারারাত কেবল এপাশ-ওপাশ করে আর ভাবতে থাকে—আর কী হওয়া যায়। কিন্তু ভেবে-ভেবে কোনো কুল-কিনারা সে পেল না। যথা সময়ে সূর্য উঠতে শুরু করল। পূর্ব দিকের আকাশ গোলাপী



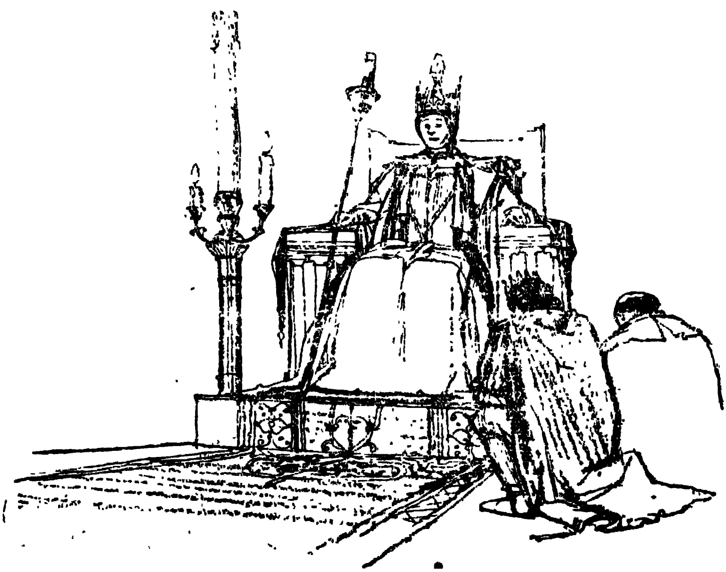
হয়ে উঠতে দেখে বিছানায় বসে আলোর দিকে তাকাল সে।
আর জানলার মধ্যে দিয়ে সূর্য উঠতে দেখে সে ভাবল, 'সূর্য আর চাঁদকে ওঠবার আদেশ দিতে আমি কি পারি না?'

কনুই দিয়ে জেলের পাঁজরে খোঁচা দিয়ে সে বলল, "ওগো শুনছ! উঠে পড়ে পোনামাছটাকে গিয়ে বল আমি চাই চাঁদ আর সূর্যকে শাসন করতে।"

জেলের তখনো ভালো করে ঘুম ভাঙে নি। দারুণ ভয়ে আতংকে উঠে বিছানা থেকে সে পড়ে গেল। মনে হল বউয়ের কথা সে ঠিক-মতো বুঝতে পারে নি। তাই চোখ রগড়ে সে বলল, "বউ! কী বললে?"

তার বউ বলল, "চাঁদ আর সূর্যকে ওঠবার আদেশ না দিতে পারলে, তাকিয়ে থেকে তাদের উঠতে দেখতে হলে—আমি বরদাস্ত করতে পারব না। যখন খুশি তখন তাদের ওঠাতে না পারলে এক দণ্ডও স্বস্তি পাব না।"

এমন কট্‌মট্‌ করে তার দিকে সে তাকাল যে জেলের সর্বাঙ্গ উঠল শিউরে।



জেলের বউ চেঁচিয়ে উঠল, "এক্ষুনি যাও। চাঁদ আর সূর্যের প্রভু আমি হতে চাই।"

"কী সর্বনাশ, বউ!" বলে জেলে মেঝেয় পড়ে তার সামনে নতজানু হয়ে বসল। "পোনামাছ ওটা করতে পারে না। সে তোমাকে করতে পারে মহারানী আর পোপ্। দোহাই তোমার, পোপ্ হয়েই সন্তুষ্ট থাকো।"

তাই-না শুনে জেলের বউ একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। এলোমেলো হয়ে গেল তার মাথার চুল। নিজের জামা-কাপড় ছিঁড়তে ছিঁড়তে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করতে-করতে জেলেকে সজোরে লাথি মেরে বলল, "আমি আর বরদাস্ত করতে পারছি না, আমি আর বরদাস্ত করতে পারছি না। যাবে কি না বল!"

তাই চট্‌পট্ পোশাক পরে জেলে ছুটল পাগলের মতো।

বাইরে তখন ভয়ংকর ঝড় হুংকার ছেড়ে চলেছে। জেলের পক্ষে খাড়া থাকাও কঠিন হয়ে উঠল। ঘরবাড়ি গাছপালা পড়ল মাটিতে আছড়ে, কাঁপতে লাগল পাহাড়-পর্বত। পাথরের বড়ো-বড়ো চাঁই লাগল গড়িয়ে গড়িয়ে সমুদ্রে পড়তে। আকাশ হয়ে গেল কুচকুচে কালো। বিদ্যুৎ লাগল চমকাতে, বাজ লাগল পড়তে। মাথায় সাদা ফেনা আর পাহাড়ের মতো উঁচু-উঁচু ঢেউ তুলে ফুঁপিয়ে উঠল সমুদ্র। জেলে তখন চেঁচিয়ে উঠল, যদিও ঝড়-জল বজ্র-বিদ্যুতের মধ্যে নিজের স্বর সে শুনতে পেল না:

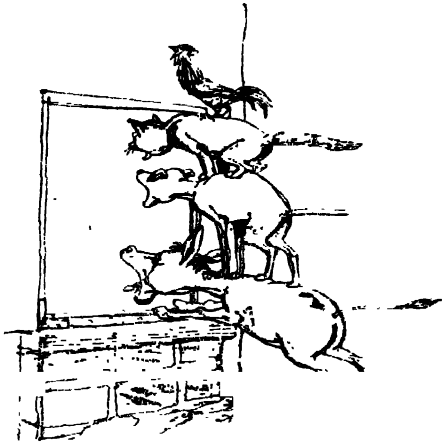
"সমুদ্রের মাছ, আছ তুমি কোথায়,
বউটি যে কান দেয় না আমার কোনো কথায়।"

পোনামাছ প্রশ্ন করল, "কী সে চায়?"

জেলে উত্তর দিল, আমার বউ চায় চাঁদ আর সূর্যের প্রভু হতে।"

পোনামাছ বলল, "বাড়ি ফিরে যাও। গিয়ে দেখবে সে তার পুরনো গোয়ালে ফিরে এসেছে।"

আর আজ পর্যন্ত সেই গোয়ালেই তারা আছে।



ব্রেমেন্ শহরের গায়ক দল

একটি লোকের একটা গাধা ছিল। অনেক বছর ধরে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে জাঁতাকলে সে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল ভারী-ভারী বস্তা। কিন্তু বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার শক্তি এল কমে। তাই প্রভু স্থির করল তাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু গাধাটা টের পেল তার বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। তাই সে সেখান থেকে পালিয়ে ধরল ব্রেমেন্ শহরের পথ। কারণ ভাবল সেখানকার গাইয়ে-বাজিয়েদের দলে হয়তো তার জায়গা হবে।

খানিক যাবার পর সে দেখে পথে একটা কুকুর শুয়ে-শুয়ে ঘেউ-ঘেউ করছে। দেখে মনে হয় অনেক পথ ছুটে আসায় সে বেজায় ক্লান্ত। গাধা প্রশ্ন করল, "ওরকম ঘেউ-ঘেউ করছিস কেন?"

কুকুর বলল, "আমি বুড়ো হয়ে গেছি। দিনকের দিন দুর্বল হয়ে পড়ছি। শিকারে আর যেতে পারি না। প্রভু চেয়েছিল আমাকে মেরে ফেলতে। তাই পালিয়ে এসেছি। কিন্তু নিজের রুজি-রোজগার করি কেমন করে?"

গাধা বলল, "কী করতে হবে বলি শোন। আমি চলেছি ব্রেমেন্

শহরে, সেখানকার গাইয়ে-বাজিয়েদের দলে যোগ দিতে। আমার সঙ্গে আয়। আমি বাজাব বীণা, দুই পেটাবি ঢাক।"

কুকুরের তাতে আপত্তি ছিল না। একসঙ্গে তারা যেতে শুরু করল। খানিক যাবার পর তারা দেখে পথের এক পাশে একটা বেড়াল বসে। বর্ষার দিনের মতো মুখটা তার বিষণ্ণ। গাধা প্রশ্ন করল, "তোর কী হয়েছে রে, বুড়ো গুঁফো ?"

বেড়াল বলল, "মাথার ওপর খাঁড়া ঝুললে কারে মন ভালো থাকে ? আমার বয়েস হয়েছে। আগের মতো আর দাঁতে ধার নেই। ইঁদুরের পেছনে ধাওয়া করার চেয়ে উনুনের পেছনে বসে ফ্যাস্‌ফাঁস করতেই আমার ভালো লাগে। তাই গিন্নি চান জলে ডুবিয়ে আমাকে মারতে। কোনোরকমে তো পালিয়ে এসেছি। এখন সমস্যা : কোথায় যাই ?"

"আমাদের সঙ্গে ব্রেমেন্‌ শহরে চল। ঐকতান কাকে বলে সেটা তো তোর জানা। সেখানকার গাইয়ে-বাজিয়েদের দলে হয়তো যোগ দিতে পারবি।"

বেড়ালের মনে হল পরামর্শটা ভালো। তাই তাদের সঙ্গে সে চলল। খানিক পরে তারা পৌঁছল এক গোলাবাড়ির উঠোনের কাছে। সেখানকার সামনের ফটকে বসে একটা মোরগ পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছিল। গাধা বলল, "তোর চেঁচানি শুনলে তো যে-কোনো লোকের কানের পর্দা ফেটে যাবে। হয়েছেটা কী ?"

"বাড়ির গিন্নির শরীরে দয়া-মায়া বলে কোনো জিনিস নেই। কাল রোববারের ডিনারে নানা অতিথি আসবে। রাঁধুনিকে বলেছে আমাকে দিয়ে স্যুপ্‌ বানাতে। আজ সন্ধ্যায় আমার ঘাড় মটকানো হবে। তাই যতক্ষণ দম আছে চেঁচিয়ে চলেছি।"

গাধা বলল, "কী করতে হবে বলি শোন, লাল-ঝুঁটিদার। আমাদের সঙ্গে ব্রেমেন্‌ শহরে চল। সেখানে মরার চেয়ে ভালো নিশ্চয়ই একটা কিছু খুঁজে পাবি। তোর গলার স্বরটা ভালো। আমরা সবাই মিলে একটা কন্‌সার্ট দিলে নিশ্চয়ই খুব ভালো হবে।" পরামর্শটা মোরগের পছন্দ হল তাই তারা চারজন একসঙ্গে আবার যাত্রা করল।

একদিনে তারা ব্রেমেন্‌ শহরে পৌঁছতে পারল না। সন্ধেয় তারা পৌঁছল এক বনে। স্থির করল সেখানে তারা রাতটা কাটাবে। একটা প্রকাণ্ড গাছের তলায় শুলো গাধা আর কুকুর। বেড়াল আর মোরগ

উঠল ডালে। নিজের পক্ষে সব চেয়ে নিরাপদ বলে মোরগ উড়ে গিয়ে বসল মগডালে। ঘুমবার আগে চার দিকে তাকিয়ে তার মনে হল খানিক দূরে যেন একটা আলো মিট্‌মিট্‌ করছে। তাই সঙ্গীদের সে হেঁকে বলল, কাছাকাছি একটা বাড়ি আছে, কারণ একটা আলো তার নজরে পড়েছে। গাধা বলল, "এখানকার পাট চুকিয়ে সেখানেই তা হলে যাওয়া যাক। কারণ এখানকার থাকার বন্দোবস্ত খুব খারাপ।" কুকুর রাজি হয়ে বলল, সামান্য মাংস-লাগানো হাড়-টাড় পেলে মন্দ লাগবে না।

তাই যেদিকে আলো জ্বলছিল সেদিকে তারা যেতে শুরু করল আর খানিক যেতেই দেখল সেই টিম্‌টিমে আলো জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। আলোটা ক্রমশই হয়ে উঠতে লাগল বড়ো আর তার পর তারা পৌঁছল একটা বাড়ির সামনে। বাড়িটা এক ডাকাত দলের। সেটার ভিতরে জ্বলছিল নানা জোরাল বাতি। দলের মধ্যে সব চেয়ে লম্বা গাধা। তাই জানলার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে ভিতরে সে তাকাল।

মোরগ প্রশ্ন করল, "কী দেখছ?"

চেঁচিয়ে গাধা বলল, "কী দেখছি? দেখছি একটা টেবিল জুড়ে রয়েছে ভালো-ভালো মাংস আর পানীয়। আর কতকগুলো ডাকাত সেটা ঘিরে বসে মনের আনন্দে ভুরিভোজ করছে।"

মোরগ বলল, "আমাদেরও ঠিক ওরকমটি দরকার।"

গাধা বলল, "নিশ্চয়ই! কিন্তু আমরা ভেতরে যাই কী করে?"

ডাকাতদের কী করে তাড়ানো যায় এই নিয়ে তাদের একটা পরামর্শ সভা বসল। শেষটায় তাদের মাথায় একটা ফন্দি এল। প্রথমে জানলার চৌকাঠের নীচের অংশে সামনেকার পা দুটো তুলে দাঁড়াল গাধা। তার পর কুকুর লাফিয়ে উঠল তার পিঠে, বেড়াল চড়ল কুকুরের কাঁধে আর সবশেষে উড়ে গিয়ে মোরগ বসল বেড়ালের মাথায়। তার পর সমস্বরে গলা ছেড়ে ধরল তারা গান। গাধা চেঁচাতে লাগল হ্যাঁ-কো হ্যাঁ-কো করে, কুকুর করতে লাগল ঘেউ-ঘেউ, বেড়াল মিউ-মিউ আর মোরগ কোঁকোর-কো। আর তার পর তারা জানলা দিয়ে ছুটে ঢুকল ঘরে। ফলে ঝন্‌ঝন্‌ করে ভেঙে গেল জানলার শার্সির কাচ। একসঙ্গে সেই বীভৎস শব্দ শুনে ডাকাতের দল ভাবল বুঝি তাদের মধ্যে একটা ভূত তেড়ে আসছে। তাই দারুণ ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল তারা বনের মধ্যে। আর তার পর সেই চার গায়ক টেবিলটা ঘিরে

বসে এমন খাওয়া খেল যে, মনে হয় একমাস বুঝি তাদের উপোস করে কাটাতে হবে।

ভুরিভোজ শেষ হলে পর সেই চার গায়ক আলো নিভিয়ে যে যার পছন্দমতো জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। গাধা গিয়ে শুলো গোবর গাদায়; দরজার পিছনে গোল হয়ে শুলো কুকুর; বেড়াল শুলো ঘরের উনুনের গরম ছাইয়ের মধ্যে; আর মোরগ গিয়ে বসল ছাদের একটা বরগায়। দীর্ঘ পথ আসার দরুন ক্লান্ত হয়ে তারা সবাই পড়ল ঘুমিয়ে। মাঝ রাত পার হবার পর দূর থেকে ডাকাতের দল দেখল বাড়িটায় আলো জ্বলছে না। তাদের মনে হল সব-কিছুই শান্ত। তখন তাদের সর্দার বলল, "অত তাড়াতাড়ি ভয় পাওয়া আমাদের উচিত হয় নি।" এই-না বলে দলের একজনকে সে পাঠাল বাড়িটা দেখে আসতে। সেই ডাকাত গিয়ে দেখে সব-কিছু চুপচাপ। রান্নাঘরে এসে সে গেল একটা মোমবাতি জ্বালাতে। বেড়ালের জ্বলন্ত চোখদুটোকে জ্বলন্ত কয়লা বলে ভুল করে সেখানে একটা কাঠি বসিয়ে সে ভাবল আগুন জ্বলে উঠবে। বেড়াল কিন্তু এই রসিকতার মানে বুঝতে পারল না। তাই তার মুখের উপর ঝাঁপ দিয়ে আঁচড়ে আর থুথু ছিটিয়ে তাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ল। দারুণ ঘাবড়ে সে চেষ্টা করল দৌড়ে খিড়কি-দরজা দিয়ে পালাতে। সেখানে শুয়ে ছিল কুকুর। লাফিয়ে উঠে সে তার পা দিল কামড়ে। গোলাবাড়ির উঠোনের মধ্যে দিয়ে সে দিল দৌড়। কিন্তু গোবর গাদার পাশ দিয়ে যাবার সময় গাধা তার পিছনের পা দিয়ে কষালো সাংঘাতিক লাথি। আর এই-সব হৈচৈ শুনে জেগে উঠে মোরগ তার বরগায় বসে তারস্বরে ডাক জুড়ে দিল; কোঁ-কো-র-কো-কো কোঁ-কো-র-কো-কো!

পড়িমরি করে ছুটে সেই ডাকাত তার সর্দারের কাছে ফিরে হাউমাউ করে বলল, "কী সর্বনাশ! আমাদের বাড়িতে ভয়ংকর একটা ডাইনি বসে আছে। আমাকে দেখে ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্ করে উঠে তার লম্বা লম্বা নখ দিয়ে আমার মুখ আঁচড়ে শেষ করে দিয়েছে। দরজার সামনে ছোরা হাতে বসে আছে একটা লোক। আমার পায়ে সে ছোরা বসিয়েছে। উঠোনে শুয়ে আছে প্রকাণ্ড একটা কালো দৈত্য। মুগুর দিয়ে আমায় সে পিটেছে। আর ছাতের বরগায় বসে আছেন জজ্-সায়েব। ক্রমাগত তিনি চেঁচাচ্ছেন: 'পাজি বদমায়েশটাকে আমার কাছে ধরে আন।' তাই কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি।"

সেদিন থেকে ডাকাতের দল বাড়িটায় ফিরে যেতে আর সাহস করে নি। কিন্তু ব্রেমেন্ শহরের সেই চারজন গায়কের কাছে বাড়িটা এমন আরামের বলে মনে হয়েছিল যে, সেখান থেকে আর তারা বেরোয় নি।



চালাক হান্‌স্‌

হান্‌স্‌-এর মা প্রশ্ন করলেন, "হান্‌স্‌ যাচ্ছিস কোথায় ?"

হান্‌স্‌ বলল, "গ্রেথেলের বাড়ি।"

"তার সঙ্গে আবার ভাবসাব করতে ?"

"আবার ভাবসাব তো কবেই হয়ে গেছে, মা। চললাম।"

"আয় বাছা।"

গ্রেথেলের বাড়িতে পৌঁছল হান্‌স্‌। "শুভদিন, গ্রেথেল।"

"শুভদিন হান্‌স্‌। আমার জন্যে ভালো কিছু এনেছিস ?"

"কিছুই আনি নি রে! বরঞ্চ তুই কিছু আমায় দে।"

হান্‌স্‌কে গ্রেথেল দিল একটা ছুঁচ। হান্‌স্‌ বলল, "চলি, গ্রেথেল।"

গ্রেথেল বলল, "আয়, হান্‌স্‌।"

খড়ের গাড়িতে ছুঁচটা আটকে সেটার পিছন পিছন হেঁটে হান্‌স্‌ বাড়ি ফিরল। "শুভসন্ধ্যা, মা।"

"শুভসন্ধ্যা, হান্‌স্‌। কোথায় গিয়েছিলি ?"

"গ্রেথেলের বাড়ি।"

"তার জন্য কি নিয়ে গিয়েছিলি ?"

"কিছুই না। সে আমাকে একটা জিনিস দিয়েছে।"

"কি দিয়েছে রে ?"

"একটা ছুঁচ।"

"কোথায় সেটা, হান্‌স্‌ ?"

"খড়ের গাড়িতে সেটা আটকে দিয়েছি।"

"বোকার মতো কাজ করেছিস, হান্‌স্। ছুঁচটা তোর জামার আস্তিনে আটকানো উচিত ছিল।"

"তাতে কিছু যায় আসে না। পরের বার কথাটা মনে রাখব।"

"চললি কোথায়, হান্‌স্?"

"গ্রেথেলের বাড়ি, মা।"

"ঝগড়া মিটিয়ে ফেলিস, হান্‌স্।"

"নিশ্চয়ই। চলি—মা।"

"আয় বাছা।"

গ্রেথেলের বাড়িতে হান্‌স্ পৌঁছল। "শুভদিন, গ্রেথেল।"

"শুভদিন, হান্‌স্। আমার জন্যে কি এনেছিস?"

"কিছুই না। আমাকে কিছু দে।"

হান্‌স্‌কে গ্রেথেল একটা ছুরি দিল।

"চলি, গ্রেথেল।"

"আয়, হান্‌স্।"

ছুরিটা জামার আস্তিনে আটকে হান্‌স্ বাড়ি ফিরল। "শুভসন্ধ্যা, মা।"

"শুভসন্ধ্যা, হান্‌স্। কোথায় গিয়েছিলি?"

"গ্রেথেলের বাড়ি।"

"তার জন্য কী নিয়ে গিয়েছিলি?"

"কিছুই না। কিন্তু সে আমাকে একটা জিনিস দিয়েছে।"

"কি দিয়েছে রে?"

"একটা ছুরি।"

"কোথায় সেটা?"

"আমার জামার আস্তিনে সেটা আটকে দিয়েছি।"

"বোকার মতো কাজ করেছিস, হান্‌স্। সেটা তোর পকেটে রাখা উচিত ছিল।"

"তাতে কিছু যায় আসে না। পরের বার কথাটা মনে রাখব।"

"চললি কোথায়, হান্‌স্?"

"গ্রেথেলের বাড়ি, মা।"

"ঝগড়া মিটিয়ে ফেলিস।"

"নিশ্চয়ই!"

"আয় বাছা, হান্‌স্।"

"চলি, মা।"

গ্রেথেলের বাড়িতে হান্‌স্ পৌঁছল। "শুভদিন, গ্রেথেল।"

"শুভদিন, হান্‌স্। আমার জন্যে কী এনেছিস?"

"কিছুই না। আমাকে কিছু দে!"

হান্‌স্‌কে গ্রেথেল একটা ছাগল-ছানা দিল।

"চলি, গ্রেথেল।"

"আয়, হান্‌স্।"

ছাগলছানার পা চারটে একসঙ্গে বেঁধে সেটাকে তার পকেটে রাখল হান্‌স্। যখন সে বাড়ি পৌঁছল ছাগল-ছানাটা তখন দম বন্ধ হয়ে মরেছে। "শুভসন্ধ্যা, মা।"

"শুভসন্ধ্যা, হান্‌স্। কোথায় গিয়েছিলি?"

"গ্রেথেলের বাড়ি।"

"তার জন্যে কী নিয়ে গিয়েছিলে?"

"কিছুই না! সে আমাকে একটা জিনিস দিয়েছে।"

"কি দিয়েছে রে?"

"একটা ছাগল-ছানা।"

"কোথায় সেটা?"

"আমার পকেটে।"

"বোকার মতো কাজ করেছিস, হান্‌স্। ছাগলছানাটার গলায় দড়ি বেঁধে নিয়ে আসা উচিত ছিল।"

"তাতে কিছু আসে-যায় না। পরের বার কথাটা মনে রাখব।"

"চললি কোথায়, হান্‌স্?"

"গ্রেথেলের বাড়ি, মা।"

"ঝগড়া মিটিয়ে ফেলিস।"

"নিশ্চয়ই! চলি, মা।"

"আয় বাছা, হান্‌স্।"

গ্রেথেলের বাড়িতে হান্‌স্‌ পৌঁছল। "শুভদিন, গ্রেথেল।"

"শুভদিন হান্‌স্‌। আমার জন্যে কী এনেছিস?"

"কিছুই না। আমাকে কিছু দে।"

"গ্রেথেল তাকে নুনে-জরানো এক টুকরো শুয়োরের মাংস দিল।"

"চলি, গ্রেথেল।"

"আয়, হান্‌স্‌।"

নুনে-জরানো শুয়োরের মাংসর টুকরোতে দড়ি বেঁধে টানতে-টানতে নিয়ে চলল হান্‌স্‌। কুকুরের দল ছুটে এসে সেটা ফেলল খেয়ে। যখন সে বাড়ি পৌঁছল তখন তার হাতে শুধুই দড়িটা। দড়িটার অন্যপ্রান্তে কিছু নেই।" "শুভসন্ধ্যা, মা।"

"শুভসন্ধ্যা, হান্‌স্‌। কোথায় গিয়েছিলি?"

"গ্রেথেলের বাড়ি।"

"তার জন্যে কি নিয়ে গিয়েছিলি?"

"কিছুই না। কিন্তু সে আমাকে একটা জিনিস দিয়েছে।"

"কী দিয়েছে রে?"

"নুনে-জরানো এক টুকরো শুয়োরের মাংস।"

"সেটা নিয়ে কি করলি হান্‌স্‌?"

"দড়িতে বেঁধে বাড়িতে টেনে আনছিলাম। কুকুরের দল চুরি করে নিয়েছে।"

"বোকার মতো কাজ করেছিস, হান্‌স্‌। সেটা তোর মাথায় করে আনা উচিত ছিল।"

"তাতে কিছু যায় আসে না। পরের বার কথাটা মনে রাখব।"

"চললি কোথায়, হান্‌স্‌?"

"গ্রেথলের বাড়ি, মা।"

"আয় বাছা, হান্‌স্‌।"

"আসি, মা।"

গ্রেথেলের বাড়িতে হান্‌স্‌ পৌঁছল। "শুভদিন, গ্রেথেল।"

"শুভদিন, হান্‌স্‌। আমার জন্যে কী এনেছিস?"

"কিছুই না। আমাকে কিছু দে।"

গ্রেথেল তাকে একটা বাছুর দিল।

"চলি, গ্রেথেল।"

"আয়, হান্‌স্।"

বাছুরটাকে মাথায় তুলল হান্‌স্। সঙ্গে সঙ্গে সেটা হান্‌স্-এর মুখে চাঁটি ছুঁড়ল। শুভসন্ধ্যা, মা।"

"শুভসন্ধ্যা, হান্‌স্। কোথায় গিয়েছিলি ?"

"গ্রেথেলের বাড়ি।"

"তার জন্যে কী নিয়ে গিয়েছিলি ?"

"কিছুই না। সে কিন্তু আমাকে একটা বাছুর দিয়েছে।"

"কোথায় সেটা ?"

"সেটাকে মাথায় করে আনছিলাম। আমার মুখে সেটা চাঁটি মেরেছে।"

"বোকার মতো কাজ করেছিস, হান্‌স্। বাছুরটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে এনে গোয়ালে রাখা উচিত ছিল।"

"তাতে কিছু যায় আসে না। পরের বার কথাটা মনে রাখব।"

"কোথায় চললি, হান্‌স্ ?"

"গ্রেথেলের বাড়ি, মা।"

"তাকে বিয়ের কথা বলতে ?"

"আগেই তাকে বলেছি। আসি, মা।"

"আয় বাছা, হান্‌স্।"

গ্রেথেলের বাড়িতে হান্‌স্ পৌঁছল। "শুভদিন, গ্রেথেল।"

"শুভদিন, হান্‌স্। আমার জন্যে কী এনেছিস ?"

"কিছুই না। আমাকে কিছু দে।"

হান্‌স্‌কে গ্রেথেল বলল, "এবার আমাকে নিয়ে চল। তোর সঙ্গে যাব।"

গ্রেথেলের গলায় দড়ি জড়িয়ে এনে হান্‌স্ তাকে বেঁধে রাখল গোয়াল ঘরে।

তার মা বললেন, "শুভসন্ধ্যা, হান্‌স্।"

"শুভসন্ধ্যা, মা।"

"কোথায় গিয়েছিলি ?"

"গ্রেথেলের বাড়ি।"

"তার জন্যে কী নিয়ে গিয়েছিলি ?"

"কিছুই না।"

"গ্রেথেল তোকে কী দিল ?"

"কিছুই না। কিন্তু আমার সঙ্গে এসেছে।"

"কোথায় তাকে রেখে এলি ?"

"তার গলায় দড়ি জড়িয়ে এনে গোয়ালে বেঁধে রেখেছি। খেতে দিয়েছি এক গোছা ঘাস।"

"বোকার মতো কাজ করেছিস, হান্‌স্। তার দিকে ভেড়ার চোখে তাকানো উচিত ছিল।"[১]

"তাতে কিছু যায় আসে না মা, পরের বার কথাটা মনে রাখব।"

গোয়াল-ঘরে গিয়ে সেখানকার সব ভেড়া আর বাছুরের চোখ উপড়ে গ্রেথেলের মুখে সেগুলো ফেলল হান্‌স্।

তাতে গ্রেথেল ভীষণ রেগে দড়ি খুলে ছুটে পালাল আর তার পর হয়ে গেল হান্‌স্-এর বউ।

[১] ইংরিজিতে Sheep's-eye মানে ভালোবাসাপূর্ণ দৃষ্টি।



ছোটো লাল-টুপি

এক সময় ছিল একটি ছোট্টো মেয়ে। তাকে দেখলেই লোকে ভালো-বেসে ফেলত। ঠাকুমা তাকে সব চেয়ে ভালোবাসতেন। তাকে উপহার দিয়ে-দিয়ে তাঁর আশ মিটত না। একবার মেয়েটিকে তিনি দেন লাল মখমলের ছোট্টো একটা টুপি। টুপিটা ভারি মানাতো মেয়েটিকে। তাই সব সময় সেটা সে পরত। ফলে তার নাম হয়ে যায় লাল-টুপি।

একদিন মা তাকে বলল, "লাল-টুপি, এই কেক আর এই এক বোতল আঙুর-রস তোর ঠাকুমাকে দিয়ে আয়। তাঁর শরীর ভালো যাচ্ছে না। এই ভালো জিনিসগুলো খেলে তিনি চাঙ্গা হয়ে উঠবেন। রোদ কড়া হয়ে উঠবার আগেই যাত্রা করিস। সভ্যভব্য হয়ে হাঁটিস। খবরদার দৌড়াবি না। দৌড়লে হোঁচট খেয়ে পড়বি, আর বোতলটা যাবে ভেঙে—তোর ঠাকুমা আঙুর-রস খেতে পাবেন না। আর মনে

রাখিস, তাঁর ঘরে ঢুকে এদিক-সেদিক তাকাবার আগে 'সুপ্রভাত' বলতে যেন ভুল না হয়।"

লাল-টুপি তার মাকে চুমু খেয়ে বলল, "যা-যা বললে সব করব।"

তার ঠাকুমা থাকতেন এক বনে। তাদের গ্রাম থেকে হেঁটে যেতে লাগে আধ ঘণ্টা। বনে পৌঁছে লাল-টুপির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল নেকড়ের। জন্তুটা যে কী রকম পাজি আর হিংস্র সে-সম্বন্ধে মেয়েটির কোনো ধারণাই ছিল না। তাই তাকে দেখে মোটেই ভয় পেল না সে।

নেকড়ে বলল, "সুপ্রভাত, লাল-টুপি।"

"ধন্যবাদ, নেকড়ে," উত্তর দিল লাল-টুপি।

"ছোট্টো লাল-টুপি, এত সকাল-সকাল কোথায় চলেছ?"

"ঠাকুমার কাছে।"

"তোমার আলোয়ানের নীচে কী আছে?"

"কেক আর আঙুর-রস। গতকাল ছিল কেক-রুটি সেঁকার দিন। ঠাকুমার শরীর খারাপ। তাই আমরা ভাবলাম এই ভালো-ভালো খাবার পেলে তিনি খুশি হবেন।

"তোমার ঠাকুমা কোথায় থাকেন, লাল-টুপি?"

"এই বনে। আরো মিনিট পনেরোর পথ। তিনটে প্রকাণ্ড ওক্-গাছের নীচে তাঁর বাড়ি। পাশেই একটা বাদাম ঝাড়।"

নেকড়ে ভাবল, 'এই নিরীহ বাচ্চা মেয়েটার মাংস বুড়িটার চেয়ে নিশ্চয়ই খেতে অনেক ভালো। আমাকে সাবধানে ফন্দি আঁটতে হবে— দুটোকেই যাতে সাবড়ানো যায়।'

তারা পাশাপাশি খানিক হাঁটার পর নেকড়ে বলল, "লাল-টুপি, তোমার চার পাশে কত সুন্দর-সুন্দর ফুল ফুটে আছে দেখো। তাদের না দেখে সোজা তাকিয়ে চলেছ কেন? লাল-টুপি, আমার মনে হয় পাখিদের মিষ্টি গানও তুমি শুনছ না। এমন গোমড়া মুখে হাঁটছ যেন চলেছ ইস্কুলে। বনের সুন্দর-সুন্দর জিনিসগুলো একেবারে লক্ষ্যই করছ না।"

চোখ তুলে তাকিয়ে লাল-টুপি দেখল গাছের ডালপালার মধ্যে দিয়ে এসে সূর্যের-রশ্মি পড়েছে সুন্দর-সুন্দর ফুলের উপর। সে ভাবল, 'এক তোড়া তাজা সুগন্ধি ফুল নিয়ে গেলে ঠাকুমা নিশ্চয়ই খুব খুশি হবেন। এখনো বেলা বাড়ে নি। হাতে অনেক সময় আছে।' এই-না ভেবে

আসল পথ ছেড়ে সে ছুটল ফুল তুলতে। এক-একটা ফুল তোলে আর দেখে আরো দূরে আরো সুন্দর-সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে। এইভাবে ফুল তুলতে তুলতে সে পৌঁছল বনের গহনে।

ইতিমধ্যে মেয়েটির ঠাকুমার বাড়িতে গিয়ে নেকড়ে দরজায় দিল টোকা।

ঠাকুমা প্রশ্ন করলেন, "কে ?"

"আমি লাল-টুপি। আপনার জন্যে কেক আর আঙুর-রস এনেছি। দরজা খুলুন।"

ঠাকুমা চেঁচিয়ে বললেন, "হুড়কোটা তোলো। আমি ভারি দুর্বল। উঠতে পারছি না।"

হুড়কো তুলে, ভিতরে না গিয়ে আর কোনো কথা না বলে ঠাকুমাকে গিলে ফেলল নেকড়ে। তার পর তাঁর পোশাক পরে, তাঁর রাত-টুপি মাথায় দিয়ে, তাঁর বিছানায় শুয়ে খাটের চার পাশের পর্দা টেনে দিল।

রাশি-রাশি ফুল তুলল লাল-টুপি। এত ফুল যে তার পক্ষে সেগুলো বয়ে নিয়ে যাওয়াই শক্ত। তার পর সে ধরল তার ঠাকুমার বাড়ি যাবার পথ। সেখানে পৌঁছে দরজা খোলা দেখে সে অবাক হল। ঘরের মধ্যেকার সব-কিছুই তার মনে হল কেমন যেন অদ্ভুত। ভাবল, 'কী কাণ্ড! আজ আমার গা ছম্‌ছম্‌ করে কেন? আমার তো ঠাকুমার কাছে আসতে খুব ভালো লাগে!'

লাল-টুপি চেঁচিয়ে উঠল, "সুপ্রভাত!" কিন্তু কোনো উত্তর পেল না। তার পর খাটের কাছে গিয়ে পর্দা সরিয়ে দেখে মুখের উপর রাত-টুপিটা টেনে নামিয়ে তার ঠাকুমা শুয়ে। কিন্তু তাঁকে কেমন যেন অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

"ঠাকুমা, তোমার কানগুলো কী বড়ো-বড়ো!" চেঁচিয়ে উঠল সে।

"বড়ো বলে অনেক ভালো শুনতে পাই।"

"ঠাকুমা, তোমার চোখগুলো কী বড়ো-বড়ো!"

"বড়ো বলে অনেক ভালো দেখতে পাই।"

"ঠাকুমা, তোমার হাতগুলো কী বড়ো-বড়ো!"

"বড়ো বলেই তো তোকে ভালো করে জড়িয়ে ধরতে পারি।"

"ঠাকুমা, তোমার এরকম সাংঘাতিক বড়ো মুখ তো কখনো দেখি নি।"

"বড়ো বলেই তো ভালো করে তোকে গিলতে পারব।"

কথাটা বলে নেকড়ে বিছানা থেকে মুখ বার করে ছোট্টো লাল-টুপিকে গিলে ফেলল। এইভাবে খিদে মিটিয়ে আবার বিছানায় শুয়ে নেকড়ে পড়ল ঘুমিয়ে। তার নাক ডাকতে লাগল অসম্ভব জোরে-জোরে।

ঠিক সেই সময় বনকর্মী যাচ্ছিল বাড়িটার পাশ দিয়ে। আপন মনে সে বলে উঠল, "ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে বুড়ি দারুণ গোঙাচ্ছে তো! অসুখ-বিসুখ করল কি না ভেতরে গিয়ে দেখি।" ভিতরে গিয়ে সে দেখে বিছানায় নেকড়েটা শুয়ে। সে চেঁচিয়ে উঠল, "বুড়ো শয়তান, তুই তা হলে এখানে। অনেকদিন ধরে তোর খোঁজ করছি।" এই-না বলে নিজের বন্দুকে গুলি ভরতে সে শুরু করল। হঠাৎ তার মনে হল বুড়িকে হয়তো নেকড়েটা গিলেছে। তাই গুলি না ছুঁড়ে কাঁচি দিয়ে সে কাটতে শুরু করল ঘুমন্ত জন্তুটার পেট।

কাঁচি দিয়ে কচ্‌কচ্‌ করে দু ধার কাটতেই প্রথমে দেখা গেল ছোট্টো একটা লাল-টুপির ডগা আর তার কয়েক মুহূর্ত পরেই সেই টুপির মালিক এক লাফে বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে উঠল, "উঃ! কী যে ভয় পেয়েছিলাম। একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার—ধারণাই করতে পারবে না নেকড়ের পেটের ভেতরটা কী ভীষণ অন্ধকার!" আর তার পর বেরিয়ে এলেন বুড়ি ঠাকুমা। তখনো তিনি বেঁচে, কিন্তু নিশ্বেস নিচ্ছিলেন খুব কষ্ট করে।

তাড়াহুড়ো করে লাল-টুপি নিয়ে এল বড়ো-বড়ো পাথর। সেগুলো সে ভরল নেকড়েটার পেটে। ঘুম ভাঙার পর যাবার জন্য নেকড়ে উঠল। কিন্তু পাথরগুলো এমনই ভারী যে, সে সঙ্গে সঙ্গে গেল পড়ে আর তার পর মরে। নেকড়েকে মরতে দেখে তারা তিনজনেই খুব খুশি। নেকড়েটার চামড়া নিয়ে বনকর্মী তার বাড়ি গেল। ঠাকুমা তারিয়ে-তারিয়ে খেলেন সেই কেক আর আঙুর-রস। আর লাল-টুপি মনে-মনে বলল, 'মা যে পথে যেতে বলেছিল সে পথ ছেড়ে বনের মধ্যে অন্য পথে জীবনে আর কখনো যাব না।"

শোনা যায় আর-একবার নতুন-সেঁকা একটা কেক নিয়ে লাল-টুপি আবার যাচ্ছিল তার ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করতে। এমন সময় তার সঙ্গে দেখা হয় আর-একটা নেকড়ের। সেটাও চেষ্টা করে আসল পথ

থেকে তাকে সরিয়ে আনতে। কিন্তু লাল-টুপি তখন আগের চেয়ে অনেক সাবধানী হয়ে গিয়েছিল। তাই নেকড়ের কথায় সে কান দিল না। ঠাকুমার বাড়ি পৌঁছে নেকড়েটার কথা তাঁকে সে বলল। জানাল শয়তানের মতো কী রকম আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে সে বলেছিল "সুপ্রভাত।" বলল, আসল পথে না থাকলে সঙ্গে সঙ্গে নেকড়েটা আমায় খেয়ে ফেলত।"

ঠাকুমা বললেন, "আয়, দরজায় আমরা হুড়কো দিয়ে দি। তা হলে ওটা আর ভেতরে আসতে পারবে না।"

খানিক পরেই নেকড়ে দরজায় টোকা দিয়ে বলল, "ঠাকুমা, দরজা খুলুন। আমি লাল-টুপি। আপনার জন্যে চমৎকার নতুন একটা কেক এনেছি।" তারা চুপচাপ রইল। দরজা খুলল না। নেকড়েটা তখন চোরের মতো পা টিপে-টিপে বাড়ির চার দিকে ঘুরতে লাগল। শেষটায় লাফ দিয়ে ছাতে উঠে অপেক্ষা করতে লাগল সন্ধের জন্য—যখন লাল-টুপি আবার বাড়ি ফিরবে আর অন্ধকার তার পিছন পিছন গিয়ে লাল-টুপিকে সে ফেলবে খেয়ে।

ঠাকুমা কিন্তু নেকড়ের মতলব বুঝতে পেরে নাতনিকে বললেন, "লাল-টুপি, এই বালতিটা নে। গতকাল আমি সসেজ্ সেদ্ধ করেছিলাম। যে জলে সসেজ্ সেদ্ধ করি সেই জল নিয়ে গিয়ে চৌবাচ্চায় ঢাল।" সেই জল বালতি-বালতি নিয়ে গিয়ে লাল-টুপি প্রকাণ্ড চৌবাচ্চাটা ভরে ফেলল। তার পর নেকড়ের নাকে গিয়ে পৌঁছল সসেজের গন্ধ। শুঁকতে-শুঁকতে ছাত থেকে সে নীচে উঁকি মারতে লাগল। গলা বাড়িয়ে ঝুঁকতে ঝুঁকতে সে আর টাল সামলাতে পারল না। ঝপাং করে সেই প্রকাণ্ড চৌবাচ্চায় পড়ে সে ডুবে মরল। খুশি মনে লাল-টুপি ফিরল তার বাড়িতে। পথে কেউ আর তার কোনো ক্ষতি করতে চেষ্টা করল না।

ছজনের কেরামতি

এক সময় নানা ছল-চাতুরি আর জাদুবিদ্যা-জানা এক লোক ছিল। যুদ্ধে সে সাহসীর মতো লড়ে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার পর খুব সামান্য পেনসেন দিয়ে তাকে বরখাস্ত করা হয়। রেগেমেগে সে বলল, "সবুর কর, মজা দেখাচ্ছি। এই সামান্য ভাতায় মোটেই আমি খুশি হই নি। ঠিক-ঠিক লোক জোগাড় করতে পারলে রাজার কোষাগার আমি ফাঁক করে দেবো।" এই-না বলে ভীষণ চটে সে গেল একটা বনে। সেখানে গিয়ে দেখে এমনভাবে একটা লোক ছটা গাছ ওপড়াল, যেন সেগুলো গমের চারা। সেই ভীমসেনকে সে বলল, "আমার চাকর হয়ে আমার সঙ্গে আসবে?"

লোকটা বলল, "যাব। কিন্তু তার আগে আগুন জ্বালাবার এই কাঠকুটো বাড়িতে মাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।" এই-না বলে একটা গাছ দিয়ে অন্য পাঁচটা গাছ জড়িয়ে বোঝাটা পিঠে করে সে নিয়ে গেল।

তার পর সে ফিরল তার নতুন প্রভুর কাছে। নতুন প্রভু তাকে বলল, "আমরা দুজন যাব পৃথিবীর শেষ সীমানায়।"

খানিক যাবার পর এক শিকারীর সঙ্গে তাদের দেখা। একটা হাঁটু গেড়ে বসে বন্দুক তুলে সে তাক করছিল।

প্রভু প্রশ্ন করল, "ওহে, কী তুমি গুলি করতে চাও?"

সে বলল, "দু মাইল দূরে একটা ওক্‌গাছের ডালের কিনারে একটা মাছি বসে আছে। মাছিটার ডান চোখ গুলি মেরে উড়িয়ে দিতে চাই।"

"তাই নাকি? তা হলে চলে এসো আমার সঙ্গে। আমরা তিনজনে যাব পৃথিবীর শেষ সীমানায়।"

রাজি হয়ে শিকারী তাদের সঙ্গে বেরুল। খানিক পরে তারা পৌঁছল সাতটা বাতাস-কলের কাছে। বাতাস না বইলেও, গাছের কোনো পাতা না কাঁপলেও সেগুলো বন্‌বন্‌ করে ঘুরছিল। প্রভু বলল, "বাতাস নেই অথচ বাতাস-কল ঘুরছে—ব্যাপারটা মোটেই বুঝলাম না।" এই-না বলে ভৃত্যদের সঙ্গে সে হেঁটে চলল।

দু মাইল এগিয়ে তারা দেখে একটা গাছে বসে একটা লোক এক নাক টিপে অন্য নাক দিয়ে বাতাস ছাড়ছে।

প্রভু প্রশ্ন করল, "গাছে বসে করছ কী?"

"দু মাইল দূরের সাতটা বাতাস-কল চালাচ্ছি!"

"তাই নাকি? তা হলে চলে এসো আমাদের সঙ্গে। আমরা চারজনে যাব পৃথিবীর শেষ সীমানায়।"

লোকটা গাছ থেকে নেমে তাদের দলে যোগ দিল। খানিকটা যাবার পর তারা দেখল একটা লোক এক পায়ে দাঁড়িয়ে। অন্য কাটা-পা তার পাশে মাটির উপর পড়ে।

প্রভু মন্তব্য করল, "এইভাবে বিশ্রাম নেওয়া বোধ হয় খুব আরামের ব্যাপার।"

লোকটা বলল, "আমি দৌড়বাজ। যাতে খুব জোরে না ছুটি তার জন্যে একটা পা করাত দিয়ে কেটে ফেলেছি। যে-কোনো পাখি যত জোরেই উড়ুক-না-কেন—দু পায়ে তার চেয়ে জোরে আমি ছুটতে পারি।"

প্রভু বলল, "তাই নাকি? তা হলে চলে এসো আমাদের সঙ্গে। আমরা পাঁচজনে যাব পৃথিবীর শেষ সীমানায়।"

লোকটা রাজি হল। খানিকটা যাবার পর তারা দেখল একটা লোক তার টুপি পরেছে এক কানে।

প্রভু বলল, "এ কী অসভ্যতা! টুপিটা ঠিকমতো পর। তোমাকে একটা ক্লাউনের মতো দেখাচ্ছে।"

লোকটা বলল, "তোমার আদেশ মানতে পারলাম না। টুপিটা সোজা করে পরলে ভীষণ বরফ পড়বে। তা হলে আকাশের সমস্ত পাখি মরে পড়বে মাটিতে।"

প্রভু বলল, "তাই নাকি ? তা হলে চলে এসো আমাদের সঙ্গে। আমরা ছজনে যাব পৃথিবীর শেষ সীমানায়।"

তারা ছজন যেতে-যেতে পৌঁছল রাজধানীতে। সেখানে তারা শুনল রাজা ঘোষণা করেছেন—যে-কেউ দৌড়ে তাঁর মেয়েকে হারাতে পারবে তার সঙ্গেই দেবেন মেয়ের বিয়ে। কিন্তু হারলে তার গর্দান নেওয়া হবে।

সেই পাঁচজনের প্রভু জানাল রাজকন্যের সঙ্গে সে দৌড়বে। ভাবল, 'আমার বদলে আমার চাকরকে বলব দৌড়তে।'

নিজের মাথা বাজি রেখে তার হয়ে অন্য কাউকে দৌড়তে দিতে রাজার আপত্তি হল না। প্রভু তখন দৌড়বাজের কাটা পা স্ক্রু দিয়ে ভালো করে এঁটে দিয়ে বলল, "বাতাসের মতো ছুটে তোমায় জিততে হবে।"

দৌড়ের সেই প্রতিযোগিতায় স্থির করা হয় একটা নির্দিষ্ট কুয়ো থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীদের জল আনতে হবে। প্রথম যে জল আনবে সে-ই হবে বিজয়ী। দৌড়বাজ আর রাজকন্যেকে দেওয়া হল একটা করে জাগ্। একসঙ্গে তারা ছুটতে শুরু করল। কিন্তু রাজকন্যে কয়েক পা দৌড়বার আগেই দৌড়বাজ অদৃশ্য হয়ে বিদ্যুৎ চমকের মতো পৌঁছল সেই কুয়োয়। জাগ্-এ জল ভরে সে শুরু করল দৌড়ে ফিরতে। কিন্তু ফিরতি-পথে খুব ক্লান্ত বোধ করায় জাগ্‌টা নামিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল। মাথার বালিশ সে করেছিল ঘোড়ার মাথার খুলি দিয়ে। ভেবেছিল এই শক্ত জিনিসটায় মাথা রাখলে বেশিক্ষণ সে ঘুমবে না।

যে-কোনো মানুষের মতোই জোরে দৌড়তে পারত রাজকন্যে। নির্দিষ্ট কুয়োয় গিয়ে সে তার জাগ্ ভর্তি করল। তার পর ফিরতি-পথে দৌড়বাজকে ঘুমতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, "আরে, কী-কাণ্ড ! শত্রু যে দেখি আমার মুঠোয় !" এই-না বলে দৌড়বাজের জাগ্-এর জল ফেলে দিয়ে সে ছুটে চলল।

ফলে সমূহ সর্বনাশ ঘটে যেতে পারত। কিন্তু যে-শিকারী বহু দূরের জিনিস দেখতে পেত সে বসেছিল দুর্গের মিনার-চুড়োয়। সব-কিছু দেখে সে মনে-মনে বলল, 'রাজকন্যের কাছে আমরা হারব না।" এই-না বলে বন্দুক তুলে ঘোড়ার মাথার খুলিটা সে চুরমার

করে দিল। দৌড়বাজের গায়ে আঁচড়টি লাগল না। কিন্তু তার ঘুম গেল ভেঙে।

চমকে জেগে উঠে দৌড়বাজ দেখে তার জাগ্ শূন্য আর রাজকন্যে দৌড়ে এগিয়ে জিততে চলেছে। কিন্তু একটুও না ঘাবড়ে, আবার তার জাগ্ নিয়ে কুয়োয় গিয়ে জল ভরে রাজকন্যের দশ মিনিট আগে প্রতিযোগিতার খুঁটি সে পেরিয়ে গেল। তার পর বলল, "আগে তো দৌড়ের কোনো প্রতিযোগিতাই হচ্ছিল না। শেষ মুহূর্তে পা দুটো সামান্য খেলালাম।"

রাজা কিন্তু ভীষণ রেগে গেলেন। সাধারণ এক সৈনিক, যাকে বরখাস্ত করা হয়েছে, তাকে বিয়ে করতে হবে ভেবে রাজকন্যে উঠল আরো রেগে। কী করে লোকটাকে আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের দূর করা যায় তাই নিয়ে তারা অনেক জল্পনা-কল্পনা করল। রাজা হঠাৎ তাঁর মেয়েকে বলে উঠলেন, "আমার মাথায় একটা ফন্দি এসেছে। ভয় পাস নি। আমি একটা ব্যবস্থা করছি।" এই-না বলে তাদের ছজনকে তিনি ভোজ খাবার নিমন্ত্রণ করলেন। নিজে গিয়ে তাদের তিনি নিয়ে এলেন একটা ঘরে। সে-ঘরের মেঝেটা লোহার, দরজা-জানালাও লোহার। জানলার গরাদগুলোও লোহার। ঘরের মাঝখানের টেবিলে ছিল হরেকরকম দামী-দামী খাবার। রাজা তাঁদের খাওয়া শুরু করতে বলে বেরিয়ে এসে দরজায় কুলুপ দিয়ে দিলেন। তার পর রাঁধুনিকে ডেকে বললেন ঘরের নীচে আগুন জ্বালিয়ে মেঝেটা গন্‌গনে লাল করে তুলতে।

রাজার আদেশমতো রাঁধুনি আগুন জ্বালাল। টেবিলের চার পাশে খেতে বসে গরম লাগতে তাদের ছজনের মনে হল—বোধ হয় বদহজমের জন্যে ওরকম লাগছে। কিন্তু গরমটা ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠতে ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে তারা দেখে দরজায় কুলুপ দেওয়া।

তারা তখন বুঝল রাজা তাদের পুড়িয়ে মারতে চান।

যে-লোকটার টুপি কানের উপর সে বলল, "রাজার ফন্দি আমি বানচাল করে দিচ্ছি।" এমন বরফ ঝরাব যাতে আগুনটা নিভে যায়।" এই-না বলে টুপিটা সে সোজা করে পরল আর সঙ্গে সঙ্গে বরফ পড়ায় ঘরের তাপ মিলিয়ে গেল আর ডিশের খাবারগুলো গেল জমে।

কয়েক ঘণ্টা কাটার পর রাজার মনে হল লোকগুলো নিশ্চয়ই

মরেছে। তিনি আদেশ দিলেন দরজা খুলতে। তার পর নিজে গেলেন দেখতে। কিন্তু তাদের সুস্থ সবল দেখে একেবারে তাজ্জব বনে গেলেন। তারা বলল, ঘরের বাইরে খানিক বেরিয়ে তাদের শরীর গরম করতে তারা চায় আর জানাল ভীষণ ঠাণ্ডায় ডিশের সব খাবার জমে শক্ত হয়ে গেছে।

ঘরটার তলায় চুল্লি জ্বালায় নি বলে রাঁধুনিকে রাজা ভীষণ বকাবকি করতে লাগলেন। রাঁধুনি তখন চুল্লির কপাট খুলে রাজাকে দেখাল গন্‌গনে আঁচ। রাজা তখন বুঝলেন লোকগুলোকে ঝলসে মারার ফন্দিটা একেবারে ভেস্তে গেছে।

রাজা তখন আবার ভাবতে বসলেন লোকগুলোকে কী করে তাড়ানো যায়। শেষটায় লোকগুলোর প্রভুকে ডেকে বললেন, "তুমি যদি আমার মেয়েকে বিয়ে করবে না বল, তা হলে তোমাকে অনেক মোহর দেব।"

সে বলল, "রাজি, মহারাজ! আমার চাকররা যত মোহর বয়ে নিয়ে যেতে পারে তত মোহর দিতে হবে কিন্তু।"

তার কথা শুনে রাজা খুশি হলেন। প্রভু বলল, দিন পনেরো পরে মোহরগুলো নিতে সে আসবে।

তার পর প্রভু রাজত্বের সব দর্জিদের ডেকে বলল চোদ্দোদিন ধরে মস্ত একটা থলি সেলাই করে দিতে। প্রকাণ্ড থলিটা শেষ হলে পরে দুজনের মধ্যে সবচেয়ে জোয়ান লোকটি সেটা কাঁধে করে রাজপ্রাসাদে হাজির হল।

তাকে দেখে তো রাজার চক্ষু চড়কগাছ। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "এ-দানবটা কে, বাড়ির মতো প্রকাণ্ড কাপড়ের মোট যে কাঁধে করে এনেছে?" তার পর আঁতকে উঠে ভাবলেন, 'এরা দেখছি অনেক মোহর নিয়ে যাবে।'

তিনি আদেশ দিলেন দু মণ মোহর নিয়ে আসতে। চোদ্দোজন ষণ্ডামার্কা লোক ধরাধরি করে মোহরের বস্তাটা নিয়ে এল। কিন্তু সেই দানবের মতো চেহারার লোকটা বস্তাটা এক হাতে তুলে বলল সেটায় তার থলির তলাটাও ভরবে না। আরো মোহর সে দাবি করল। একে-একে রাজার কোষাগারের মোহর-ভর্তি সব বস্তাগুলো তারা নিয়ে এল কিন্তু থলিটার অর্ধেকও ভরল না।

দানবের মতো চেহারার লোকটা রেগে চেঁচিয়ে উঠল, "আরো আনো!

এই-সব খুদকুঁড়োয় কী হবে? এইভাবে আমার থলি কখনো ভরবে না।" শেষটায় রাজত্বের সব জায়গা থেকে সাতহাজার মালগাড়ি সোনা এসে পৌঁছল আর সেই দানব বলদসমেত গাড়িগুলো ভরল তার থলির মধ্যে।

দানব বলল, "আরো সোনার জন্যে অপেক্ষা করার ধৈর্য আমার নেই। সামনে যা পাব তাই দিয়েই আমার থলিটা ভরব।" এই-না বলে সেই বিরাট থলিটা কাঁধে তুলে সে চলে গেল।

রাজত্বের সমস্ত সম্পদ লোকটাকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে দেখে ভীষণ ক্ষেপে উঠে রাজা তাঁর অশ্বারোহীবাহিনীকে আদেশ দিলেন সেই ছুজন লোককে বন্দী করে দানবের কাছ থেকে থলিটা ফিরিয়ে আনতে।

দু দল সৈন্য চট্‌পট্‌ তাদের কাছে পৌঁছে চেঁচিয়ে উঠল, "তোমরা বন্দী! সোনার থলিটা দাও। নইলে তোমাদের কচুকাটা করব।"

নাক দিয়ে যে-লোকটা জোরে হাওয়া ছাড়তে পারে সে বলল, "কী বললে? আমরা বন্দী? তোমাদের সবাইকে এখনি শূন্যে নাচাচ্ছি।" এই-না বলে একটা নাক টিপে আর-একটা নাক দিয়ে সে হাওয়া ছাড়তে লাগল। দেখতে-দেখতে ছত্রভঙ্গ হয়ে পাহাড়ের উপর দিয়ে নীল আকাশের দু দিকে উড়ে গেল দু দল সৈন্য। একজন সেনাপতি চেঁচাতে লাগল, "আমায় দয়া কর! আমায় দয়া কর!" সে ছিল খুব সাহসী সৈনিক। যুদ্ধে হয়েছিল ন বার আহত। তার এ-ধরনের অপমানজনক মৃত্যু হওয়া অনুচিত। তাই লোকটা বাতাস ছাড়া খানিক বন্ধ করল। আকাশ থেকে ধীরে-ধীরে নেমে এল সেনাপতি।

সে তখন সেনাপতিকে বলল, "তোমার রাজাকে বল গে যাও, আর সৈন্য পাঠালে তাদেরও এই দশা হবে।"

সেনাপতির মুখে কথাটা শুনে রাজা বললেন, "লোকগুলোকে যেতে দাও। লোকগুলো কেমন যেন ভুতুড়ে ধরনের।"

তারা মনের আনন্দে চলে গেল। আর তার পর সেই অগাধ সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে সমান ভাগ করে নিয়ে মনের আনন্দে দিন কাটাতে লাগল।

মানুষ আর নেকড়ে

এক সময় এক শেয়াল এক নেকড়েকে বলছিল মানুষের ক্ষমতার কথা। বলছিল নানা ধরণের ছলাকলার সাহায্য না নিলে কোনো জন্তুই তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না।

শুনে নেকড়ে বলল, "মানুষের যদি দেখা পাই তা হলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব।"

শেয়াল বলল, "তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারি। কাল সকালে আমার কাছে এসো। তোমাকে একটা মানুষ দেখিয়ে দেবো।"

পরদিন ভোর-ভোর উঠে নেকড়ে গেল শেয়ালের কাছে। যে-পথ দিয়ে বনকর্মী আসে সেই পথে শেয়াল তাকে নিয়ে গেল। প্রথমে তাদের সঙ্গে দেখা এক বুড়ো সৈনিকের।

নেকড়ে প্রশ্ন করল, "ওটা কি মানুষ?"

শেয়াল বলল, "না। এক সময় মানুষ ছিল।"

তার পর তাদের সঙ্গে দেখা একটি ছোটো ছেলের। সে ইস্কুলে যাচ্ছিল।

নেকড়ে প্রশ্ন করল, "ওটা কি মানুষ?"

শেয়াল বলল, "না। তবে একদিন মানুষ হবে।"

শেষটায় এল বনকর্মী। তার কাঁধে দো-নলা বন্দুক; কোমরে ছোরা।

নেকড়েকে শেয়াল বলল, "ঐ দেখো একটা মানুষ আসছে। তুমি ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পার। আমি কিন্তু দৌড়ে আমার গর্তে চললাম।"

নেকড়ে তার দিকে তেড়ে গেল। বন্দুকে বুলেট ভরে নি বলে বনকর্মী মনে মনে আক্ষেপ করে নেকড়ের মুখে ছর্‌রা-ভরা গুলি ছুঁড়ল। ভয়ংকর মুখবিকৃতি করে উঠল নেকড়ে, কিন্তু তবুও ভয় না পেয়ে গেল তেড়ে। বনকর্মী তখন ছুঁড়ল তার দ্বিতীয় গুলি। আবার মুখবিকৃতি করল নেকড়ে। কিন্তু যন্ত্রণা চেপে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল বনকর্মীর উপর। বনকর্মী তখন তার ছোরা বার করে তার উপর লাগাল ঘনঘন কোপ বসাতে। ফলে করুণভাবে আর্তনাদ করতে-করতে রক্তাক্ত শরীর নিয়ে নেকড়ে ছুটে ফিরে গেল শেয়ালের গর্তে।

শেয়াল প্রশ্ন করলে, "মানুষের দেখা পেয়ে কেমন লাগল, ভায়া?"

নেকড়ে বলল, "হায় হায়! আমি জানতাম না মানুষদের অমন ক্ষমতা হয়। প্রথমে লোকটা কাঁধ থেকে একটা লাঠি নিয়ে তাতে ফুঁ দেয়, আর কী সব আমার মুখে উড়ে এসে বিশ্রী কামড় বসায়। তার পর আবার সে ফুঁ দেয় তার লাঠিতে আর শিলাবৃষ্টির শিল আর বিদ্যুতের মতো কী সব ছুটে এসে আমার নাকে লাগে। তার পর আমি যখন তার পিঠে সে তখন তার বুকের পাশ থেকে চকচকে একটা পাঁজরা খুলে আমাকে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে। আমি মরমর হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম।"

শেয়াল বলল, "তুমি যে কী রকম মিথ্যে বড়াইকারী এবার বুঝলে তো? আমার কথাটা তোমার শোনা উচিত ছিল। যেটা পার না সেটা করতে যাওয়া বোকামি।"

তিনটে জাদুময় উপহার

বহুকাল আগে এক দর্জির ছিল তিনটি ছেলে আর একটি ছাগল। সেই ছাগলের দুধ সবাই খেত। তাই তাকে তাজা ঘাস খাওয়াবার জন্য রোজ নিয়ে যেতে হত মাঠে। ছাগলকে পালা করে এক-একদিন এক-এক ছেলে চরাতে নিয়ে যেত। একদিন বড়ো ছেলে তাকে নিয়ে গির্জের কবরখানায় গেল। সেখানকার লতা-পাতা-ঘাস সব চেয়ে ভালো। সারা দিন ছগলটা সেখানে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে চরে বেড়াল। সন্ধেয় বাড়ি ফেরার সময় হলে বড়ো ছেলে জিগ্‌গেস করল, "তোর পেট ভরেছে তো রে?"

ছাগল বলল :

"পেট করছে হাঁস্‌ফাঁস্‌,
ধরবে না আর একটা ঘাস,
ব্যা! ব্যা! ব্যা!"

ছেলেটি বলল, "তা হলে বাড়ি চ।" এই-না বলে তার গলায় দড়ি জড়িয়ে এনে তাকে সে রাখল গোয়ালঘরে বেঁধে।

দর্জি জিগ্‌গেস করল, "পেট ভরে ছাগলটা খেয়েছে তো রে?"

ছেলে জবাব দিল, "হাঁ, বাবা। এমন পেট ভরেছে যে, আর একটা ঘাসও খেতে পারে নি।"

বাবা কিন্তু নিঃসন্দেহ হবার জন্য গোয়ালঘরে গিয়ে তার প্রিয় ছাগলের পিঠে হাত বুলিয়ে জিগ্‌গেস করল, "কী রে, পেট ভরেছে?"

ছাগল জবাব দিল :

"পেট কী করে ভরবে ?
কবরখানায় লাফাচ্ছিলাম
ঘাসের পাতা কোথায় পেলাম ?
ব্যা ! ব্যা ! ব্যা !"

দর্জি চেঁচিয়ে উঠল, "আরে ! এ কী বলে !" তার পর দৌড়ে গিয়ে তার ছেলেকে বলল, "মিথ্যেবাদী কোথাকার ! তুই বললি ছাগলটা পেট ভরে খেয়েছে। আর এদিকে সে বলছে উপোস করে রয়েছে !" এই-না বলে ভীষণ রেগে একটা খেঁটে দিয়ে তাকে দারুণ পেটাল। তার পর দিল বাড়ি থেকে দূর করে।

পরদিন ছাগলকে চরাতে নিয়ে যাবার পালা ছিল মেজো ছেলের। বাগানের এক ঝোপের কাছে তাকে সে নিয়ে গেল। সেখানে গজিয়েছিল মিষ্টি-মিষ্টি তাজা-তাজা লতা-পাতা-ঘাস। ছাগলটা সেই ঝোপ মুড়িয়ে শেষ করল। সন্ধেয় বাড়ি ফেরার সময় হলে দ্বিতীয় ছেলে জিগ্‌গেস করল, "তোর পেট ভরেছে তো রে ?"

ছাগল বলল :

"পেট করছে হাঁস্‌ফাঁস্‌,
ধরবে না আর একটা ঘাস,
ব্যা ! ব্যা ! ব্যা !"

ছেলেটি বলল, "তা হলে বাড়ি চ !" তাকে এনে গোয়ালঘরে সে বেঁধে রাখল।

বুড়ো দর্জি জিগ্‌গেস করল, "পেট ভরে ছাগলটা খেয়েছে তো রে ?"

ছেলে জবাব দিল, "হ্যাঁ, বাবা। এমন পেট ভরেছে যে আর একটা ঘাসও খেতে পারে নি।"

দর্জির কিন্তু মন খুঁতখুঁত করতে লাগল। তাই গোয়ালঘরে গিয়ে ছাগলের পিঠে হাত বুলিয়ে জিগ্‌গেস করল, "কী রে, পেট ভরেছে ?"

ছাগল জবাব দিল :

"পেট কী করে ভরবে ?
কবরখানায় লাফাচ্ছিলাম
ঘাসের পাতা কোথায় পেলাম ?
ব্যা ! ব্যা ! ব্যা !"

দর্জি চেঁচিয়ে উঠল, "আরে! এ কী বলে! বজ্জাতটা দেখছি জন্তুটাকে উপোস করিয়ে রেখেছে!" এই-না বলে ভীষণ রেগে একটা খেঁটে দিয়ে তাকে দারুণ পেটাল। তার পর দিল বাড়ি থেকে দূর করে।

পরদিন ছাগল চরাতে নিয়ে যাবার পালা ছিল সেজো ছেলের। ছাগলটা যাতে ভালো খেতে পায় সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবার জন্য তাকে সে নিয়ে গেল খুব সুন্দর আর-একটা ঝোপের কাছে। সেটাকেও ছাগল মুড়িয়ে শেষ করল। সন্ধেয় বাড়ি ফেরার সময় হলে সেজো ছেলে জিগ্‌গেস করল, "তোর পেট ভরেছে তো রে?"

ছাগল বলল:

"পেট করছে হাঁস্‌ফাঁস্,
ধরবে না আর একটা ঘাস,
ব্যা! ব্যা! ব্যা!"

ছেলেটি বলল, "তা হলে বাড়ি চ।" তাকে এনে গোয়ালঘরে সে বেঁধে রাখল।

বুড়ো দর্জি জিগ্‌গেস করল, "পেট ভরে ছাগলটা খেয়েছে তো রে?"

ছেলে জবাব দিল, "হ্যাঁ বাবা। এমন পেট ভরেছে যে, আর একটা ঘাসও খেতে পারে নি।"

তার কথায় কিন্তু বুড়ো দর্জির বিশ্বাস হল না। তাই আবার ছাগলের কাছে গিয়ে জিগ্‌গেস করল, "তোর পেট ভরেছে তো রে?"

ছাগল বলল:

"পেট কী করে ভরবে?
কবরখানায় লাফাচ্ছিলাম
ঘাসের পাতা কোথায় পেলাম?
ব্যা! ব্যা! ব্যা!"

রেগে দর্জি চেঁচিয়ে উঠল, "মিথ্যেবাদী কোথাকার! তুইও দেখছি তোর ভাইদের মতোই পাজি!" এই-না বলে সেই খেঁটে দিয়ে তাকে এমন পেটাল যে তার সেজো ছেলে বাড়ি থেকে গেল পালিয়ে।

বাড়িতে তখন রইল শুধু বুড়ো দর্জি আর তার ছাগল। পরদিন সকালে গোয়ালঘরে গিয়ে ছাগলটার পিঠে হাত বুলিয়ে সে বলল, "আজ আমি নিজেই তোকে চরাতে নিয়ে যাব।" তার গলায় দড়ি জড়িয়ে একটা ঝোপের কাছে ছাগলকে সে নিয়ে গেল। সেখানে ছিল বিছুটি

আর সব এমন গাছ-গাছড়া, ছাগলদের যেগুলো খুব প্রিয়। "পেট ভরে খেয়ে নে," বলে ছাগলকে সে দিল সন্ধে পর্যন্ত চরতে। বাড়ি ফেরার সময় হলে সে জিগ্‌গেস করল, "তোর পেট ভরেছে তো রে?"

ছাগল বলল :

"পেট করছে হাঁস্‌ফাঁস্‌,
ধরবে না আর একটা ঘাস,
ব্যা! ব্যা! ব্যা!"

বুড়ো দর্জি বলল, "তা হলে বাড়ি চ।" এই-না বলে তাকে এনে গোয়ালঘরে সে বাঁধল। যাবার সময় ঘুরে দাঁড়িয়ে ছাগলকে সে বলল, "এই প্রথম আজ তোর পেট ভরল।"

কিন্তু যথারীতি ছাগল বলে উঠল :

"পেট কী করে ভরবে?
কবরখানায় লাফাচ্ছিলাম
ঘাসের পাতা কোথায় পেলাম?
ব্যা! ব্যা! ব্যা!"

ছাগলের কথাগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো দর্জি বুঝতে পারল আসল ব্যাপারটা। বুঝল অকারণে তিন ছেলেকে সে তাড়িয়েছে। রেগে সে চেঁচিয়ে উঠল, "দাঁড়া, মজা দেখাচ্ছি। হতভাগা অকৃতজ্ঞ জানোয়ার। তোকে শুধু তাড়ালে উপযুক্ত সাজা দেওয়া হবে না। তোকে প্রথমে দাগী করে দেবো, যাতে সৎ দর্জিদের কাছে মুখ দেখাতে তোর লজ্জা হবে।" চক্ষের নিমেষে একটা দাড়ি কামানোর ক্ষুর এনে ছাগলটার মাথায় সাবান মাখিয়ে সে মুড়িয়ে দিল। তার পর সেই খেঁটের বদলে একটা চাবুক দিয়ে এমন তাকে চাবকাল যে, আতংকে পড়িমরি করে লাফাতে-লাফাতে পালাল ছাগলটা।

বাড়িতে একলা হয়ে গিয়ে বুড়ো দর্জি খুব মনমরা হয়ে পড়ল। খুশি হয়েই ছেলেদের সে ফিরিয়ে আনত। কিন্তু তাদের যে কী হয়েছে সে-বিষয়ে তার কোনো ধারণাই ছিল না।

এদিকে বড়ো ছেলে কাজ শিখছিল এক ছুতোরের কাছে। অধ্যবসায়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট সময় কাজ করার পর ছুতোর তাকে উপহার দিল ছোট্টো একটা টেবিল। সাধারণ কাঠ দিয়ে তৈরি হলেও টেবিলটার একটা বিশেষত্ব ছিল। যে-কোন জায়গায় সেটাকে নামিয়ে যদি বল, "ছোট্টো

টেবিল, ভরে ওঠো"—টেবিলটা সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকে নিয়ে আসত ধবধবে সাদা ছোট্টো টেবিল-ঢাকা, প্লেট, ছুরি-কাঁটা, নানা ডিশে সেদ্ধ আর ঝলসানো মাংস আর মস্ত বড়ো পাত্রে ফলের লাল রস। ফলের রসের ঝকঝকে ফেনাগুলো দেখলে মন খুশি হয়ে ওঠে। বড়ো ছেলে ভাবল, 'এটা থাকলে জীবনে কখনো খাবার অভাব হবে না।"



টেবিলটা নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল সারা পৃথিবী দেখতে। যে-সব সরাই-খানায় সে উঠত, সেগুলো ভালো কি মন্দ—তা নিয়ে কখনো মাথা ঘামাত না। সরাইখানা মনের মতো না হলে টেবিলটা নিয়ে সে চলে যেত কোনো বনে বা মাঠে। টেবিলটা পেতে যক্ষুনি সে বলত "ভরে ওঠো" তক্ষুনি ভালো-ভালো খাবারে ভরে উঠত টেবিলটা।

ঘুরতে-ঘুরতে ঘুরতে-ঘুরতে একদিন তার মনে হল—বাবার কাছে ফেরা যাক। ভাবল, এত দিনে নিশ্চয়ই বাবার রাগ পড়েছে আর এই আশ্চর্য ছোট্টো টেবিলটা নিয়ে গেলে নিশ্চয়ই তিনি খুব খুশি হবেন।

এখন হল কি—ফিরতি-পথে সে পৌঁছল এক সরাইখানায়। লোক সেখানে গিস্‌গিস্‌ করছে। তারা তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে বলল তাদের সঙ্গে ডিনার খেতে বসে পড়তে—নইলে তার কপালে খাবার জুটবে না।

সে বলল, "তোমাদের মুখের গ্রাস আমি কাড়তে চাই না। বরঞ্চ আমার অতিথি হিসেবে তোমাদেরই খাওয়াচ্ছি।"

তার কথা শুনে সবাই হেসে উঠল। ভাবল সে তামাশা করছে।

সে তখন তার কাঠের টেবিলটা ঘরের মাঝখানে রেখে বলল, "ছোট্টো টেবিল, ভরে ওঠো।" সঙ্গে সঙ্গে ভালো-ভালো খাবারে ভরে গেল টেবিলটা। অমন ভালো খাবার সরাইখানার মালিকেরও ছিল না। খাবারের ভুর-ভুরে গন্ধে সবাইকার ক্ষিদে চনমন করে উঠল।

ছুতোর বলল, "বন্ধুরা হাত চালাও।" অতিথিরা যখন বুঝল সত্যি-সত্যি সে তাদের খেতে অনুরোধ করছে তখন তারা আর কোনোরকম দ্বিধা করল না। ছুরি-কাঁটা দিয়ে তারা শুরু করে দিল গোগ্রাসে খেতে।

সরাইখানার মালিক এক কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিছুই সে বুঝে উঠতে পারল না। ভাবল এমন একজন রাঁধুনি থাকলে তার সরাইখানার খুব লাভ হবে।

মাঝরাত পর্যন্ত ছুতোর তার দলবল নিয়ে হৈ-হল্লা করে খাওয়া-দাওয়া করল। তার পর টেবিলটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে শুয়ে পড়ল ঘুমিয়ে। সরাইখানার মালিকের মাথায় তখন নানা চিন্তা ঘুরছিল। বার বার তার মনে পড়তে লাগল গুদাম ঘরের পুরনো একটা টেবিলের কথা, যেটা দেখতে এই ম্যাজিক-টেবিলটার মতো হুবহু একরকম। শেষটায় পুরনো টেবিলটা এনে ছুতোরের টেবিলের সঙ্গে সে ফেলল বদলে। পরদিন সকালে বিল চুকিয়ে ছোটো টেবিলটা নিয়ে সে চলে গেল। স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি টেবিলটা বদলে দেওয়া হয়েছে।

দুপুরবেলায় সে পৌঁছল তার বাবার বাড়িতে। তাকে দেখে তার বাবা মহা খুশি।

বাবা বলল, "বাছা, বল এতদিন কী করছিলি?"

"আমি ছুতোরের কাজ শিখেছি, বাবা।"

"খুব ভালো ব্যবসা। কিন্তু তোর কাজের নমুনা হিসেবে কী এনেছিস?"

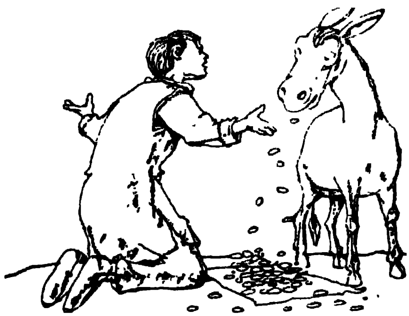
"সব চেয়ে যে ভালো জিনিসটা আনতে পেরেছি সেটা হচ্ছে এই টেবিল।"

দর্জি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে টেবিলটা দেখে বলল, "এটা যে তোর কাজের খুব একটা ভালো নমুনা, সে কথা বলতে পারছি না। মনে হচ্ছে টেবিলটা খুব পুরনো আর বাজে ধরনের তৈরি।

তার বড়ো ছেলে বলল, "কিন্তু জানো বাবা, এ টেবিলটা আপনা থেকে খাবারে ভরে উঠতে পারে। টেবিলটাকে যে কোনো জায়গায় রেখে

আমি যদি বলি—'ভরে ওঠো', সঙ্গে সঙ্গে ভালো-ভালো খাবার আর ফলের মিষ্টি রসে এটা ভরে উঠবে। তোমার সব আত্মীয়-বন্ধুদের নেমন্তন্ন করে আনো। এই টেবিল তাদের ভুরিভোজ করিয়ে খুশি করবে।"

অতিথিরা এলে পর ঘরের মাঝখানে ছোটো টেবিলটা রেখে সে বলল, "ছোট্টো টেবিল, ভরে ওঠো।" টেবিলটা কিন্তু নড়ল-চড়ল না। অন্য যে কোনো টেবিলের মতোই সেটা রইল খালি। বেচারা তখন বুঝল তার টেবিলটা বদলে দেওয়া হয়েছে। সবাইকার কাছে মিথ্যেবাদী হয়ে লজ্জায় মাথা হেঁট করে সে দাঁড়িয়ে রইল। আত্মীয়-বন্ধুরা হেসে তাকে টিটকিরি দিতে দিতে বাড়ি ফিরল। তার বাবা সেই খেঁটে এনে আবার খুব পিটিয়ে বিদেয় করে দিল তাকে। সে বেচারা চলল নতুন কোনো প্রভুর কাছে চাকরির সন্ধানে।



এদিকে মেজো ছেলে কাজ শিখছিল এক জাঁতাওয়ালার কাছে। নির্দিষ্ট সময় শেষ হবার পর তার প্রভু বলল, "খুব ভালো কাজ আর খুব ভালো ব্যবহারের জন্যে তোমাকে একটা অদ্ভুত গাধা উপহার দেব। সেটা গাড়িও টানতে পারে না, মোটও বইতে পারে না।"

"তা হলে সেটা কোন কাজে লাগে?"

"সেটার মুখ থেকে মোহর ঝরে। তার সামনে একটা কাপড় বিছিয়ে যদি বল 'ব্রিক্‌লব্রিট'—অমনি তার মুখ থেকে ঝর্‌ঝর্‌ করে মোহর ঝরবে।"

"এটা তো দারুণ ব্যাপার," বলে মেজো ছেলে তার প্রভুকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। যখনি তার টাকাকড়ি দরকার হয় গাধাকে সে

বলে 'ব্রিক্‌লব্রিট' আর সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে ঝরে পড়ে রাশি রাশি মোহর। যেখানেই সে যায় সেখানেই খরচ করে দু হাতে। জিনিসের দাম যত বেশি হয় তত তার সুবিধে। কারণ তার টাকার থলি সব সময়েই থাকে ভর্তি। কিছুকাল ধরে নানা দেশ ঘোরার পর শেষটায় সে ভাবল, 'এবার বাবার কাছে ফেরা যাক। এই গাধাকে নিয়ে বাড়ি ফিরলে নিশ্চয়ই তাঁর রাগ পড়বে, আমাকে আদর করে ঘরে তুলে নেবেন।'

এখন হল কি, সেই একই সরাইখানায় সে উঠল যেখানে তার বড়ো ভাইয়ের টেবিলটা বদলে দেওয়া হয়েছিল। গাধার গলার দড়ি ধরে সে এসেছিল। সরাইখানার মালিক তার হাত থেকে দড়িটা নিয়ে বলল, গোয়ালঘরে গাধাকে সে নিজেই নিয়ে যাবে। মেজো ভাই বাধা দিয়ে বলল, "তোমায় কষ্ট করতে হবে না। আমি যাচ্ছি আমার গাধাকে গোয়ালে বেঁধে আসতে। তা হলে জানব ঠিক কোথায় সে আছে।"

তার কথাগুলো সরাইখানার মালিকের কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকল। ভাবল, যে-লোক নিজেই তার গাধাকে গোয়ালে নিয়ে বেঁধে আসতে চায় খুব সম্ভব তার টাকাকড়ি বিশেষ নেই। কিন্তু তার অতিথি পকেট থেকে দু-দুটো মোহর বার করে তাকে যখন ভালো-ভালো খাবার আনতে বলল তখন দারুণ অবাক না হয়ে সে পারল না। ছুটে গিয়ে সে নিয়ে এল তার ভাঁড়ারের সব চেয়ে ভালো খাবার।

খাবার পর মেজো ছেলে প্রশ্ন করল, আর কত দিতে হবে। তাকে ভালো করে দুয়ে নেবার জন্যে সে বলল, "আরো দুটো মোহর।" মেজো ছেলে পকেটে হাত দিয়ে দেখে, মোহরগুলো শেষ হয়ে গেছে। সে বলল, "এক মিনিট সবুর কর। মোহর নিয়ে আসছি।" এই-না বলে টেবিল-ঢাকা নিয়ে সে চলে গেল। সরাইখানার মালিকের কৌতূহল বেড়ে উঠল। তাই পা টিপে-টিপে সে গেল তার পিছন পিছন। মেজো ছেলে গোয়ালঘরে হুড়কো দিল। কিন্তু দরজার চাবি ঢোকাবার গর্ত দিয়ে সরাইখানার মালিক দেখল গাধাটার মুখের নীচে মেজো ছেলেকে টেবিল-ঢাকা বিছতে। আর যেই-না মেজো ছেলে বলে উঠল 'ব্রিক্‌লব্রিট', অমনি সে দেখে, গাধাটার মুখ থেকে রাশি রাশি মোহর ঝরে মেঝে ঢেকে দিতে।

সরাইখানার মালিক বলে উঠল, "কী কাণ্ড! অমন চটপট্ মোহর বানানো যায়! এমন একটা টাঁকশাল আমার থাকলে মন্দ হয় না!"

মেজো ছেলে বিল চুকিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

আর মাঝরাতে সরাইখানার মালিক চুপি চুপি গোয়ালঘরে গিয়ে সোনা-ঝরানো গাধাকে সরিয়ে নিয়ে তার জায়গায় রাখল সাধারণ একটা গাধা।

পরদিন খুব ভোরে গাধাটাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল মেজো ছেলে। ভাবল সেটাই বুঝি তার সোনা-ঝরানো গাধা। আর দুপুরে পৌঁছল তার বাবার বাড়ি। তাকে দেখে তার বাবা ভারি খুশি।

বুড়ো দর্জি প্রশ্ন করল, "বাছা, বল এতদিন কী করছিলি?"

"আমি জাঁতাকলের কাজ শিখেছি।"

"তোর কাজের নমুনা হিসেবে কি এনেছিস?"

"একটা গাধা।"

তার বাবা বলল, "এখানে গাধার অভাব নেই। একটা ভালো ছাগল আনলে কাজ দিত।"

মেজো ছেলে বলল, "তা দিত। কিন্তু এটা যে-সে গাধা নয়। 'ব্রিকল্‌ব্রিট' বললেই এর মুখ থেকে মোহর ঝরে। তোমার সব আত্মীয়-বন্ধুদের নেমন্তন্ন করে আনো। তাদের আমি বড়োলোক করে দেব।

বুড়ো দর্জি বলল, "আমার মনের কথাটাই বলেছিস। যাক, আর আমাকে ছুঁচের ফোঁড় দিয়ে খেটে মরতে হবে না।"

আত্মীয়-বন্ধুরা সবাই এলে পর মেজো ছেলে তাদের বসতে বলে কাপড়টা বেছাল। তার পর গাধাকে ঘরে এনে বলল, "এবার সবাই মন দিয়ে দেখ।" তার পর চেঁচিয়ে উঠল 'ব্রিক্‌লব্রিট'। কিন্তু তার মুখ থেকে মোহর-টোহর ঝরল না। স্পষ্টই বোঝা গেল মোহর বানাবার কায়দা গাধাটা জানে না। সব গাধাই তো আর চালাক-চতুর হয় না!

মেজো ছেলের মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেল। আত্মীয়-স্বজনদের কাছে সে চাইল ক্ষমা। তারা যেমন গরিব ছিল সেরকম গরিব থেকেই ফিরে গেল। আর বুড়ো দর্জিকে আগের মতোই ছুঁচের ফোঁড় দিয়ে-দিয়ে খেটে মরতে হল। আর মেজো ছেলে গেল আর-এক জাঁতাওয়ালার কাছে চাকরি করতে।

এদিকে সেজো ছেলে গিয়েছিল এক কুম্ভকারের কাছে শিক্ষানবিশী

করতে। এটা শিল্পীসুলভ কাজ বলে শিখতে তারই সময় লাগল সব চেয়ে বেশি। তার বড়ো দু ভাই চিঠিতে তাকে জানিয়েছিল তাদের দুর্ভাগ্যের কথা। জানিয়েছিল, সরাইখানার মালিক কী ভাবে তাদের ম্যাজিক-টেবিল আর আশ্চর্য গাধাটা চুরি করেছে।

কুম্ভকারের কাছে সব-কিছু শিখে সেজো ভাই যখন দেশ ভ্রমণে বেরুবে তার প্রভু তাকে একটা থলি উপহার দিয়ে বলল, "এর মধ্যে একটা মুগুর আছে।"

"থলিটা বিছিয়ে আমি শুতে পারি। কিন্তু এর মধ্যের মুগুর আমার কোন উপকারে লাগবে? মিছিমিছি এটা থলি ভারী করবে।"

তার প্রভু বলল, "আমার কথাটা শোনো। তোমাকে কেউ মারতে গেলে তুমি শুধু বোলো, 'মুগুর, থলি থেকে লাফিয়ে বেরো।' সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে বেরিয়ে তার পিঠে মুগুর এমন দমাদম করে লাফাবে যে, তাকে আর দশদিন নড়তে-চড়তে হবে না।"

সেজো ছেলে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে থলিটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়ল। যখনি কেউ তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে সে বলে ওঠে, "মুগুর, থলি থেকে লাফিয়ে বেরো।" আর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে বেরিয়ে মুগুর তার পিঠে দমাদম করে থাকে লাফাতে।

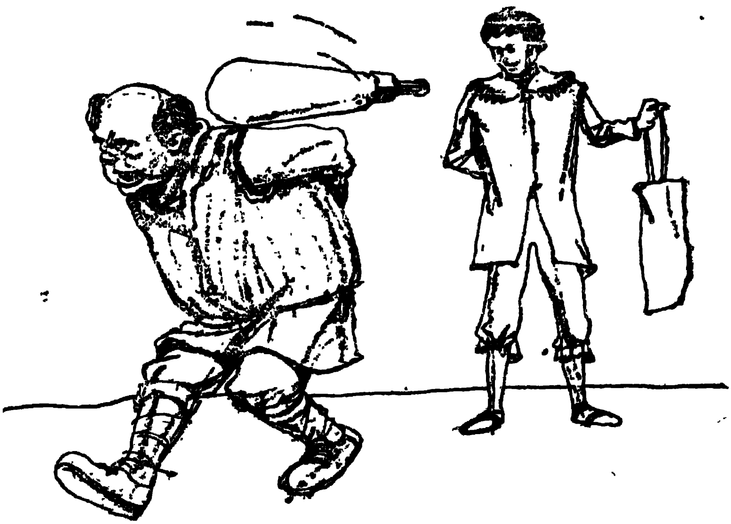
যেতে-যেতে যেতে-যেতে সেজো ছেলে এক সন্ধেয় পৌঁছল সেই সরাইখানায়, যার মালিক তার বড়ো দু ভাইকে ঠকিয়েছিল। সেখানকার একটা টেবিলে নিজের জিনিসপত্র রেখে সে বলতে শুরু করল ঘুরে বেড়াবার সময় যে-সব অদ্ভুত-অদ্ভুত জিনিস সে দেখেছিল তাদের গল্প। সে বলল, "যে-টেবিল আপনার থেকে খাবারে ভরে ওঠে, কিংবা যে-গাধার মুখ থেকে মোহর ঝরে—সেগুলো খুবই যে আশ্চর্য জিনিস তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার কাছে এমন একটা অদ্ভুত জিনিস আছে যার কাছে সেগুলো তুচ্ছ।"

সরাইখানার মালিক কান খাড়া করে তার কথা শুনে ভাবলে, 'থলিটা নিশ্চয়ই মণি-মুক্তোয় ভরা। এটা আমি বাগাবোই। বরাতে ভালো-ভালো জিনিসপত্র আসে তিন-তিনটে করে।'

ঘুমবার সময় হলে সেজো ছেলে বেঞ্চিতে শুয়ে পড়ল। থলিটাকে করল মাথার বালিশ। সরাইখানার মালিকের যখন মনে হল সে গভীর ঘুম ঘুমচ্ছে, তখন পা টিপে-টিপে এসে থলিটা টেনেটুনে দেখতে

লাগল, সেটা বদলে অন্য একটা থলি তার মাথার নীচে রাখা যায় কি না।

সেজো ছেলে কিন্তু মটকা মেরে শুয়েছিল। সরাইখানার মালিক যেই-না তাকে ঠেলে থলিটা নিতে গেছে এমনি সে চেঁচিয়ে উঠল, "মুগুর, থলি থেকে লাফিয়ে বেরো।" সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে বেরিয়ে মগুর তার পিঠে দমাদম করে লাফাতে শুরু করে দিল।



সরাইখানার মালিক চেঁচাতে লাগল "ক্ষমা কর, ক্ষমা কর" বলে। কিন্তু যত সে চেঁচায় মুগুরের লাফানি ততই ওঠে বেড়ে। শেষটায় সে মেঝেয় পড়ে কাতরাতে শুরু করল।

সেজো ছেলে তখন বলল, "সেই ম্যাজিক-টেবিল আর সোনা-ঝরানো গাধাকে যতক্ষণ-না ফেরত দিচ্ছ ততক্ষণ মুগুরের লাফানি থামবে না।"

ভাঙা-ভাঙা গলায় সরাইখানার মালিক বলে উঠল, "দোহাই তোমার! সব-কিছু ফেরত দিচ্ছি। এই ভূতটাকে শুধু বল থলির মধ্যে ফিরে যেতে।"

সেজো ছেলে বলল, "তোমার উচিত শিক্ষা হয়েছে! কিন্তু ভবিষ্যতে

সাবধান।" তার পর সে আদেশ দিল, "মুগুর, থলির মধ্যে লাফিয়ে যা। সরাইখানার মালিককে রেহাই দে।"

সেই ম্যাজিক-টেবিল আর সোনা-ঝরানো গাধা নিয়ে পরদিন সকালে সেজো ছেলে বেরিয়ে পড়ল। বাবার বাড়িতে পৌঁছলে বুড়ো দর্জি খুব খুশি হল তাকে দেখে। জিগ্‌গেস করল, কী সে শিখে এসেছে।

সেজো ছেলে বলল, "বাবা, আমি কুম্ভকারের কাজ শিখেছি।"

তার বাবা মন্তব্য করল, "খুব শিল্পীসুলভ পেশা। কিন্তু কাজের নমুনা হিসেবে কী এনেছিস?"

সে উত্তর দিল, "খুব দামী একটা জিনিস, বাবা—থলির মধ্যে একটা মুগুর।"

তার বাবা চেঁচিয়ে উঠল, "কী বললি—একটা মুগুর? মুগুর তো যে-কোনো গাছ কেটে বানানো যায়!"

"এরকম মুগুর বানানো যায় না, বাবা। আমি যদি বলি, 'মুগুর, থলি থেকে বেরো', সঙ্গে সঙ্গে সেটা লাফিয়ে বেরিয়ে আমার শত্রুর পিঠে দমাদম করে লাফাতে শুরু করে দেবে, যতক্ষণ-না লোকটা মাটিতে পড়ে কাতরাতে কাতরাতে ক্ষমা চায়। এই মুগুরের সাহায্যে আমি সেই ম্যাজিক-টেবিল এনেছি, আপনা থেকে যেটা খাবারে ভরে যায়। আর এনেছি সেই গাধাকে, যার মুখ থেকে মোহর ঝরে। এগুলো আমার বড়ো ভাইদের কাছ থেকে সরাইখানার পাজি মালিক চুরি করেছিল। আমাদের সব আত্মীয়-বন্ধুদের তুমি নেমন্তন্ন কর। তাদের ভুরিভোজের ব্যবস্থা আমরা করব আর তাদের পকেট ভরে দেবো মোহর দিয়ে।"

কথাটা বুড়ো দর্জির খুব বিশ্বাস হল না। তবু আত্মীয়-বন্ধুদের সে নেমন্তন্ন করে পাঠাল।

সেজো ভাই তখন একটা কাপড় বিছিয়ে নিয়ে এল সেই সোনা-ঝরানো গাধাকে। তার পর মেজো ভাইকে বলল, "মেজদা, গাধার সঙ্গে কথা বলো।"

মেজো ভাই, যে জাঁতাকলের কাজ শিখেছিল, সে বলল, "ব্রিক্‌লব্রিট।" সঙ্গে সঙ্গে সেই কাপড়ের উপর গাধার মুখ থেকে ঝর্‌ঝর্‌ করে ঝরতে লাগল মোহর। মোহর কুড়িয়ে সবাইকার পকেট

ওরার পর তবেই গাধা থামল। (তোমরাও কি ভাবছ না—সেখানে থাকলে খুব মজা হত?) তার পর সেজো ভাই সেই টেবিলটা এনে বড়ো ভাইকে বলল, "দাদা, টেবিলটার সঙ্গে কথা বলো।" বড়ো ভাই, যে ছুতোরের কাজ শিখেছিল, সে বলল, "ছোট্টো টেবিল, ভরে ওঠো।" সঙ্গে সঙ্গে টেবিলটা ভরে গেল নানা মুখরোচক খাবারে। বুড়ো দর্জির বাড়িতে সবাই তখন এমন ভোজ খেলো যেরকম ভোজ জীবনে তারা খায় নি। অনেক রাত পর্যন্ত তারা নাচ-গান করে ফূর্তি করল। তার পর বুড়ো দর্জি দেরাজে তুলে রাখল তার ছুঁচ আর সুতো, খেঁটে আর ইস্ত্রি। আর তিন ছেলেকে নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে অবসর সময় লাগল কাটাতে।

কিন্তু সেই ছাগলটার কী হল, যার জন্য ছেলেদের বুড়ো দর্জি বাড়ি থেকে দূর করে দিয়েছিল? সেটার কী হল বলি—ন্যাড়া মাথার জন্য তার এমন লজ্জা হল যে, সে গিয়ে লুকলো এক পাতি-শেয়ালের গর্তে। বাড়ি ফিরে পাতিশেয়ালটা দেখে অন্ধকারের মধ্যে থেকে বড়ো-বড়ো একজোড়া চোখ তার দিকে কট্‌মট্ করে তাকাচ্ছে। দারুণ ভয় পেয়ে তাই সেখানে থেকে সে পিট্‌টান দিল।

ছুটতে-ছুটতে ভালুকের সঙ্গে তার দেখা হল। ভয়ে তার শুকনো মুখ দেখে ভালুক প্রশ্ন করল, "শেয়ালভায়া, তোমার হল কী? মুখটা যে ভয়ে আমসি হয়ে গেছে।"

শেয়াল বলল, "ভয়ংকর একটা জীব আমার গর্তে বসে জলন্ত চোখ মেলে আমার দিকে কট্‌মট্ করে তাকাচ্ছে।"

ভালুক বলল, "আমার সঙ্গে এসো। দুজনে মিলে তাকে তাড়িয়ে দেবো।" এই-না বলে সেই গর্তের কাছে গিয়ে ভালুক তাকাল ভিতরে। কিন্তু সেই জ্বলন্ত চোখদুটো দেখে সেও ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। ভয়ংকর জন্তুটাকে ঘাঁটাতে সাহস করল না।

ফিরতি পথে তার সঙ্গে দেখা হল একটা মৌমাছির। তাকে ভীষণ ঘাবড়ে পড়তে দেখে মৌমাছি বলল, "ভালুকভায়া, তোমার হল কী? মুখটা যে ভয়ে আমসি হয়ে গেছে।"

ভালুক বলল, "আমার বন্ধু রুফ্‌ফাস্-শেয়ালের বাড়িতে ভয়ংকর একটা জীব বসে আছে। তাকে আমরা তাড়াতে পারছি না।"

মৌমাছি বলল, "আমি দুর্বল ক্ষুদে জীব হলেও মনে হয় তোমাদের

সাহায্য করতে পারব।" এই-না বলে মৌমাছি পাতিশেয়ালের গর্তে উড়ে গিয়ে ছাগলের ন্যাড়া মাথায় বার বার লাগল হুল ফোটাতে। শেষটায় ছাগল যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে লাফিয়ে বেরিয়ে ব্যা-ব্যা করতে-করতে পালাল দৌড়ে।



জোরিন্‌ডে আর জোরিংগেল

এক সময় প্রকাণ্ড এক গহন বনের মাঝখানে পুরনো এক দুর্গে একলা এক বুড়ি থাকত। বুড়ি ছিল ডাইনি। দিনেরবেলায় সে হয়ে যেত বেড়াল কিংবা পেঁচা। রাতের বেলায় আবার নিত মানুষের রূপ। হরিণ কিংবা পাখিদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে কাছে এনে তাদের সে মারত আর তার পর তাদের রেঁধে খেত। কেউ সেই দুর্গের একশো পা'র মধ্যে এলে তার আর নড়বার-চড়বার ক্ষমতা থাকত না। বুড়ি তাকে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত তাকে থাকতে হত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। সেই জাদুর বেষ্টনীর মধ্যে কোনো তরুণী এসে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ে যেত একটা পাখি আর বুড়ি তাকে একটা খাঁচায় ভরে দুর্গের একটা ঘরে খাঁচাটা রাখত বন্ধ করে। এই ভাবে সেই দুর্গের নানা ঘরে নানা দুর্লভ পাখি প্রায় সাতহাজার খাঁচায় ভরে সে রেখেছিল।

জোরিন্‌ডে নামে একটি মেয়ে ছিল। তার মতো সুন্দরী মেয়ে আর হয় না। জোরিংগেল নামে এক সুদর্শন তরুণ তাকে ভালোবাসত। একদিন তারা দুজন বেড়াতে-বেড়াতে সেই বনে এসে পৌঁছল। জোরিংগেল বলল, "আমাদের সাবধান হতে হবে—দুর্গটার কাছাকাছি যেন না পৌঁছই।"

ভারি সুন্দর সান্ধ্য-সূর্যের দীর্ঘ রশ্মি গাছের গুঁড়ি আর সবুজ পাতায়-পাতায় ঝলমল করছে। বহুদিনের পুরনো লম্বা-লম্বা বীচ্‌গাছে বসে করুণ স্বরে ডেকে চলেছে ঘুঘুর দল। হঠাৎ জোরিন্‌ডে বিনা

কারণে আর্তনাদ করে পড়ন্ত রোদের মধ্যে পড়ে গেল। তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল হতাশার ভাব। জোরিংগেলও হয়ে উঠল বিষণ্ণ। তাদের দুজনেরই বুক দুর্‌দুর্‌ করে উঠল—মনে হল আর তারা বাঁচবে না। চার দিকে তাকিয়ে তার ভেবে পেল না কোন পথে বাড়ি ফিরবে।

পাহাড়ের পিছনে ধীরে-ধীরে সূর্য ডুবতে লাগল। ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে জোরিংগেল দেখল, খুব কাছেই রয়েছে দুর্গটার প্রাচীন দেয়াল। দেখে সে আঁতকে উঠল, তার মুখটা হয়ে উঠল মড়ার মতো ফ্যাকাশে। আর তখনই জোরিন্‌ডে গাইতে শুরু করল :

"ঘুঘু বলছে করুণ সুরে
মরণ আর নেইকো দূরে!"

জোরিংগেল তাকাল জোরিন্‌ডের দিকে। কিন্তু জোরিন্‌ডে তখন নাইটিঙ্গেল পাখি হয়ে গান গেয়ে চলেছে।

হঠাৎ একটা কাল-প্যাঁচা মাথার উপর তিনবার ঘুরে ডেকে উঠল, "হু-হু! কে যায় রে? কে যায় রে?"

জোরিংগেল একেবারে নড়তে-চড়তে পারল না। মনে হল সে যেন পাথর হয়ে গেছে। সে না পারল চেঁচাতে বা কথা কইতে। না পারল হাত তুলতে বা পা তুলতে।

সূর্য অস্ত গেল। পেঁচাটা উড়ে গেল একটা ঝোপে আর সেখান থেকে বেরিয়ে এল এক খুন্‌খুনে বুড়ি—বড়ো-বড়ো লালচে চোখ, টিয়া-পাখির ঠোঁটের মতো নাকটা বাঁকা, গায়ের চামড়া শুকনো আর কুঁচকনো, কোমর ভাঙা। বিড়্‌বিড়্‌ করে কী একটা আউড়ে নাইটিঙ্গেলকে মুঠোয় ভরে সে চলে গেল।

জোরিংগেল তখনো সে-জায়গা থেকে না পারল নড়তে-চড়তে না পারল কথা কইতে।

খানিক বাদে আবার এসে ফাটা কাঁসির মতো খন্‌খনে গলায় বুড়ি বলল, "ছোট্টো চাঁদ যখন পুকুরের বুকে ঝলমল করবে তখন তুমি মুক্তি পাবে।"

বুড়ির কথাগুলো শেষ হতেই জোরিংগেল দেখল সে নড়তে-চড়তে পারছে। বুড়ির সামনে নতজানু হয়ে বসে কাকুতি-মিনতি করে সে বলল, তার জোরিন্‌ডেকে ফিরিয়ে দিতে। বুড়ি বলল, জীবনে আর তার দেখা সে পাবে না। এই-না বলে নড়্‌বড়্‌ করতে-করতে বুড়ি চলে গেল।

জোরিংগেল ভেবে পেল না কী সে করবে। যেখান থেকে যেতে-যেতে সে পৌঁছল অচেনা এক গ্রামে। বহুকাল সেখানে সে ভেড়া চরাবার কাজ করল। মাঝেমাঝে সেই দুর্গটার চার পাশে সে ঘুরে আসে। কিন্তু খুব কাছে যেতে ভরসা পায় না। হঠাৎ এক রাতে স্বপ্নে সে দেখে রক্তের মতো লাল একটা ফুল আর তার মাঝখানে ভারি সুন্দর বড়ো একটা মুক্তো। স্বপ্নে আরো দেখে—সেই ফুল হাতে নিয়ে সে গেছে দুর্গটার কাছে আর ফুলের সুগন্ধে কেটে গেছে ডাইনির মায়াজাল আর ডাইনি ফিরিয়ে দিচ্ছে জোরিন্‌ডেকে।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর সেই স্বপ্নের ফুলের খোঁজে সে বেরিয়ে পড়ল। নানা পাহাড় আর উপত্যকা পেরিয়ে যাবার পর ন দিনের দিন তার চোখে পড়ল রক্তের মতো লাল টুকটুকে একটি ফুল। ফুলটির মাঝখানে সুন্দর মুক্তোর মতো ঝলমলে একটি শিশির-বিন্দু। সেই ফুল নিয়ে দিন-রাত হাঁটতে-হাঁটতে পৌঁছল সে দুর্গটার কাছে। দুর্গের কয়েক গজের মধ্যে পৌঁছবার পরেও তার শরীর অবশ হয়ে পড়ল না। দুর্গের সিংহদ্বারে ফুলটা ঠেকাতেই সেটা খুলে গেল। আঙিনার মধ্যে দিয়ে যেতে-যেতে সে শুনতে পেল বন্দী পাখিদের গান। যেদিক থেকে সেই গান ভেসে আসছিল সেদিকে যেতে-যেতে বিরাট এক হলঘরে সে পৌঁছল। সেখানে সাতহাজার খাঁচার পাখিদের ডাইনি তখন খাবার দিচ্ছিল।

জোরিংগেলকে দেখে ভীষণ রেগে সে চেঁচাতে লাগল। কিন্তু তার কাছে যেতে সে পারল না।

বুড়ির সঙ্গে কোনো কথা না বলে জোরিংগেল খুঁটিয়ে দেখতে লাগল খাঁচাগুলো। কিন্তু সেখানে ছিল কয়েকশো নাইটিঙ্গেল পাখি। তাদের মধ্যে জোরিন্‌ডে কে—কী করে সে বুঝবে? কিন্তু হঠাৎ তার নজরে পড়ল একটা খাঁচা নিয়ে বুড়ি চুপি চুপি দরজা দিয়ে সরে পড়তে চলেছে। এক লাফে সেখানে গিয়ে সেই ফুল সে ঠেকাল বুড়ি আর খাঁচাটার গায়ে আর সঙ্গে সঙ্গে বুড়ির সমস্ত জাদুর ক্ষমতা হয়ে গেল নিঃশেষ।

আর দেখা গেল তার সামনে দু হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অপরূপ সুন্দরী জোরিন্‌ডে। খাঁচার অন্য সব পাখিদের আবার তরুণী করে দিয়ে জোরিন্‌ডেকে নিয়ে সে বাড়ি ফিরল আর তার পর সুখে-স্বচ্ছন্দে লাগল দিন কাটাতে।



শেয়াল-গিন্নির বিয়ে

এক সময় ছিল এক বুড়ো শেয়াল। নটা তার লেজ। তার কেমন করে যেন মাথায় এল—বউ তাকে ভালোবাসে না। সে স্থির করল বউ তাকে সত্যি-সত্যি ভালোবাসে কি না সেটা পরখ করে দেখবে। তাই সে সোফার নীচে টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল, শরীরের একটা পেশীও নাড়াল না। দেখলে মনে হয় মরে যেন কাঠ হয়ে গেছে। শেয়াল-গিন্নি তার ঘরে গিয়ে দরজায় হুড়কো দিল। বলে গেল তার দাসী মিস্ পুসিকে উনুন-পাশে বসে রান্নাবান্না করতে। খানিক পরেই রটে গেল শেয়াল-কর্তা মরেছে। তাই শেয়াল-গিন্নিকে বিয়ে করার জন্য আসতে লাগল অনেকে। দরজার ঘণ্টা বাজাতে মিস্ পুসি গেল দরজা খুলতে। বিয়ে করার জন্য যে এসেছিল সে তাকে প্রশ্ন করল, "মিসেস্ শেয়াল কী করছেন? কেমন আছেন?" মিস্ পুসি উত্তর দিল :

"গিন্নি-মা ঘরে একা
শোকের নেই লেখা-জোখা।
কেঁদে-কেঁদে লালচে চোখ
স্বামীর জন্যে বড়োই শোক।"

"মিস্, দয়া করে তাঁকে গিয়ে বল, দোর-গোড়ায় এক তরুণ শেয়াল দাঁড়িয়ে—সে তাকে বিয়ে করতে চায়।"

"বলছি, স্যার।" মিস্ পুসি তর্ তর্ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে টুক্-টুক্ করে শেয়াল-গিন্নির দরজায় টোকা দিল।

"গিন্নি-মা, ভেতরে আছেন?"

"হ্যাঁ রে পুসি, ভেতরে আছি।"

"দোরগোড়ায় একজন আপনাকে বিয়ে করার জন্যে দাঁড়িয়ে।"

"বাছা, সে কি খুব চালিয়াৎ? আর আমার মৃত স্বামীর মতো তার কি সুন্দর-সুন্দর ন'টা লেজ আছে?"

"না, গিন্নি-মা! তাঁর মাত্র একটা লেজ।"

"তা হলে তাকে আমি বিয়ে করব না।"

মিস্ পুসি নীচে গিয়ে শেয়ালটাকে তাড়িয়ে দিল। কিন্তু খানিক বাদেই আবার বাজল দরজার ঘণ্টা। দেখা গেল আর-একটা তরুণ শেয়াল দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। সেও চায় শেয়াল-গিন্নিকে বিয়ে করতে। কিন্তু তার ছিল দুটো লেজ। তাই প্রথমজনের মতো সেও বাতিল হয়ে গেল। তার পর একে-একে আসতে লাগল আরো অনেকে। যে আসে আগের জনের চেয়ে তার একটা লেজ বেশি। শেষটায় যে এল মৃত শেয়ালের মতো তার ন'টা লেজ।

সে কথা শুনে বিধবা শেয়াল-গিন্নির দারুণ ফুর্তি। সে বলে উঠল, "এক্ষুনি তার জন্যে দরজা খোলো আর বুড়ো শেয়ালের মৃতদেহ দাও বাইরে বার করে।"

বিয়ের সব ঠিকঠাক। দিনক্ষণ স্থির। নিমন্ত্রিতরা হাজির। এমন সময় বুড়ো শেয়াল বেঁচে উঠল আর তার পর শেয়াল-গিন্নি সমেত সব অতিথি-অভ্যাগতদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করল বাড়ি থেকে।

দ্বিতীয় গল্প

শেয়াল-কর্তা মারা যাবার পর নেকড়ে এল শেয়াল-গিন্নিকে বিয়ে করতে। দরজায় টোকা দিতে মিস্ পুসি এসে দরজা খুলে দিল।

নেকড়ে বলল, "শুভদিন, ম্যাডাম। এখানে একলা বসে কেন? ভালো-ভালো কী সব রাঁধছ?"

মিস্ পুসি বলল :

"দুধ আর সুরা দিয়ে
সব সেরা স্যুপটা,
মশাই আসুন দেখি,
বদলান মুখটা।"

নেকড়ে বলল, "ধন্যবাদ, ম্যাডাম পুসি। কিন্তু শেয়াল-গিন্নি কি বাড়ি নেই?"

মিস্ পুসি বলল, "গিন্নি-মা ঘরে একলা রয়েছেন। শেয়াল-কর্তা মারা গেছেন বলে কেঁদে-কেঁদে আকুল।"

নেকড়ে বলল, "আর-একটা বর চাইলে তাঁকে বল গে নীচে নামতে।"

তর্ তর্ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে সোনার আংটি-পরা পাঁচটা আঙুল দিয়ে শেয়াল-গিন্নির শোবার ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে মিস্ পুসি চেঁচিয়ে উঠল, "গিন্নি-মা, গিন্নি-মা! বর চাও তো নীচে এসো।"

বিধবা শেয়াল-গিন্নি বলল, "ভদ্দরলোকের পায়ে কি ছোট্টো লাল মোজা, আর মুখটা ছুঁচল?"

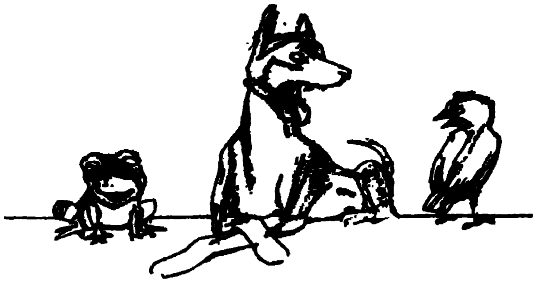
মিস্ পুসি বলল, "না।"

শেয়াল-গিন্নি বলল, "তা হলে ওকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না।"

নেকড়েকে পছন্দ না হতে বর হবার জন্য একে-একে এল পৃথিবীর সব জন্তু-জানোয়ার—কুকুর, হরিণ, খরগোশ, ভালুক, সিংহ। কিন্তু শেয়াল-কর্তার ভালো গুণগুলো তাদের ছিল না। তাই প্রত্যেককেই বাতিল করে দেওয়া হল। সবশেষে এল এক তরুণ শেয়াল। বিধবা শেয়াল-গিন্নি যথারীতি প্রশ্ন করল, "ভদ্দরলোকের পায়ে কি ছোট্টো লাল মোজা, আর মুখটা ছুঁচল?"

মিস্ পুসি বলল, "হ্যাঁ।"

শেয়াল-গিন্নি বলল, "তা হলে তাকে আসতে দাও।" আর সঙ্গে সঙ্গে দাসীকে আদেশ দিল বিয়ের ব্যবস্থা করতে।



তিনটি ভাষা

এক সময় স্যুইজারল্যাণ্ডে ছিলেন এক বৃদ্ধ কাউণ্ট[১]। তাঁর ছিল একটি মাত্র ছেলে। এতই সে বোকা যে, কিছুই শিখতে পারত না।

একদিন তার বাবা তাকে বললেন, "শোন বাছা, প্রাণপণ চেষ্টা করেও তোর মাথায় আমি কিছু ঢোকাতে পারি নি। এখান থেকে তোকে যেতেই হবে। বিখ্যাত এক মাস্টারের কাছে তোকে পাঠাচ্ছি। তোকে শেখাবার-পড়াবার সাধ্যমতো চেষ্টা তিনি করবেন।"

বিদেশের এক শহরে ছেলেটিকে তিনি পাঠালেন। মাস্টারের সঙ্গে পুরো এক বছর সে কাটাল। ফেরার পর বাবা তাকে প্রশ্ন করলেন, "কী শিখেছিস, বাছা।"

ছেলে বলল, "বাবা, কুকুরদের ঘেউ-ঘেউ-এর মানে বুঝতে শিখেছি।"

তার বাবা রেগে চেঁচিয়ে উঠলেন, "হা ভগবান! আর কিছু শিখিস নি? তোকে আমি অন্য শহরে অন্য মাস্টারের কাছে পাঠাব।"

ছেলেকে তিনি পাঠালেন আর-একটা শহরে। সেখানেও এক বছর সে কাটাল। ফেরার পর বাবা আবার প্রশ্ন করলেন, "কী শিখেছিস, বাছা?"

ছেলে বলল, "বাবা, পাখিদের গানের মানে বুঝতে শিখেছি।"

[১] ইউরোপের অভিজাত লোকের উচ্চ খেতাব।

রেগে আগুন হয়ে বাবা বললেন, "হতচ্ছাড়া ছেলে! এত সময় আর টাকা নষ্ট করে ফিরে এসে তোর বলতে লজ্জা করছে না—কিছুই শিখি নি? তোকে আমি তৃতীয় এক মাস্টারের কাছে পাঠাব। এবারেও যদি কিছু শিখতে না পারিস তা হলে তোকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করব।"

তৃতীয় মাস্টারের কাছে ছেলেটি গেল। পুরো এক বছর পর বাড়ি ফিরলে, বাবা তাকে জিগ্‌গেস করলেন—কী শিখেছে সে? সে বলল, "বাবা, এ-বছর শিখলাম ব্যাঙের ডাকের মানে বুঝতে।"

শুনে রাগে দিশেহারা হয়ে পড়লেন তার বাবা। চাকরদের ডেকে বললেন, "আজ থেকে এ-ছোকরা আমার আর ছেলে নয়। একে আমি ত্যাজ্যপুত্র করলাম। বনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে একে তোমরা মেরে ফেল।

চাকররা তাকে নিয়ে গেল। কিন্তু তার প্রতি করুণার দরুন না মেরে তাকে দিল ছেড়ে। তাকে মারার প্রমাণ হিসেবে তারা নিয়ে গেল একটা হরিণের জিভ আর চোখ।

ঘুরতে-ঘুরতে ছেলেটি পৌঁছল এক দুর্গে। রাতের জন্য সেখানে সে আশ্রয় চাইল। দুর্গের মালিক বললেন, ইচ্ছে করলে সেখানকার এক পুরনো বাড়িতে সে ঘুমতে পারে। কিন্তু তাকে সাবধান করে, দিয়ে বললেন—সেটা বিপজ্জনক। কারণ সেখানে আছে অনেক হিংস্র কুকুর। সব সময়েই সেগুলো রেগে চেঁচায়। ছেড়ে দিলেই লোকজনদের খেয়ে ফেলে। আশেপাশের মানুষ তাদের জন্য ভারি আতংকে আছে। কিন্তু কেউই কোনো প্রতিকারের উপায় খুঁজে পায় নি। ছেলেটি কিন্তু মোটেই ভয় না পেয়ে বলল, "কুকুরগুলোর কাছে আমি যাব। তাদের জন্যে কিছু খাবার আমায় দিন। জানি তারা আমায় কামড়াবে না।" যেতে বদ্ধপরিকর দেখে হিংস্র জন্তুগুলোর জন্য খাবার দিয়ে দুর্গের মালিক তাকে নিয়ে গেলেন বাড়িটার মাটির নীচের ঘরে। তাকে সেখানে আসতে দেখে কুকুরগুলো ঘেউ-ঘেউ করে উঠল না। সবাই খুব খুশি হয়ে লেজ নাড়তে লাগল।

পরদিন সকালে দুর্গের মালিককে ছেলেটি বলল, "কুকুরগুলো তাদের ভাষায় আমাকে বলেছে—কেন তারা সেখানে থেকে দেশের ক্ষতি করছে। জাদুর মায়ায় তারা আচ্ছন্ন। বাড়িটার মধ্যে অনেক গুপ্তধন আছে। সেটা পাহারা দেবার ভার তাদের ওপর। গুপ্তধন না সরানো

পর্যন্ত তাদের ছুটি নেই। কী করে সেটা করা যায় সে কথাও তাদের কাছে জেনেছি।".

তার কথা শুনে সবাই খুব খুশি। দুর্গের মালিক বললেন, গুপ্তধন নিয়ে আসতে পারলে তাকে তিনি নিজের ছেলের মতো ভালোবাসবেন। মাটির নীচের ঘর থেকে সিঁড়ি ভেঙে ছেলেটি উঠে এল। কী করতে হবে তার জানা ছিল। তাই সহজেই সে খুঁজে বার করল রাশিরাশি মোহর।

সেদিন থেকে কুকুরগুলোর ভয়ংকর তর্জন-গর্জন আর শোনা গেল না। দেশের লোক স্বস্তির নিশ্বেস ফেলে বাঁচল।

কিছুকাল পরে ছেলেটির ইচ্ছে হল রোম শহরে যাবার। পথে একটা জলা জমির পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার কানে এল নানা ব্যাঙের ডাক। তাদের ডাকের মানে বুঝে সে হয়ে উঠল খুব গম্ভীর আর বিষণ্ণ। রোমে সে যখন পৌঁছল ঠিক তখনই পোপ্-এর[১] মৃত্যু হয়েছে। কার্ডিন্যালরা[২] তখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন কাকে পোপ্ করা যায়। শেষটায় তাঁরা স্থির করেন—অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন লোককেই তাঁরা পোপ্-এর পদে অভিষিক্ত করবেন। যে মুহূর্তে এটা তাঁরা স্থির করেন সেই মুহূর্তে গির্জের মধ্যে আসে সেই ছেলেটি। আর সঙ্গে সঙ্গে দুটি তুষার-ধবল পায়রা উড়ে এসে বসে তার দু কাঁধে—সেখান থেকে উড়ে পালায় না। যাজকরা বুঝলেন—এটা ঈশ্বরের নির্দেশ। তাই সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটিকে অনুরোধ করলেন পোপ্-এর সিংহাসনে বসতে। ছেলেটি ইতস্তত করতে লাগল। বুঝতে পারল না এই মহা সম্মানের আসনে বসবার সে উপযুক্ত কি না। কিন্তু পায়রা দুটোর কথা শুনে সে বলল, "বেশ—আমি রাজি।" নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পর তাকে বসান হল পোপ্-এর সিংহাসনে। তখন তার মনে পড়ল পথে আসতে আসতে ব্যাঙের ডাকের কথাগুলো। তারা বলছিল: এক-দিন তুমি পোপ্ হবে। সঙ্গে সঙ্গে তার ম্যাস্[৩] বলার কথা। কিন্তু ম্যাস্-এর একটি কথাও সে জানত না। পায়রা দুটো তখনো তার কাঁধে বসেছিল। ম্যাস্-এর সব কথা ফিস্‌ফিস্ করে তাকে তারা বলে দিল।

[১]পোপ্—রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মসম্প্রদায়ের প্রধান গুরু।

[২]কার্ডিন্যাল—রোম্যান ক্যাথলিক যাজকদের বিশেষ উঁচু পদ।

[৩]খৃস্টীয় নৈশ ভোজোৎসব-পর্ব উপলক্ষে গির্জেয় গাওয়া ভজনগান।

হাত-কাটা মেয়ে

এক জাঁতাওয়ালা ক্রমশ খুব গরিব হয়ে পড়ে। শেষটায় তার জাঁতা-কল আর সেটার পিছনকার বড়ো-একটা আপেলগাছ ছাড়া কিছুই তার রইল না। একবার সে বনে গেছে কাঠকুটো কুড়ুতে এমন সময় এক অচেনা বুড়ো হাজির হল তার কাছে। বুড়ো বলল, "গাছ কাটছ কেন? তোমার জাঁতাকলের পেছনে যে দাঁড়িয়ে আছে তাকে আমায় দিলে তোমাকে খুব বড়োলোক করে দেবো।"

জাঁতাওয়ালা ভাবল, 'সেটা তো আমার আপেলগাছটা।' মুখে বলল, "তাই দেবো।" অচেনা লোকটি ঘৃণার হাসি হেসে বলল, "তিন বছরের মধ্যে এসে আমার সম্পত্তির দাবি জানাব।" এই বলে সে চলে গেল।

জাঁতাওয়ালা বাড়ি ফিরতে তার বউ তাকে প্রশ্ন করল, "হ্যাঁ গো, এই-সব রাশিরাশি ধন-সম্পত্তির মানে কী? হঠাৎ সব দেরাজ-সিন্দুক ভরে গেছে। বাড়িতে তো কেউ আসে নি। কী করে এমনটা হল আমি ভেবে পাচ্ছি না।"

সে বলল, "এটা নিশ্চয়ই সেই অচেনা লোকটির কাজ, বনে যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমাদের বাড়ির পেছনে যেটা দাঁড়িয়ে সেটার বদলে রাশিরাশি মোহর সে দেবে বলে কথা দিয়েছিল। বড়ো আপেলগাছটা অনায়াসে তাকে আমরা দিতে পারি।"

তার বউ বলল, "হায় ভগবান। লোকটা নিশ্চয় শয়তান। আপেল-গাছটার কথা সে বলে নি। বলেছিল আমাদের মেয়ের কথা। সে-ই তখন জাঁতাকলের পেছনে দাঁড়িয়ে উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিল।"

জাঁতাওয়ালার মেয়েটি সুন্দরী আর ধার্মিক প্রকৃতির। তিনটে বছর সে কাটাল ভগবানে মতি রেখে, কোনোরকম পাপ কাজ না করে তার পর যেদিন শয়তানের তাকে নিয়ে যাবার কথা সেদিন সে স্নান করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে খড়ি দিয়ে নিজের চার পাশে গোল একটা দাগ কাটল।

বেশ ভোর-ভোর শয়তান এসে হাজির। কিন্তু মেয়েটির কাছে সে যেতে পারল না। ভীষণ রেগে জাঁতাওয়ালাকে সে বলল, "এখানকার সব জল সরাও যাতে তোমার মেয়ে আর স্নান করতে না পারে। তা না হলে তাকে আমি বশে আনতে পারব না।"

দারুণ ঘাবড়ে জাঁতাওয়ালা শয়তানের কথামতো কাজ করল।

পরদিন সকালে আবার এল শয়তান। কিন্তু মেয়েটি তার দু হাতের উপর এমন কেঁদেছিল যে, চোখের জলে দু হাত তার ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়। শয়তান তাই তাকে ছুঁতে না পেরে দারুণ রেগে জাঁতাওয়ালাকে বলল, "ওর হাত দুটো কেটে ফেল। তা না হলে ওর কাছে যেতে পারব না।"

দারুণ আতংকে জাঁতাওয়ালা চেঁচিয়ে উঠল, "বলছ কী! আমার নিজের মেয়ের হাত আমাকে বলছ কাটতে!"

শয়তান তখন আরো রেগে বলল—তার কথামতো কাজ না করলে জাঁতাওয়ালাকে সে ধরে নিয়ে যাবে।

ভয় পেয়ে জাঁতাওয়ালা কথা দিল তার কথামতো কাজ করবে বলে। মেয়ের কাছে গিয়ে সে বলল, "বাছা, তোর হাতদুটো না কাটলে শয়তান আমায় ধরে নিয়ে যাবে। ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম, তাই কাটব বলে কথা দিয়েছি। তোর খুব কষ্ট হবে। তার জন্যে আমায় ক্ষমা করিস!"

মেয়েটি বলল, "বাবা, আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছে করতে পার। কারণ আমি তো তোমারই মেয়ে।" এই-না বলে মেয়েটি তার হাতদুটো বাড়িয়ে দিল আর জাঁতাওয়ালা ফেলল সে-দুটো কেটে।

তৃতীয়বার শয়তান যখন হাজির হল তার আগে মেয়েটি তার কাটা নুলোদুটোর উপর খুব কেঁদেছিল। তাই সে-দুটো ধুয়ে একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায়। ফলে হার মানতে বাধ্য হল শয়তান। কারণ মেয়েটির উপর কোনো প্রভাব তার আর ছিল না।

জাঁতাওয়ালা তার মেয়েকে বলল, "আমার জন্যে এত ত্যাগ স্বীকার করেছিস বলে আজীবন তোকে আমি খুব আরামের মধ্যে রাখব।"

কিন্তু মেয়েটি বলল, "আমি আর এখানে থাকব না। পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াব। আমাকে দেখে লোকের করুণা হবে। আমার দরকারের অতিরিক্ত জিনিসপত্র তারা দেবে।"

এই-না বলে নুলোদুটো কাপড় দিয়ে বাঁধিয়ে নিয়ে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়ল পথে, তার পর হেঁটে চলল রাত না হওয়া পর্যন্ত। রাত হলে সে পৌঁছল এক রাজবাড়ির বাগানে। চাঁদের আলোয় সে দেখতে পেল নানা গাছে সুন্দর-সুন্দর ফল ধরে রয়েছে। কিন্তু জল দিয়ে ঘেরা থাকায় সেই বাগানের মধ্যে সে যেতে পারল না। সারাদিন উপোস করে হাঁটার দরুন তখন ক্ষিদেয় তার আধ-মরা অবস্থা। কয়েকটা ভালো-ভালো ফল খাবার খুব ইচ্ছে করতে লাগল তার। তাই নতজানু হয়ে বসে সে ডাকতে লাগল ভগবানকে। হঠাৎ সেখানে এক দেবদূত এসে সামনেকার জল সরিয়ে করে দিল দু ভাগ। তার যাবার পথ হয়ে গেল শুকনো খট্‌খটে। সেই পথ দিয়ে মেয়েটি বাগানের মধ্যে গেল, তার পিছন পিছন এল সেই দেবদূত। মেয়েটি দেখল একটা গাছে ফলে রয়েছে সুন্দর-সুন্দর নাশপাতি। প্রত্যেকটায় নম্বর দেওয়া। যেটায় তার মুখ পৌঁছল দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সেটা খেয়ে মেয়েটি তার ক্ষিদে মেটাল।



মালি তাকে দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু দেবদূত তার পিছনে দাঁড়িয়েছিল বলে তাকে কিছু বলার সাহস মালির হল না। ভাবল মেয়েটি সম্ভবত ভূত। নাশপাতি খাওয়া শেষ হতেই একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে মেয়েটি লুকিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে বাগানে এসে রাজা গুণে দেখেন একটা নাশপাতি কম। গাছের তলায় সেটা পড়ে নেই দেখে মালিকে রাজা প্রশ্ন করলেন —সেটা কোথায়?

মালি বলল, "মহারাজ! গত রাতে একটা হাত-কাটা ভূত এসে না তুলে গাছ থেকেই সেটা খেয়ে ফেলেছে।"

রাজা প্রশ্ন করলেন, "সেই ভূত জল পেরুল কী করে?"

মালি বলল, "তুষার-ধবল পোশাক পরে স্বর্গ থকে একজন এসে জল দু ভাগ করে দেয়। মাঝখানের শুরু পথ দিয়ে ভূতটা আসে। সাদা পোশাকে যে এসেছিল নিশ্চয়ই সে দেবদূত। তাই আমি ভয়ে চেঁচামেচি করতে পারি নি। নাশপাতি খাওয়া হতেই ভূতটা চলে যায়।"

রাজা বললেন, "তোমার কথা সত্যি হলে আজ রাতে তোমার সঙ্গে আমি পাহারা দেবো।"

রাতে রাজা এলেন বাগানে। সঙ্গে এক পুরোহিত। সেই ভূতের সঙ্গে তার আলাপ করার কথা। একটা গাছের তলায় তারা তিনজনে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

মাঝরাতে পা টিপে-টিপে গাছটার কাছে এসে মেয়েটি আগের মতোই আর-একটা নাশপাতি খেলো। সাদা পোশাকে দেবদূত দাঁড়িয়েছিল তার কাছে।

পুরোহিত তখন এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল, "তুমি স্বর্গের না মর্তের? তুমি মানুষ না ভূত?"

মেয়েটি বলল, "আমি ভূত নই। দুর্ভাগা এক মেয়ে। সবাই আমাকে ছেড়ে গেছে। ভগবানই আমার একমাত্র সহায়।"

রাজা বললেন, "পৃথিবীর সবাই ত্যাগ করলেও আমি তোমায় ত্যাগ করব না।" এই-না বলে রাজা তাকে নিয়ে গেলেন তাঁর প্রাসাদে। মেয়েটি ছিল খুব সুন্দরী আর তার স্বভাবটিও খুব মিষ্টি। তাই মেয়েটিকে ভালোবেসে একজোড়া রুপোর হাত গড়িয়ে দিয়ে রাজা তাকে বিয়ে করলেন।

বছরখানেক পরে রাজকাজে রাজাকে বেরুতে হল। যাবার আগে রানীর দেখাশোনার ভার তিনি দিয়ে গেলেন তাঁর মায়ের উপর। বলে গেলেন, "রানীর অসুখ করলে ভালো করে তার সেবাযত্নের ব্যবস্থা করবে। কেমন থাকে চিঠিতে আমায় জানাবে।"

রাজা যাবার কিছুদিনের মধ্যেই রানীর কোলে এল ফুটফুটে একটি ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে এই সুখবর রাজার বুড়ি মা রাজাকে চিঠিতে জানালেন। যে দূত চিঠিটা নিয়ে যাচ্ছিল বিশ্রাম নেবার জন্য পথে এক ঝরনার পাশে শুয়ে অঘোরে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

এদিকে সেই শয়তান ভালো রানীর বিরুদ্ধে সর্বদাই কুমতলব আঁটছিল। সে চিঠিটা বদলে দিল। নতুন চিঠিতে লিখল রানী জন্ম দিয়েছে ছোট্টো একটা দানবকে।

চিঠিটা পড়ে রাজা চমকে উঠলেন। মন তাঁর খুব খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু উত্তরে লিখলেন, তিনি না ফেরা পর্যন্ত রানীর যেন সেবাযত্নের কোনোরকম ত্রুটি না হয়।

চিঠিটা নিয়ে সেই দূত ফিরল। কিন্তু ফিরতি পথে সেই একই জায়গায় পৌঁছে বিশ্রাম নিতে গিয়ে আবার পড়ল ঘুমিয়ে।

কিন্তু শয়তানটা আবার এসে চিঠি বদলে দূতের পকেটে রাখল আর-একটা চিঠি। তাতে আদেশ ছিল রানী আর তার ছেলেকে মেরে ফেলার। বুড়ি মা চিঠিটা পড়ে থর্‌থর্‌ করে কেঁপে উঠলেন। রাজা এ কথা লিখতে পারেন বলে তাঁর বিশ্বাস হল না। রাজাকে তিনি আর-একটা চিঠি লিখলেন। কিন্তু চিঠিটা রাজার হাতে পৌঁছল না। কারণ শয়তান আর-একটা জাল চিঠি দূতের পকেটে রেখে দিয়েছিল। শেষ জাল চিঠিতে আদেশ ছিল—রানীর যেন দু চোখ উপড়ে ফেলা আর জিভ কেটে নেওয়া হয়। আর রানীকে খুন করার প্রমাণ হিসেবে সেগুলো যেন তুলে রাখা হয়।

রাজার মা এই নিষ্ঠুরতার কথা ভেবে খুব কাঁদলেন। রাতে একটা হরিণ-ছানা আনিয়ে সেটার চোখদুটো ওপড়াতে আর জিভ কেটে ফেলতে আদেশ দিলেন। তার পর রানীকে তিনি বললেন, "রাজার আদেশমতো তোমাকে মেরে ফেলতে পারব না। কিন্তু এখানে তোমার একা থাকা ঠিক নয়। ছেলেকে নিয়ে তুমি পালিয়ে যাও। কখনো আর ফিরো না।" ছেলেটিকে তার পিঠে তিনি বেঁধে দিলেন। বেচারা রানী কাঁদতে-কাঁদতে চলে গেল।

যেতে-যেতে সে পৌঁছল গহন এক বনে। সেখানে নতজানু হয়ে বসে সে ভগবানকে ডাকতে লাগল। আবার তার কাছে এল সেই দেবদূত। তাকে সে নিয়ে গেল ছোট্টো একটা বাড়িতে। বাড়িটার দরজায় লেখা, "এখানে সবাই স্বাধীনভাবে থাকে।"

সাদা পোশাক-পরা এক তরুণী সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "এসো রানী, এসো।" বলে ভিতরে নিয়ে গিয়ে রানীর পিঠ থেকে তার ছেলেকে খুলে, কোলে করে তাকে খাইয়ে-দাইয়ে শোয়াল খুব সুন্দর আর নরম ছোট্টো একটি বিছানায়।

মেয়েটি বলল, "কী করে জানলে আমি রানী?"

সাদা পোশাকের মেয়েটি বলল, "আমি দেবদূত। ভগবান আমায় পাঠিয়েছেন তোমার ছেলেকে মানুষ আর তোমাদের দুজনের দেখাশোনা করার জন্যে।"

খুব আদর-যত্নে মেয়েটি সেখানে রইল সাত বছর। সে খুব ভালো বলে তার কাটা-হাত দুটো আবার গজিয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে রাজা ফিরলেন তাঁর রাজ্যে। ফিরেই জানতে চাইলেন তাঁর বউ আর ছেলে কেমন আছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের তিনি চাইলেন দেখতে।

তাঁর বুড়ি মা কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, "তুই ভারি নিষ্ঠুর। আমাকে তুই লিখিস নি সেই নিষ্পাপ দুজনকে মেরে ফেলার কথা?" তার পর শয়তানের সেই জাল চিঠি দুটো দেখিয়ে বলে চললেন, "তুই যা লিখেছিলি তাই করেছি।" প্রমাণ হিসেবে রাজাকে তিনি দেখালেন সেই হরিণ-ছানার জিভ আর চোখদুটো।

সব শুনে বউ আর ছেলের জন্য রাজা শোকে-দুঃখে মরণাপন্ন হয়ে পড়লেন। তাই দেখে তাঁর বুড়ি মায়ের করুণা হল। তিনি বললেন, "কাঁদিস না। তারা এখনো বেঁচে আছে। গোপনে একটা হরিণ-ছানা মারিয়ে প্রমাণ হিসেবে তার জিভ আর চোখদুটো রেখে দিয়েছিলাম। আসলে তোর বউয়ের পিঠে ছেলেটিকে বেঁধে দিয়ে তাদের বলি পালাতে। তার ওপর তোর রাগ দেখে তাকে বলে দি কখনো যেন না ফিরে আসে।"

সঙ্গে সঙ্গে রাজা প্রতিজ্ঞা করলেন, "আকাশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আমি যাব। ইতিমধ্যে উপোস করে মরে না গিয়ে থাকলে যতদিন-না আমার বউ আর ছেলের দেখা পাব ততদিন জলস্পর্শ করব না।"

এই-না বলে পুরো সাতটা বছর রাজা ঘুরে বেড়ালেন বনে-বনে, পাহাড়ে-পর্বতে, গুহায়-গুহায়। খুঁজে বেড়াতে লাগলেন তাঁর বউ আর ছেলেকে। কিন্তু কোথাও তাদের খোঁজ না পেয়ে ভাবলেন, 'নিশ্চয়ই তারা মারা গেছে।' সেই সাত বছর তিনি জলস্পর্শ করেন নি। কিন্তু ভগবান তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। অবশেষে সেই বনে পৌঁছে তিনি দেখতে পেলেন সেই ছোট্টো বাড়ি, যেটার দরজায় লেখা ছিল, 'এখানে সবাই স্বাধীনভাবে থাকে।'

সেই সাদা পোশাকের মেয়েটি বেরিয়ে এসে বলল, "এসো রাজা, এসো।" তার পর তার হাত ধরে ভিতরে নিয়ে যেতে-যেতে জানতে চাইল কোথা থেকে তিনি আসছেন।

রাজা বললেন, "সাত বছর ধরে আমি আমার বউ আর ছেলের খোঁজ করছি। কিন্তু কোথাও তাদের দেখা পাই নি।"

দেবদূত তাঁকে খাদ্য আর পানীয় এনে দিল। রাজা বললেন—তিনি খাবেন না ; কিন্তু খুব ক্লান্ত বলে বিশ্রাম নিতে তিনি চান। এই-না বলে শুয়ে পড়ে একটা কাপড়ে তিনি নিজের মুখ ঢাকলেন।

তার পর দেবদূত গেল যে-ঘরে রানী বসেছিল তার ছোট্টো ছেলেটিকে নিয়ে সেই ঘরে। ছেলেটিকে রানী ডাকত 'দুঃখ-মানিক' বলে। দেবদূত তাকে বলল, "তোমার বর এসেছেন। ছেলেকে নিয়ে যাও।" রাজা যেখানে ঘুমচ্ছিলেন ছেলেকে নিয়ে রানী সেখানে গেল। রাজার মুখ থেকে সেই কাপড়ের ঢাকা তখন খসে পড়েছিল।

রানী বললেন, "দুঃখ-মানিক, তোর বাবার মুখ কাপড় দিয়ে আবার ঢেকে দে।"

কাপড়টা তুলে রাজার মুখ ছেলেটি ঢেকে দিল।

ঘুমের মধ্যেই রাজা শুনছিলেন তাদের কথাবার্তা। আবার নিজের মুখ থেকে কাপড়টা তিনি খসিয়ে ফেললেন। তাই ছোট্টো ছেলেটি অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠল, "মামণি, আবার বাবার মুখ ঢাকি কেমন করে? পৃথিবীতে তো বাবা বলতে কেউ আমার নেই। তুমি আমাকে প্রার্থনার সময় বলতে শিখিয়েছ, 'আমাদের পিতা যিনি তিনি স্বর্গে থাকেন।' বলেছ আমার বাবা স্বর্গে থাকেন আর তিনিই ভগবান। এই অচেনা লোককে কী করে আমার বাবা বলে মনে করব?"

তার কথা শুনে জেগে উঠে বসে রাজা প্রশ্ন করলেন—তারা কে?

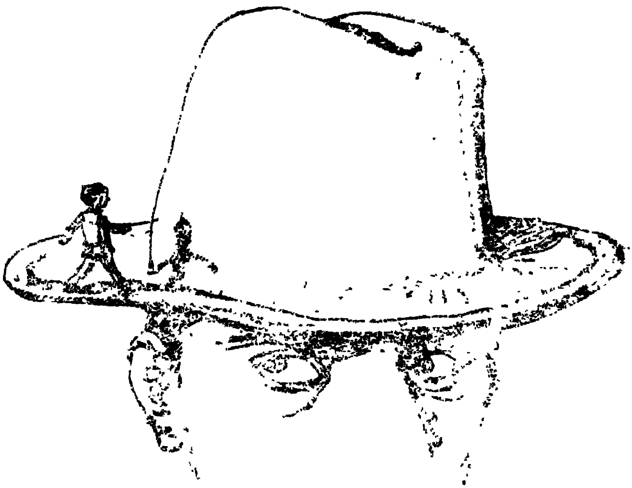
রানী বললেন, "আমি তোমার বউ, আর এ তোমার ছেলে। নাম দুঃখ-মানিক।"

তার রক্ত-মাংসর সুস্থ হাত-দুটো দেখে রাজা বললেন, "আমার বউয়ের তো রুপোর হাত ছিল।"

মেয়েটি বলল, "ভগবানের করুণার শেষ নেই। তাঁর দয়াতেই সুস্থ হাত আবার গজিয়েছে।"

দেবদূত অন্য ঘরে গিয়ে সেই দুটো রুপোর হাত এনে রাজাকে দেখাল। রাজা তখন নিঃসন্দেহ হয়ে বুঝলেন—এই তার বউ। তাকে চুমু খেয়ে সানন্দে তিনি বলে উঠলেন, "আমার হৃদয় থেকে একটা ভারী বোঝা এত দিনে নামল।"

দেবদূত খুব ঘটা করে তাদের বিদায়-ভোজ খাওয়াল। তার পর তারা দেশে ফিরল রাজার বুড়ি মায়ের কাছে। তার পর সারা রাজ্যময় আনন্দের বান ডাকল আর রাজা-রানীর জন্য আয়োজন করা হল আর-একটা বিরাট বিয়ের ভোজের। আর তার পর আজীবন তাঁরা বেঁচে রইলেন পরম সুখে শান্তিতে।



বুড়োআংলা টমের অ্যাডভেঞ্চার

এক দর্জির একটি ছেলে ছিল। ভারি ছোট্টোখাট্টো—বুড়ো আঙুলের চেয়ে বড়ো নয়। তাই তারা তার নাম দিয়েছিল বুড়োআংলা টম। ছোট্টোখাট্টো হলে হবে কি, তার ছিল ভীষণ সাহস। তাই বাবাকে সে বলল, "বাবা, পৃথিবীটা আমাকে ঘুরে দেখে আসতেই হবে।"

বুড়ো দর্জি বলল, "ঠিক আছে, বাছা।" মোম দিয়ে রিপু-করার লম্বা ছুঁচের খাপ বানিয়ে ছেলেকে দিয়ে সে বলল, "এই তলোয়ারটা সঙ্গে নিয়ে যা।"

ক্ষুদে টম বলল, যাবার আগে বাড়িতে শেষ ভোজ সে খেয়ে যাবে। তার মা কী রাঁধছে দেখার জন্য তাই সে তুড়ুক-তুড়ুক করে লাফিয়ে রান্নাঘরে গেল। খাবার তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ঢাকা দিয়ে খাবারের পাত্র চাপানো ছিল উনুনের উপর।

সে প্রশ্ন করল, "মামণি, আজ ডিনারের জন্যে কী রেঁধেছ?"

তার মা বলল, "নিজেই দেখ-না!"

বুড়োআংলা টম উনুনের পাশে লাফিয়ে উঠে পাত্রটার মধ্যে উঁকি

মারল। স্যুপ থেকে ভাপ উঠছিল। মাথাটা অনেকখানি ঝোঁকাবার দরুন সেই ভাপের মধ্যে পড়ে সে ভেসে বেরিয়ে গেল ধোঁয়া বেরুবার চিমনির মধ্যে দিয়ে। সেই ভাপের মেঘে খানিক সে ভেসে বেড়াল। তার পর ধীরে-ধীরে নেমে এল পৃথিবীতে। ক্ষুদে দর্জি এবার সত্যিই বেরিয়ে এল পৃথিবীতে।

প্রথমে সে গিয়ে চাকরি নিল এক নামজাদা দর্জির কাছে। কিন্তু সেখানকার খাবার-দাবার তার পছন্দ হল না।

তাই সে বলল, "গিন্নিমা, এর চেয়ে ভালো খাবার না দিলে আমি তোমার বাড়ির দরজায় খড়ি দিয়ে লিখে দেবো : 'শুধুই আলু, মাংসের ছিটেফোঁটা নেই। বিদায় মিস্টার আলুরাজা' !"

"উইচিংড়ি, কী সব বাজে বকবক করছিস ?" এই-না বলে দর্জিগিন্নি একটা সুতো তুলে নিল তাকে ঘা কয়েক দেবার জন্য। কিন্তু বুড়োআংলা টম ততক্ষণে সেঁধিয়ে পড়েছে অঙ্গুষ্ঠানার মধ্যে। সেটা খানিক ফাঁক করে দর্জিগিন্নিকে জিভ বার করে সে ভ্যাংচাল। দর্জিগিন্নি অঙ্গুষ্ঠানাটা তুলে ধরতে গেল তাকে। চক্ষের নিমেষে কিন্তু ক্ষুদে টম কাপড়ের টুকরো-টাকরার মধ্যে মধ্যে দিয়ে খর্‌খর্‌ করে গিয়ে ঢুকে পড়ল টেবিলের একটা ফাটলের মধ্যে।

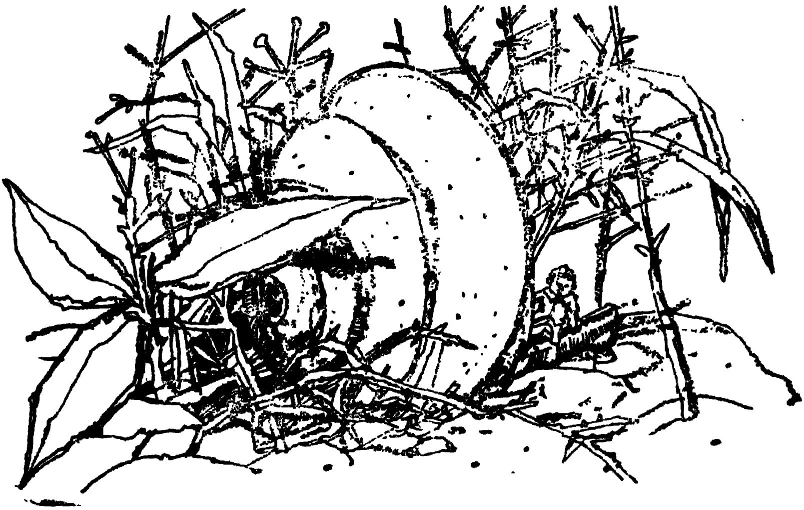
সেখান থেকে মাথা উঁচিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, "হি-হি-হি, ম্যাডাম্‌।" দর্জিগিন্নি তার কানমুলে দিতে এলে সুড়ুৎ করে সে সেঁধিয়ে গেল একটা ড্রয়ারের মধ্যে।

শেষটায় কিন্তু টমকে দর্জিগিন্নি ধরলেন, তার পর দিলেন তাকে বাড়ি থেকে দূর করে।

যেতে-যেতে সেই ক্ষুদে দর্জি পৌঁছল বিরাট এক বনে। সেখানে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এক ডাকাত দলের। রাজার কোষাগার লুট করার ফন্দি আঁটছিল তারা। ক্ষুদে দর্জিকে দেখে তারা ভাবল, "এই ক্ষুদে মানুষটা দরজার চাবির ফুটোর মধ্যে দিয়ে সেঁধিয়ে আমাদের গুপ্তচরের কাজ করতে পারে।"

ডাকাতদের একজন চেঁচিয়ে উঠল, "হ্যালো ভীমসেন! আমাদের সঙ্গে রাজার কোষাগারে যাবি ? সেখানে সুড়ুৎ করে ঢুকে টাকা-পয়সা তুই বাইরে ছুঁড়ে দিতে পারিস।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিয়ে ক্ষুদে দর্জি বলল, "যাব।" তার পর



তাদের সঙ্গে গেল কোষাগারে। দরজাটার উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ভালো করে পরীক্ষা করে শেষটায় সে একটা ফাটল আবিষ্কার করল, যেটার মধ্যে দিয়ে সে গলতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে সে ঢুকে পড়তে যাচ্ছিল। কিন্তু একজন প্রহরী তাকে দেখতে পেয়ে তার সঙ্গীকে বলল, "দেখো, দেখো, কী কুচ্ছিত একটা মাকড়সা ঘুরঘুর করছে। এক্ষুনি পায়ে চিপটে ওটাকে নিকেশ করছি।"

তার সঙ্গী বলল, "ওটাকে মেরে কী করবে? বেচারা তো আমাদের কোনো ক্ষতি করে নি।"

তাই ক্ষুদে দর্জি সেই ফাটলের মধ্যে দিয়ে নির্বিঘ্নে সেঁধিয়ে পড়ল কোষাগারে। তার পর যে জানলার নীচে ডাকাতরা দাঁড়িয়েছিল সেটা দিয়ে ছুঁড়ে দিতে লাগল মুঠো মুঠো মোহর। পুরোদমে সে যখন কাজ করে চলেছে এমন সময় সে শুনল, রাজা আসছেন তাঁর কোষাগার দেখতে। সঙ্গে সঙ্গে জানলার মধ্যে দিয়ে সুড়ুৎ করে গলে সে বেরিয়ে গেল।

রাজা দেখলেন তাঁর অনেক মোহর খোয়া গেছে। অথচ তালাচাবি হুড়কো-টুড়কো সব-কিছুই আছে ঠিকঠাক। তাই বুঝতে পারলেন না মোহরগুলো অদৃশ্য হল কী করে। বাইরে গিয়ে প্রহরীদের তিনি জানালেন, তাঁর মোহর কেউ চুরি করছে।

বুড়োআংলা টম আবার শুরু করে দিল তার কাজ। প্রহরীরা

শুনতে পেল কোষাগারের মধ্যে ঝন্‌ঝন্ শব্দ। তারা ছুটে গিয়ে ভাবল চোরের গলা চেপে ধরতে পারবে। কিন্তু বুড়োআংলা তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে এক কোণে ছুটে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল একটা মোহরের নীচে। তার শরীরের কোনোখানটাই দেখা গেল না। তাই সে প্রহরীদের হেঁকে বলল, "এই যে আমি।"

প্রহরীরা ছুটে গেল সেখানে কিন্তু সেখানে তারা পৌঁছবার আগেই আর-এক কোণে ছুটে গিয়ে আর-একটা মোহরের নীচে লুকিয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠল সে, "এই যে আমি!" প্রহরীর দল সেদিকে ছুটল। কিন্তু সেখানে তারা পৌঁছবার আগেই তৃতীয় কোণে গিয়ে লুকিয়ে বুড়োআংলা হেঁকে বলল, "এই যে আমি!" অনর্থক তাড়া করে করে তাদের মাথা খারাপ হবার দাখিল। শেষটায় ক্লান্ত হয়ে তারা চলে গেল। তখন সে বাকি মোহরগুলো জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে শেষ মোহরটার সঙ্গে নিজেও লাফিয়ে এল বাইরে।

তার দারুণ প্রশংসা করে ডাকাতরা বলল, "বাহাদুর বটে! আমাদের সর্দার হবে?"

বুড়োআংলা তাদের ধন্যবাদ দিল। তার পর জানাল আগে কিন্তু সে পৃথিবীটা ঘুরে দেখতে চায়।

লুঠের মোহর ডাকাতরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিল। কিন্তু ক্ষুদে দর্জি চাইল শুধু একটা তামার ছোট্টো পয়সা। কারণ তার চেয়ে ভারী জিনিস বয়ে-বয়ে ঘুরে বেড়াবার সামর্থ্য তার নেই।

তলোয়ারটা কোমরে ঝুলিয়ে, ডাকাতদের ধন্যবাদ দিয়ে পায়ে হেঁটে আবার সে যাত্রা করল। দু-তিন জায়গায় সে চাকরি নিলে। কিন্তু কোনো কাজই তার পছন্দ হল না। শেষটায় সে এক সরাইখানার হল ওয়েটার।

সেখানকার দাসী আর রাঁধুনিরা তাকে কিন্তু বরদাস্ত করতে পারল না। কারণ নিজে অদৃশ্য থেকে সে দেখতে পেত তাদের সব কাণ্ড-কারখানা। আর সরাইখানার মালিক আর তার বউকে গিয়ে বলে দিত কখন তারা প্লেট থেকে খাবার আর 'সেলার' (মাটির তলার ঘর) থেকে বিয়ার চুরি করে খায়। তারা বলল, "ছোকরাকে উচিত শিক্ষা দিচ্ছি।" এই-না বলে তাকে জব্দ করার জন্য তারা ফন্দি আঁটতে বসল।

অল্প কদিন পরে এক দাসী কাস্তে দিয়ে কাটছিল বাগানের ঘাস—লতা-পাতা। বুড়োআংলাকে ফুল আর লতাপাতার মধ্যে তুড়ুক-তুড়ুক করে লাফিয়ে বেড়াতে দেখে কাটা ঘাসের সঙ্গে তাকে সে জড়িয়ে নিল তার থলিতে। তার পর সবসুদ্ধু দিল গোরুগুলোর সামনে ফেলে। তাদের মধ্যে ছিল প্রকাণ্ড একটা কালো গোরু। বুড়োআংলা টমকে সে এমনভাবে গিলে ফেলল যে তার লাগল না। কিন্তু গোরুটার পেটের মধ্যে গিয়ে মোটেই ভালো লাগল না তার। গোরুটার দুধ দোয়া হবার সময় সে চেঁচিয়ে উঠল :

"ঝর ঝর ঝরেছে,
বালতিটা ভরেছে ?"

কিন্তু দুধ দুইবার শব্দে তার স্বর চাপা পড়ে গেল।

কিছু পরে গোয়ালে এসে সরাইখানার মালিক বলল, "গোরুটাকে কাল কাটা হবে।" কথাটা শুনে বুড়োআংলা ভীষণ ভয় পেয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল।

"আগে আমাকে বেরুতে দাও। আমি ভেতরে রয়েছি।"

মালিক তার কথাগুলো শুনল। কিন্তু ভেবে পেল না স্বরটা কোথা থেকে আসছে। সে প্রশ্ন করল, "কোথায় তুমি ?"

বুড়োআংলা বলল, "কালো গোরুর পেটের মধ্যে।"

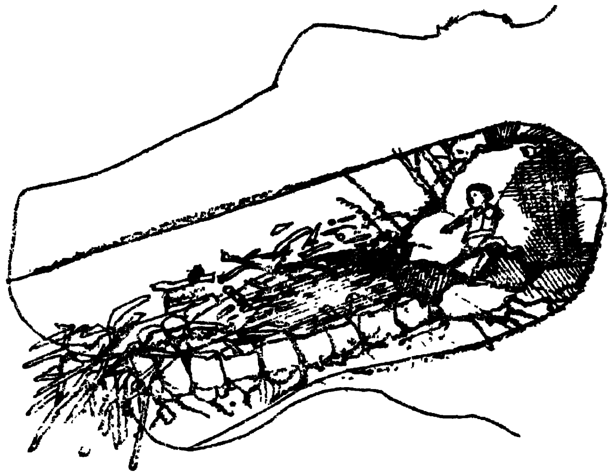
মালিক কিন্তু বুঝতে পারল না। তাই চলে গেল।

পরদিন সকালে গোরুটাকে কাটা হল। ক্ষুদে মানুষটার কপাল ভালো—তাই গোরুটাকে কাটার সময় আঘাত এড়িয়ে যেতে পারল সে। কিন্তু যে-মাংস দিয়ে 'সসেজ্' বানানো হবে তার মধ্যে সে রয়ে গেল। কসাই এসে কাজ শুরু করে দিতে প্রাণপণ জোরে চেঁচিয়ে উঠল বুড়োআংলা :

"মিহি করে কিমা কোরো না, মিহি করে কিমা কোরো না। আমি রয়েছি ভেতরে।"

কিন্তু কসাইয়ের মাংস কোপানোর শব্দের মধ্যে তার স্বর গেল তলিয়ে। কেউ তার কথা শুনতে পেল না।

বুড়োআংলার তখন প্রাণ নিয়ে পালানো বিশেষ দরকার। আর বিশেষ দরকার পড়লে লোকে অসাধ্য সাধন করতে পারে। তাই খাঁড়ার কোপ এড়িয়ে তড়াং করে সে বেরিয়ে এল। কিন্তু পুরোপুরি



পালাতে পারল না। বুঝল 'সসেজের' মাংসের সঙ্গে মুষল দিয়ে তাকে মেরে ফেলা হবে। 'সসেজ্'কে ধোঁয়া দিয়ে সংরক্ষিত করার জন্য সেটা ঝুলিয়ে রাখা হল চিমনির মধ্যে। তার মধ্যে থেকে গেল বুড়োআংলা। সময় কাটতে লাগল খুবই ধীরে ধীরে।

অবশেষে শীত এল। আর সেই সঙ্গে এল এক অতিথি। তাকে আপ্যায়ন করার জন্য নামানো হল সসেজ্‌টা। মালিকের বউ সসেজ্‌টা স্লাইজ করে কাটার সময় বহু কষ্টে সে নিজের গর্দান বাঁচাল। তার পর সুযোগ বুঝে মনের আনন্দে এল লাফিয়ে বেরিয়ে। কিন্তু সেখানে থাকতে আর তার ইচ্ছে করল না। কারণ সেখানে তার সময় মোটেই ভালো কাটে নি। তাই আবার সে যাত্রা করল। কিন্তু বেশি দিন স্বাধীনতা ভোগ করা তার কপালে লেখা ছিল না। মাঠের মধ্যে একটা শেয়াল তাকে দেখতে পেয়ে চক্ষের নিমেষে ফেলল গিলে।

ক্ষুদে দর্জি চেঁচিয়ে উঠল, "শেয়ালমশাই। তোমার গলায় আমি আটকে গেছি। দয়া করে বেরুতে দাও।"

শেয়াল বলল, "তুই এতই ছোট্টো যে আমার গলায় আটকে আছিস বলে একেবারেই টের পাচ্ছি না। তোর বাবার উঠোনের সব মুরগি-গুলো আমাকে খাওয়াবি বলে কথা দে—তবেই তোকে ছাড়ব।"

বুড়োআংলা বলল, "কথা দিচ্ছি—সব মুরগিগুলো তুমি পাবে।"

তাই শুনে শেয়াল তাকে ছেড়ে দিল। তার পর নিজেই তাকে

পিঠে করে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। হারানো ছেলেকে ফিরে আসতে দেখে বুড়োআংলার বাবা এতই খুশি হল যে, প্রতিদানে শেয়ালকে সে দিয়ে দিল সব মুরগিগুলো।

বুড়োআংলা টম বাবাকে বলল, "তোমার জন্যে চমৎকার একটা পয়সা এনেছি।" এই-না বলে তামার সেই ছোট্টো পয়সাটা তাকে সে দিয়ে দিল, যেটা এতদিন ঘোরাঘুরি করে সে রোজগার করেছিল।

তোমরা কি জানতে চাও শেয়ালকে কেন সব মুরগিগুলো খেতে দেওয়া হয়েছিল? কারণ, বোকারাম্! জানো না—আঙিনার সব মুরগির চেয়ে বাবাদের কাছে তাদের সন্তান যে অনেক বেশি প্রিয়!



তিন গাছা সোনার চুল

এক সময় এক গরিব মেয়ের এক ছেলে ছিল। সে যখন জন্মায় খুব একটা পাতলা চামড়ায় তার মাথা ঢাকা ছিল বলে লোকে বলত চোদ্দো বছর বয়সে রাজকন্যের সঙ্গে তার বিয়ে হবে।

যেদিন ছেলেটি জন্মায় সেই গ্রামের মধ্যে দিয়ে রাজা যাচ্ছিলেন। কেউ তাঁকে চিনতে পারে নি। সেখানকার খবর কী জানতে চাইলে লোকে জানাল যে, এইমাত্র সেখানে একটি ছেলে জন্মেছে যার মাথা খুব একটা পাতলা চামড়ায় ঢাকা। তাই গণকরা বলেছে সেই শিশু যে-কাজেই হাত দেবে তাতেই সফল হবে আর চোদ্দো বছর বয়সে সে বিয়ে করবে রাজকন্যেকে।

রাজা ছিলেন ভারি নিষ্ঠুর। এই ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনে তিনি খুব রেগে গেলেন। সেই শিশুর বাপ-মার কাছে গিয়ে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ গলায় তিনি

বললেন, "তোমরা গরিব লোক। তোমাদের ছেলেকে আমায় দাও। আমি তাকে খুব ভালো করে মানুষ করব।"

প্রথমে তারা দিতে চাইল না। কিন্তু রাজা অনেক মোহরের লোভ দেখাতে নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করল, "ছেলেটা ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে। এর কখনো অমঙ্গল হবে না।" এই বলে ছেলেকে দিতে তারা রাজি হল।

রাজা সেই শিশুকে একটা বাক্সয় ভরে নদীতে ফেলে দিলেন। ভাবলেন এরকম ছন্নছাড়া বরের হাত থেকে মেয়ে তাঁর বাঁচল। কিন্তু না ডুবে ছোট্টো একটা নৌকোর মতো বাক্সটা ভেসে চলল। এক ফোঁটা জলও সেটার মধ্যে সেঁধুল না। ভাসতে-ভাসতে রাজধানীর দু মাইল দূরে একটা জাঁতাকলের জল-কপাটে সেটা আটকে গেল। জাঁতাকলের মালিকের ছোকরা চাকর সেখানে ছিল। বাক্সটা দেখে একটা আঁকশি দিয়ে সে টেনে আনল। সে ভেবেছিল বাক্সটার মধ্যে অনেক ধনদৌলত আছে। কিন্তু খুলে দেখে তার মধ্যে রয়েছে ফুটফুটে একটি ছেলে। জাঁতাকলের মালিকের কাছে ছেলেটিকে সে নিয়ে গেল। মালিক আর তার বউয়ের ছেলেপুলে ছিল না। তারা ভাবল স্বর্গ থেকে ছেলেটি এসেছে তাদের কাছে। ছেলেটিকে তারা খুব আদর-যত্ন করে মানুষ করতে লাগল। দেখতে-দেখতে সুস্থ-সবল চালাক-চতুর হয়ে ছেলেটি লাগল বড়ো হয়ে উঠতে।

একদিন রাজা বৃষ্টির দরুন সেই জাঁতাকলে আশ্রয় নিয়ে মালিককে প্রশ্ন করলেন সুপুরুষ যুবকটি তার ছেলে কি না।

মালিক বলল, "না মহারাজ। চোদ্দো বছর আগে একটা বাক্স ভাসতে-ভাসতে এসে আমাদের কারখানার বাঁধে আটকে গিয়েছিল। ছেলেটি ছিল সেই বাক্সর মধ্যে। কারখানার এক ছোকরা চাকর তাকে দেখতে পেয়ে নিয়ে আসে।"

রাজা তখন বুঝলেন এ সেই ছেলে যাকে তিনি নদীতে ফেলে দিয়েছিলেন।

তিনি বললেন, "ছেলেটি কি আমার একটা চিঠি নিয়ে রানীর কাছে যেতে পারবে? পারলে তাকে আমি দুটো মোহর দেবো।"

তারা বলল, "নিশ্চয়ই পারবে, মহারাজ।" ছেলেটিকে তারা বলল তৈরি হয়ে নিতে।

চিঠিতে রানীকে রাজা লিখলেন পত্রবাহককে মেরে ফেলে যেন কবর দেওয়া হয়। তিনি যেন ফিরে দেখেন তাঁর আদেশ পালন করা হয়েছে।

ছেলেটি চিঠি নিয়ে যাত্রা করল। কিন্তু যেতে-যেতে ফেলল পথ হারিয়ে। রাতে সে পৌঁছল গহন এক বনে। অন্ধকারের মধ্যে দূরে সে দেখল মিটমিটে একটা আলো। আলোর দিকে যেতে-যেতে সে পৌঁছল ছোট্টো একটা কুঁড়েঘরে। সেখানে আগুনের সামনে বসেছিল এক বুড়ি। মনে হল ছেলেটিকে দেখে সে খুব অবাক হয়েছে। বুড়ি প্রশ্ন করল, "কোথা থেকে আসছিস বাছা, কী চাই?"

সে বলল, "জাঁতাকল থেকে আসছি। চলেছি রানীর কাছে একটা চিঠি নিয়ে। আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। এখানে রাত কাটাতে দিলে খুশি হব।"

বুড়ি বলল, "তোর বরাত খুব খারাপ। এটা ডাকাতদের আস্তানা। তোকে দেখতে পেলে নির্ঘাৎ তারা মেরে ফেলবে।"

সে বলল, "ভগবান আমাকে বাঁচাবেন। তাই আমার ভয় নেই। তা ছাড়া আমি ক্লান্ত। আর এক পাও হাঁটতে পারব না।"

বেঞ্চিতে শুয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল। খানিক পরেই ডাকাতরা ফিরল। রেগে তারা বুড়িকে প্রশ্ন করল অচেনা ছেলেটা ওখানে রয়েছে কেন। বুড়ি বলল, "বেচারা বনে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। দেখে মায়া হল; তাই ওকে থাকতে দিয়েছি। রানীর কাছে ও একটা চিঠি নিয়ে যাচ্ছে।"

চিঠিটা বার করে তারা পড়ল। পড়ে দেখে রানীকে আদেশ দেওয়া হয়েছে পত্রবাহককে মেরে ফেলতে। তাদের হৃদয় কঠোর হলেও ছেলেটার জন্য তাদের মায়া হল। ডাকাতদের সর্দার সেটা ছিঁড়ে ফেলে তার বদলে রাখল অন্য একটা চিঠি। তাতে সে লিখল ছেলেটি পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যার সঙ্গে যেন তার বিয়ে দেওয়া হয়। সকাল পর্যন্ত সেই বেঞ্চিতে তাকে তারা দিল ঘুমতে। তার পর তার ঘুম ভাঙতে চিঠিটা দিয়ে তাকে তারা দেখিয়ে দিল পথ।

চিঠিটা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে রানী নির্দেশ পালন করলেন। খুব ঘটা করে বিয়ে হয়ে গেল রাজকন্যের সঙ্গে ভাগ্যবান ছেলেটির। তাকে দেখতে সুন্দর, স্বভাবটাও মিষ্টি। তাই রাজকন্যে মনের সুখে তার সঙ্গে ঘর করতে লাগল।

কিছুদিন পরে প্রাসাদে ফিরে রাজা দেখেন গণকদের ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হয়েছে—ভাগ্যবান ছেলেটির সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তাঁর মেয়ের।

তিনি প্রশ্ন করলেন, "কী করে এটা ঘটল। চিঠিতে তো আমি উলটো নির্দেশ দিয়েছিলাম।"

রানী তাঁকে চিঠিটা দেখালেন। রাজা পড়ে দেখেন সেটা তাঁর লেখা চিঠি নয়। ছেলেটিকে তিনি প্রশ্ন করলেন—তাঁর চিঠিটার কী হল আর কেনই-বা সেটার বদলে অন্য চিঠি সে দিয়েছে?

ছেলেটি বলল, "আমি সে কথা কিছুই জানি না। রাতের বেলায় বনের মধ্যে আমি যখন ঘুমচ্ছিলাম নিশ্চয়ই চিঠিটা তখন কেউ বদলে দিয়েছে।"

ভীষণ রেগে রাজা তাকে বললেন, "এভাবে বিয়ে আমি মানি না। আমার মেয়েকে যে বিয়ে করতে চায় তাকে পাতালের গুহা থেকে রাক্ষসের মাথার তিন গাছা সোনার চুল আনতে হবে। সেই চুল তিনটে আমায় এনে দাও। রাজকন্যে তা হলে তোমার হবে।"

এই কথাগুলো রাজা বললেন কারণ তিনি ভেবেছিলেন সেখান থেকে ছেলেটি আর ফিরতে পারবে না।

ছেলেটি উত্তর দিল, "রাক্ষসকে আমি ভয় করি না। তিন গাছা সোনার চুলের খোঁজে আমি বেরুলাম।" এই বলে রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে যাত্রা করল।

যেতে-যেতে সে পৌঁছল বড়ো একটা শহরে। সিংহদ্বারের প্রহরী তাকে প্রশ্ন করল—কিসের তার ব্যবসা আর কী সে জানে?

সে বলল, "সব-কিছুই।"

প্রহরী বলল, "দয়া করে তা হলে বল এখানকার যে জায়গায় হাট বসে কেন সেখানকার ফোয়ারাটা শুকিয়ে গেছে। আগে সেখান থেকে আঙুর-রস ঝরত, এখন জলও পড়ে না।"

সে বলল, "সবুর কর। ফিরতি পথে বলব।"

আরো খানিক যাবার পর সে পৌঁছল আর-একটা শহরে। সেখানকার সিংহদ্বারের প্রহরী প্রশ্ন করল—কিসের তার ব্যবসা আর কী সে জানে?

সে বলল, "সব-কিছুই।"

"দয়া করে তা হলে বল আমাদের আপেলগাছটায় পাতাও কেন গজায় না। আগে সেটায় সোনার আপেল ফলত।"

সে বলল, "সবুর কর। ফিরতি পথে বলব।"

আরো খানিক যাবার পর সে পৌঁছল বিরাট নদীর তীরে। খেয়া-মাঝি তাকে প্রশ্ন করল—কিসের তার ব্যবসা আর কী সে জানে?

সে বলল, "সব-কিছুই।"

খেয়ামাঝি বলল, "দয়া করে তা হলে বল—এখানে কি চিরকাল আমায় থাকতে হবে? আমার কি ছুটি নেই?"

সে বলল, "সবুর কর। ফিরতি পথে বলব।"

খেয়ামাঝি তাকে নদীর অন্য পারে পৌঁছে দিতে তার নজরে পড়ল রাক্ষসটার গুহার মুখ। সেটা কুচ্‌কুচে কালো আর তার মধ্যে থেকে গলগল করে বেরুচ্ছে ধোঁয়া। রাক্ষসটা বাড়ি ছিল না। সেখানে শুধু তার দাসী বসেছিল প্রকাণ্ড এক আরাম-কেদারায়।

বেশ মিষ্টি গলায় সে প্রশ্ন করল, "বাছা, কী তোমার দরকার?"

"রাক্ষসের মাথার তিন গাছা সোনার চুল আমার দরকার। কারণ সেগুলো না হলে আমার বউকে পাব না।"

দাসী বলল, "এটা ভারি কঠিন কাজ বাছা। তা ছাড়া রাক্ষস তোমায় দেখতে পেলে খুবই বিপদে পড়বে। কিন্তু তোমাকে দেখে আমার ভালো লেগেছে। দেখি কী করতে পারি।"

দাসী তাকে একটা পিঁপড়ে করে দিয়ে বলল, "আমার পোশাকের ভাঁজের মধ্যে লুকিয়ে পড়। সেখানে তুমি নিরাপদে থাকবে।"

সে বলল, "ধন্যবাদ। এটা খুব ভালো ব্যবস্থা। কিন্তু আমি তিনটে কথা জানতে চাই। যে-ফোয়ারা দিয়ে একদিন আঙুর-রস ঝরত সেটা দিয়ে এখন কেন জলও ঝরে না? যে-গাছে একদিন সোনার আপেল ফলত সেখানে এখন কেন পাতাও গজায় না? এক খেয়া-মাঝিকে কি চিরকাল নদীর তীরে থাকতে হবে? কখনো কী সে ছুটি পাবে না?"

দাসী বলল, "তিনটেই খুব জটিল প্রশ্ন। কিন্তু রাক্ষসের তিনটে সোনার চুল আমি তোলবার সময় সে কী বলে চুপচাপ মন দিয়ে শুনো।"

সন্ধেয় রাক্ষস বাড়ি ফিরল। গুহায় ঢুকতেই তার নাকে এল অদ্ভুত একটা গন্ধ। তাই সে বলল, "আমি যেন মানুষের গন্ধ পাচ্ছি।" এই

বলে তন্নতন্ন করে গুহার মধ্যে সে খুঁজলে। কিন্তু কাউকেই সে দেখতে পেল না।

গজ্‌গজ্‌ করতে করতে সে দাসী বলল, "সারাদিন আমি জায়গাটা ঝাঁট দিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখি, আর তুমি সব-কিছু নোংরা কর আর ঘাঁটো। সর্বদাই তোমার ধারণা—মানুষের গন্ধ পাচ্ছ! রাতের খাবার খেতে বস।"

খাবার খেয়ে ক্লান্ত হয়ে দাসীর হাঁটুতে মাথা রেখে শুয়ে রাক্ষস তাকে বলল তার মাথা চুলকে দিতে দিতে। খানিক পরেই তার নাক ডাকতে শুরু করল। বুড়ি দাসী তখন তার এক গাছা সোনার চুল তুলে রাখল এক পাশে।

রাক্ষস বলে উঠল, "উঃ! করছ কী?"

দাসী বলল, "একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখছিলাম। তাই তোমার চুলে হাত পড়েছিল।"

রাক্ষস প্রশ্ন করল, "কী স্বপ্ন দেখছিলে?"

"স্বপ্ন দেখছিলাম এক শহরের হাটের জায়গার ফোয়ারাটা শুকিয়ে গেছে। আগে সেখান দিয়ে আঙুর-রস ঝরত। এটার কারণ কি?"

রাক্ষস বলল, "কথাটা লোকে যদি জানত! ফোয়ারাটার মধ্যে একটা পাথরের নীচে একটা কোলাব্যাঙ আছে। কেউ সেটাকে মারলে আবার সেখান থেকে আঙুর-রস ঝরবে।"

দাসী আবার তার মাথা টিপতে শুরু করল আর খানিক পরে এমন জোরে জোরে তার নাক ডাকতে লাগল যে থর্‌থর্‌ করে উঠল সব জানলাগুলো। তখন দাসী তুলল তার মাথার দ্বিতীয় সোনার চুল। "উঃ! করছ কী?" রেগে চেঁচিয়ে উঠল রাক্ষস।

দাসী বলল, "রেগো না। আবার একটা খারাপ স্বপ্ন দেখছিলাম।"

রাক্ষস প্রশ্ন করল, "কী স্বপ্ন দেখছিলে?"

"স্বপ্ন দেখছিলাম এক শহরের একটা গাছে এখন পাতাও গজায় না। আগে সেটায় সোনার আপেল ফলত। এটার কারণ কী?"

রাক্ষস বলল, "কথাটা লোকে যদি জানত! একটা ইঁদুর গাছটার শেকড় কাটছে। কেউ ইঁদুরকে মারলে গাছটায় আবার সোনার আপেল ফলবে। কিন্তু ইঁদুর যদি শেকড় কাটতে থাকে তা হলে গাছটা একেবারে

মরে যাবে। এবার আমায় শান্তিতে ঘুমতে দাও। আবার তোমার স্বপ্ন নিয়ে জ্বালালে কান মলে দেব।"

দাসী তাকে শান্ত করে তার মাথা টিপতে লাগল আর আবার রাক্ষসের নাক ডাকতে শুরু করলে তুলল তৃতীয় চুলটা। জেগে উঠে চেঁচাতে-চেঁচাতে রাক্ষস তেড়ে গেল তাকে মারতে। দাসী কিন্তু তাকে আবার শান্ত করে বলল, "খারাপ স্বপ্ন দেখার ওপর কি কারুর হাত আছে?"

কৌতূহলী হয়ে রাক্ষস প্রশ্ন করল, "এবার কী স্বপ্ন দেখছিলে?"

"স্বপ্ন দেখছিলাম এক খেয়ামাঝি দুঃখু করে বলছে সব সময় তাকে খেয়া পারাপার করতে হয়। কেউ তাকে ছুটি দিতে কখনো আসে না। তার কি কোনোদিন ছুটি হবে না?"

রাক্ষস বলল, "খেয়ামাঝিটা ভারি বোকা। নদী পার হতে প্রথম যে-লোক আসবে নৌকোর বৈঠা তার হাতে ধরিয়ে দিতে পারলেই তার ছুটি। সেই লোকটাকে তখন বাধ্য হয়ে খেয়ামাঝির কাজ করতে হবে।"

তিন গাছা সোনার চুল তোলা হল। তিনটে প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া গেল। তাই দাসী দিল রাক্ষসকে শান্তিতে ঘুমতে। সকাল পর্যন্ত ঘুমাল রাক্ষস।

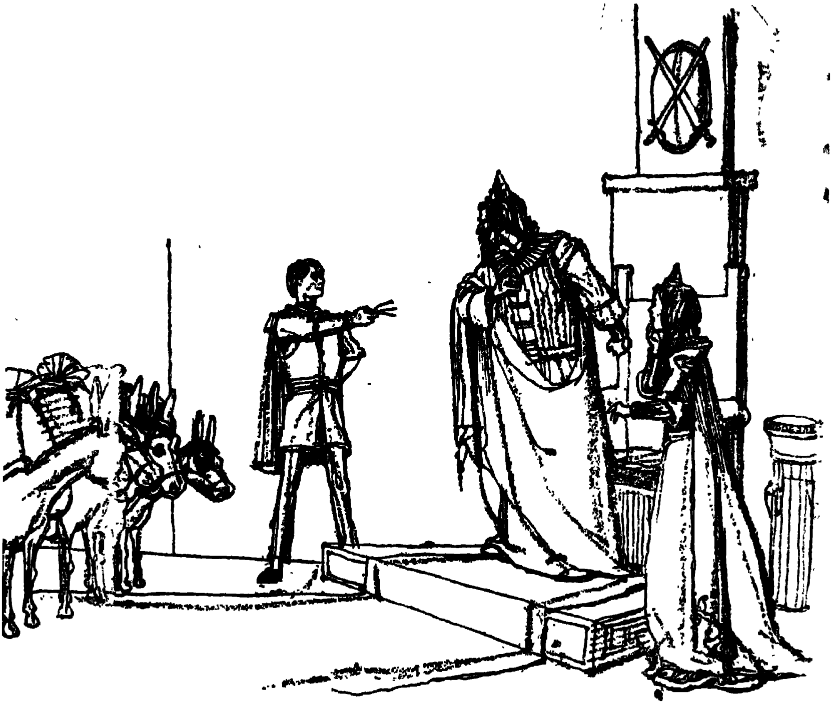
গুহা থেকে রাক্ষস বেরুতে বুড়ি দাসী তার পোশাকের ভাঁজ থেকে তিন গাছা সোনার চুল বার করে ছেলেটিকে আবার মানুষ করে দিল। তার পর বলল, "এই নাও তিন গাছা সোনার চুল কিন্তু তোমার প্রশ্নগুলোর যে-উত্তর রাক্ষস দিয়েছিল সেগুলো শুনেছিলে তো?"

ছেলেটি বলল, "খুব ভালো করেই শুনেছি। কথাগুলো মনে থাকবে।"

দাসী বলল, "তোমার কাজ তা হলে সারা হয়েছে। এবার ফিরতে পার।"

সাহায্য করার জন্য বুড়ি দাসীকে ধন্যবাদ দিয়ে ধোঁয়াটে গুহার মধ্যে থেকে সে বেরুল। ভালোয়-ভালোয় কাজ হাসিল হওয়ায় মনে তার আনন্দ আর ধরে না।

খেয়াঘাটে পেঁৗছে আগে সে নদী পার হল। তার পর রাক্ষসের মুখে শোনা প্রশ্নের উত্তর খেয়ামাঝিকে সে জানাল। বলল, "এর পর প্রথম যে-লোক নদী পার হতে আসবে নৌকোর বৈঠে তার হাতে ধরিয়ে দিতে পারলেই তোমার ছুটি।"



তার পর সে পৌঁছল সেই বাঁজা গাছের শহরে। সেখানকার প্রহরীও তার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে ছিল। ছেলেটি বলল, "যে-ইঁদুর শেকড় চিবুচ্ছে সেটাকে মেরে ফেল। তা হলেই আবার সোনার আপেল ফলবে।"

প্রহরী তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে উপহার দিল দুটো গাধা। তাদের পিঠে বস্তা-বস্তা সোনা।

তার পর সে পৌঁছল সেই শহরে, যেখানকার ফোয়ারা শুকিয়ে গিয়েছিল। প্রহরীকে সে বলল, "ফোয়ারার মধ্যে একটা পাথরের নীচে একটা কোলাব্যাঙ আছে। সেটাকে খুঁজে বার করে মেরে ফেল। তা হলেই আবার ফোয়ারার মধ্যে থেকে প্রচুর আঙুর-রস ঝরবে।"

প্রহরী তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে উপহার দিল আরো দুটো গাধা। তাদের পিঠেও বস্তা-বস্তা সোনা।

অবশেষে সেই ভাগ্যবান ছেলেটি ফিরে এল তার বউয়ের কাছে। তাকে ফিরতে দেখে আর ভালোয়-ভালোয় সব হাঙ্গামা চুকেছে শুনে রাজ-কন্যের আনন্দ আর ধরে না। তার পর রাজাকে সে দিল রাক্ষসের তিন গাছা সোনার চুল।

চারটে গাধার পিঠে বস্তা-বস্তা সোনা দেখে রাজা খুব খুশি। তিনি বললেন, "সব শর্ত পূর্ণ হয়েছে। এখন আমার মেয়ে তোমার হল। কিন্তু বাবাজি বল—অত সোনা কোথায় পেলে? যা এনেছ সেটা তো বিরাট সম্পত্তি।"

সে বলল, "একটা নদী আমাকে পেরুতে হয়। তার অন্য তীরে এই সোনা। সেখানকার বালিই সব সোনার।"

রাজা ছিলেন খুব কৃপণ। তাই প্রশ্ন করলেন, "আমিও সেখান থেকে এত সোনা আনতে পারি?"

ছেলেটি বলল, "যত খুশি আনতে পারেন। সেখানে এক খেয়ামাঝি আছে। তাকে বলবেন নদীটা পার করে দিতে। ওপারে গেলেই সোনা দিয়ে আপনার বস্তাগুলো ভরতে পারবেন।"

লোভী রাজা সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করলেন। সেই নদীর তীরে পৌঁছে খেয়ামাঝিকে ইশারায় তিনি বললেন তার নৌকো নিয়ে আসতে। খেয়া-মাঝি তাঁকে নিয়ে অন্য তীরে পৌঁছে রাজার হাতে বৈঠা তুলে দিয়ে এক লাফে নৌকো থেকে নামল। এইভাবে পাপের সাজা হিসেবে রাজাকে হতে হল খেয়ামাঝি।

"এখনো কি তিনি সেখানে?"

"নিশ্চয়ই; কারণ কেউই তাঁর হাত থেকে নৌকোর বৈঠা নেয় নি।"